উত্তর সাগরের তীরে

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

অভিব্যক্তি

পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর : ১৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
১লা আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
রবি ভট্টাচার্য
২০১, মানিকতলা মেন রোড
ফ্ল্যাট নং-৪৫
কলকাতা-৭০০০৫৪

প্রচ্ছদ ঃ
বিভূতি-সেনগুপ্ত

মুদ্রকঃ
অশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

তিরিশ টাকা

॥ ১ ॥

সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে বিপুল পাহাড়ের চূড়োতে উঠে নীচে রাজগীরের সমস্ত দৃশ্যটা চোখে পড়ল। চোখে পড়ল বিপুল-বৈভার-গৃধ্রকূট-সপ্তপর্ণী-উদয়গিরি ঘেরা মাঝখানকার জংগলভরা জায়গাটা। এই ডিসেম্বরের শীতেও কী অদ্ভুত শ্যাম দেখাচ্ছে। সেদিকে চোখ রেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে পিছন থেকে স্পর্শ করল। চমকে উঠলাম। এই প্রায় সন্ধ্যাবেলায় এখানে তো কারুর থাকার কথা নয়।

পিছন ফিরে তাকিয়ে কিন্তু অবাক হলাম।

দেখি এক দীর্ঘাকার মূর্তি। গেরুয়া আলখাল্লায় ঢাকা। রংটা সব চেয়ে আগে চোখে পড়বার মতো। একেবারে খাস বিলিতী। মুড়ানো মাথা। সমস্ত মাথা ঘিরে একটা ঘননীল আভা ফুটে বার হচ্ছে। কটা চোখ—চাপা রহস্যে উজ্জ্বল। মূর্তি মুচকে মুচকে হাসছে।

বারবার মনে হতে লাগল, এ চেহারা যেন কোথায় দেখেছি। এ হাসি যে আমার বিশেষ পরিচিত। অথচ মনেও পড়ছে না ঠিকমতো।

কয়েক মুহূর্ত আমার কেটে গেল দ্বিধায়। তারপর হৈহৈ করে উঠলাম। আরে আরে জ্যাক! জ্যাক, তুমি এখানে এলে কবে? আর এলে তো আমায় আগে জানাওনি কেন? মাথার চুল মুড়োতে গেলে কোন দুঃখে? আর এ অদ্ভূত পোশাকই বা পরলে কোন খেয়ালে?

জ্যাক ততক্ষণে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। বললে, আমি দূর থেকে তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়েই চিনতে পেরেছি। কিন্তু লজ্জায় দ্বিধা এসেছিল। দেখা করব কী করব না। ভারতে এসেছি প্রায় তিন মাস। এতোদিন নিশ্চয় আমার তোমার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল। অন্ততঃ চিঠি লিখে জানানও। কিন্তু পায়ে হেঁটে সব তীর্থগুলো দেখতে দেখতে আসছি বলে দেরী হয়ে গেল। ভেবেছিলাম সব শেষে যাব কলকাতায়। গিয়ে তোমাকে চমকে দেবো। কিন্তু তা হল না—

আমার দৃষ্টির ঘোর তখনও কাটেনি। বিস্ময়ভরা চোখে তখনও তাকিয়ে ছিলাম জ্যাকের এই অদ্ভুত বেশের দিকে। দেখছিলাম ওর স্কট চেহারায়

এই গেরুয়া আলখাল্লাটা কোথাও বেমানান দেখাচ্ছে কিনা। দেখছিলাম ওর চওড়া কপালের নীচে ছোট ছোট চোখ দুটি। ওর আগের সেই চঞ্চল চাউনী তো কই আর টের পাচ্ছি না। আশ্চর্য হচ্ছিলাম বড় কম নয়। এ প্রশান্তি ওর চোখে মুখে এলো কেমন করে?

ভাবলাম এতো দিনে তা হলে অশান্ত জ্যাক শান্ত হয়েছে। নাকি এও ওর নানান খেয়ালের মতো আরও একটা খেয়াল।

জ্যাককে দেখছি আর নানা কথা ভাবছি। আমার দৃষ্টির সামনে ও যেন বেশ একটু কুঁচকে গেল।

মৃদু মন্দ হাসি হাসতে হাসতে বললে, শেষ পর্যন্ত ভারতে এসে আমি বৌদ্ধ হলাম বোধি। নালন্দার ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী আমাকে দীক্ষা দিলেন। এখন আমি আর জ্যাক নই। আমার নাম আনন্দ।

একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগল, আমার প্রোফেসর ম্যাকিন্টরের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। আর তিনি তোমার সামনেই আমাকে যে কথা বলেছিলেন তাও ভোলনি নিশ্চয়। মিস্টিসিজম্ ছাড়া মানুষের মনে পূর্ণ শান্তি আসতে পারে না। সেই পূর্ণ শান্তিকে, সেই সুপ্রীম ব্লিস্‌কে যদি লাভ করতে চাও তবে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদই হল তার সবচেয়ে বড় পথ। এ আমার পরীক্ষিত সত্য জ্যাক। প্রোফেসরের এই কথা কটাই শেষ পর্যন্ত আমার সম্বল হল।

মনে আমার হাজার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আর হলও তাই। মনে পড়ল মাত্র মাস ছয়েক আগে জ্যাক কারগফ ইউথ হস্টেল থেকে আমাকে যে শেষ চিঠি-খানা লিখেছিল তারই কথা।

বোধি, তুমি কী ভাবতে পারছ যে এই পাহাড়-জংগল্-ভরা দুনিয়া-ছাড়া নির্জন একটি গাঁয়ে গত দুমাস আমি রয়েছি। এই গাঁটার একটেরে হল এই ইউথ হস্টেলটা। এর ওয়ার্ডেনের ঘরে বিছানায় শুয়ে আমি এখন তোমাকে চিঠি লিখছি। আমার সামনে বেকন আর এগ ভাজছে আমারই ব্রেকফাস্টের জন্যে কে ভাবতে পার? আমি জানি তুমি পারবে না। কারণ আমার ঘরোয়া-সঙ্গিনী হিসাবে যাদের সবচেয়ে আগে মনে পড়ার কথা তারা কেউই এখন আমার সঙ্গে নেই। না-না, ইউনিভার্সিটির কোন মেয়েও আমার জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরী করছে না। অথচ একে তুমি চেনো। খুব ভাল করেই চেনো। তোমাকে আমি ভাববার অবকাশ দিলাম বোধি। তোমার অনুমান আমাকে লিখে জানিও পরে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আমার কী মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে যেন বিয়ের পর আমরা দুটিতে এখানে হনিমুন করতে এসেছি। এই নিরালাতে। বেশ লাগছে। দুনিয়াটা আবার একটু একটু করে ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। আবার মনে হচ্ছে বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ আছে। পরের চিঠিতে তোমাকে সব কথা সবিস্তারে জানাব। তখন জানবে মেয়েটি কে।

পরের চিঠি আর আসে নি। তবে সেদিন সেই চিঠিটা পড়ে আমার মনের মধ্যে ওর সেই বিচিত্র ঘটনায়ভরা জীবনের চিত্রগুলো ভিড় করে এসেছিল। যাদের কথা ও একদিন সারারাত জেগে আমায় শুনিয়েছিল মিসেস ব্রাউনের বাড়িতে।

আজ জ্যাককে দেখেই মনে পড়ল সেসব কথা। আর মনে পড়ল এক এক করে জ্যাকের সেই সব বান্ধবীদের যাদের অনেকের সঙ্গে আমার ছিল সাক্ষাৎ পরিচয়। আবার অনেককেই চোখে না দেখলেও জ্যাকের মুখে শোনা গল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমার মানসলোকে।

বিশেষ করে মনে পড়ে সেই একজনের কথা। সেই শ্যামা মেয়ে যাকে প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর অবধি শ্রদ্ধা করেছেন গভীর ভাবে। তাকে আমি কোনদিন চোখে দেখি নি। তবুও আমার মনে তার যে ছবি আঁকা আছে তা কি জীবনে মুছবে?

হঠাৎ মনে হল জ্যাকের এই পরিবর্তনের পথটা কী অদৃশ্য হাতে শেষ পর্যন্ত সেই-ই দেখাল?

বললাম, অনেক কথাই আজ তোমার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছে করছে জ্যাক। চল নেমে আমার বাসায়। গল্প করা যাবে।

ও বললে, বোধি, শীতের বেলা এই গড়িয়ে এল। দেখো নীচে চারপাশে অন্ধকার জমতে আরম্ভ করেছে। আমাকে এখুনি এখান থেকে পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে নালন্দায়। সেইখানেই আপাততঃ কদিন আছি। তুমি বরঞ্চ সেইখানেই এসো না কাল কী পরশু দুপুরে। আমারও অনেক কথা জমে আছে। তোমাকে না বলে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না।

বলে সে আর দাঁড়াল না। পিছন ফিরেই সিঁড়ি দিয়ে হনহন করে নামতে লাগল। আমি সেই আবছা অন্ধকারে বিপুল পাহাড়ের ওপর হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিপুল পাহাড়ের ওপর থেকে বিকেলের আগেই ভ্রমণকারী আর যাত্রীরা সব নেমে গেছে। আমি এগিয়ে গিয়ে জৈনমন্দিরটার পৈঠার ওপর বসে পড়লাম। ক্রমশঃ সেই ধূসর সন্ধ্যায় মনে ভেসে এল, বহুদূরে সাত সাগর পারের সেই দেশটি। তার আকাশ বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি এমন কী মানুষগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত আমি মাত্র এই ক' বছর আগেও কী ভাবেই না মিশে গিয়েছিলাম।

আবার্ডিনের ল্যান্ডলেডী মিসেস ব্রাউনের বুড়ী বোন আন্টি জেনের কথা মনে পড়ল। বোধি, তুমি যে এখানে কোন দিন ছিলে না তা যেন মনেই হয় না। তোমাকে স্কট্ ছাড়া আর কিছু যেন ভাবাই যায় না। আচ্ছা তুমি দেশে গিয়ে আমাদের ছেড়ে থাকবে কেমন করে বলত?

শীলাও একদিন ক্যালিডোনিয়ান হোটেলের একটা নির্জন কোণে কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়া থামিয়ে বলেছিল, আচ্ছা বোধি, কী করে এমনটা সম্ভব হয় ? তুমি তো এখানে বিদেশী। তোমার ভাষা আমি বুঝি না, তোমার দেশের রীতি নীতি কিছুই জানি না। তোমার দেশের লোকেদের চেহারা তাদের ধরন ধারণ এদেশের থেকে তো কত আলাদা। তবু তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর মুহূর্ত থেকেই আমার মনে হয়েছে তুমি তো এখানে মোটেই নতুন নও। তুমি যেন এখানকারই একজন। তোমার সঙ্গে যেন আমার মনের মিতালী বহুদিনের।

স্মৃতির ওপরে যেন এতদিন একটা আবছা পর্দা পড়ে গিয়েছিল। আজ জ্যাকের দেখাটা একটা দমকা হাওয়ার মতো সে পর্দাটা উড়িয়ে দিতেই ভিতরে দেখলাম সে আগুন এখনও বেশ উজ্জ্বল।

একটা অদ্ভুত আবেগ মুহূর্তে যেন আমাকে ছেয়ে ফেলল।

আমি যে বিপুল পাহাড়ের ওপরে বসে আছি একথা আমি মুহূর্তে ভুলে গেলাম। মনে হল এ অঞ্চলটা যেন ব্রীমার। আমি বসে আছি ব্রীমারের গা দিয়ে কেয়ার্ণব্রকহেড বলে যে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে তারই মাথায়। একটু উত্তরে যদি চলে যাই তবে হয়তো দেখতে পাব তুষারমৌলী কেয়ার্ণগর্মকে। ওই যে নীচে কতকগুলো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে একফালি লম্বা রাস্তা বেরিয়ে গেছে ওটা ধরে কিছুদূর গেলেই হয়তো পোঁছে যাব লীন-ও-ডী—ডী নদীর উৎসের কাছে। শহরের ভিতর খোঁজ করলে এখনও হয়তো দেখা পেতে পারি সেই এক রাতের বন্ধু বিল পেট্রিকে। হাসিমুখে তার বাড়ির দরজায় হয়তো এখুনি ছুটে এসে অভ্যর্থনা করবে তার সেই সুন্দরী ছেলেমানুষের মতো বৌ মেরী।

আঁৎকে উঠলাম। আলসেসিয়ানের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে শুনতে পেলাম জিমি রবার্টসনের সেই ভয়ার্ত আর্তনাদ। আর সব শব্দ ছাপিয়ে মেরীর সেই রাতের চীৎকারটা যেন বীভৎস হয়েই সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজল। তুমি শয়তান। একটা আস্ত শয়তান। নৈলে এমন সর্বনাশ আমাদের তুমি কক্ষনো করতে না।

অতটুকু একটা ছেলেমানুষের মতো চেহারা। কিন্তু কী দুঃসাহসিক ছিল মেরীর বুকের পাটা।

জিমি রবার্টসনের কথা মনে হতেই মনে একটা তীব্র উত্তাপ অনুভব করলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আলেক্স-এর সেই ডাগর ডাগর শান্ত চোখ দুটো মনের পটে ভেসে উঠে সে তাপকে তক্ষুনি জুড়িয়ে দিলে। মনে পড়তে লাগল তার সেই হালকা গলার মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো আর সেই অদ্ভুত হাসি। কাঁদবে না বলেই যেন ওর কান্নাগুলো হাসি হয়ে ঝরত। ওর সঙ্গে জিমিকে কী

মেখাপাই না ঠেকত। ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই আমার যে উপমাটি মনে পড়ত, সেটি হল কাঁচপোকা আর আরশুলার। নিজের অজান্তেই ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে আমাকে মুহূর্তের জন্য সচকিত করে দিল।

বেচারা আলেক্স্। কী জানি এখন তার কী দশা হয়েছে!

॥ ২ ॥

বিপুল পাহাড়ের উপর অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। পাহাড়ে ঝিঁঝির তীক্ষ্ম কর্কশ শব্দ একসঙ্গে বাজতে শুরু হল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মন যেন আমার বল্গা ছেড়ে দিয়েছে। ভেসে চলেছি স্মৃতির জোয়ারে। কলকাতার নানান কাজের ভীড়ে যে কথাগুলো সব সময়েই ভুলে থাকি। আজ এই শীতের মৌনসন্ধ্যায় যেন তারা সুযোগ বুঝে সব বাধা ভেঙে বেনো জলের মতো মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কোথায় ভারতবর্ষের একপ্রান্তে বিপুল পাহাড় আর কোথায় আট হাজার মাইল দূরে দুস্তর সাগরপারে হিমজমানো, কুয়াশায় ঢাকা এক ধোঁয়াটে দেশ। এখানে বসে তার কথা সব হয়তো স্বপ্ন বলেই মনে হয়। তা হোক। তবু তার নিসর্গের ঐশ্বর্য উজাড় করে, তার বহু নরনারীর অন্তর নিঙড়ে, যে ভালবাসা, যে আনন্দ বেদনার রস সে আমাকে পান করিয়েছে তা কি জীবনে ভুলতে পারব? আজ এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যাবেলাতে, নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় বসে স্মৃতির অতলে ডুবে গিয়ে দেখলাম সেখানে আজও অম্লান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে উত্তর সাগরের তীরে—বনি স্কোশিয়া।

বনি স্কোশিয়া। সুন্দরী স্কটল্যাণ্ড। হেদার-হেজ-টিউলিপ-ড্যাফোডিল-ড্যাণ্ডিলায়ন আর ডেজীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ওক্-এলম্-বার্চ-বীচ্—এ্যাডলার-ফার আর স্কচপাইনের শ্যামসমারোহ। ছোট্ট পাহাড়ে নদীগুলোর চঞ্চলা মেয়েদের মতো এখান সেখান দিয়ে খেয়ালখুশী মাফিক ছুটে চলা। থ্রাস আর লার্কের গান। ব্ল্যাক-বার্ড আর স্টার্লিংদের কিচিরমিচির আনন্দ কলরব। সোয়ালোর লুকিয়ে-থাকা-অদেখা-বাসা থেকে ভেসে আসা লম্বা সরু শিসের আওয়াজ। দীর্ঘদিনের পর সুন্দরী স্কটল্যাণ্ড জেগে ওঠে। কবে কোন হেমন্তের প্রারম্ভে কে যেন তুষারশুভ্র রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ছিল তার গায়ে। ঘুমিয়ে পড়েছিল সুন্দরী স্কটল্যাণ্ড। বসন্তে সোনার কাঠির ছোঁওয়া লাগে। আস্তে আস্তে বনি স্কোশিয়ার সে ঘুম ভাঙে। রিক্ত পত্রহীন ডাল-গুলোতে গুঁড়ি গুঁড়ি পোকা বসার মতো দেখা যায় পত্রশিশুদের উঁকি ঝুঁকি। ধুক ধুক করে তাদের কচি-বুকে প্রাণস্পন্দন। তারপর হু-হু করে তারা জাগতে থাকে। দু' একদিনের মধ্যেই ডালে ডালে দেখা যায় মথের ডানার

মতো পাক খোলা পাতাদের সবুজ অভিযান। নতুন পাতায় পাতায় গাছগুলো ছেয়ে যায়। মাটিতে ভুঁই চাঁপার মতো ফোটে অজস্র ক্রকাসের দল। সাদা, ফিকে-লাল, হলুদে, বেগুনী। তারপর আসে ড্যাফোডিলরা। হলুদে উজ্জ্বল রঙে রোদের রেখা ছড়িয়ে দেয় পাহাড়ে, প্রান্তরে, অরণ্যে।

গ্রীষ্মে স্কটল্যাণ্ড সাজে রাণীর সাজে। সবুজ শাড়ী ঘিরে পরে তার সারাটি অঙ্গে। তার পীনদ্ধ শরীরের ঘন উচ্চাবচ রেখা ঢেউ খেলিয়ে চলে যায় মাইলের পর মাইল। শাড়ীর জমিতে কাজ করে আঁধার আকাশে অগুণতি নক্ষত্রের মতো অজস্র ডেজী। লাল-হলুদে-বেগুনী। নানান রঙের। কাপড়ের পাড়ে বসিয়ে দেয় হেজের ঝাড়। গোছায় গোছায় ফোটে তাদের ফুল। সারা অঙ্গে তার আভরণ তৈরী করে সাইক্লামেন, প্রিমিওলা আর রোডোড্রেণ্ডনের গুচ্ছ। সুন্দরীর গণ্ডে লাগে তখন হেদারের অভ্র-আবীর আভা। স্কটল্যাণ্ড রূপে ঝলমল করে। অনাবিল রোদে প্রসন্না হয়ে ওঠে।

আমার মনে কে যেন আজ সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে গেল রাজগীরের এই দারুণ শীতের মধ্যেও। সেখানেও দেখছি জেগে উঠছে আজ বনি স্কোশিয়া। অনুভব করছি আমার বুকের মধ্যে তার প্রাণস্পন্দন।

বনি স্কোশিয়া। নামটায় কী যেন একটা মোহ আছে। মনে পড়ল স্টোনহাভেনের সমুদ্রের ধারে উঁচু পাহাড়ে জমিটার কথা। নীচে—অনেক নীচে শীতের কুয়াশা আর ধোঁয়া ঢাকা উত্তর সাগরের ঢেউ ভেঙে পড়ছে। আমি উঁচু পাহাড়ের পাড় বেয়ে চলেছি। মনে হল কে যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। ব্যাগপাইপ এদেশে জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সুতরাং তাতে খুব আশ্চর্য হই নি। আশ্চর্য হয়েছিলাম যে সুরটা ব্যাগ-পাইপে বাজছিল তাই শুনে। সুরটা কানে যেতেই মনে আছে আমার সর্বদেহ মনে রোমাঞ্চ হয়েছিল। সুরটা ছিল—রবীন্দ্রনাথের 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা' গানটার মতো।

বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার সেদিনকার কথা। দেখলাম একজন বিরাটকায় ব্যক্তি একটা ওক গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে তন্ময় হয়ে পাইপ বাজাচ্ছে। পরনে কিল্ট, সামনে ঝুলছে লেস্ আর হর্ণ। তার সব পোশাকটাই ম্যাকবেথ টার্টানের। পায়ে টার্টানের মোজা। তাতে গোঁজা ছুরি। এ হল হাইল্যাণ্ডারদের খাঁটি জাতীয় পোশাক। বেশ লেগেছিল আমার লোকটিকে। আমি তার ধ্যান ভাঙাইনি প্রথমে। তার বাজনা শেষ হতে আমি গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম।

লোকটি পাইপটা পাশে রেখে ঘাড় নেড়ে খাঁটি গ্যালিক উচ্চারণে বলেছিল, ফুইরিয়ে ডিন ? কেমন আছ ?

জবাবে আমি ওর কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, এ সুর তুমি কোথায় পেলে ? এ তো আমাদের কবি টেগোরের সুর।

সে বলেছিল, তাতো জানি না। তবে পাঁচশ' খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি স্কটেরা যখন উত্তর আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসে ডালরিয়াডা রাজ্যের পত্তন করেছিল তখন বোধ হয় তাদের সঙ্গেই এ সুরটা এসেছিল এদেশে। বলেই সে একটু হেসে গম্ভীর ভরাট গলায় গান ধরেছিল—

মাই বনি লাইজ্ ওভার দি ওসেন্
মাই বনি লাইজ ওভার দি সী
মাই বনি লাইজ্ ওভার দি ওসেন্
ও ব্রিং ব্যাক্ মাই বনি টু মী।
ব্রিং ব্যাক্, ব্রিং ব্যাক্ ও ব্রিং ব্যাক্ মাই বনি
টু মী-ঈ-ঈ
টু-উ-উ মী-ঈ-ঈ।

মুগ্ধ হয়ে সে গান শুনেছিলাম। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কে তোমার বনি ? কোথায় গেছে সেই বনি ল্যাসী ?

সে জবাব দিয়েছিল, খাঁটি স্কটের কাছে বনি হল তিনজন। বনি প্রিন্স চার্লি, বনি ল্যাসী কুইন মেরী আর বনি স্কোশিয়া। আমার বনিরা সমুদ্রের উপর দিয়ে ইংলণ্ডে চলে গেছে। বহুদিন হয়ে গেল। তারা আর সেখান থেকে ফেরে নি। তাই আমি এ গান গাই। তাদের গল্প যদি শুনতে চাও তবে এখানে এসো মাঝে মাঝে। ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে আমার কাঠের কেবিন।

লোকটাকে সেদিন মনে হয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের চারণ। রাজপুত চারণদের মতোই মনে হয়েছিল তার স্বদেশপ্রেম। মনে মনে তাকে ভাল না বেসে পারি নি। আর ভালবেসেছিলাম তার মুখে শোনা বনি স্কোশিয়া নামটি।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্কোশিয়া তো ইংরেজী কী স্কচ কথা নয়।

সে আস্তে আস্তে বলেছিল এটা আমরা রোম্যানদের কাছ থেকে পেয়েছি। বিখ্যাত রোম্যান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাশের শ্বশুর এগ্রিকোলা তিরাশী খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ড জয় করেছিলেন। তখন থেকেই তারা একে স্কোশিয়া বলে ডাকত।

হঠাৎ এক ঝলক দারুণ ঠাণ্ডা বাতাস এসে আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চমক ভাঙল। একা এতো রাত্তিরে এই পাহাড়ের ওপর থাকা ঠিক নয়। মনে পড়ল সেকথা। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলাম। দ্বিতীয়ার চাঁদ শীতের কুয়াশা ঢাকা আকাশে মেটে জ্যোৎস্নার একটা রহস্যময় জাল বুনছে।

আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলাম। আজ

সুন্দরী স্কটল্যাণ্ডের আত্মা যেন অদৃশ্য দুহাত দিয়ে একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আমাকে ভিতর দিকে টানতে শুরু করেছে। বাইরে নিথর রাত ঝিম্‌ঝিম করছে। নামতে নামতে হঠাৎ অনুভব করলাম যেন আমার মনে একটি পরম মুহূর্তের পদপাত হল। আর সেই মুহূর্তেই দেখলাম আমার ভিতর বাহির সব কখন এক হয়ে গেল। চোখের সমুখে রাজগীরের পঞ্চচূড় পাহাড়—তাদের আবছা আলো-আঁধারে ঢাকা রূপটি নিয়ে যেন একেবারে মিশে গেল স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে। আর সেই মিলন মুহূর্তে আমার সমস্ত মন আলোতে ভরিয়ে দিয়ে সেখানে ভেসে উঠল সৌম্যমূর্তি শুদ্ধসত্ত্বের মুখখানা।

আজ অনুভব করলাম স্কটল্যাণ্ড দেখা আমার যেন বিশ্ব দেখারই অনুরূপ। স্কটল্যাণ্ড না গেলে, শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় না হলে, হয়তো কোনদিন আমার এ দেখার চোখ খুলত না। আজ অন্তরে উপলব্ধি করলাম, শুদ্ধসত্ত্বের কথাগুলো যেন কবে কেমন করে আমার সমস্ত সত্ত্বায়, আমার প্রতিটি চিন্তার অণুতে অণুতে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। সেগুলি তো শুধু তার মুখের কথাই ছিল না তারা ছিল আত্মদর্শন করাবার, বিশ্বদর্শন করাবার প্রাণময় প্রতিভূ।

অথচ এই শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে আমার আত্মদ্বন্দ্বের অবসান আজও হয় নি। তার মহত্তর অনুভূতির কথা মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় তার চরিত্রের বিপরীত দিকটার কথা। আমি আজও ভেবে অবাক হই, সমস্ত মানুষ জাতটাকে যে আপনার বলে মনে করে' জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যে কোন আর্তের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে সব সময়েই প্রস্তুত, একমাত্র নেলী নেলসনের প্রতি সে কেন এত নিষ্করুণ ছিল। তার কঠোর আচরণ এক এক সময়ে সীমা ছাড়িয়ে এমন অবস্থায় আসত যে তখন শুদ্ধসত্ত্বকে কোন রকমে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করা চলত না।

পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রায় মাটিতে এসেছি। নেলীর রূপটা আমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একবার ঝিলিক মেরে গেল। কী অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। পূব-পশ্চিমের মধ্যে অমন রূপ আমার চোখে কোনদিন পড়ে নি। কী দৃপ্তোজ্জ্বল উন্নত চেহারা। যেন রাজরাণী! তার রূপের মধ্যে, তার প্রকৃতির মধ্যে গর্ব আর মহিমার ছিল এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। কিন্তু সেই নেলীকেই আর একদিন দেখেছিলাম নিতান্ত অসহায়ের মতো লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে।

থাক সে কথা। মনে পড়ল রাত অনেক হয়েছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম নীচের দিকে।

বিপুল পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে গেল সেই দিনটার কথা। সেটা বোধ হয় নভেম্বরের শেষের দিকে একটা দিন। তখনও আমি সাউথ কনস্টিটিউশন স্ট্রীটের মিসেস মরিসনের বাড়ির বোর্ডার। সবে সন্ধ্যাবেলা হাই-টীতে বসব এমন সময় টেলিফোন বাজল ঝনঝন করে। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই ওপার থেকে প্রশ্ন এলো আপনি কী মিঃ মৈত্রেয় ?

—হাঁ। কিন্তু আপনি কে ? কী জন্য আমায় খুঁজছেন ?

জবাব এলো, আমি কে সে পরিচয় টেলিফোনে দেবো না। মুখো-মুখি বসে মুখ দেখতে দেখতে কথা না বললে কী পরিচয় দেওয়া যায় ? না দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ? তার চাইতে আসুন একটু পরে ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে। সেখানে আলাপ করব। আর যে জন্যে আপনাকে খুঁজছি তা সাক্ষাতেই বলব।

আমার ভারী মজা লাগল। বারবার ভাবলাম কে ভদ্রলোক। এখানে এই কদিনে এমন কোন লোকের সঙ্গে তো আলাপ হয় নি যে আমার সঙ্গে এমন রসিকতা করতে পারে। ব্যাপারটিকে নিছক একটা রসিকতা বলেই মনে হয়েছিল আমার সেদিন।

তাড়াতাড়ি হাই-টী সেরে চলে এলাম ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে। আবার্ডিনের বিখ্যাত হোটেল। এসে সরাসরি হোটেলে না ঢুকে তার সামনের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মিনিট দুই পরেই যে লোকটি হঠাৎ এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরল তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এ যে সেই লণ্ডন থেকে গ্লাসগো আসবার পথে কোচের মধ্যে দেখা আমার সহযাত্রীটি। লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। বলিষ্ঠ হাতের চাপ দিয়ে সে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। গুড্ ইভ্নিং ! হা-ডু-ডু। আমাকে চিনতে পারছ তো ?

বললাম, তাতো পারছি। কিন্তু—

—কিন্তু কি ? খুব অবাক হয়েছ নয় ? তোমার ঠিকানা পেলাম কোথা থেকে—

দেখি লোকটির পুরু লেন্সের চশমা-পরা ছোট ছোট চোখ দুটো কিছু একটা যেন মজা পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখে একটা অনাবিল শিশু-সুলভ ভাব খেলা করছে।

আমাকে নির্বাক থাকতে দেখেই সে হো-হো করে হেসে উঠল। একেবারে দমকে দমকে হাসতে লাগল। বললে, দেখ তুমি তো আমার কিছুই জানো না। আমি কিন্তু তোমার সব খবরই রাখি। হাঃ হাঃ হাঃ। তোমাকে কেমন অবাক

করে দিলুম নয় ? এসো হোটেলে বসে কিছু খাওয়া যাক।

গম্ভীর ভাবে বললাম, না—

সে ব্যস্ত হয়ে বললে, কেন ?

তার হাসি আমার গম্ভীর স্বরে খানিকটা নিভে গেল।

বললাম, আলাপ তো হয়েছে একতরফা। তুমি আমার সবই জানো। কিন্তু আমি তো তোমার নামটা পর্যন্ত জানি না। কাজেই আমি তোমার ফ্রেণ্ড হলেও তুমি তো আমার ফ্রেণ্ড নও। কী করে তোমার নিমন্ত্রণ নিই বল ?

দেখি তার অত হাসিখুশি ভরা মুখটা ঝট্ করে একেবারে শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, দুঃখিত, দুঃখিত—ভারী দুঃখিত আমি। তুমি কিছু মনে কোরো না, প্লিজ। দেখ কাউকে অবাক করে দিয়ে মজা করতে পারলে আমি দুনিয়ার আর কিছুটি চাইনে। আর তার জন্যে কতো লোককে যে চটিয়ে দিই তারও ঠিক নেই। সেজন্যে খেসারৎও দিতে হয় প্রচুর। তবুও—। যাক গে—আমার নাম জন ম্যাকফারসন। জ্যাক বলে তুমি আমায় ডাকতে পার।

লোকটি এক মুহূর্তে অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। বললে, আরে এসো এসো। ভেতরে এসো। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব বলে আমার দুজন ফ্রেণ্ডকে এখানে আসতে বলেছি।

বলতে বলতে জ্যাক কাঁচের দরজা ঠেলে আমাকে নিয়ে হুড়মুড় করে হোটেলের ভিতর ঢুকে পড়ল। দেখি সামনের ওয়েটিং বক্সে কতকগুলি মেয়ে পুরুষ বসে আছে—দেখে মনে হল বন্ধু-বান্ধবীর জন্যে প্রতীক্ষমান। আমরা গিয়ে একধারে বসে পড়লাম। পাশের একটি জোড়ের সঙ্গে জ্যাক আলাপ করিয়ে দিল।

এ জেম্স্ রবার্টসন,সোজাসুজি জিমি। আর এই জিমির বান্ধবী আলেক্স্ ফ্রেজার। ভারি মিষ্টি আর ভাল মেয়ে। পরিচয় হলেই বুঝতে পারবে—

জিমি রোগা আর বেঁটে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা রুক্ষ এলোমেলো সোনালী চুল। ছোট ছোট চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। আর আলেক্স্ সাড়ে পাঁচ ফুটের কাছাকাছি। ভারী গড়ন। চওড়া হাড়। বড়সড় ভরাট মুখে বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ। ঠোঁট দুটো পাতলা আর আশ্চর্য রকমে অভিব্যক্তিব্যঞ্জক। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আলেক্স্-এর চোখ আর ঠোঁট সব সময়ে হাসে। সেই সঙ্গে দেখলাম এ হাসি আনন্দের হাসি নয়। মনে হল যেন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কোন গভীর কান্না।

পরিচয় শেষ হতেই সেখান থেকে উঠে হোটেলের একটি কোণ নিয়ে ক'জনে বসে পড়লাম। সামান্য কিছু দিয়ে শুরু করে কফিতে এলাম। গল্প চলতে লাগল। জ্যাক জিমির পরিচয় দিয়ে বললে, জিমি হল কবি। ইলিয়ট-উত্তর যুগের কাব্য তার আদর্শ। লরেন্স—অডেনের ছাঁদে কাব্য লেখে। তবে জিমির

অন্য একটা পরিচয়ও আছে। সে তোমার বাড়িওয়ালী মিসেস মরিসনের ভাইপো। তোমার ঠিকানা আমি জিমির কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি।

একটু থেমে, আমার পরিচয় দিয়ে জ্যাক বললে, মিস্টার মেত্রেয় যে কী তার প্রমাণ এখনও পাই নি বটে। তবে ধরে নেওয়া যায় ইনি প্রাচ্যের একজন জ্ঞানী।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল হো হো করে। হাসি থামিয়ে বললে, ইণ্ডিয়ান পোয়েট টেগোরের বাড়ির কাছে ওর বাড়ি। কলকাতাতে। আমি ওকে আজ ডেকেছি এখানে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্বন্ধে কিছু শুনব বলে। অফ্ অল টেগোরকে আমার ভারী ভালোলাগে।

বললাম, মিস্টার রবার্টসন, মিস্ ফ্রেজার টেগোর আপনাদের কেমন লাগে?

আলেক্স্ তার মিষ্টি গলায় স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বললে. কবিতা আমি খুব বেশী পড়ি না। বুঝতে পারি না বলে। কাজেই আমার মতামত গৌণ। ওই কবিকেই জিজ্ঞাসা করুন তার মত কী?

জিমি বললে, টেগোর আমি পড়েছি। হ্যাঁ, ভাল করেই পড়েছি। অন্ততঃ যতগুলোর ইংরাজীতে অনুবাদ হয়েছে তাদের সবগুলো তো বটেই।

তারপর গলার আওয়াজ যথাসম্ভব নিরাসক্ত করে বলে উঠল, হ্যাঁ—তা মন্দ লাগে না। তবে সত্যি কথা বলতে কি বড্ড বেশী ভাবালুস। মানে এক কথায় বলা যায় টেগোর ভিক্টোরিয়ান রোমাণ্টিসিজ্মের বোধ হয় শেষ কবি। অবশ্য তার পরে কাব্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কাব্যের ধারা একটা অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ পথ নিয়েই চলেছে এখন আমাদের দেশে। বোধ হয় ইণ্ডিয়াতেও। এখনকার কাব্য হল সব ইঙ্গিত-ধর্মী, সিম্বলিক। এখনকার কাব্যে তাই দেখতে পাবে ইন্টেলেক্চুয়াল সিম্বলের কী রকম যথাযথ প্রয়োগ।

জ্যাক বললে, জিমি, কবিতা সব যুগে সব কালেই ইঙ্গিত-ধর্মী। ওটা আর বিশেষ কী হল!

জিমি ঠোঁট কুঁচকে হি হি করে হাসতে হাসতে বললে, কাব্য লেখা কী অত সহজ? পড়ে দেখো আমার Gentle Craftsman যদি সবটা বুঝতে পার তবে বলব তোমার অক্সফোর্ডে পড়া সার্থক হয়েছে। ভাল কাব্য লিখতে উঁচু কালচার চাই, ইন্টেলেক্ট চাই। যার তার কাজ নয়।

জ্যাক আমার মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখটা নীচু করে বসে একমনে কী যেন দেখতে লাগল কফির পেয়ালায়।

আলেক্স্ বললে, জ্যাক তুমি মৈত্রেয়কে নিয়ে একদিন আমার বাড়ি এসো না। ওর কাছ থেকে টেগোরের কাব্য শুনব, আর শুনব ইণ্ডিয়ার কথা। এসো একদিন নির্ঘাৎ—কেমন? হ্যাঁ, আর একদিন তুমি ওকে নিয়ে এসো আমাদের ইউনিভারসিটি স্টুডেণ্ট্স্ ইউনিয়নে। সেখানে ওর সঙ্গে অনেকের আলাপ হবে। হয়তো সঙ্গী-সাথী বেচারার কিছুই জোটে নি। আমাদের

স্কটল্যাণ্ডের লোকগুলো বাইরের লোকের কাছে যা গোমড়ামুখো। আমরা যদি ওর হয়ে এইটুকু না করি তবে দেশে ফেরবার সময় নির্ঘাৎ উনি স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বলবেন বাবাঃ কি রাম গরুড়ের দেশেই যে গিয়েছিলুম।

একটু মিষ্টি হেসে একটা নোট বই বার করে আমাকে দিয়ে বললে, তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও তো এতে।

দিলাম ঠিকানা লিখে। সবাই মিলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। বিল মিটিয়ে দিল জ্যাক। বাইরের বারান্দায় আসতেই জিমি বললে, এখনও রাত কুমারী রয়েছে। চল কোন পাবলিক বারে যাই। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। কফি খেয়ে এ তেষ্টা গেল না।

আলেক্‌স্‌ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না—না। প্লিজ্‌ জিমি চল। আজ আমার বিশেষ দরকার আছে বাড়ি ফেরার।

আলেক্‌স্‌-এর গলার উৎকণ্ঠাটুকু আমাদের কান এড়াল না। জ্যাক ওদের গুড্‌ নাইট জানিয়ে আমার কাছে এল। বললে, চল এখন তোমার সঙ্গে একটু হাঁটা যাক। ওঃ যা ঠাণ্ডা পড়েছে ক'দিন—

জ্যাক আর আমি সটান ইউনিয়ন স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তায় প্রচুর লোকজনের ভীড়। দোকানে দোকানে নানান রঙের আলো জ্বলছে। কিন্তু সেই জনারণ্যের মধ্যে আমি আর জ্যাক একেবারে ডুবে গিয়ে ভীড় কাটিয়ে চলতে লাগলাম। জ্যাকের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে দিতে মোটেই অসুবিধা হল না সেই হাজার লোকের ভীড়ের মধ্যেও।

জ্যাক বললে, আশ্চর্য বলে মনে হয় আমার এই আধুনিক শিক্ষাসভ্যতায় পুষ্ট মানুষকে। এরা সব চায় কিন্তু মন চায় না। কেবল বাইরেরটা নিয়েই মারামারি করে।

আমার মধ্যে অনেকক্ষণ থেকে একটা কৌতূহল দানা বেঁধে উঠছিল। এবার সেটাকে প্রকাশ করলাম।

বললাম, জ্যাক তোমাকে এখানে দেখেই আমার কিন্তু মনে পড়ছে সেই রাতের সেই মেয়েটিকে। শেষ পর্যন্ত তার কী হল বলতে পার—

জ্যাক বললে, মেয়েটি বোলো না, বলো ভদ্রমহিলা। বলেই একটু হেসে উঠল।

তারপর বললে, ও বয়সে তোমার-আমার থেকেও বেশ কিছু বড়। তা হোক চেহারায় এখনো ছেলেমানুষীটি আছে। সেজে থাকলে এখনও প্রেটী বলতে বাধে না।

একটু নিস্তব্ধ থেকে গভীর গলায় বললে, মেয়েটি জীবনে কঠিন শোক পেয়েছিল। স্বামী আর বয়স্ক ছেলে কয়েক দিনের আড়াআড়িতে মারা যাওয়াতে। বড্ড ইমোশন্যাল মেয়ে। তাই শোকটা ওকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কোন কিছু ঠিক না করে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল আমেরিকাতে। পথে বাসের

মধ্যে যে কাণ্ড ঘটল তাতো দেখেছ ? কোন রকমে ওর আমেরিকা যাবার ইচ্ছেটা ছাড়িয়েছি। গ্লাসগো থেকেই ও আমার সঙ্গে আবার্ডিনে এসেছে।

বললাম, সে কি ? তুমি কী তাকে সঙ্গে নিয়ে এলে ?

জ্যাক নির্বিকারভাবে বললে, কী করে ছেড়ে দিই বল—

বললাম, কিন্তু ও তো তোমার পরিচিতও না—

জ্যাক বাধা দিয়ে বললে, তাতে কী ? আজ যে একেবারে অপরিচিত কাল সে পরিচিত এমন কি অতিপরিচিতও হতে পারে। এই যে তুমি—তোমার সঙ্গে আমার পরিচিত হতে সময় লাগল কি খুব বেশী ? আসলে মনটা তুলে ধরতে হয়। সেটাকে লুকিয়ে রেখে মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেই সময় লাগে বেশী।

একটু দম নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, দুনিয়া ভরে কত মানুষ জাহাজ তো এমনি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। কটাকে উদ্ধার করতে পারছি বল না ? তবে যেটা একেবারে সামনে আসে—তাকে চট করে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না। গ্লাসগোতে সেই ভদ্রমহিলাটির বন্ধু যখন তার বাসায় নিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করল তখনই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম আমাকে কি করতে হবে। আর একবার ঠিক করে ফেললে কাজে তা করতে আমার কিছুমাত্র দেরী হয় না।

জ্যাকের এ-স্বভাবের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম সেই রাতে লণ্ডন থেকে গ্লাসগো আসবার পথে বাসের মধ্যে। অমন সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে যেতে যে পারে তাকে হাজার সেলাম না দিয়ে পারি না।

বললাম, কিন্তু সে রাতে তুমি কেমন করে বুঝলে মেয়েটি আর্ত ? তাকে সাহায্য দেওয়া দরকার—

জ্যাক মনে মনে বোধহয় একটু বেশী রকম ভিজে উঠেছিল এই প্রসঙ্গতে। একটু অন্ধকার নিরিবিলির মধ্যেও আমরা এসে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে সে হঠাৎ আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে নরম গলায় আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—আমার মনও যে আগুনে পুড়েছে। একবার নয় কয়েকবার। নানা দিক থেকে আঘাত যা পেয়েছি তা একটা মানুষকে শুইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই ক্লিষ্ট মানুষের কান্না আমি চট করে বুঝতে পারি। তারপর একটু থেমে বললে, চেতন মন দিয়ে মানুষ সমস্ত কিছুকে বাহ্যিক দিক থেকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। তাই ভেতরের মনের দাবী সে সব সময়ে টের পেয়ে উঠছে না। এ কান্না হল সেই ভেতরের মনের কান্না—

এবার চুপ করে জ্যাক কী ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দু'জনের চমক ভাঙল। দেখি ক্যাস্‌ল্‌গেটে পেঁচৈছি। জ্যাক একটু হেসে বললে, তত্ত্ব কথার ভেতরে তথ্যটুকু ডুবে গেছে। সেই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে কথা শেষ হল না। থাক্‌ ও আর একদিন বলব এখন।

আজ এই ঠাণ্ডায় আর বাইরে থেকো না। আচ্ছা গুড্ নাইট—

বলেই সে আমার হাতটা ধরে একটা জোরে ঝাঁকানি দিল। তারপর সটান এ্যাবাউট টার্ণ করে কুইক্ মার্চ করতে লাগল সামনের পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে। আধা অন্ধকারে পিছনে দাঁড়িয়ে তার সুদীর্ঘ চলন্ত মূর্তিটা দেখতে পেলাম। মনে হল ওর জীবনের চলার ভঙ্গীটাও অবিকল ঐ রকম। অচঞ্চল, সুদৃঢ়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমিও বাসার দিকে চললাম।

॥ ৪ ॥

সেদিন ক্যাসল্গেটে জ্যাককে বিদায় দিয়ে মিসেস মরিসনের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে লণ্ডন থেকে গ্লাসগো আসবার পথে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সেগুলির আনুপূর্বিক তোলাপাড়া করেছিলাম মনে মনে। আজ রাজগীরের পাহাড়ে পথে নামতে নামতে মনে হল সে কথা।

আরও মনে হল সে রাতে যদি আমি কোচে স্কটল্যাণ্ড না গিয়ে ট্রেনে বা আর কিছুতে যেতাম, তবে হয়তো আমার ভ্রমণ উপন্যাসের এই প্রারম্ভিক কাহিনী-টুকুই শুরু হত না। আর আমার ওদেশে দেখা চরিত্রগুলোর মধ্যে একটা বেশ বড় চরিত্র, বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রই হয়তো দেখা বাকি থেকে যেত।

সেই সঙ্গে আরও একটা জিনিস আমার চোখের সামনে থেকে বাদ যেত তা হল ইংলণ্ড-স্কটল্যাণ্ডের নিসর্গ। লণ্ডন-গ্লাসগো-এডিনবরার মতো শহরেই যদি শুধু মাত্র ঘুরে বেড়াতাম তবে এই নিসর্গের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ বা ইচ্ছে কোনদিনই হয়তো আমার হত না।

লণ্ডন থেকে যখন বিদায় নিলাম তখন সেখানে ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজতে শুরু করেছে। নভেম্বর মাসের উত্তুরে ঝোড়ো হাওয়া এখন তখন বইছে হু হু করে। রাস্তার ধারে, পার্কে, প্লেন আর পীচ গাছগুলো অবিশ্রাম পাতা ঝরিয়ে চলেছে। পাকা পাতার রাশ জমেছে রাস্তায় রাস্তায়—আবর্জনা হয়ে। লোম-ছেঁটে-নেওয়া ভেড়ার মতো গাছগুলোর হাড় পাঁজরা ফুটে বার হতে আরম্ভ করেছে। টিপটিপিনি বৃষ্টির কামাই নেই।

এর ওপর আছে লণ্ডনের কুখ্যাত কুয়াশা। কলের ধোঁয়ায় কুয়াশায় মেশামেশি হয়ে একটা তেলচিটে তরল অন্ধকার সমস্ত শহরটাকে গ্রাস করে। রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি, কল-কারখানা সব কিছু ঢেকে ফেলে। পথ দেখা তো দূরের কথা এক হাত দূরের কোন পদার্থ দেখা যায় না। ধোঁয়ার রাশ ক্রমশঃ লণ্ডনের বুকের ওপর চেপে বসতে থাকে। লণ্ডনের বাসিন্দাদেরও

বুকে চাপ ধরতে থাকে। দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। পরের দিন খবরের কাগজে দেখা যায় কতগুলি বৃদ্ধ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে তাদের সংখ্যা। কুয়াশা নামলে রাস্তায় গাড়িঘোড়া বন্ধ হয়ে যায়। পথিক ওপরের পথ ছেড়ে কোনরকমে হাতড়ে এসে ঢোকে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড টিউব-রেলওয়ের গর্তে।

অন্য বছরের নভেম্বরের তুলনায় শীত এবার বড় কড়া। তার ওপর এই বিদ্‌ঘুটে ভুতুড়ে কুয়াশার ফেরে পড়ে তিন দিন তিন রাত্রি চার দেওয়ালের চৌহদ্দীর মধ্যে বন্দী থেকে আমারও বুকে হাঁফ ধরবার মতো হয়েছিল। বেরিয়ে পড়ে হাঁফ ছাড়লাম।

বাস যখন ছাড়ল ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে তখন কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা আটটা। গ্রীষ্মকালে এখনও বেশ আলো থাকে। কিন্তু নভেম্বর মাসে বেলা চারটের মধ্যেই সন্ধ্যা নামে বলে আটটাতেই মনে হয় কতো না রাত হল।

যাচ্ছি স্কটল্যাণ্ডে।

নিজের কাছে নিজেকেই কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। আসলে মানুষের ভিতর যে আদিম যাযাবরটা লুকিয়ে থাকে, পথের ডাক শুনতে পেলে যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে পড়ে, তাকে সব সময়ে এঁটে ওঠা যায় না। দারুণ শীতের ভয়, অজানা অচেনার শত অসুবিধে, এমন কি, বিপজ্জনক পরিস্থিতি পর্যন্ত সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে শুধু বলে, চলুম। নইলে এই নভেম্বরের প্রচণ্ড শীতে কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে আমার মতো গরম দেশের শীতকাতুরে লোক যাবে উত্তর স্কটল্যাণ্ডে ?

বন্ধু নিক তো শুনে চোখ কপালে তুলেছিল। বললে, আমার কথায় বিশ্বাস না হয় এই জিজ্ঞাসা কর এলসিকে—

এলসি নিক-এর প্রণয়িনী। গিয়েছিল স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে সপ্তা দুই আগে। চার দিনের বেশী সেখানে টিকতে পারে নি। পাশে বসে সাইডারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সে জবাব দিলে—বিচ্ছিরী। ভয়ানক বিচ্ছিরী। কেবল ঠাণ্ডা, বিষ্টি আর ধোঁয়া। কোথায় তুমি যাবে বোধি ? এখন লণ্ডনের এই ফায়ার-প্লেসই হল সবচেয়ে সেরা জায়গা—

চুপ করে হাসিমুখে ওদের কথা শুনলাম।

মাঝে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিল বন্ধু স্টুয়ার্ট তার শহরতলীর বাড়িতে। সেখানে ডিনারে বসে আমার স্কটল্যাণ্ড যাবার ইচ্ছেটা প্রকাশ করতেই স্টুয়ার্টের মা-বাবা এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন। বল কী ? এই বরফজমা শীতে যাবে উত্তর স্কটল্যাণ্ডে ? এখানে এসেছ বাছা, শীতের বহরটা তো জান না। তাছাড়া এত জায়গা থাকতে কিনা স্কটল্যাণ্ড !

তুমি নিশ্চয়ই ওদেশে গিয়ে আরাম পাবে না। আমি হলপ করে বলতে পারি। বললেন মিসেস স্টুয়ার্ট। ওখানকার লোকেরা ঘাঘরার মতো কিল্ট পরে।

হাড়-কঞ্জুষ মানুষগুলো। যে ভাষায় কথা বলে সে সব ভাষা বোধ হয় সভ্যজগতে শোনা যায় না। আর খায় কি ? না, পুলটিশের মতো পরিজ। ছিছি, ওখানে গিয়ে যে কেউ ফুর্তিতে থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না। অন্ততঃ আমি হলে কখনও স্কটল্যাণ্ডে যেতাম না—

খাঁটি ইংরেজ পরিবার। সুতরাং ওদের সঙ্গে স্কটদের যে ঘটি-বাঙালের সম্পর্ক তা আগেই জেনেছিলাম। কাজেই চুপ করে শুনলাম সব কথা।

এতো কথাও আমাকে খুব বেশী বিচলিত করে নি কিন্তু সত্যি ভাবিয়ে তুলেছিল যাঁর কথা, তিনি হলেন বৃটিশ মিউজিয়ামের জগদ্বিখ্যাত প্রাণী-বিজ্ঞানী ডক্টর ট্রেওয়াভাস। ডক্টর মৃদু হেসে বলেছিলেন, শীতটা এখনও খুব বেশী নয়। তবে জোর শীত পড়বার দেরীও নেই। সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন কিন্তু। নইলে ঐ কঠিন শীত আপনার সহ্য নাও হতে পারে।

কিন্তু কদিনের এই বিশ্রী কুয়াশা আমার স্কটল্যাণ্ড যাবার ইচ্ছাতে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে দিলে।

কোচে বসে ভাবছিলাম সব কথা। স্কটল্যাণ্ড সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে সে দেশসম্বন্ধে যে কারুর বিন্দুমাত্রও কৌতূহল থাকতে পারে এইটাই আশ্চর্য। এর ওপর যদি কেউ ডক্টর জনসনের স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ পড়ে থাকে তো তার কথাই নেই। তবু আশ্চর্য, কোন এক বিধিনিয়মের অদৃশ্য কারসাজিতে আমাকে সেই স্কটল্যাণ্ডের পথেই যাত্রা শুরু করতে হল।

বন্ধু চিন্ময়ের কথা মনে পড়ল। আসলে আমরা হলাম সওয়ারী মাত্র। পথের নিশানা বোধ হয় সারথি ছাড়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর কেউ জানে না।

বেশ কিছুদূর আসার পর এক জায়গায় বাসটা থামল। তারপর আমরা যাত্রীরা কোচের কণ্ডাক্টারের নির্দেশ পেয়ে নামলাম। রাত প্রায় ১০টা বেজেছে। কাছেই একটা কফিখানায় অনেকেই রাতের সাপার সারলেন। চা আর কফি দিয়ে অনেকেই ঠাণ্ডা শরীর গরম করলেন। কেউ কেউ পাশের বারে গিয়ে শীত কাটাবার আসল দাওয়াই চড়ালেন।

কফিখানাটা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করছে একটা প্রকাণ্ড ঝকঝকে নতুন স্ট্রিমলাইন করা গ্রীনলাইন কোচ। এদেশে যে সব বাস যাত্রী নিয়ে দূর দূরান্তরে যাতায়াত করে তাদের বলে গ্রীনলাইন কোচ। আমরা সবাই কোচ বোঝাই হলাম। সুন্দর নরম কুশন-দেওয়া হেলান-চেয়ার। পাশেই তার ঘুরোন চাকী। সেই চাকীটাকে ঘুরিয়ে সীটকে যেমন খুশী হেলান যায়। এরোপ্লেনের সীটের মতো। আর যে জিনিসটা দেখে মনটা আনন্দে সবচেয়ে বেশী নেচে উঠল সেটা হল এক একখানা কম্বল প্রত্যেকের সীটে। মুড়ি দিয়ে বসবার জন্য। সমস্ত কোচটা পুরু কাঁচে ঢাকা। ভিতরে হাল্কা আলো জ্বলছে। কোচের শেষে ল্যাভেটরী। এ একেবারে রাজসূয় ব্যবস্থা। এতক্ষণ যে ভেবে

অস্থির হচ্ছিলাম কেমন করে চারশো মাইল পাড়ি দেব এই রকম হিমজমা রাতে, সে ভাবনা এক মুহূর্তে জল হয়ে গেল। ভারী খুশী হয়ে উঠলাম।

কোচের টিকিটের যে একটা নম্বর ছিল তা আগের কোচে আসার সময় আমরা খেয়াল করি নি। কোচের কর্মচারীরাও কেউ সেটা খেয়াল করিয়ে দেয় নি। এবার নতুন কোচে দেখলাম সব নম্বর আঁটা। যে যার টিকিটের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বসে যেতে লাগলাম। কোচে যাত্রী প্রায় চল্লিশ জন। একমাত্র আমি ছাড়া বাকী সবাই শ্বেতাঙ্গ। সবাই গুছিয়ে নিয়ে বসে গেল।

বাস ছাড়তে সাড়ে দশটা বাজল।

নভেম্বরে রাত সাড়ে দশটা বেশ অনেকটা রাত্তির। বাইরের অন্ধকারে তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে ড্রাইভার কড়া হাতে ধরে বসল স্টিয়ারিং। গোঁ গোঁ করে একটা মিষ্টি মৃদু অথচ গম্ভীর আওয়াজ তুলে কোচ ছুটতে লাগল।

এদিকে আস্তে আস্তে যাত্রীদের কথাবার্তা ফিসফিসানী কমে আসতে লাগল। কণ্ডাক্টর কোচের ভিতরকার চড়া আলোটা নিভিয়ে জ্বালিয়ে দিল একটা অতি মৃদু সবুজ রংএর বাতি। মুহূর্তে সমস্ত কোচটা স্বপ্নপুরীর নিভৃত কক্ষের মতো অপার্থিব হয়ে উঠল।

বাসের একটানা গুনগুন ঘুমপাড়ানী শুনতে শুনতে চোখে আমার কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রা নেমে এল। কিন্তু শীতের ছ্যাঁকছ্যাকানির ভিতর ঘুম আর জমাট বাঁধবার অবকাশই পাচ্ছিল না। সেটা তন্দ্রাতেই ঠেক খেয়ে রইল।

তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। দার্জিলিং-এর সেগুল অরণ্যের ভিতর পথ হারিয়েছি। চারিদিক ধোঁয়া আর কুয়াশায় হঠাৎ ঢেকে গেছে। দারুণ ঠাণ্ডায় হাত পা আমার হিম হয়ে আসছে। সেই নিস্তব্ধ গভীর জঙ্গলের মধ্যে কার অতি করুণ একটা কান্নার সুর আমার কানে ভেসে এল। মনে হল জঙ্গলের সমস্ত গাছের পাতাগুলো সেই শব্দে শিউরে শিউরে উঠছে। আমার মনটা ভয়ানকভাবে নাড়া খেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাটা ছুটে গেল।

গুন্‌গুন্‌ শব্দ তুলে হু হু করে ছুটে চলেছে রাত্রির যাত্রীবাহী বাসটা। চারপাশের মাঠ-ঘাট-জঙ্গল এই এত রাতে একান্ত নিস্তব্ধ, নির্জন। ফাঁকা পথ বাসের গতি বাড়িয়ে দেবার সুযোগ করে দিয়েছে পুরোপুরি। সমস্ত কোচটা ঘুমে আর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। এমন সময় জেগে উঠে শুনলাম কান্নার শব্দটা। আমার সামনের সীটে পুরুষের পোশাক পরা, ছোট করে ছাঁটা এক রাশ ঝাঁকড়া সোনালী চুল মাথায় মেয়েটি কাঁদছে।

লম্বালম্বিভাবে সীটের সারি সাজান। মাঝে সরু একফালি পথ। প্রত্যেকটা

সীটে দুটো করে বসবার জায়গা। মেয়েটির পাশে বসেছেন একজন প্রৌঢ়া। তিনি বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মেয়েটির কান্নাটা এমন দমকে দমকে চড়তে শুরু করেছে যে সে হঠাৎ থামবে বলে মনেও হচ্ছে না।

মেয়েটি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছে।

দুনম্বর কোচে ওঠবার সময় দেখেছিলাম ঐ মেয়েটিকে বারে গিয়ে মদ খেতে। সন্দেহ হল, হয়তো মাতাল হয়েই কাঁদছে মেয়েটি। কিন্তু কান্নাটা শুনে মনে হতে লাগল—মানুষের যদি দুনিয়ার সব আশা-ভরসা, সহায়-সম্বল সবকিছু চলে যায়—সেই বোধ হয় এমন করুণ, এমন বুকফাটা কান্না কাঁদতে পারে।

এ একটা অদ্ভূত অবস্থা। মনে হল বাইরের সমস্ত অন্ধকারটা একটু একটু করে কোচের ভিতরকার যাত্রীগুলোকে গ্রাস করে ফেলছে। যেন বাসের গতি গেছে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে। আর নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতার বুক চিরে কোথায় একটা আর্তনাদ উঠেছে। কোচের ভিতরকার যাত্রীরা প্রায় সবাই নড়ে চড়ে বসেছেন। আমার পাশের সীটের যাত্রীটিও উঠে বসেছে। লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা। বাসে ওঠার সময়েই দেখেছিলাম চঞ্চল আর চটপটে স্বভাব। চোখে খুব পুরু লেন্সের চশমা। আবছা আলোতে যদিও সবকিছু দেখা যায় না, তবুও লোকটির গায়ে যে প্রচণ্ড শক্তি আছে এটা বেশ বোঝা যায়।

অন্য যাত্রীরাও উৎসুক হয়ে দেখছে মেয়েটির কান্না। কিন্তু কেউ কিছু করতে ভরসা পাচ্ছে না। অনেকটা হতভম্ব ভাব।

আমাদের অবাক করে দিয়ে আমার পাশের লোকটি উঠে দাঁড়াল। সামনের সীটের প্রৌঢ়াকে কানে কানে কি অনুরোধ করল। প্রৌঢ়া তাঁর সীট বদলে আমার পাশে এসে বসলেন। আর লোকটি গিয়ে বসল কান্নায় কাতর মেয়েটির পাশের সীটে। তারপর নিতান্ত অপরিচিতা সেই মেয়েটিকে একান্ত পরিচিতের মত কাছে টেনে নিয়ে তার মাথাটি তুলে নিল নিজের কাঁধের উপর। মেয়েটি তার কাঁধের উপর মুখ রগড়ে আগের মতোই কাঁদতে লাগল।

আমরা সবাই দেখলাম জোয়ান লোকটি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটির ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

বাসের গতির কামাই নেই। কোন ছেদ নেই তার গোঁ গোঁ আওয়াজের মধ্যে। ঘসা কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে যে কি সব চলে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে তারও কোন একটা স্পষ্ট রূপ ধরা পড়েছে না চোখে। এই কোচের লম্বা কামরাটাই আমাদের জগৎ। মায়ের গর্ভশায়ী ভ্রূণের মধ্যে শিশুর অবচেতন মনের মতো আমাদের মনও হয়তো জাগ্রত চেতনার স্তরের নীচে ডুব দিয়েছে গভীর অবচেতনে। এখন সামনে পাশে যা ঘটছে তাদের কাউকেই খুব বেশী অবাস্তব বলে মনে তো হচ্ছেই না, খুব কৌতূহলও আসছে না কিছুতে। নিশীথ রাতের নিঝুম আত্মা ক্রমশঃ ভর করছে আমার মনে।

মধ্যে দু একবার চোখ খুলে দেখেছি। সামনের ছেলেটি আর মেয়েটির চারটি ওষ্ঠাধর কখন এক হয়ে গেছে।

পাশের ভদ্রমহিলা কানের কাছে মুখ এনে বলছেন, শুনছো গো মিস্টার। দেখছো তো ব্যাপারটা—তোর না হয় চব্বিশ দিনের আড়াআড়িতে স্বামী আর পুত্তুর মরেছে, কিন্তু তার জন্যে কি এই রকম একটা লোক দেখান কেলেঙ্কারী করতে হয়? তবুও যদি একপক্ষের স্বামী হত। এর আগেও তো দু দুটোকে পার করেছিস। সেগুলো তো এখনও জলজ্যান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বয়সেও তুমি এমন কিছু তরুণীটি নও—দেখতে অমন হলে কী হবে? যে ছেলেটা মরে গেল তারই তো বয়েস ছিল বাইশ বছর—

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন। লোকটাকেও বলি মিস্টার। কি যে রুচি—ওর ঠাকুমার বয়সী একটা উটকো মেয়েছেলের সঙ্গে রাত দুপুরে পীরিত—আসলে দুটোই হিস্টিরিয়াতে ভুগছে—নয় কী? আমার তো তাই বিশ্বাস—।

কতকগুলো কথা আমার কানে যাচ্ছিল, কতকগুলো হারিয়ে ফেলছিলাম। মাঝে মাঝে অবাক লাগছিল এইটুকু সময়ের মধ্যে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে এতো কথা এই ভদ্রমহিলা জানলেন কেমন করে?

এদিকে কান্নার শব্দ একেবারে থেমে গেছে। থেমে গেছে মেয়েটির ফুলে ফুলে ওঠা। সে শান্ত শিশুর মতো জোয়ান ছেলেটির কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে অঘোরে। এতো ব্যাপার যে ঘটে গেছে তা হয়তো সে আসলে টেরই পায় নি।

বাস এদিকে ছুটে চলেছে অব্যাহত গতিতে। এক্সপ্রেস বাস সকালের আগে আর কোথাও থামবে না।

কোচের ভিতরে একটু ফিসফিসানি শুরু হয়েছিল। সেটা নিস্তব্ধ হয়ে এলো। কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম এলো না।

পার্শ্ববর্তিনী প্রৌঢ়াও জেগে বসে আছেন। আমার দিকে চেয়ে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, খুব ঠাণ্ডা না?

বললাম, তাতে আর সন্দেহ কি।

বুঝলাম ভদ্রমহিলা আলাপের সূত্র খুঁজছেন। তারপর কথায় কথায়—নিবাস কোথায়? এখানে কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাদের উত্তর চালাচালি হতে হতেই মহিলাটি হাতব্যাগ থেকে একমুঠো টফি বার করলেন। ঢেলে দিলেন আমার পকেটে। দু পীস ছোট ছোট স্যাণ্ডউইচও দিলেন তার সঙ্গে। টফি চিবানোর সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলতে লাগল।

ভদ্রমহিলা স্কট। থাকেন লণ্ডনে। বাড়ি কিলমার্ণকে। আপাততঃ ছুটি নিয়ে হোমে যাচ্ছেন। বললেন, একে তো কোচে আমার মোটেই ঘুম হয় না,

তার ওপর এই সব বিদ্ঘুটে কান্নার ব্যাপার আমাকে বড্ড বেশী নার্ভাস করে তোলে—

আলাপ থামিয়ে চোখ মটকে চাপা গলায় বললেন, দেখ দেখ, কাণ্ডটা দেখ। চেনা নেই শোনা নেই—একজন উত্তর মেরুর আর একজন হয়তো দক্ষিণ মেরুরই হবে—তাদের কাণ্ডটা দেখ একবার—বলে চুপি চুপি আঙুল দেখালেন সামনের সীটে।

লোকটি মেয়েটির মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বুকে গুঁজে নিয়েছে। মেয়েটি তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে। লোকটি গভীর স্নেহের সঙ্গে মেয়েটির মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছে।

লণ্ডনের হাইড পার্কে বা রাস্তায় ঘাটে এমন দৃশ্য কিছু কম নয়। তবু এতো কাছে এ ব্যাপারটা ঘটছে দেখে বাসের অনেকেরই সুতীব্র কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমি বেশ অনুভব করলাম বাসের যাত্রীদের অনেকেই ঘুমের ভান করে চোখ মিটমিটিয়ে এদৃশ্য উপভোগ করছে। বিশেষ করে মেয়েরা তো বটেই। আর বাসের যাত্রীদের মধ্যে প্রায় দশ আনাই মেয়ে যাত্রী।

শীতের সকাল এদেশে কোন সমারোহ নিয়ে আসে না। আঁধার আর আলোতে মেশামেশি হতে হতে আলোর ভাগ খানিকটা বেড়ে যায় মাত্র। আবছা আঁধারের একটা তরল প্রলেপ সব কিছুর ওপরেই তার হাল্কা পর্দা বিছিয়ে রেখে দেয়।

বাসের এক ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে একটু আড়ামোড়া দিতেই পার্শ্ববর্তিনী মৃদু হেসে সুপ্রভাত জানালেন। যদিও প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কোনরকম 'সু'ই নজরে পড়ল না। পেলাম না কোন আশা ভরসার রেশ। গুডউইস্‌টি ফিরিয়ে দিয়ে ঘড়ি দেখলাম। বেলা প্রায় সাড়ে আটটার কাছাকাছি। কি সর্বনাশ! এখনও এখানে আঁধার কাটবার, ভাল করে আলো ফোটবার সময়ই হল না। লণ্ডনে দেখে এসেছি আজকাল সাড়ে সাতটাতেই সকাল হয়। আলো ফোটা না ফোটার কথা তো এখানে কেউ জোর করে বলতে পারে না। কাজেই সকাল হল এইটুকু মাত্র বলেই থামতে হয় সবাইকে।

ঝট করে মনে পড়ল কলকাতার কথা।

কলকাতাতে কোন সেই ভোর চারটেতে বৈরাগী খঞ্জনী বাজিয়ে ভাঙা ভৈঁরো আর রামকেলীতে গেয়ে গেছে—

রাই জাগো রাই জাগো বলে সারি
শুক বোলে
কতো নিদ্রা যাও গো রাধে কালো মানিক
লয়ে কোলে।—

লেপের গরমে শুয়ে সে গান শুনেছি সেই অত ভোরে। আধোজাগা আধো-নিদ্রার মধ্যে সে গান যেন নিবিড় হয়ে বসে গেছে মনের তারে।

ঘরমুখো বাঙালীর মন। ঘরের চিন্তা পেয়েই সে তাতে ডুবতে লাগল একটু একটু করে। চোখের সামনে ইংলণ্ডের মাটি মিলিয়ে গেল। বাসের লোকেদের মুখ আবছা হয়ে এল। দেখতে লাগলাম কালীঘাটের সেই ছোট্ট বাড়িটাকে আর কলকাতার রাস্তা ঘাটকে। সেখানে এতক্ষণে জীবন অনেক বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—মিস্টার তুমি কী আবার ঘুমোলে নাকি ?

পাশের স্কট মহিলাটির মৃদু ডাকে ধ্যানটা ভেঙে গেল।

বললাম, নাঃ, এই একটু—

সঙ্গিনী বললেন, তা যাই হোক তুমি বাপু বেশ ঘুমোতে পার। দেখলাম তো। ভোরের দিকে যা ঘুমটা ঘুমোলে—আমি তো অবাক। বাসে বসে লোকে এত ঘুমোতে পারে এ আমার ধারণাই ছিল না। আচ্ছা কিছু যদি মনে না কর তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার নিশ্চয়ই বিয়ে হয়েছে—ঠিক কিনা ?

খুব কৌতুক লাগল আমার সঙ্গিনী মহিলার কথাগুলোতে। বয়সে প্রৌঢ়া। মাথার চুলেও বেশ পাক ধরেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করবার সময়ে তাঁর গলায় এসে পড়েছিল যতো রাজ্যের ছেলেমানুষী আর আহ্লাদী-পনার সুর।

বললাম, কেন বলুন তো—

ভদ্রমহিলা নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন, বিয়ে করা লোকগুলো ভয়ানক ঘুমোতে পারে কিনা—

আমার মনে কৌতুকটা বেশ নিবিড় হয়ে এলো। মনে পড়ল কলকাতাতে বন্ধু বিশুর কথা। ভাইরে ঘুম আর বৌ একসঙ্গে কিছুতেই রাখার যো নেই—

কিন্তু এখানে কী সে নিয়মের ব্যতিক্রম নাকি ? জিজ্ঞাসা করলাম, তা আপনি কী—

আমি—আমি হলাম মিস্—মিস্ স্মিথ। না-না বিয়ে থা আমি করি নি। মানে ইচ্ছে করেই করি নি। ছেলেদের সঙ্গে একলা থাকতে আমার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে।

বলেই শিউরে উঠলেন কোন ছেলের সঙ্গ কল্পনা করে। তাঁর ব্যাপার দেখে মনে মনে হাসি যে না পেল কিছুটা এমন নয়। কিন্তু হাসতে গিয়েই চমকে উঠলাম। যে দারুণ সত্যটা এই কৌতুককর ব্যাপারটার আড়াল থেকে উঁকি দিল। সেটা অনুভব করেই আর হাসতে পারলাম না।

বৃটেনের স্ট্যাটিস্টিক্স্ বলে—এদেশে প্রতি এগার জন মেয়েপিছু আটজন করে পুরুষ। এদেশের সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে যদি এদেশের সমস্ত জোয়ান পুরুষের বিয়ে হয়ে যায় তবুও দেখা যাবে বেশ কয়েক লক্ষ মেয়ের কপালে কোনদিনই বর জুটবার সম্ভাবনাই নেই। তারপর গত যুদ্ধে এদেশের লক্ষ লক্ষ

জোয়ান পুরুষ মরেছে স্বদেশে বিদেশে। সুতরাং সবকিছু বিবেচনা করলে প্রৌঢ়া আইবুড়ীদের আর এসব কথা বলা ছাড়া সান্ত্বনা কোথায় ?

বাসের গতি এদিকে যথা পূর্বং। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। দুদিকে উঁচু-নীচু ঢেউ খেলিয়ে চলে গেছে ফাঁকা জমি। কোথাও নজরে পড়ছে পাতা-ঝরা গাছের একটুকরো জঙ্গল। আর তাদের দু ভাগে ভাগ করে মাঝখান চিরে বেরিয়ে গেছে কালকেউটের গায়ের মতো মসৃণ কালো চকচকে চওড়া রাস্তা। সেটা ধরে আমাদের বাস ছুটে চলেছে ছেদহীন গতিতে। আশপাশের সমস্ত জগৎটাকে মনে হচ্ছে যেন মৃতের পুরী। তার মধ্যে একমাত্র এই বাসটাই তুলেছে প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া।

মনে পড়ল গত রাতের কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে সামনের সীটের দিকে নজর পড়ল। দেখি সেখানে দুটি প্রাণী আগাগোড়া কম্বলে ঢেকে এক হয়ে ঘুমুচ্ছে। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে তাদের কম্বলে ঢাকা দেহ।

মাঠ শেষ হয়ে একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। সেইটা ধরে বাসটা এগিয়ে চলেছে। পথটা বাঁকের উপর ঘুরে যেতেই জঙ্গলটা শেষ হল আর দেখতে পেলাম সমুখে একটা লোকালয়।

শহরটার নাম কার্লাইল।

শহরে ঢুকে কয়েকটা রাস্তা পার হয়ে আমাদের কোচ গোঁ গোঁ করে ঢুকল এসে একটা পেট্রোল পাম্পের মেরামতি কারখানাতে। কোচ থামল। কিন্তু তার দরজা খোলা হল না।

প্রায় সবলোকই একটু চায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। ল্যাভেটরীর রাস্তায় বাসের মধ্যেই কিউ দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েরা রাতের ভ্রমণ-ক্লান্তি মোছবার আয়োজন করতে লাগলেন প্রসাধন দিয়ে। টয়লেট ব্যাগ হাতে করে সবাই দাঁড়ালেন কিউয়ে।

আমার পার্শ্ববর্তিনীও উঠলেন। সীটগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল।

এমন সময়ে দেখলাম আমার সমুখের সীটে মেয়েটির ঘুম ভাঙল। সে আড়ামোড়া দিয়ে চোখ মুছতে যেতেই একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সাঁ করে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পাশে কম্বল ঢাকা লোকটিকে দারুণভাবে ঠেলতে লাগল। এই—কে তুমি—ওঠ ওঠ—

লোকটির ঘুম ভাঙল। দেখলাম সে মোটেই আশ্চর্য বা বিরক্ত হল না। ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে, বস বস—সব কথা বলছি শোন—

মেয়েটির গলায় আবার অধৈর্য ফেটে পড়ল। চাপা রাগে তার চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ।

—সব কথা বলবে কী ? তুমি কেন এ সীটে এলে তাই বল আগে—

লোকটা দ্বিধা না করে মেয়েটিকে হাত ধরে টেনে পাশে বসাতে গেল। সে হাত ছিটকে ফেলে দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইল।

বাসের যাত্রীরা বেশীর ভাগই ল্যাভেটরী আর প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত। কণ্ডাক্টার আর ড্রাইভার নেমে গেছে কারখানাতে। বাসের কি সব ছোট খাটো মেরামতির জন্যে। তেল মবিল নেওয়ার জন্যে। তবুও কয়েকজন যাত্রী বেশ অবাক হয়েই ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটি ভ্রূক্ষেপও করল না। ক্রুদ্ধ মেয়েটির কানের কাছে মুখ এনে বললে, রাতে অমন কাঁদছিলে কেন—কি হয়েছিল বলত—

মেয়েটির রাগে-রাঙা শক্ত মুখখানা এক নিমিষে নরম হয়ে কুঁচকে পাংশু হয়ে গেল। ফুঁসে ওঠা দীর্পতা সর্পিনীর মুখের কাছে কোন এক ওস্তাদ সাপুড়ে একটা কিসের মূল তুলে শুঁকিয়ে দিলে। মুহূর্তে কোথায় লুকাল তার ফোঁসানী। টপ করে সে বসে পড়ল সীটে। এক নিমেষে কে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে নিঙড়ে নিল। শুকনো মুখ তুলে সে লোকটিকে নীচুগলায় জিজ্ঞাসা করল, আমি রাতে কেঁদেছিলাম নাকি—

লোকটি বললে, হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলে—

মেয়েটি যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, ছি-ছি, কী লজ্জার কথা—এক বাস লোকের সামনে—

তারপর চোখ তুলে শুধাল, আচ্ছা বাসসুদ্ধ লোক খুব বিরক্ত হয়েছিল নয় ? শেষ পর্যন্ত কী তুমিই এসে আমার পাশে বসে আমায় ভোলালে ?

লোকটি জবাব দিল, তাছাড়া উপায় ছিল না—

তারপর গলার আওয়াজ খুব নামিয়ে জিজ্ঞাস করল, বল দিকিনি কত মদ খেয়েছিলে গতকাল সন্ধ্যাবেলায়।

মেয়েটি বললে, এমন কিছু নয়। খুব শীত করেছিল বলে এক পেগ হুইস্কি খেয়েছিলাম।

তারপর ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে বলতে লাগল, কান্না আমার তার জন্য নয়। ওটা আমার একটা ব্যায়রাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদি। আমি কিন্তু জেগে উঠে বিন্দুমাত্রও ওর মনে করতে পারি না। অনেক ডাক্তার বদ্যি করেছি, কিছুই হয় নি। কিন্তু তোমায় আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো মিস্টার—

সে লোকটির হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।

বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছি। কানে ভেসে আসছে মেয়েটির প্রতিটি কথা।

বাস ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। কার্লাইলের সীমানা ছাড়িয়ে বাস আবার তার পুরানো স্পীড ফিরে পেয়েছে। হু-হু করে সে ছুটে চলেছে গ্লাসগোর পথে।

একটু পরেই ইংলণ্ডের সীমানা পার হলাম।

এদিকে স্কটল্যাণ্ডের মাটিতে পড়েই আকাশে বাতাসে তার শুভ সূচনা দেখলাম। এতক্ষণ সে লুকিয়ে ছিল ঘোমটার আবরণ ফেলে। এখন সে প্রসন্ন মুখ তুলে তাকাল। দেখলাম হাসিকান্না একসঙ্গে খেলা করছে তার দু চোখে।

রোদে আর কুয়াশায় মেশামেশি হয়ে গেছে দূর প্রান্তরের উপর। রোদের ভাগটা ক্রমশঃ বাড়ছে। দেখে মন বেশ আনন্দিত হয়ে উঠল। রাতের গ্লানি প্রায় অর্ধেক মুছে গেল।

সমুখের সীটে ছেলেটি আর মেয়েটির মধ্যে একটা রফা হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। তাদেরও দেখাচ্ছে বেশ আনন্দিত।

বাস এক রোখে এগিয়ে যাচ্ছে। সমান তার গতিবেগ। দুদিকে এবার সব দৃশ্য একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রোদ লেগে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। দেখছি পাহাড়, অরণ্য আর প্রান্তরের রিক্ত সৌন্দর্য। মনে পড়ল হেমন্ত চলছে এখানে। আসবে এবার শীত। প্রকৃতি এখন বসবে কৃচ্ছ্র-সাধনায়।

দেখছি চারপাশে অনেকগুলি অরণ্য। সবগুলি প্রায় পত্রহীন। ওক-এলম-বার্চ-বীচ-সাইডার-প্লেন-উইলো আর স্কচ পাইনগুলোর অবস্থা প্রায় একই রকম। সবাই ইতিমধ্যে পাতা ঝরিয়ে নিঃস্ব হয়ে বসে আছে। শুধু রাস্তার ধারে কপারহেজের পাতাগুলো নিতান্ত নির্লজ্জের মতো তামাটে শুকনো রূপ নিয়ে এখনো পথিকের মন ভোলাবার চেষ্টায় আছে। মাঝারি আকারের গাছ-গুলোর দিকে তাকালে কিন্তু চট করে বোঝা যায় না যে ওদের পাতা নেই। সরু মোটা অজস্র শাখা-প্রশাখার ঘন বুননে দূর থেকে মনে হয় কীসের একটা জাল সারা গাছগুলো ছেয়ে আছে। কেবল ডগলাসফার, কোনিফার, ইউ আর মাংকি পাজলের পাতা কোন সময়েই ঝরে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোদের উজ্জ্বল তীক্ষ্ম আলো সকালের জমা কুয়াশার স্তরকে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। অস্পষ্ট হয়ে উঠল স্পষ্টতর। দৃষ্টিকে যতটা দূরে পাঠান যায় কোচের সীটের মধ্যে বসে ততদূরে পাঠাতে লাগলাম। এ যেন যা দেখবার এখনই আমাকে দেখে নিতে হবে। কে জানে এই আলো-কুয়াশার দেবদানবের লড়ায়ে কখন কে হারে কে জেতে। বিশ্বাস নেই এদেশের আবহাওয়ায়।

একটু পরেই বাস এসে থামল লকার-বিতে। ছোট্ট সুন্দর পরিষ্কার ঝকঝকে গাঁ লকার-বি। রোদ লেগে আরও ঝকঝকে দেখাচ্ছে। আমাদের বাস গিয়ে থামল একটা হোটেলের ধারে। কণ্ডাক্টার দরজা খুলে দিয়ে ভারী গলায় ব্রেকফাস্টের সময় ঘোষণা করেই উধাও। এতক্ষণে সবাই হাঁপ ছাড়ল।

একটানা বারো-তেরো ঘণ্টা এক সীটে বসে থাকার পর সবাই একটু হাত-পা ছড়ানর সুযোগ পেল।

বাস থেকে নামতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আমার বুকের ভিতরটা থরথর করে কাঁপিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গরম হলাম হোটেলের কর্ত্রী ঠাকরুণের উত্তপ্ত অভ্যর্থনায়। হোটেলের উনুন ছেড়ে তিনি স্বয়ং নেমে এসেছেন রাস্তায় যাত্রীদের সাদর আহ্বান জানাতে। ঠাকরুণের বয়স ঢলেছে, কিন্তু ঠোঁটের উপর লিপস্টিক মাখানো হাসিটুকু এখনও বেশ সরস। কথাগুলিতে আত্মীয়তার সুর মাখানো।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম আগন্তুকদের সঙ্গে তার ব্যবহারও ভারী সহৃদয়। কে কি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে চায় একাই একশ হয়ে জেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে হেঁকে পরিচারিকাদের সব কিছু তৈরী করতে আদেশ দিল। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল আরও ভিতরে। দেখিয়ে দিল গরম জলের বাথ-রুম।

—মুখ হাত-পা মাথা যে ধোবে ধুয়ে নিয়ে রাতের ক্লান্তি কাটাতে পার। আহা এসেছ অনেক দূর থেকে। বাসে রাতে ঘুম হওয়া তো অসম্ভব বাছা—তা কি আর জানি না। আর ঠাণ্ডাও এই নভেম্বরে যা পড়েছে তা আর বলে কাজ নাই—তুমি তো নিশ্চয়ই গরম দেশ থেকে এসেছ মিস্টার। কোথায় তোমার দেশ? ভারতবর্ষ? ওহো সে তো সোনার দেশ—তোমাদের পণ্ডিত নেহরু যা করেছেন—আমার এক বোনাইয়ের ভাই ঐদেশে—নাও মিস্টার তোয়ালে নাও—বলে তোয়ালে এগিয়ে দেয়।

ব্রেকফাস্ট-টেবিলে বসে আলাপ হয়ে গেল লম্বা-চেহারার জোয়ান ছেলেটির সঙ্গে। গত রাতের একাঙ্কিকাতে সে ছিল একমাত্র নায়ক।

আমার পাশের চেয়ারটাতেই সে বসল। ছেলেটিকে দিনের আলোয় এতক্ষণে বেশ ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম।

যেমন সুদীর্ঘ চেহারা তেমনি অস্বাভাবিক চওড়া তার কপাল। তীক্ষ্ম তার নাক। ছোট ছোট চোখ। পুরু লেন্সের চশমা থাকা সত্ত্বেও মনে হল চোখের দৃষ্টিটা বড় বেশী চঞ্চল। চোখে চোখ রাখলেই দেখা যায় লোকটি ভিতরে-বাইরে একটু সচেতন। মুখের তারুণ্যে শুধু ধরা পড়ে বয়সটা অনেক কাঁচা। তবে কারুর সঙ্গে আলাপ করার সময়ে তার ভ্রূ কুঁচকে বিশেষ এক রকমের চাওয়াটা মনে হল প্রবীণতার ভাণমাত্র।

টেবিলে বসেই আলাপ শুরু হল।—গুডমর্ণিং, সকালটা ভারী সুন্দর নয়?

বললাম, নিশ্চয়ই। অন্ততঃ লণ্ডনের চেয়ে তো বটেই।

লোকটা বললে, আরে দূর! লণ্ডন আবার একটা জায়গা নাকি? এই কানট্রি-সাইড লণ্ডনের চেয়ে এখন ঢের ভাল। তুমি নিশ্চয় ভারতবর্ষ পাকিস্তান

কী সিংহল থেকে আসছ ?

—ভারতবর্ষ। আমার বাড়ি কলকাতাতে।

ভদ্রলোকের চোখ দুটো দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। ক্যালকাটাতে তো টেগোরের বাড়ি—কবি টেগোর—

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ—

ভদ্রলোক টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। তারপর বললে, দুনিয়াটা বড় বেশী রকমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। এই যুগে টেগোর যে কী করে অতটা রোমাণ্টিক ছিলেন তা ভাবতে আমার বড় আশ্চর্য লাগে। তুমি কাব্য পড় ত ? টেগোরের কাব্য—

ভদ্রলোকের সেই অতি সচেতন চঞ্চল দৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে গেছে। এক মুহূর্তে সে পাড়ি দিয়েছে কোন সুদূরলোকে।

বেশ অবাক লাগল। এত তাড়াতাড়ি যে কারুর মুখের ভাব বদলে এমন হয় তা আমার জানা ছিল না।

বললাম, পড়ি আর অনুভব করি—

লোকটি বিস্ফারিত চোখে আমার মুখের দিকে আবার তাকাল। মনে হল অনেক দূর থেকে সে নেমে এলো।

—কিন্তু আমি সত্যি আনন্দ পেলাম যে তুমি এতদূরে থেকেও টেগোর পড়েছ জেনে। বললাম আমি। আবার যদি আমাদের অবসর সময়ে দেখা হয় তবে নিশ্চয় আমি কয়েক ঘন্টা তোমার সঙ্গে টেগোরের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব—

ভদ্রলোক বললে, তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

—আপাততঃ আবার্ডিন। গ্লাসগো হয়ে—

লোকটি প্রবীণভাবে হেসে বলল, হুঁ। বলে গম্ভীরভাবে নিজের মনে কি যেন ভাবতে লাগল।

হঠাৎ দেখলাম তার মুখ চোখ থেকে প্রবীণতার মুখোশটা খসে গেল। এক মুখ হাসি নিয়ে বললে, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে। হ্যাঁ তা হতেই পারে। তৈরী থেকো একটা বড় রকম অবাক হবার জন্যে—

নিতান্ত শিশু-সুলভ একটা মজায় সে হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়তে লাগল। দুচোখে একটা ছেলেমানুষী দুষ্টুমীর ভাব ভরে জিজ্ঞাসা করল, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় তোমার নাম ?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কোথা থেকে—

লোকটি বললে, এ এমন শক্ত কথা কী। এটা তো তোমার সুটকেশ যে দেখবে সেই-ই বলতে পারে—

হোটেলের পরিচারিকা ওর সামনে একপট পরিজ রেখে গেল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমায় কি দেব ? কর্ণফ্লেক্‌স্‌, পরিজ, না পাফ্‌ড্‌ রাইস্‌ ?

লোকটি বললে, স্কটল্যাণ্ডে এসেছ পরিজ খাও। পরিজের মত জিনিস নেই—

—আচ্ছা, পরিজই দাও—

পরিচারিকা এক পট পরিজ এনে সামনে রাখল।

লোকটি বললে, পরিজ তৈরী করে খেতে পারে না বলে অনেকে পরিজের বদনাম করে। কিন্তু পরিজের মতো নির্দোষ পুষ্টিকর খাবার তুমি এদেশে খুব কম দেখবে। দাও ওর ওপর বেশ কিছু নুন ছড়িয়ে। এবার খুব দুধ ঢালো —অল্প চিনি দাও—বেশ করে চামচ নেড়ে মিহি করে মিশিয়ে নাও—ঠিক আমি যেমন করেছি—তেমনি করে—

সে নিজে শুধু নুনই মিশাল পরিজে। চিনির পট ছুঁলও না।

এবার পরিজ মুখে তুলে দেখি সুন্দর—ভারী সুন্দর। দেশে অনেক দুধ ঢেলে সুজির পায়স রাঁধলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

ভদ্রলোক চোখ বুজিয়ে নোনতা পরিজের স্বাদটাকে উপভোগ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেল। বিল মিটিয়ে উঠে পড়লাম। বাস ছাড়তে একটু দেরি ছিল। হোটেল থেকে বার হয়ে এলাম। বাইরে সকালের হেলে-আসা রোদ্দুরটা পরম লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

লোকটি হোটেল থেকে বার হয়ে একটু হাঁটতে লাগল। আমি পড়লাম স্কট প্রৌঢ়াটির পাল্লায়। তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

লোকটি সামনে এগিয়ে গেল আমার দিকে একটু নড করে।

—শোন গো মিস্টার, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। প্রৌঢ়া সহযাত্রিনী বললেন, তোমার জন্য আমি সীট রেখে দিলাম আমার পাশে ব্রেকফাস্ট টেবিলে। তা তুমি তো এলে না। গিয়ে বসলে ঐ বিদ্‌ঘুটে লোকটার সঙ্গে। ওর সঙ্গে এত কি বকছিলে বল ত ? লোকটাকে সবাই ছি-ছি করছে। তুমি মনে করছ বাসের লোক সবাই ঘুমিয়েছিল রাতে ? মোটেই না—তারা সব দেখেছে। ঐ ও-পাশের ভদ্রমহিলারা তো কত বললে। আর মেয়েটাও কী বেলজ্জ বাবা— গিলল যেন রাক্ষুসীর মতো। আমরা তো মরে গেলেও অমন করে খেতে পারব না।

রোদে পিঠ রেখে সমস্ত মন আর অনুভূতি দিয়ে রোদটাকেই উপভোগ করছিলাম। প্রৌঢ়ার কথা কিছু শুনছিলাম কিছু ছাড়ছিলাম। একটু পরেই বাস বোঝাই হলাম। লোকটি এসে তার আগের জায়গায় আমার পাশেই বসল। স্কট প্রৌঢ়াকে দেখলাম কোন রকমে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বসেছেন মেয়েটির পাশে।

বাস ছেড়ে দিল।

লকার-বি পার হলাম আর কুয়াশার পর্দার আড়ালে সূর্যদেব লুকিয়ে পড়লেন। এবার শুরু হয়ে গেল আসল পাহাড়ে পথ। দুদিকে উঁচু জমি এবার আর জমি নয়। একেবারে পাহাড়ের রূপ নিয়েছে। আগাগোড়া তাদের হাল্কা কুয়াশার পর্দায় ঢেকে গেছে। আকাশে—পাহাড়ে—প্রান্তরে—অরণ্যে সব একাকার হয়ে গেছে। হু হু করে শীত বাড়তে লাগল। একটু একটু করে সব কিছু আবছা হয়ে এল। চারিদিকের হাসি হাসি ভাবটা আস্তে আস্তে নিভে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যেতে লাগল। বাস চলতে লাগল পুরোদমে সেই ধূসর ধোঁয়ার স্তূপকে দুফাঁক করে দিয়ে।

আর কিছু দূরে এসে যাত্রীদের রক্তে ঝিম ধরে এলো। এমনি করে ঝিমুতে ঝিমুতেই বেলা সাড়ে এগারোটায় পৌঁছে গেলাম গ্ল্যাসগোতে। যাত্রীরা সবাই খোঁয়াড় থেকে ছাড়া পাওয়া জন্তুর মতো লাফিয়ে নেমে পড়ে বাঁচল। তারপর মিনিট পাঁচেকের ভিতরে সরে পড়ল।

যাবার আগে স্কট প্রৌঢ়াটি আমায় ধরে বললেন, এসো না মিস্টার আজ দিনটা থেকে যাওনা কিলমার্ণকে। আমার একটি বোন থাকে শুধু বাড়িতে। কোন অসুবিধে হবে না। আর কিলমার্ণক হল বিখ্যাত জায়গা—বহু বিখ্যাত 'জনি ওয়াকারের' ওটা জন্মস্থান। দুশো বছর আগ জন্মেছে কিন্তু এখনও জোয়ান। চল না ওখান থেকে একটু জোয়ান হয়ে আসবে—

বললাম, ক্ষমা করুন। আমাকে আজকের মধ্যেই আবার্ডিনে পৌঁছাতে হবে।

পাশের ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাই নি। মাল রাখবার সুঁড়ি-পথটা দিয়ে যেতে গিয়েই টীনের সেডের পাশে দেখলাম ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে আছে। আর রাতের সেই মেয়েটি করুণ আবেদনে তাকে জিজ্ঞাসা করছে—আবার কবে কোথায় দেখা হবে? লোকটির উত্তরটা অদ্ভুত শোনাল। বললে, সময় হলেই দেখা হবে আবার। তোমার ঠিকানা যা হয় একটা দিয়ে যাও। আমার ঠিকানা পরে জানাব। তবে বলছিলে না আমেরিকায় যাবে—ওটা কোরো না। এটা আমার পরামর্শ রইল—

মেয়েটি আবার ধরা গলায় বললে, তোমাকে যে আমার এখন বড় দরকার। তোমাকে যে আমি ছাড়তে পারছি না—

লোকটি নিরাসক্ত গলায় বললে, ছেলেমানুষী কোরো না। ওখানে তোমার ফ্রেণ্ড অপেক্ষা করছে। সে তোমায় নিতে এসেছে মনে রেখো।

নিস্তব্ধ নির্জন রাজগীরের পঞ্চচূড় পাহাড়। আবছা অন্ধকারে তারা পঞ্চ প্রহরীর মত স্থির নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে। ডিসেম্বরের দারুণ ঠাণ্ডায় পথে ঘাটে লোকজন আজ একেবারেই নেই। যাত্রীদের ভীড়ে আর ব্যবসার ফিকিরে আসা নানান লোকের গোলমালে দিনের বেলা যে রাজগীর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে এখন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। কেবল মাত্র আমিই একলা পাহাড়ে পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছিলাম নীচের রাস্তাটার দিকে। কতো রাত হয়েছে খেয়াল করি নি। মানুষকে যখন নিশির ডাকে পায়, তখন সে ঘুমের ঘোরে পথ চলে কথা বলে। সব কিছু করে। খেয়াল হয় যখন সে ঘোর ভাঙে। আজ আমারও অবস্থা প্রায় সেই রকম।

আজ সন্ধ্যাবেলা জ্যাককে বৌদ্ধ শ্রমণের বেশে দেখা থেকে আমি নিশির ডাক শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। অভ্যস্ত পথ অতিক্রম করছি স্বপ্নের ঘোরে। মাঝে মাঝে ঘোর কেটেছে রাস্তার ধারের নিশাচর কুকুরদের তীক্ষ্ম চীৎকারে। আবার ডুবে গেছি সেই স্বপ্নের মধ্যে পরমুহূর্তেই। কোন কথাই মন আমার হারায় নি। অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলি, অতি সূক্ষ্ম মনমানসিকতার প্রকাশগুলিও সে সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছিল। এতক্ষণ সেই স্বপ্নের ভিতরেই দেখতে দেখতে এলাম আমার লণ্ডন থেকে আবার্ডিনে আসার যাত্রাপথ। দেখলাম সেই রহস্যময় পুরু লেন্সের চশমা চোখে দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার যুবকটিকে। দেখলাম সেই রাতের আঁধারে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা মেয়েটিকে, দেখলাম থেরেসাকে। আবার দেখা হল মিসেস মরিসনের বাড়ির বোর্ডারদের সঙ্গে। দেখা পেলাম শ্যামল আর পামেলার। আর যার কথা আমার সমস্ত জীবনে একটা বিশেষ সঞ্চয় হয়ে আছে অথচ যার সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও অন্ত নেই সেই শুদ্ধকে। দেখতে লাগলাম তার সেই পূর্বপারিপার্শ্বিকের মধ্যে।

আজ এই অনাবৃত আকাশের তলায়, অবারিত পর্বত-প্রান্তরের প্রশান্ত সান্নিধ্যে, পরম নিস্তব্ধ রাতে মন আমার ধ্যানের আসন পেতে বসেছে। ধ্যান-নেত্রে দেখছি উত্তর সাগরের তীরকে। দেখছি তার সমুদ্রমেখলা বন-গিরি-কান্তার-পরিবেষ্টিত প্রকৃতিকে। দেখছি তার নানান বৈচিত্র্য আর মনোভাবে গড়া মানব প্রকৃতিকে।

থেরেসার সঙ্গে আলাপ গ্লাসগো থেকে আবার্ডিনে যাবার রাস্তায় ট্রেনের কামরাতে।

এদেশের ট্রেনগুলি বড় সুন্দর। এক একটা বড় বগি অনেকগুলি ছোট

ছোট কামরায় ভাগ করা। প্রত্যেকটা কামরায় দুটো করে লম্বা আসন। নরম আরামপ্রদ গদী দিয়ে মোড়া। প্রত্যেকটা লম্বা আসনে তিনটি করে ভাগ। তিনজন বসতে পারে। সব কামরার সামনে দিয়ে গার্ডের গাড়ি থেকে এঞ্জিন পর্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে চলে গেছে সরু করিডর। কামরাগুলি পুরু কাঁচের দরজা জানলায় ঘেরা। ভিতরে পর্দা।

গ্লাসগোর বুকানন স্ট্রীট স্টেশন থেকে চাপলাম উত্তরের ট্রেনে। হাতের গোড়ায় যে থার্ড ক্লাশ কামরাটা পেলাম তাতেই উঠে বসলাম। নরম সীটের মধ্যে গা ঢেলে দিতেই নীচের ঝাঁঝরি দিয়ে একঝলক গরম হাওয়া বেরিয়ে এসে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরল। কামরায় ছটা সীটে ছজন লোক আমাকে নিয়ে। সবার সঙ্গে আলাপ হতে খুব বেশী দেরী হল না। কিন্তু ফ্যাসাদও বাধল সঙ্গে সঙ্গে।

গ্লাসগো ছেড়ে বেশ কয়েকটা স্টেশন পার হয়ে যাবার পর মনে পড়ল লণ্ডন থেকে রাণী নিজের হাতে লুচি আর সন্দেশ করে দিয়েছিল গাড়িতে খাবার জন্যে। সেগুলি যেমন ছিল তেমনি আছে। মনে হতেই মাথায় মতলব এলো। সদ্য যখন এদের সঙ্গে আমার আলাপ হল তখন মিষ্টিমুখ দিয়েই শুরু করা যাক। ভেবে সন্দেশের কৌটো খুলে সবাইকে দিলাম। বললাম, ভারতীয় মিষ্টি। খেয়ে দেখ কেমন লাগে—

সন্দেশ খেয়ে সবাই ভারী খুশী। গোলগাল পুতুলের মতো মিষ্টি চেহারার মেয়েটি বললে, শুনলাম তুমি আবার্ডিনে যাচ্ছ? আমিও সেখানে যাচ্ছি। কোথায় থাকবে ঠিকানাটা দিও। তোমার কাছ থেকে এই ইণ্ডিয়ান সুইট তৈরী শিখে নেব—

সবাই সন্দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কেবল আমার পাশে বসা একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক সন্দেশ নিল না। গোমড়া মুখ করে জানাল এ দেশের প্যাস্ট্রী এর থেকে ঢের ভাল। প্যাস্ট্রী তৈরী করতে যে উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কলকৌশল লাগে ইণ্ডিয়া তা পাবে কোথায়? ভাল খাবার তৈরী করতে পারাটা হল একটা মস্ত বড় কালচার।

—নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দ্বিমত নেই, বললাম আমি।

ভদ্রলোক আমার কথায় কান না দিয়ে নিজের ঝোঁকের উপরই বললে, কিন্তু ভারতবর্ষ যে এক রোপট্রিক দেখান ছাড়া আর কিছু করতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না।

এবার সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ?

—কারণ অত্যন্ত সোজা, বললে ভদ্রলোক। ভারতবর্ষের জনসাধারণের কালচার বলে কোন পদার্থ-ই নেই।

বেশ বুঝতে পারলাম তার কথা শুনে ট্রেনের অপর যাত্রীরা ঈষৎ চমকে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ক্ষমা করবেন জানতে পারি কি আপনি কোনদিন ভারতবর্ষে গেছেন কিনা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা—

ভদ্রলোক নির্লিপ্ত গলায় বললে, যাবার দরকার নেই। আমার ভায়রা ভাই আসামের চা বাগানের ম্যানেজার ছিল। তার কথাতো অবিশ্বাস করতে পারব না। সে নিজেই বলে এ কথা।

অপর যাত্রীদের মুখ চোখ বেশ লাল হয়ে উঠেছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এই লোকটির কথাবার্তার ধরনটা কেউই ভালভাবে নিতে পারছে না। লোকটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। বললে, তোমাদের নিজেদের দেশে কালচার থাকলে এত দূরে দেশে তোমরা আস কেন লেখাপড়া শিখতে।

খাঁটি বৃটিশ যে এভাবে কথা বলতে পারে তা ছিল আমার ধারণারও বাইরে। অন্ততঃ বৃটেনের এটিকেট আর ভদ্রতা এ দুটো বিশ্ববিখ্যাত বলে জানতাম। লণ্ডনে থাকার সময়েও এদেশের সম্বন্ধে যে অল্প পরিচয়টুকু পেয়েছিলাম তাতে করে এ ধরনের লোকের সংস্পর্শে আমি কোনদিন আসি নি। তবুও যখন সে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুমি যিশুতে বিশ্বাস কর ? তার ধর্মকে জান ? বললাম, হ্যাঁ জানি। যিশু হলেন মহামানব।

শুনে লোকটা বললে, তুমি নিজে কি ?

—হিন্দু।

লোকটা বললে, এই দ্যাখো তোমার নিজেরই মনে কত গলদ। কতো ফাঁকি। তুমি ধর্মে হলে হিন্দু। পুতুল পুজো কর। আরও নানা রকম বদ কাজ কর—তবুও বিশ্বাস কর যিশুতে—

বলে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল।

—তাতে কিছু আটকায় না। আমি বললাম ধর্মের মূল কথাটাই আমার ধর্ম আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। তাই আমি দুনিয়ার কোনো ধর্মকেই আর অবিশ্বাস করিনে—

—কক্ষনো তা হতে পারে না, লোকটি চট্ করে হাসি থামিয়েই চোখ লাল করে বলে উঠল, দুনিয়ার পথ মাত্র দুটো। সুপথ আর কুপথ। সুপথ মানেই হল খৃষ্টানদের পথ। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভাল পথ থাকতেই পারে না। তুমি হাজার জোর দিয়ে বললেও আমি সেকথা বিশ্বাস করি না—

কথা কটা বলে নিজের গর্বের বাতাসে পাম্প করা ফুটবলের ব্লাডারের মতো ফুলে উঠল। বুকের উপর হাত দুটো আড়াআড়ি ভাবে রেখে সবাইকার দিকে জাঁক করে তাকাতে লাগল।

আমি বলবার চেষ্টা করলাম, আপনি ভয়ানক ভুল করছেন—

সঙ্গে সঙ্গে সেও লাফিয়ে বলে উঠল, খৃষ্টানিটী ছাড়া আর যে সব ধর্ম তা হল পেগ্যান অসভ্যদের ধর্ম—

মনে হল লোকটি একটি ভুয়ো ধর্মধ্বজ। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে অবাক হবার সময় পেলাম না। আরও একটা ব্যাপার অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে আমাকে আরও বেশী অবাক করে দিল। কোণের পুতুলের মত মেয়েটির মুখের ভাবটা যে কখন কঠিন হয়ে উঠেছে আমি টেরও পাই নি। সে তক্ষুনি লোকটার সামনে উঠে এসে বললে, খুব তো ধর্মের বড়াই করছ ? গত পরশু সন্ধ্যে রাতে গ্লাসগোর কুখ্যাত হোপ স্ট্রীটে মদ খেয়ে কী কীর্তি করেছিলে মনে আছে ? পুলিশে যেতে যেতে বেঁচে গেলে কার জন্যে সেটা মদের নেশা কেটে গেছে বলে মনে পড়ছে না বুঝি ? স্কাউনড্রেল—

তীব্র ঘৃণায় মেয়েটার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। ঠোঁটের কোণ দুটো অস্বাভাবিকভাবে কুঁচকে গেল। চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল আগুনের হল্কা।

এদিকে লোকটার লাফানি ততক্ষণ থেমে গেছে। ফ্যাকাশে মুখে সে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে। মেয়েটি বলছে, লজ্জা করে না নিজেদের খৃষ্টান বলে পরিচয় দিতে। বাইবেলের দশটা উপদেশের আধখানাও মানতে পার না। আর যতো দাপট বিদেশী ভদ্রলোকদের ওপর। গ্লাসগোর থেচোট-শ্ল্যাসার সঙ্গে এদের সবাইকে জেলে দেওয়া উচিত। এদের জন্যেই আমাদের বিদেশে যত বদনাম—

বলে ফুঁসতে ফুঁসতে গিয়ে সে নিজের সীটে বসে পড়ল। কামরার অপর যাত্রীরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল এতক্ষণ ব্যাপারটা। এবার সবাই চোখ দিয়ে লোকটাকে এমন ছি ছি করতে লাগল যে পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই সে নেমে চম্পট দিল।

পুতুলের মতো গোলগাল মেয়েটির রাগে রাঙা মুখে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল। কামরার অন্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে বললে, হতভাগা জানে না আজ সকালে ওর ছবি বেরিয়েছে কাগজে ওরই কু-কীর্তি ঘোষণা করে—

ভিতরটা আমার কেমন যেন তেতো হয়ে উঠেছিল। তাই বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। ট্রেন ছুটে চলেছে মাঠ, পাহাড় আর জঙ্গলগুলো পিছনে ফেলে। কুয়াশা যেন ক্রমশঃ নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। বাইরে খুব বেশী কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দিনের বেলায় নেমে আসছে অন্ধকার। শীতটা খুব বেশী বোধ হচ্ছে না। গাড়ির কামরায় গরম হাওয়া যাতায়াত করছে বলে শরীরটা গরমই আছে।

গাড়ি এসে থামল স্টার্লিং-এ। স্টার্লিং জংশন স্টেশন। গাড়ির প্রায় তিন ভাগ যাত্রী নেমে গেল ডাণ্ডি যাবার গাড়ি ধরতে। ঝুপঝুপ করে বিষ্টি নেমেছে বাইরে। ম্যাকিণ্টস্ ঢাকা মূর্তিগুলো সেই বিষ্টি মাথায় করে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল অপর প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ধরবার জন্যে।

স্টার্লিং থেকে গাড়ি ছাড়ল আর আমরা দুজন কামরার মধ্যে একেবারে

একলা হয়ে গেলাম। মেয়েটি উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চুলটা ঠিক করে নিয়ে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে আমার পাশের সীটটায় বসে বললে, এখন দুনিয়াটা আমাদের দুজনের কি বল ? তার গলায় আগের সেই ভয়ানক রাগের সুরের এতটুকু চিহ্নও নেই। বরঞ্চ তার ঘরোয়া সুরটা আমার মন ছুঁয়ে গেল। ভারী ভাল লাগল। মনে করিয়ে দিল আমার দেশের আত্মীয় বন্ধুদের কথা।

থেরেসাকে গাড়ির কামরায় যখন প্রথম দেখি সত্যিকথা বলতে কী তার চরিত্রে যে একটা অত্যন্ত বলিষ্ট জীব বাস করে সে ধারণা আমার হয় নি। তাকে বাইরে থেকে দেখলে তা মনেও হয় না। ঘটনা সংঘাতে সে পরিচয় পেয়ে তার ওপর আমার শ্রদ্ধাটা বেড়ে গিয়েছিল। তাই শ্রদ্ধার দূরত্বটা বজায় রেখে জানালাম—হ্যাঁ—

থেরেসা বললে, তোমার দেশের কথা কিছু বলত শুনি এবার। আমি অবশ্য বিশেষ কিছু জানি না। তবে ভারতবর্ষ যে একটা বড় দেশ—তার যে একটা মহান ঐতিহ্য আছে এ কথা আমি আমার বাবার কাছে শুনেছি। আমার বাবা ছিলেন পর্তুগীজ। ভারতের নৌ-বাহিনীতে তিনি অনেকদিন কাজ করেছিলেন। থেরেসা নামটা আমার বাবারই দেওয়া—

—তা তুমি আবার্ডিনে কি করতে যাচ্ছ—

—আমার মা যে স্কট। থেরেসা হেসে জবাব দিল। তাই মায়ের ন্যাশন্যালিটি ধরে আমি আবার্ডিনের বাসিন্দা। আমার বাবাকে আমি মাত্র একবার দেখেছি। তিনি ভারতবর্ষেই মারা গেছেন। তাঁর টাকা পয়সাও আমরা কিছু পাই নি। আমার মা আবার্ডিনের রিজেণ্ট কিতে সুইট্‌স্‌-এর দোকান করেছেন। তাতেই আমাদের দিন চলত। এখন আমি কাজ করছি ফিস্‌ মার্কেটে। বেশী লেখা পড়ার তো সুযোগ হল না। তা তুমি আসছ কোথা থেকে ? বোম্বে, ম্যাড্রাস, ডেল্‌হী না ক্যালকাটা—

—কোলকাতার লোক আমি। শুনে থেরেসা বললে, ক্যালকাটা ? আমার বাবাকে ক্যালকাটায় কবর দেওয়া হয়েছে। লোয়ার সার্কুলার রোডের কবর খানায়। সে জায়গাটা তুমি জান ?

—খুব জানি—

থেরেসা বললে, আবার্ডিনে তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। আমার মা কোলকাতার লোক পেলে ভারী খুশী হবে। আমার বাবার কবরের একটা ছবি আছে তোমাকে দেখাব। তা তুমি এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছ কোথায় মিস্টার ?

বললাম, কিছু ঠিক করি নি। গিয়ে একটা দেখে নেব—

থেরেসা বললে, আমাদের পাড়ায় এক গিন্নী বাড়িউলী বিদেশী ছাত্রদের রাখে। সেখানে যদি ঘর খালি থাকে তোমাকে সেখানে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারব—

হঠাৎ একটা গুম্‌ গুম্‌ আওয়াজ শুনে নীচে তাকালাম। দেখি অনেক উঁচু দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে আর নীচের দিকটা একটা খাড়ির মত হয়ে গেছে। তার মধ্যে ঢুকছে সাগরের জল। ফিয়র্ড-এর যে কল্পনা মনে ছিল তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল দৃশ্যটা। ডানদিকে অন্ধকার ধোঁয়ার ভিতর অনেক কষ্টে চোখের দৃষ্টিটা পাঠিয়ে দিলাম। দেখলাম উত্তর সাগরের অশান্ত জল সেখানে গাঢ় কুয়াশার আস্তরণের নীচে যদিও প্রায় অদৃশ্য তবুও মনে হল ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে একের পর এক যথারীতি। তাতেই নিরবচ্ছিন্ন গুম্‌ গুম্‌ আওয়াজ ভেসে আসছে।

—আমরা এই স্টোনহাভেনে এসে গেলাম, থেরেসা বললে।—এর পরের স্টপেজটা আবার্ডিন। ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা বেজেছে।

॥ ৬ ॥

স্টোনহাভেন ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে থেরেসা আবার্ডিনের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

বললে, তুমি যে বৃটেনের আর কোন জায়গা না বেছে আবার্ডিনকে পছন্দ করেছ তার জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বলছি তুমি এখানে থেকে সত্যিকারের আনন্দ পাবে।

বললাম, কী জানি। আবার্ডিন সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে কারুর কাছ থেকে কিছু শুনি নি। কাজেই এদেশ সম্বন্ধে বাস্তবিক ধারণা আমার আদবে নেই। এখানে এসে কেমন থাকব এ ভাবনা আগে থেকে না করেই এখানে এসে পড়েছি এক অদৃশ্য পথের দেবতার টানে। দেখি তিনি এখন আমায় কেমন রাখেন—

—আমি বলছি তিনি তোমাকে যথাসাধ্য ভালই রাখবেন—আবার্ডিনে লোকে শখ করে আসে আরামে থাকবার জন্য। এটা বৃটেনের একটা ছুটি কাটাবার উত্তম জায়গা—

—তা বলে নভেম্বর মাসে কেউ এখানে শখ করে থাকতে আসে না নিশ্চয়। বললাম আমি।

—না তা আসে না। কারণ নভেম্বরে এদেশে কাটাবার মতো ছুটিই পাওয়া যায় না। ক্রিস্‌মাসে, জানুয়ারীতে আসে কিন্তু—

আঁৎকে উঠে বললাম, এই প্রচণ্ড শীতের দেশে—

থেরেসা হেসে বললে, আবার্ডিনে সূর্যদেবের দাক্ষিণ্য বৃটেনের সব দেশের থেকে একটু বেশী। তা ছাড়া এর আকাশটাও যতো বেশী দিন পরিষ্কার দেখা

যায় বৃটেনের অন্য কোন জায়গায় বোধ হয় অত দিন নয়। সবার চেয়ে আকর্ষণ এর ঈষৎ উষ্ণ আবহাওয়া। তুমি কী জান না—আবার্ডিনের পাশ দিয়ে গরমজলের গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম বয়ে চলেছে?

—ওসব কথা ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম। বললাম আমি। কিন্তু বাস্তবিক আবার্ডিনের কাছে এসে মনে তো হচ্ছে না এর বাতাস-ঈষদুষ্ণ—

—জেনে রেখো এখানে যখন এই অবস্থা—তখন বৃটেনের অন্যান্য জায়গায় এর থেকেও দুরবস্থা নির্ঘাৎ। বললে থেরেসা।

বললাম, বাদ দাও তোমার আবহাওয়া প্রসঙ্গ। শুনেছি যখন কোন কিছু বক্তব্য থাকে না তখন এখানকার লোকে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করে। সত্যিকরে বলত এখানকার প্রধান আকর্ষণটা কী?

থেরেসা একটু ফিক করে হেসে বললে, ধর এই আমাদের মতো মেয়েরা। কথাটা বলে ওর ঠোঁটই শুধু হাসছিল না চোখ দুটোও কৌতুকে হাসছিল।

সে দিকে চেয়ে বললাম, সে তো একশোবার সত্যি। কিন্তু তা ছাড়া—

ও মুহূর্তে হাসিটা সামলে নিয়ে একটু গম্ভীর হবার ভান করে বললে, সত্যি কথা বলছি বেড়াবার জায়গা হিসেবে আবার্ডিনের খ্যাতি আছে। এ শহরের নাম কী জান?

—না।

স্কটরা আদর করে এর নাম দিয়েছে—সিলভার সিটি উইথ্‌ গোল্ডেনস্যাণ্ড। আবার্ডিনে বিখ্যাত গ্রানাইটের কোয়ারী আছে। এই শহরের রাস্তাঘাট-বাড়িঘর সব তৈরী সেই চকচকে রুপোর পাতের মতো গ্রানাইটে। শহরের শেষে উত্তর দিকে উত্তর সাগর। তার নীল জলের জমিতে পাড় বসান সোনালী বালির। রোদ উঠলে যা দেখতে লাগে—অপূর্ব সুন্দর। আমি বলছি তোমার ভাল লাগবে এদেশ। আমি জানি তোমরা বাঙালীরা প্রকৃতির সৌন্দর্য ভালবাস। তাদের উপভোগ করবার মতো মানসিক সম্পদ আছে তোমাদের।

বলে একটা ভীষণ রকম প্রবীণতার ভান করল থেরেসা।

আমরা এসে নামলাম আবার্ডিন স্টেশনে। থেরেসা নিজেই আমার ভারী সুটকেশটা ধরে নীচে নামিয়ে ফেলল। তারপর জিনিসগুলো বাইরে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে আমায় শুধাল—গ্লাসগো থেকে আবার্ডিন পর্যন্ত বেশ কাটল—নয়?

—তার জন্যে সব কৃতিত্বটুকু তোমার পাওনা থেরেসা—

—দূর! তোমায় দেখে ভেবেছিলাম তুমি হয়তো একটা জ্ঞানীগুণী মানুষ হবে। তা কথা বলছ যেন একটা উঠতি বয়সের প্রেমে পড়া ছোকরার মতো, বললে থেরেসা। দুজনের কৃতিত্ব না থাকলে কী আনন্দ পুরো হয়? দেখো বাপু,আমি তো লেখা পড়া শিখি নি। তবু এ জ্ঞানটা আমার খুব ভালই আছে। বলে খিলখিল করে হাসতে হাসতে এসে একটা ট্যাক্সির হাতল চেপে ধরল।

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম রাতের অন্ধকারের মধ্যে বেশ বৃষ্টি নেমেছে।

আবার্ডিনে প্রথম যে ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ তিনি মিসেস রেবেকা মরিসন। স্টেশন থেকে সটান তাঁরই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ব্যবস্থা করে দিয়েছিল থেরেসা।

মিসেস মরিসনের সঙ্গে প্রথম দেখায় আমি তাকে ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারি নি। যেমন বুঝতে পারি নি তার পাখির বাসার মতো বাড়িটাকে বাইরে থেকে। কিন্তু পরে সব কিছুই বুঝেছিলাম। চিনেছিলাম মিসেস মরিসনকে।

থেরেসাও মরিসন গিন্নীর বাইরেটাই জানত। ভিতরের কথা তারও জানা ছিল না।

মিসেস মরিসনের সঙ্গে প্রথম দেখায় আমি বেশ একটু মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ডক এলাকার কাছে সাউথ কন্‌স্টিটিউশন স্ট্রীট। গোটাকতক বাড়ির পরে একটা দরজায় গিয়ে কলিং বেল টিপতেই যিনি দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনিই মিসেস মরিসন। একহারা একেবারে খাপখোলা তলোয়ারের মতো শরীর। চেহারাতে বেশ কিছুটা পুরুষালী ছাপ। মাথার চুল ফোলান কিন্তু ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। পরণে নেভীব্লু রং-এর সার্জের ট্রাউজার্শ। অঙ্গে আঁটসাঁট সাদা পুলোভার।

মিসেস মরিসন দরজা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল। মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল কাকে চাই—

মিসেস মরিসনের দিকে তাকিয়েই নজরে পড়ল তার সেই বিশেষ দাঁড়াবার ধরনটা। বুকটাকে ফুলিয়ে দিয়েছিল মিসেস মরিসন। গলার কাছটা ঈষৎ কুঁচকে গেছে আর ঠোঁটের উপর খেলা করছে একটা মধুর আপ্যায়নের হাসি। কুঁচ কুঁচ চোখ দুটো ঈষৎ রক্তাভ এবং চঞ্চল।

এক নজরে দেখে নিলাম মিসেস মরিসনকে। থেরেসা আলাপ করিয়ে দিল। বললে, আপনাকে তো বীচ বলরুমেই দেখেছি। এ অঞ্চলের আপনি এক নম্বর নাচিয়ে। আর শুনেছি আপনার মধুর ব্যবহারের কথা। জানি আপনি বিদেশী বোর্ডারদের রাখেন। তাই একান্ত অজানা লোকটিকে এনেছি আপনার কাছে। আপনার এখানে কী জায়গা হবে—

মিসেস মরিসন ঠোঁটের উপর হাসিটাকে আরও রসঘন করে নিল। বললে, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আমার কী সৌভাগ্য এঁর মতন ভদ্রলোককে আমার এখানে নিয়ে এসেছেন। জায়গা নিশ্চয়ই হবে। অবশ্য জায়গা সব সময়ে থাকে না। যাই হোক তৈরী করে নিতে হবে। বিশেষ ইনি যখন বিদেশী।

স্পষ্ট ইংরাজী উচ্চারণে কথাগুলি বললে মিসেস মরিসন। ঝাঁকুনি খেয়ে মাথার ছোট করে ছাঁটা অথচ স্যাম্পু দিয়ে ফোলান চুলের গোছা দুলে দুলে

উঠতে লাগল।

মিসেস মরিসন শুধু যে গলা কুঁচকে দাঁড়ায় তাই নয়, কোন কথাকে জোর দিয়ে বলবার সময় পায়ের পাতার সামনের দিকে ভর করে কিছুটা নাচের ভঙ্গীতে শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।

অতঃপর সে থেরেসাকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে উধাও হল। ধারণা করলাম আমার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিল তার কাছ থেকে। বেরিয়ে এসে আমার দিকে সটান হাত বাড়িয়ে দিল মিসেস মরিসন।—এসো, এসো, অন্দরে এসো—

থেরেসার দিকে চেয়ে হেসে বললে, কিছু ভেবো না, সব ঠিক করে দেব দুমিনিটে। তোমার বিদেশী বন্ধুকে আরামে রাখবার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার।

থেরেসা আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। বললে, আমার বাড়ি খুব বেশী দূরে নয়। কাজেই শীঘ্রই আসব তোমায় দেখতে—

আমি মরিসন গিন্নীকে অনুসরণ করে গিয়ে ঢুকলাম বেসমেন্টের একটা ঘরে। সে ঘরে একটা পুরোনো খাটের ওপর পাতা আছে কতকালের পুরোনো একটা বিছানা। পাশে একটা টেবিল আর একটা রংচটা পুরোনো চেয়ার। দূরে ফায়ার প্লেসের কাছে শীতে কুঁকড়ে আছে একটা ছোট্ট ইজিচেয়ার। তারও দশা ঘরের অন্যান্যদের সঙ্গে এমন কিছু তফাৎ নয়। ঘরটাতে কেমন একটা পুরোনো পুরোনো গন্ধ ছাড়ছে।

আমাকে সেই চেয়ারে বসিয়ে মিসেস মরিসন তক্ষুনি উধাও হল। এল মিনিট দশেকের মধ্যেই। হাতে তার একটা ট্রে। তাতে সাজান রয়েছে কয়েকখানা স্যাণ্ডউইচ, প্যাস্ট্রী, টোস্ট, মাখন, জেলী আর চায়ের পট।

—একটু খেয়ে নাও চটপট। শুনলাম গ্লাসগো থেকে আসছ। নিশ্চয় রাস্তায় ভাল কিছু খাবার পাও নি। আর তাছাড়া আমি ভয়ানক দুঃখিত তোমাকে এই খেয়েই আজ রাতটা কাটাতে হবে। আমার সন্ধ্যে বেলাকার হাইটীর ব্যবস্থা সব পাঁচটার মধ্যেই হয়ে যায় কী না? বোর্ডাররা ছটার মধ্যেই খেয়ে নেয়। এ বাড়ির নিয়ম।

মধুর আপ্যায়িতের হাসি হাসতে লাগল মিসেস মরিসন কথাগুলো বলার সময়। মাঝে মাঝে আমার দিকে ফিরে গল্প করে আর হাতের জিনিসগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখে।

সাজান শেষ হতেই আমার দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল কী যে তোমার নামটি। ওই দেখো এখুনি শুনলাম কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। অবাক হবার ভান করল মিসেস মরিসন।

আমার নাম বললাম। মিসেস মরিসন কয়েকবার চোখ পিট পিট করে

নামটাকে দু-চারবার রপ্ত করে নিল। তারপর বললে, আমার নাম মিসেস রেবেকা মরিসন। আমার বাড়িতে যে সব নাবালক ছেলেগুলো থাকে তারা এই স্কট-ল্যাণ্ডেরই ছেলে। তাদের কারুর গোঁফ গজিয়েছে, কারুর গজায় নি। তারা আমায় মাম বলে ডাকে। তোমাদের ইণ্ডিয়া থেকে দুটি ছেলে এখানে এসেছে। তারা থাকে এটিকের ঘরে। তারাও আমায় মাম বলে। তা তোমার যা ইচ্ছে আমায় ডাকতে পার।

বললাম, তোমার রেবেকা নাম তোলা থাক শুধু মিস্টার মরিসনের জন্য। মাম বলে ডাকুক তোমার নাবালক পোষ্যরা। আমি তোমায় মিসেস মরিসনই বলব—

মরিসন গিন্নী কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—বাঃ কী চমৎকার কথা বল তুমি—

তড়বড় করে কথা বলতে থাকে বাড়িওয়ালী রেবেকা মরিসন। তার কথা বলার ধরনটা যদিও খুব দ্রুত তবুও ইংরেজী উচ্চারণ খুবই স্পস্ট আর মিষ্ট।

চট করে পাশের পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বার করল মিসেস মরিসন। আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ঠোঁটে একটা ধরিয়ে চোঁ চোঁ করে প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে আমার পাশে এসে বসল। মুখখানা আমার কানের কাছে এনে অন্তরঙ্গ হবার ভান করে বললে, এই ঘরখানাতেই আপাততঃ তুমি থাক কেমন? ঘরটা খারাপ নয়। বেশ বড়ো সড়ো আছে। তা ছাড়া—বলেই খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিয়ে চোখবুজে একটুখানির জন্য চুপ করল মিসেস মরিসন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা ছাড়া কী—

মিসেস মরিসন আমার কাছে আরও একটু ঘেঁষে এল। মুখখানাকে আরও কাছে এনে প্রায় ফিসফিস করে বললে, ব্যাপারটা তোমার আমার মধ্যে বলেই বলছি। আমার এখানে যে সব ছেলের থাকে তারা সব ছোকরা। তাদের কোন গার্লফ্রেণ্ড আনতে দিই না এখানে সন্ধ্যার পর। কিন্তু তোমার মতো বয়স্ক লোকের সম্বন্ধে তো সে আইন খাটবে না। অথচ আইন ভাঙাও চলবে না। বাইরের সবাই, পড়শীরা সবাই জানে—ওসব ব্যাপার মিসেস মরিসনের ওখানে চলে না। তাই যাতে দুদিকই বজায় থাকে—তার জন্যে তোমায় এই ঘরখানা দিলাম। ঘরের সামনে গলির বাঁ দিকের দেয়ালে ঐ যে লাল পর্দাটা দুলছে ওটা সরালেই দেখবে একটা ছোট দরজা। ওটা একেবারে রাস্তার ওপরকার দরজা। দরকার হলে রাত বিরেতে তুমি ওটা তোমার নিজের জন্য ব্যবহার করতে পার।

বলে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বাঁ দিকের চোখটা কুঁচকে নাচের ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেল মিসেস মরিসন।

আমি সেই পুরোনো ঘরের ভাপসা গন্ধের মধ্যে বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম।

ফায়ার প্লেসের গনগনে আগুনের পাশে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দোরে টোকাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমটা ভেঙে গেল। পরিষ্কার বাংলায় বাইরে থেকে কে যেন বললে, ভিতরে আসতে পারি ?

চটপট উঠে দরজা খুলে বললাম, আসুন আসুন--

যে ভিতরে এল তাকে দেখে সম্ভ্রমের জায়গায় মনে জাগল বাৎসল্য রস। একটি সুন্দর চেহারার তরুণকান্তি যুবক। ভাল করে গোঁফের রেখা দেখা যায় না বলে মুখখানাকে দেখাচ্ছে নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো। বয়স হদ্দ কুড়ি। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওর এগিয়ে দেওয়া হাতখানাকে জড়িয়ে ধরলাম।

ছেলেটি এসেই বললে, আপনার নাম শুনলাম মামের কাছে। মৈত্রেয় শুনেই ভেবেছি—হুঁ হুঁ বাবা এ বাঙালী হতেই হবে। যাক্ এতদিনে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আপনার বাড়ি কলকাতায় তো ? আমিও কলকাতার লোক—

আমার জবাবের কোন অপেক্ষা না রেখেই বলতে লাগল ছেলেটি তড়বড় করে। ওর সমস্ত মুখ চোখ ছেয়ে আছে শিশুর অনাবিল সারল্য। ছেলেটিকে প্রথম দেখাতেই ভাল লেগে গেল। ও সারল্য মনকে ছুঁয়ে গেল।

—নাম কী ? জিজ্ঞাসা করলাম। ও বললে, এই দেখুন নামটা তো বলি নি এখনও। আমি শ্যামল মিত্তির। বেলতলায় শ্যামল মিত্তিরকে জানতো না এমন লোকই ছিল না। সিটি কলেজের ছাত্রদের কাছেও আমার নাম করলেই চিনতে পারবে—

হঠাৎ কথা থামিয়ে মাথা নীচু সুরে ছেলেমানুষী গলায় বললে, ভয়ানক দুষ্টু ছিলাম কি না—

বললাম, আপনি আজ্ঞে আর করব না। এখন বস। এখানে কতদিন এসেছ—কী করছ—

শ্যামলের চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, এসেছি এখানে প্রায় বছর খানেকের কাছাকাছি। এই বাসাতেই রয়েছি। কিন্তু আমার এখানে একদম ভাল লাগছে না—জানেন দাদা। আপনি তো আমার বড় ভায়ের মতো। আপনাকে দাদা বলতে বাধা নেই। একটা লোক এখানে নেই যার সঙ্গে মনের দুটো কথা বলি। ভাল ইংরেজী আমার আবার রপ্ত হয় নি। না-না আপনাকে বলতে কোন বাধাই নেই—

থমকে থেমে গেল শ্যামল। তারপর চোখে মুখে একটা ভয়ের ভাব এনে বললে, আপনাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলছি। আপনি আবার আমার উপর গুরুগিরি করবেন না তো ? কাউকে বলে দেবেন না তো এই উইক্‌নেস—

বেশ মজা লাগল। বললাম, না-না—তুমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পার। আমাকে ধরে নিতে পার তোমার দাদা বলে—

শ্যামল বলতে লাগল, এখানে এসে থেকে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি দাদা। বাংলা যে কতদিন বলি নি—ওঃ! বাঙালীর মুখই যে কতোদিন দেখি নি। এ আমার নির্বাসন হয়েছে। তারপর বাবার চিঠি পাই নি প্রায় একমাস। তবে সুমিত দিদির চিঠিতেই সব খবর পাই। উনিই কেবল আমাকে চিঠি দেন রীতিমতো।

—কী করছ এখানে তাতো বললে না।

ও বললে, করছি কী আর, কুলীগিরি। একটা ডিজেল ইঞ্জিনের ফার্মে কাজ করছি। এখানে আসবার আগে নাম শুনেছিলাম এ্যাপ্রেণ্টিস্‌শিপ। বেটাচ্ছেলেরা কিছু শেখায় না। শুধু মেশিনে তেল দেওয়া ছাড়া। তবে ভরসার কথা সপ্তার শেষে দশটা পাউণ্ড গুণে দেয়। ওই আশাতেই এখনও টেঁকে আছি। নইলে কবে পিট্টান দিতুম।

শ্যামল ইতিমধ্যে একবার ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়েছে। বললে, এঃ! আপনাকে সব চাইতে ওঁচা ঘরটাই দিয়েছে মাম। এই ঘরে মিঃ মরিসনের বুড়ো বাপটা মরে ছিল। তারপর তো অনেকদিন থেকেই শুনছি ঘরটার পেপার পাল্টাবে। তা যা হাড় কঞ্জুষ। এক পয়সা যেন ওর বুকের পাঁজরা—তা ভাড়া কতো চেয়েছে—

বললাম। শুনে ও বলে উঠল, ডাকাত—একেবারে হদ্দ ডাকাত। অথচ দেখুন এই কথাটা আমার বলবার জো নেই। আমার রুম-মেট আমাকে এখুনি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। সে আবার এ দেশের লোককেও হার মানায়।

শ্যামল তার রুম-মেটের গল্প আরম্ভ করল।

এই এত বড় আবার্ডিন শহরে আমরা কজনই বা ভারতীয় আছি? কিন্তু মনে হয় এদেশের লোকও আমার বেশী আত্মীয় শকসেনার চাইতে। দুজনে থাকি এক ঘরে কিন্তু কথাবার্তা যদি সারাদিনে দুটো হয় তো যথেষ্ট। ছোকরা ডাঁটের চোটে অন্ধকার দেখছে। বাবা নাকি ইউ, পির একজন এম এল এ। সেই অহংকারেই বুঁদ হয়ে আছে। আরে বাবা, এদিকে টাকা না পাঠালে তার পরের সপ্তায় তাগাদা আসে—এই তো অবস্থা। তার সাদা চামড়ার ওপর যা ভক্তি। সত্যি বলছি ইংরেজের রাজত্ব থাকলে সে ভারতবর্ষে স্যার টর কিছু একটা হয়ে যেতে পারত। আলাপ হলে বুঝবেন চীজটি কী। এ বাড়িতে ওই আমাকে টেনে এনেছিল। এখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি—পালাবার জন্যে। থাক্ আপনি যখন এলেন—তখন আবার আমি ভাবব এখানে থাকব কি না—

ঘরে টোকা দিয়ে একজন স্ত্রীলোক দরজার ফাঁকে উঁকি দিল। শ্যামল বললে, চায়ের সময় হল। মিসেস বেকার্শি ডাকছে।

বেকশিল্লকে ভিতরে ডেকে শ্যামল আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। লম্বা এক-হারা চেহারা। শুকিয়ে এখন কাঠ হয়ে গেছে। তবে মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এক সময়ে সুন্দরীই ছিল। বেকশিল্ল বললে, বয়, তোমার খাবার কি এ ঘরে দেবো ?

শ্যামল ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ—

বেকশিল্ল চলে যেতেই বললে, দেখুন দুর্ভাগ্য। এই বেকশিল্ল এক সময়ে এই আবার্ডিনে চারখানা বাড়ির মালিক ছিল। এই যে বাড়িখানাতে আমরা রয়েছি এ-ও ওরই বাড়ি। কিন্তু এখন ওর কিছু নেই। তাই এ বাড়িতে ঝি হয়ে আছে। অথচ যার বাড়িতে ও ঝি হয়ে আছে তারতো ঘুঁটেকুড়োনি হবার কথা। লোকে বলে ভাল লোক হলেই তার ভাল হয়। আর মন্দ লোকের শুনি সর্বনাশ হয়। কথাটা একেবারে ডাহা মিথ্যে। অন্ততঃ এই বেকশিল্ল আর মরিসনকে দেখলে তার প্রমাণ জলজ্যান্ত পাওয়া যায়। কে জানে দাদা ওসব কথা আমি ভাবতে বসলেই কেমন যেন সব আমার গোলমাল হয়ে যায়—

দোর ঠেলে বেকশিল্ল ঘরে ঢুকল। হাতের ট্রেতে সন্ধ্যের হাই-টীর সরঞ্জাম। শ্যামল আমার দিকে চোখ ঠেরে বাংলায় বললে, বলব এখন ওসব গল্প আপনাকে আর একদিন—

চা-তে বসেই শ্যামল অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠল। ওর ছেলেমানুষী স্বভাবটা সত্যই এখনও যায় নি। বললে, কী খেতে দিয়েছে দেখেছেন এই খেয়ে কি সারারাত থাকা যায় ? এই দুটুকরা আলু ভাজা আর এক টুকরো মাছ ভাজা। আমি আবার একটু বেশীই খাই। বাড়িতে দিদা মানে আমার ঠাকুমা আমাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াত। পেট ফেটে যেতো তবুও ছাড়ত না। আর সে সব কী রান্না। জানেন তো আমাদের ঢাকাই রান্নার নাম ডাক সারা বাংলা-দেশ জুড়ে। আর তার ওপর ছিলুম দিদার আদরের নাতি—মা মরা—

বলতে গিয়েই দেখি শ্যামলের হাতের কাঁটা চামচে থেমে গেছে। গলার স্বরটা ভারী হয়ে উঠেছে।

ব বা যত মারতো—দিদা তত আমাকে খেতে দিত। এই সেদিন অবধি। বুড়ো ছেলে কিন্তু মারেরও যেমন কমতি ছিল না—আদরেরও তেমনি—

চা খেতে খেতে শ্যামল বললে, এই টাকায় অনেক ভাল ব্যবস্থা হয় এখানে। ভাববেন না এ লণ্ডন। এখানে জিনিসপত্র অনেক সস্তা। **Establishment cost** অনেক কম। তবু যে কী জন্যে এখানে থাকি। স্রেফ আলসেমী। চলুন বাইরে থেকে পেট ভরে খেয়ে আসা যাক। এ খাওয়ায় আমার কিছু হল না।

বললাম, ভাই আজ আমাকে ক্ষমা করো। ভীষণ ক্লান্ত আজ। আমি এক্ষুনি বিছানা নেবো।

শ্যামল গুড্ নাইট জানিয়ে বিদায় নিল।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতেই মিসেস বেকার্শ্লি এসে সুপ্রভাত জানিয়ে বললে, মৈত্রেয় তোমার জন্যে ওপরের ডাইনিং হলে সবাই অপেক্ষা করছে। মিসেস মরিসন জানতে চাইলেন, তোমার কী ইচ্ছে—ওপরে আসবে না নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খাবে ?

বললাম, বিলক্ষণ, আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে বলছ—আর আমি কিনা নিজের ঘরে বসে একা গিলব ? তাও কী হয় ? চল চল আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—

কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরী হয়ে উপরের ডাইনিং হলটায় ঢুকলাম। নীচের সিঁড়িটা গিয়ে সেই হলেরই একধারে মিশেছে। সেই হলটাকে মাঝখানে রেখে পাখির খোপের মতো চারদিকে ছোট ছোট ঘর। তাতে নম্বর আঁটা—এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি।

হলঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল পাতা। তার চারপাশে চেয়ার সাজান। টেবিলের মাথায় বসেছে এক বিরাট বপু ঘাড়ে গর্দানে ভদ্রলোক। তার পাশেই একটি বছর বারোর কিশোর। তারপর কয়েকজন যুবক। সেই ঘাড়ে গর্দানে ভদ্রলোকের বাঁ পাশেই মিসেস মরিসন। মুখে সেই অতি অমায়িক হাসি। তাঁর বাঁ পাশে একজন ভারতীয় আর তার পাশেই শ্যামল। তার পরের চেয়ারটা আমার জন্য খালি। একটি ঢলঢলে মুখ কিশোরী আমাকে সেই চেয়ারটা এগিয়ে দিল।

মিসেস বেকার্শ্লি আর সেই কিশোরীটি আমাদের টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিতে লাগল। শ্যামল উৎসাহের সঙ্গে বাংলায় বলে উঠল, আসুন দাদা—

সঙ্গে সঙ্গে সেই ভারতীয় ভদ্রলোকটি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি একটা বিরক্তি প্রকাশ করল মনে হল।

মিসেস মরিসন উঠে দাঁড়িয়ে আমার পরিচয় দিল আর সেই সঙ্গে অন্যদেরও পরিচয় ঘোষণা করল।—এই ইনি হলেন গৃহস্বামী মিঃ মরিসন—মিঃ মরিসন বোকার মতো হাসতে হাসতে বিরাট থাবায় ধরে আমার হাতটা নাড়ল। এই আমার ছেলে টমাস। এই হল মিঃ শাকসেনা—তোমাদের ভারতবর্ষের—

মিঃ শকসেনা উঠে দাঁড়িয়ে আমার করমর্দন করল।

—মিটারের সঙ্গে তো তোমার আগেই আলাপ হয়েছে। আমাদের খাবার পরিবেশন করছে ও মিসেস বেকার্শ্লি। এ পামেলা—মিসেস বেকার্শ্লির মেয়ে। ঐ একনম্বর ঘরের বাসিন্দা—জর্জ জ্যাকসন। ঐ হল দুনম্বর সিলভিম্যান ঐ তিননম্বর জোসেফ গর্ডন—ঐ চারনম্বর রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড। এ ছাড়াও আর জন পাঁচেক আছে। তারা শুক্রবারের বন্ধে বাড়ি যায় সপ্তায় সপ্তায়।

এরা সবাই কাজ করে এই ডকে, আর কাছোঁপিঠে ডিজেল ইঞ্জিনের কারখানায়।

হেসে সবার সঙ্গে করমর্দন করে খেতে বসতে যাব মিঃ শকসেনা হঠাৎ আমার কানের কাছে আড় হয়ে বেশ একটু জোরেই বলে উঠল, একস্‌কিউজ মি মিঃ মৈত্রেয়। আপনার গলায় টাই দেখছি না—

বললাম, ছুটির বারের সকাল। সবাই তো আজ হলিডে মুডে আছি—

শকসেনা ভুরু কুঁচকে মন্তব্য করল, এদের কথা ছেড়ে দিন—এরা এদেশী লোক। আমরা এখানে বিদেশী। আমাদের টেবিল-ম্যানার্স মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

মিসেস মরিসন বলে উঠল, উনি এখন সবে নতুন। ওঁর ত্রুটি আমরা কিছুদিন ধর্তব্যের মধ্যেই আনব না। তুমি ভেবো না শকসেনা। খেতে শুরু কর। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে—

শকসেনা টানাটানা ইংরেজীতে গোরাপল্টনের মতো জোর দিয়ে বললে, তবুও আমার স্বদেশবাসী—আমি এটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি—

বলে সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করার গর্বে গলা ফুলিয়ে তুলল। টেবিলের ওপরে থেকে জর্জ জ্যাকসনের খাবার ভর্তি মুখের অস্পষ্ট মন্তব্য শুনতে পেলাম। শকসেনা বাজে বোকো না খেয়ে নাও—

রবার্ট ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড-এর মুখের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম স্পষ্ট একটা বিদ্রূপের হাসি সে গিলে ফেলার ভান করল। এপাশে শুনলাম খেতে খেতে শ্যামলের দাঁতগুলো যেন একবার ভাজা কড়াই চিবোনের আওয়াজ করল। শকসেনা কিছু না বলে এবার খাবারের দিকে মন দিল।

খেতে গিয়েই প্রথমে কর্ণফ্লেক্‌স্‌। মৃদু রসকতা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, স্কটল্যাণ্ডে এসে পরিজ দেখছি না কেন—

চারনম্বর ঘরের বাসিন্দা রবার্ট ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড-এর গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল—সেটা এ বাড়িতে তুমি খুব কমই দেখবে।—পরক্ষণেই কী একটা তরল মন্তব্য করে সে হেসে উঠল হো হো করে। শকসেনা খেতে খেতে ভয়ানক বিষম খেল। তার খাওয়া প্রায় মাথায় ওঠার উপক্রম। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে চোখ বুজিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল।

বুঝলাম শকসেনার বিষম খাবার কারণ। তাই আর বিশেষ কিছু না বলে খাওয়া চালাতে লাগলাম। খেতে খেতে একবার হঠাৎ চোখ পড়ল শ্যামলের দিকে। সে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে একটি অতি গোপন সলজ্জ দৃষ্টি পাঠিয়েছে ঠিক তার পাশে দাঁড়ান পামেলার দিকে। শ্যামলের সামনে একটু আগে পামেলা যে প্লেটটা ধরে দিয়েছে তার দিকেও নজর পড়ল। দেখলাম তাতে ওম্‌লেটটা আকারে বেশ বড় সড়। আলুভাজার পরিমাণটাও বেশ বেশী। মিসেস মরিসন আর শ্যামলের মধ্যে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পামেলা। চট্‌ করে চোখ নামিয়ে

নিলাম। খেতে লাগলাম চুপচাপ। খাওয়া শেষ হতেই জর্জ জ্যাকসন, সিলভি ম্যান আর জোসেফ গর্ডন একসঙ্গে বার হয়ে গেল। রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ড আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল টেনে।

বললে, তুমি পরিজ খেতে ভালবাস—

বললাম, নিশ্চয়ই—

আমার দিকে ভুরু কুঁচকে রবার্ট বললে, স্কটল্যাণ্ডে কতদিন এসেছ—

—মাত্র একদিন।

রবার্ট গম্ভীরভাবে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললে, হুঁ। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, তাহলে আমি বলছি তোমার স্কটল্যাণ্ড ভাল লাগবে।

অতঃপর রবার্টের পরিচয় পেলাম। ইনভার্নেস্ বলে যে হাইল্যাণ্ড-এর ছোট্ট শহর আছে ও সেখানকার বাসিন্দা। বাড়িতে কেউ নেই বলে এখানেই পড়ে থাকে। কাজ করে ডিজেল ইঞ্জিনের ফার্মে। বয়স বছর বাইশ। কোথায় যেন রাত্রে একটা কিসের ক্লাস ও করে। বললে, আমি হলাম খাঁটি হিলান—অর্থাৎ হাইল্যাণ্ডার। খাঁটি হাইল্যাণ্ডারের কাছে পরিজ শুধু তার খাবারই নয়—তার চেয়ে অনেক বেশী। জান—খাঁটি স্কট কখনো পরিজে চিনি খায় না। নুন দিয়ে পরিজ খায়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল বাসে আসা সেই লোকটির কথা। পরিজে সে শুধু নুনই মিশিয়ে ছিল, চিনির পট ফেলে রেখে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর কী কিছু কারণ আছে ?

রবার্ট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজে বসল। আমাকে তার বিছানার উপর বসতে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল। একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, নিশ্চয়—এই পরিজে নুন খাওয়ার মধ্যে খাঁটি স্কট তার ঐতিহ্যকে স্মরণ করে। স্মরণ করে ক্লোডেন—ব্যানকবর্ণের যুদ্ধ। স্মরণ করে ওয়ালেস, রবার্ট ব্রুসের মতো লোকের বীরত্ব আর কষ্টসহিষ্ণুতা। কাজেই চিনি খাবার বিলাসিতাকে তারা ঘৃণা করে। কিন্তু এ বাড়িটা স্কটল্যাণ্ডে থেকেও যেন স্কটল্যাণ্ডের বাইরে। এখানে পরিজ খুব কম পাওয়া যায়—

রবার্টকে যেমন ভেবেছিলাম তার সঙ্গে কথাবার্তার পর কিন্তু তাকে তেমন মনে হল না। বাইরে সে একটু তরল প্রকৃতি বলে মনে হলেও আসলে দেখলাম কোন কোন ব্যাপারে বেশ সিরিয়স।

এবার সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, শকসেনা কী ভারতবর্ষের লোক ?

বললাম, হ্যাঁ।

রবার্ট বললে, আমার সন্দেহ হয়। কেন না শুনেছি ভারতের লোকেরা ভারী ঐতিহ্যবাদী হয়ে থাকে। আমার এক জ্যাঠামশাই ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডেনের

এডিটোরিয়্যাল স্টাফে কাজ করতেন। তাঁর কাছে শুনেছি তোমাদের মহাত্মা গান্ধী এদেশে এসেও এই দারুণ শীতে হাঁটুর নীচে কাপড় নামান নি। পায়ে পরেছেন শুধু স্ট্র্যাপ দেওয়া সাধারণ চপ্পল। আর গায়ে দিয়েছেন একখানা চাদর। ওঃ কী ভয়ানক সহিষ্ণুতা। চার্চিলের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন—এমনকি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেছেন সে ও ঐ পোশাকে। সত্যি ভাবতে পারা যায় না। চার্চিল তাঁকে বোধ হয় ভয় পেতো—তাই 'হাফ্ নেকেড ফকি'র বলে পালাত—তাকে এড়িয়ে যেত।

বললাম, গান্ধীর মতো কী সবাই হয়। ইংরেজরা তাঁকে ঠিক বুঝতে পারে নি।

রবার্ট বললে, ইংরেজরা ঐ রকমই হয়। তাদের একটা মনোবৃত্তিই খুব প্রবল সেটা হল চাতুর্য। না হলে যেখানেই সে কাজ উদ্ধার করেছে সেখানেই দেখবে—কৌশল-চাতুর্য আর প্রতারণা। এসব কিন্তু খাঁটি স্কটদের কাছ থেকে পাবে না। তারা অনেক পরিমাণে অসভ্য-গোঁয়ার। একেবারেই কেতাদুরস্ত নয়। কিন্তু তারা সত্যবাদী আর কৌশলকে তারা ঘৃণা করে। এখানে এসেছ কয়েক দিন থাক তা হলেই বুঝতে পারবে। তবে এই-সব নামে স্কট আর আচরণে ইংরেজ, কিম্বা চেহারায় ভারতীয় কেতায় ইংরেজ—এসব লোকরা যে বেশী ভয়ানক তা আগে থেকেই বলে রাখছি।

শ্যামল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, আরে রবার্ট তুমি যে একাই দেখছি এ ভদ্রলোককে গ্রাস করবে। একটু ছাড় আমরা দুটো কথা বলি—

রবার্ট হাত বাড়িয়ে শ্যামলের হাতটা টেনে নিলে। বললে, অনেক ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাচ্ছি—তোমার সৌভাগ্যে।—বলে ঈষৎ কটু একটা হাসির টুকরো ছুঁড়ে মারল শ্যামলের দিকে।

শ্যামল বললে, কেন—আমার আবার কী হল—যাতে এমন একটি অভি-নন্দনের ঘটা—

রবার্ট আগের মতোই সিগারেট টানতে টানতে নির্বিকার হবার ভান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলে—দিলাম না হয় একটা। তুমি আমার বন্ধু হও—

পামেলার শ্যামলের উপর পক্ষপাতিত্বটা তা হলে রবার্টের চোখ এড়ায়নি নাকি? কিন্তু হাসিটা অমন কটু কেন?

ভাববার আর অবসর পাওয়া গেল না। কে যেন এসে খবর দিল নীচে একজন মহিলা আমায় খোঁজ করছেন। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দেখি থেরেসা দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই প্রথমে থেরেসার মুখ থেকে বার হয়ে এল—আরে এই ঘরটায় তোমায় থাকতে দিয়েছে। এর চেয়ে ভাল ঘর আর

ছিল না ?

আমার পিছন পিছন শকসেনাও যে এসেছিল তা নজরই করি নি। সে বললে, উনি এদেশে নতুন এসেছেন কিনা। এদেশে নভেম্বরের শীত তো চট করে সহ্য হবে না। বেসমেণ্টের ঘর শীতকালে অনেক গরম থাকে জানেন বোধ হয়। তাই বাড়িওয়ালী ওনাকে ঐ ঘরটাই দিয়েছেন।

শকসেনার সঙ্গে থেরেসার পরিচয় করিয়ে দিলাম। শকসেনা এগিয়ে এসে থেরেসার সঙ্গে গোরা পল্টনী কায়দায় আলাপ করতে আরম্ভ করল।

কোথায় থাকেন, কী করেন—ইত্যাদি প্রশ্নের পর শকসেনা হঠাৎ বললে, আপনি কী খুব সিনেমা দেখতে ভালবাসেন—

বেশ বুঝতে পারছিলাম থেরেসার মুখের ওপর একটা বিরক্তির ছাপ ভেসে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সেটাকে সরিয়ে দেবার জন্য বললাম, মিঃ শকসেনা কী নিজে খুব সিনেমা ভক্ত নাকি ?

শকসেনা আমার কথার জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না। এমন কী আমার উপস্থিতিটাকে অস্বীকার করে থেরেসাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি নাচতে ভালবাসেন—

জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বললে, আসুন না আসছে শুক্রবারের বীচ বলরুমে—

থেরেসা গম্ভীর গলায় বললে, আমার শুক্রবার অনেক কাজ। ধন্যবাদ আপনাকে।

বলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কেমন আছ—

আমি জবাব দেবার আগেই শকসেনা জবাব দিল—কেন বেশ আরামেই থাকবেন উনি। মিসেস মরিসন খুব যত্ন করেন তাঁর বোর্ডারদের।

আমাকে আর থেরেসাকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই শকসেনা বলে যেতে লাগল—এখানে সব বোর্ডাররা কি রকম আরামে থাকে। মিসেস মরিসন কী রকম সুন্দর ভদ্রমহিলা ইত্যাদি। সে সব শেষ করে শকসেনা নিজের গুণ ব্যাখ্যায় এসে পড়ল চটপট। সে যে কতো তাড়াতাড়ি এদেশের কথা রপ্ত করেছে সেই কথা শুনিয়ে দিলে। তিন মাসের মধ্যে সে সবকটা নাচের পোজ আয়ত্ত করে কী ভাবে প্রথম শ্রেণীর নাচিয়ে হয়ে গেছে। তার সঙ্গে একবার নাচলেই থেরেসা বুঝতে পারবে—ইত্যাদি।

থেরেসার মুখটা ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠছিল। সেদিকে শকসেনার নজর না পড়লেও আমি মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিলাম বড় কম নয়। থেরেসার অন্যদিকটা শকসেনা জানে না। তার সঙ্গে আমার অল্প বিস্তর পরিচয় হয়েছিল বলেই আমার ঐ শঙ্কা।

কিন্তু থেরেসা কিছুই করল না। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল মৈত্রেয়,

তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাই। যাও তৈরী হয়ে নাও। দেরী কোরো না।

এতক্ষণে শকসেনার হুঁশ হল সে একাই বকে যাচ্ছে। সে এবার কথা থামিয়ে শুকনো মুখ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর—আচ্ছা, চিয়ারিও—বলে সরে পড়ল।

শকসেনা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই থেরেসার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—বাব্বা। একটি চীজ বটে। এ তোমার জান বার করে দেবে দেখো দুদিনেই। আর কী চোখের চাউনী যেন গিলতে আসছে। একটুও মুখের, বুকের ওপর থেকে চোখ সরায় না। জীবনে মেয়েছেলে দেখে নি নাকি?—ওকি তোমার দেশের লোক—ভারতীয়?

সলজ্জভাবে স্বীকার করলাম—হ্যাঁ—

এমন সময় শ্যামল—কী দাদা, শকসেনা এ রকম আমসি মতো মুখ করে বেরিয়ে গেল কেন—বলে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকেই থেরেসাকে দেখে টপ করে, হাসি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ কাঁচু মাচু করে বললে, ভেরী সরি আপনাদের কথা-বার্তায় বাধা দিলাম—

বললাম, কিছু মাত্রও না। এসো আলাপ করিয়ে দি। এ থেরেসা। এ আমায় এ জায়গায় এনেছে। আর এ শ্যামল।

শ্যামলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। থেরেসাকে অভিবাদন জানিয়ে বললে, জানেন আমি অনেক দিন পরে আবার আমার মাতৃভাষায় কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি—ইনি আসতে। যদিও যে ঘরটা ওঁকে দেওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত বাজে—তবুও আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না—এই জন্য যে আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন।

শ্যামলের অপটু ইংরেজী উচ্চারণ, তার মুখ চোখের ভাব, সবটা মিলে আগেকার ভারী আবহাওয়াটা মুহূর্তে সরিয়ে দিল।

থেরেসার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। হেসে বললে, তাহলে আমাকে তোমার একদিন খাওয়ান উচিত।

শ্যামল লাফিয়ে উঠল। এক্ষুণি, এক্ষুণি, চলুন আজই দুপুরে কোথাও একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।

থেরেসা বললে, বাড়িউলীকে না বলে তুমি বাইরে খাবার বব্যস্থা করছ যে?

শ্যামল বললে, ওঃ বাড়িউলী যা খেতে দেয়—ও আমার নস্যি। ও খানা খাবার পরেও আমি দুটো ডিনারের নেমন্তন্ন খেতে পারি। তা ছাড়া তোমাকে আর দাদাকে যদি খাওয়াতেই হয় তো বাইরে খাওয়া ঢের ভাল। এখানে জুৎ হবে না।

থেরেসা বললে, দুঃখিত। আমি আজ তো তোমার নেমন্তন্ন নিতে পারছি না। আর একদিন হবে কেমন?

শ্যামল যতটা উৎসাহিত হয়েছিল মিইয়ে গেল ঠিক ততটা। চি' চি' করে বললে, আজ কি কিছুতেই হতে পারে না ?

থেরেসা অনেকটা ছেলে ভুলোনর সুরে বললে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আর একদিন খুব ভাল করে খাব বাইরে কোথাও—কেমন ? আজ দিনটা থাক লক্ষ্মীটি—

আশ্চর্য এই দু'মিনিটেই থেরেসা শ্যামলের আসল স্বভাবটি ধরে ফেলেছে। তাই তার সঙ্গে কথাবার্তাও কইছে সেই রকম গলায়।

শ্যামল মুখ কাঁচু মাচু করে বললে, আচ্ছা তাই, তবে মনে থাকে যেন—ভুলে গেলে চলবে না।

থেরেসা সরে এসে শ্যামলের কাঁধে হাত রেখে বললে, আরে ভুলব কী। তোমাকে খাওয়াবার জন্য রাস্তা ঘাটে দেখা হলেই জ্বালাতন করব তখন দেখে নিও।

শ্যামলের হঠাৎ যেন কী একটা মনে পড়ল। বললে, ঐ যাঃ। সব ভুলে বসে আছি। আজ সকালে—

বলেই চট করে উঠে দাঁড়িয়ে—আমায় ক্ষমা করুন—বলে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ঘরে বসেই শুনলাম বাইরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হল। বুঝলাম সে বাইরে কোথাও চলে গেল।

থেরেসা বললে, এ ছেলেটিও তোমার দেশের না ?

বললাম, হ্যাঁ।

থেরেসা বললে, ভারী মিষ্টি ! আহা এতটুকু একটা ছেলেকে তার বাপ-মা এতদূরে পাঠিয়ে আছে কেমন করে ? মন কেমন করে না ?

বললাম, ওর মা নেই—

শুনে থেরেসার চোখ ছলছল করে উঠল। আহা রে—। আচ্ছা ওর বাড়িতে কে আছে—

যা শুনেছিলাম শ্যামলের কাছ থেকে বললাম। বললাম, বয়স যতটা ওর স্বভাবটা তার থেকেও ছেলেমানুষ।

থেরেসা বললে, মনটা বড় পরিস্কার। ভারী ভালো লাগল আমার।

॥ ৭ ॥

রাজগীরের অন্ধকার রাস্তায় নিতান্ত অন্ধের মতো পথ চলছিলাম। মনের মধ্যে পূর্ব স্মৃতির নাড়াচড়াগুলো যত বেশী হচ্ছিল পায়ের গতি ততই মন্থর হয়ে আসছিল। অভ্যস্ত পথ অতিক্রম করছিলাম অন্ধভাবে। হঠাৎ পায়ে একটা ভয়ানক হোঁচট খেলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। পা-টা যন্ত্রণায়

টনটন করে উঠল। কেন জানি না তক্ষুনি আমার মনে পড়ল এই কমাস আগে খবরের কাগজে লণ্ডন থেকে যে খবরটা বার হয়েছিল। আর কেউ না জানুক আমি জানি সেটা ঠিক শ্যামল মিত্রেরই খবর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। অথচ সেইটাই তার সত্যিকারের পরিণতি।

পায়ের যন্ত্রণাটা মাথার শিরে পর্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে দিল। বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। দুচোখ ফেটে প্রায় জল বার হয়ে এল। আমি সেই পথের ধারেই বসে পড়লাম। বসে বসে দেখতে লাগলাম শ্যামলের সেই ঢলঢলে সুন্দর মুখটা।

মনে পড়ল আর একটা সকালের কথা।

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙে যে দৃশ্য দেখলাম তা আমার চোখে পরম নূতন।

সেদিন ছিল রবিবার। মিসেস মরিসনের ডাক আর দরজায় টোকা শুনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। জানালার পর্দা একটানে সরিয়ে দিতেই দিনের ম্যাড়মেড়ে অন্ধকার মেশানো খানিকটা আলো এসে ঘরে ঢুকলো। আর বাইরের দিকে চেয়ে আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম জানালার ধারে। বরফ পড়া শুরু হয়েছে।

হাল্কা পেঁজা তুলোর রাশ ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে চারদিকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে। রাস্তা ঘাট সব ডুবে গেছে সাদা বরফের স্তূপে। ভোর রাতেই বোধ হয় শুরু হয়েছে বরফ পড়া।

সাউথ কনস্টিটিউশন স্ট্রীটটা ঠিক ডক এলাকার কাছে বলে যেমন ঘিঞ্জি তেমনি ধোঁয়াটে। হঠাৎ আজ সকালে তার সমস্ত রূপটাই পাল্টে গেছে। চট করে দেখে চেনা যায় না এমন অবস্থা। আশপাশের বাড়িগুলোর শ্লেটের ছাদে বরফ জমছে আর বেশী ভারী হলেই হুড়মুড় করে স্তূপ ভেঙে পড়ছে। বাড়িগুলোর গেট থেকে পাঁচিলগুলো অবধি সাদা সিল্কের কাপড়ে মুড়ে দিয়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি পেঁজা তুলোর রাশ কখনও কখনও রূপ নিচ্ছে শ্বেত করবীর অথবা মল্লিকার পাপড়িতে। আকাশী ফুলের ছেঁড়া পাপড়িগুলো ঝরছে তো ঝরছেই। যেন কামাই নেই, শেষ নেই এই পুষ্পাঞ্জলি দেবার।

শ্যামল এসে ঘরে হাজির হল। খুশীতে আর উৎসাহে ফেটে পড়ছে শ্যামল। হাতে তার একমুঠো টাটকা তাজা বরফ।—দাদা দেখুন দেখুন কী সুন্দর। কি অদ্ভুত সুন্দর। প্রথমে তো ঠাওর করতে পারি নি যে বরফ পড়ছে। তারপর যখন জানলাম তখুনি শকসেনাকে ডেকে তুললাম। কিন্তু সে এমন বেরসিক বরফ শুনেই সেই যে কম্বলের ভেতর মাথা ঢোকালে এখনও তার ঘুম ভাঙে নি।

শ্যামলের পরেই ঘরে ঢুকল মিসেস বেকশ্লির মেয়ে পামেলা। পামেলার হাতে একটা বরফের বল। আমাকে কোন রকমে একটা গ্নড্ উইস্ করেই শ্যামলের গলার কলারটা চেপে ধরল—মিটার, এবার যদি তোমার জামার ভেতর এটা চালান করে দেই কী হয় বলত—

শ্যামল শ্নকনো ম্নখে হাঁ-হাঁ করে উঠল—লক্ষ্মীটি ও কাজ কোরো না। তুমি এত শান্তশিষ্ট ব্নঝদার মেয়ে। বোঝ না আমরা হল্নম গরম দেশের লোক। কোন রকমে ঠাণ্ডা লেগে গেলে একেবারে নিউমোনিয়ায় মরব এই বিদেশে—বেঘোরে—

দেখি পামেলার ফোঁসানিটা কিছ্ন কমেছে। কিন্তু তব্নও কলার ছাড়ে নি। আমার দিকে ফিরে বললে, দেখ্নন তো, আমি সকালে ঘর ম্নছছি এমন সময়ে এক তাল বরফ এনে আমার চুলের ভেতর পর্যন্ত কী কাণ্ড করে দিয়েছে—

সত্যি তো এতক্ষণ নজর করি নি। ওর থোকা থোকা ফোলা ফাঁপা এক মাথা চুলের মধ্যে বালির গংঁড়োর মত লেগে আছে এক রাশ বরফের গংঁড়ো। মাথাটা একেবারে উস্কোখ্নস্কো।

ব্যাচারা চুলটাকে ভালবাসে প্রাণপণে। তাই ঠিক করেছে আর ছমাসের মধ্যে ওর স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেলে ও হেয়ার-কাটিং কোর্স নেবে। সেই চুলের এই হেনস্তা। পামেলার ম্নখ কাঁদো কাঁদো হয়ে এল।

আমি মধ্যস্থতা করলাম। বললাম, বেশ তোমাকে যখন ও বরফ মাখিয়েছে মাথায় তুমি ওর মাথাতেও বরফ ঢালো—

পামেলা ঠোঁট উলটিয়ে বললে, চাই না। ভীতু কোথাকার—বলে শ্যামলের কলারটা ছেড়ে দিল।

মিসেস বেকশিলর ঐএকটি মাত্র মেয়ে। ষোল সতর বছর বয়স। বয়সের তুলনায় শরীরটা যে পরিমাণে বাড়ন্ত মনটা ততটা নয়। সকালে মার সঙ্গে এ বাড়িতে কাজ করতে আসে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে একেবারে স্কুলে যায়। এতে তার মায়ের কাজের সাহায্য হয়। খরচটাও কিছ্ন বাঁচে।

এ-বাড়িতে অনেক বোর্ডার ছেলে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ওর শ্যামলের সঙ্গেই ভাবটা বেশী। পামেলাকে চটান খ্নব সোজা। পামি বলে ডাকলেই পামেলা চটে যায়। ওকে মিস্ বেকশিল বলতে হবে। এ সব কথা মিসেস বেকশ্লিই আমাকে একদিন গল্প করেছে।

শ্যামল বললে পামেলাকে, তা যখন ঐ বরফের বলটা এনেছই তখন ওটা নিয়ে এক কাজ কর না। শকসেনা ওপরে ঘ্নম্নচ্ছে বোধ হয় এখনও, যাও তার কম্বলের ভিতরে ওটা চালিয়ে দিয়ে এসো।—বলেই হো হো করে হেসে উঠল।

পামেলা কৃত্রিম ভয়ে বলে উঠল, শকসেনা—ওরে বাবা—না-না। ওকে দেখলেই আমার কেমন ভয় লাগে। মাঝে মাঝে পাকড়ে ধরে যা নৈতিক উপদেশ দেয়—প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। কী যে বলে—অত কথা বুঝিও নে। তার থেকে মিটার তুমি এক কাজ কর। এটা যখন এনেছি তোমার জন্যে তুমিই এটা একটু মুখে ঘসে নাও। বলেই শ্যামলের দিকে এগিয়ে গেল। শ্যামল দরজা খুলেই ছুটে বেরিয়ে গেল। পিছু পিছু বরফের বল হাতে নিয়ে ছুটল পামেলা।

ব্রেকফাস্টের জন্য ওপরে উঠতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হল রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ডের সঙ্গে। কিন্তু তার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। গুড্ উইস্ করে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। একে একে শকসেনা, শ্যামল, জর্জ, সিলভিম্যান, জোসেফ, মিঃ মরিসন ও তার ছেলে, মিসেস মরিসন সবাই এসে গেল। সব শেষে এল রবার্ট। পামেলা আর তার মা পরিবেশন করতে লাগল। আমরা হৈহৈ করে খেতে খেতে বরফ পড়ার গল্প করতে লাগলাম। কিন্তু রবার্টের মুখ থেকে একটি কথাও বার হল না। সে গম্ভীর ভাবে খেতে লাগল।

সকালের শুরুটা হয়েছে একটা অভাবনীয় প্রাকৃতিক রূপ পরিবর্তনে। তার মধ্যে পামেলা আর শ্যামলের এই প্রীতিটুকু। সবটুকু মিলে মনটাকে অন্তর্মুখী করে দিতে লাগল।

মনের ভিতরেই কোথায় একটা নিগূঢ় রসের উৎস আছে। রোদে ভরা উচ্ছল আনন্দের দিনে তাকে সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ বাইরে তাকিয়ে দেখি ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে চারদিকে। রাস্তা ঘাট সব ডুবে গেছে। লোকজন পথে একদম নেই। কেমন যেন বিষাদে গম্ভীরে মেশানো একটা অপার্থিব সত্তার পদপাত হয়েছে আবার্ডিন শহরের বুকে।

এ ভাবটা যে আমার কাছে একেবারে নতুন তা নয়। মনে পড়ল শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত মেঘলা বেলায়, অথবা ঝিরঝিরে বিষ্টি পড়া দিনে এমনি ভাব আসত আমাদের গ্রামের পথে ঘাটে। এর স্বরূপটা আগেও যেমন বুঝতাম না—এখনও তেমনি সম্যকভাবে বুঝি নি। কিন্তু একে উপলব্ধি করতে পারি। মনকে যে কোথায় নিয়ে যায়—তা হঠাৎ করে জাগ্রত মন দিয়ে বোঝা যায় না।

কতক্ষণ যে একলা ঘরে জানালার ধারে বসে কেটে গেছে তা বোধ হয় খেয়াল ছিল না। ঘরে ঢুকল মিসেস মরিসন। আগুনটা খুঁচিয়ে দিয়ে গোটা কতক চাঁই কয়লা ফেলে দিল। তারপর আমাকে ডেকে বললে, কী, চুপ চাপ বসে দেখছ কী?

বললাম, আজ রবিবার তাই ডিনারের পর একটু কুঁড়েমী করে নিচ্ছি।

মিসেস মরিসন চট করে সরে এল আমার কাছে। কানের কাছে মুখ এনে

বললে, এ-বয়সে এই রকম দিনে একলা থাকা খুবই মুস্কিল। তা তোমার কি এখানে এই দু সপ্তায় কোন বান্ধবী জোটে নি—

মিসেসের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম না, সে ঠিক রসিকতা করছে না আর কিছু। বললাম, আজকের দিনে সঙ্গ দেবার মতো কোন বান্ধবীকে কই তো এখানে দেখছি না—

মিসেস মরিসন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখখানা দুহাতে তুলে ধরল তার আঁট-সাট পুল-ওভার পরা উদ্ধত দেহের সামনে। মরিসনের চোখের দিকে তাকিয়ে মনটা ছাঁত করে উঠল। সে চোখে যে ইঙ্গিত খেলা করে যাচ্ছিল তা মোটেই অস্পষ্ট নয়।

মিসেস বললে, আমি কী তোমায় সঙ্গ দিতে পারি—

ঘাড় নেড়ে বললাম, না—

মিসেস বললে, এই তো হচ্ছে বিপদ। তোমাদের দেশের লোককে নিয়ে এই জন্যেই এতো ঝামেলা হয়। যাক গে ও দুদিনেই ভাঙবে। কিন্তু শোভন সিং-এর তো বাপু এ রকম দেখি নি। সে-ও তো ছিল ভারতবর্ষের লোক। তারপর রুক্ষ গলায় খি-খি করে হেসে উঠল মিসেস মরিসন। বললে, ইউ আর এ বেবি ইনডিড্। ঐ শ্যামলের সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নেই। শকসেনা তোমার চেয়ে ঢের ওস্তাদ—

হাসতে হাসতে ঘূর্ণিনাচের তালে ঘর থেকে বার হয়ে গেল মিসেস মরিসন। ভঙ্গীতে একটা আদিখ্যেতা মাখান অতি সস্তা রকমের ঢং ফুটে উঠল যাবার সময়।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। সুস্থ অবস্থায় কেউ এমন আচরণ করতে পারে নাকি? শুনেছিলাম মিসেস মরিসন জিন আর লাইম পেলে দুনিয়া ভুলে যান। ওতে নেশাটাও চট করে জমে। গন্ধও বার হয় না।

ভিতরটা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠেছিল তাই মিসেস মরিসন ঘর থেকে চলে যেতেই সাজপোশাক করে রাস্তায় বার হয়ে পড়লাম। বাইরে তখনও তুষারপাত চলছে বেশ জোরে। রাস্তায় এক হাঁটু বরফ জমে গেছে। চারদিক সাদায় সাদা। মনে হচ্ছে কে যেন সমস্ত মাটিটা মুড়ে দিয়েছে নরম সাদা ইয়ারকান্দি গালচেতে। শুধু মাটি কেন—ঘর-বাড়ি, রাস্তার ধারের গাছগুলো, চিমনীর সারা বছরের ধোঁয়া-খাওয়া মিশকালো আগাগুলো পর্যন্ত দুধের ফেনায় ঢাকা।

॥ ৮ ॥

ঠাণ্ডাটা মনে হল সমস্ত জামাকাপড়ের স্তূপ ভেদ করে সটান হাড়ে গিয়ে নাড়া দিচ্ছে। বুকের ভিতরটায় দারুণ কাঁপুনীর চোটে গুর-গরুনী ঠেলে উঠতে

লাগল। দাঁতে দাঁতে বাজতে লাগল জোড়া করতাল। তবুও একরোখে চলতে লাগলাম সামনের পথে বরফের স্তূপ ঠেলে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়। সাউথ কনস্টিটিউশন স্ট্রীটটা ঢালু। তার উপর সকালে ছেলের দল স্কেটিং করে রাস্তাটার জায়গায় জায়গায় বরফ শক্ত করে দিয়েছে। বাড়ির সামনে উৎসাহের সঙ্গে কেউ কেউ তৈরী করেছে বরফের তুষার মানব—এ্যাবমিনেবল্ স্নো-ম্যান।

জমাট বাঁধা বরফের উপর দিয়ে চলা বড় কঠিন। যেমন পিছল তেমনি বিপজ্জনক। একবার পড়লেই নির্ঘাৎ হাঁটুর হাড় ভাঙবে। কাজেই রাস্তা দিয়ে অনেক সাবধানে চলতে হয়।

কনস্টিটিউশন স্ট্রীটের গলির মোড়টা ফিরতেই দেখি থেরেসা আসছে। একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল সে।

বললে, তোমার কাছেই আসছিলাম। আচ্ছা লোক তো। কই আমার বাড়িতে তো এলে না। আমি তোমাকে কিন্তু দু দিন খোঁজ করে গেছি এর মধ্যে। তুমি বাড়ি ছিলে না। টেলিফোন করেছি কয়েকবার। তা মিসেস মরিসন বলেছিলেন তোমার নাকি রাতের আগে পাত্তা পাওয়া যায় না। দু দিন তোমার দরজা থেকেই চলে গেছি। দুদিনই মিসেস মরিসন বলেছিলেন তুমি বাড়ি নেই। তা তিনি তোমাকে কিছু বলেন নি—

গম্ভীর গলায় বললাম, কৈ না তো?

কেমন যেন সন্দেহ হল। বললাম, আচ্ছা কোন কোন বার এসেছিলে বল তো?

থেরেসা বললে, গত শনিবার দুপুরে ডিনারের পর আর বুধবার সন্ধ্যে আটটাতে।

ভেবে দেখলাম দু দিনই ঐ সময়ে আমি আমার ঘরে ছিলাম। একটু আগে যদি মরিসন গিন্নির ঐ রকম আচরণটা না দেখতাম তা হলে হয়তো অবাক হতাম। কিন্তু এখন আর কিছুই হেঁয়ালী রইল না।

থেরেসাকে বললাম, যাক্ গে এ-সব কথা। এখন চল তোমাদের বাড়ি যাই। তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসি—

থেরেসা তখুনিই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল—চল, চল, আমার মা তোমাকে দেখলে বড় খুশী হবেন। তোমার কথা আমি মাকে বলেছি।

ডক এলাকার কতকগুলি গলিঘুঁজি পার হয়ে এলাম থেরেসার মায়ের দোকানে রিজেণ্ট কি-তে। দুটো ঘর। একটাতে ওরা মায়েঝিয়ে থাকে আর একটাতে দোকান। আজ দোকান বন্ধ। তবুও সেখানে থেরেসার বুড়ীমা হাতেগড়া প্যান কেক, ক্যাণ্ডি আর বিস্কিট সাজিয়ে রাখছেন।

আমার সঙ্গে থেরেসা আলাপ করিয়ে দিল—এই বোধিসত্ত্ব, ক্যালকাটা থেকে

এসেছে। আর এই আমার মা। বস বস, এই আগুনের কাছটাতে বস—

বৃদ্ধা কানে একটু কম শোনে। এগিয়ে এসে সব কথা ভাল করে বুঝে নিয়ে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বললে, তোমার কথা শুনেছি থেরেসার কাছে। এই দ্যাখো মাই বয়—এখানে ঠাণ্ডা আর বরফে বাতের ব্যায়রামে অস্থির হয়ে উঠেছি। এখন আমি সব সময়ে ভাবি তোমাদের দেশের সেই রোদ্দেভরা আকাশের কথা। আহা কী সুন্দর নীল আকাশ—দেখলে চোখ ফেরান যায় না। রাতে সেই আকাশের শোভাই বা কী? অত নক্ষত্র আর বোধহয় কোন আকাশে নেই। আমার বিয়ের পর একবারমাত্র গিয়েছিলুম ইণ্ডিয়াতে। ক্যালকাটাতেই বেশীর ভাগ সময়ে থাকতাম আমরা। আমার স্বামী ক্যালকাটাকেই বেশী পছন্দ করতেন কী না। জীবনের সেসব অধ্যায় যে কবে শেষ হয়ে গেল মাই বয়, আমি ভাল করে বুঝতেও পারলুম না। যাক্ বুঝতে পারি আর না পারি শেষ তো হয়েছে—

বৃদ্ধার ডাগর ডাগর চোখ দুটোর দৃষ্টি যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেছে। তারা চলে গেছে যেন কোন সুদূর অতীতে। বৃদ্ধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সচকিত হল। মোটাসোটা গোলগাল বৃদ্ধা। দেখলে ঠিক থেরেসার মা বলে বোঝা যায়। কষ্টে উঠল বৃদ্ধা। তারপর ঘরের এক কোণে একটা গ্যাস-হীটারে কেটলি চাপাল চা করতে। থেরেসা লক্ষ্মী মেয়েটির মতো এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল আমার পাশের সোটিতে। মাকে উঠতে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল। —থাক মা আমি চা করছি—

থেরেসার মা বললে, ভারতবর্ষকে আমার স্বামীর ভাল লেগেছিল। আমারও। হয়তো দুজনে গিয়েই সেখানে বাস করতুম। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুই সব-কিছুতে ছেদ টেনে দিয়ে গেল। আমার থেরেসা তখন সবেমাত্র পাঁচ বছরের শিশু। তারপর যে কষ্ট আমি সহ্য করেছি, যে যুদ্ধ করে আমরা এই মায়ে-পোয়ে বেঁচে আছি তা বলবার নয়। ভারত সরকার থেকে অনেক টাকা আমার স্বামীর মৃত্যুর পর পাঠাবার কথা হয়। আমি এই আবার্ডিনের একজন ভাল এটর্নীকে সে সমস্ত আদায় তশিলের ভার দিয়েছিলাম। কিন্তু সে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে রাতারাতি গেল কানাডায় পালিয়ে। একটা কানাকড়িও আমরা পাই নি। এ্যাটর্নী ছিল আমার কাজিন।

তারপর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সেই অল্প বয়সে আমাকে যে কতো প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, তা আর বলতে পারি নে। এখন অবশ্য আমাদের আর অভাব বিশেষ নেই—

থেরেসার মায়ের হাতে গড়া বাদামের বিস্কিট দিয়ে চা খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম। কখনো থেরেসার সঙ্গে কখনো তার মায়ের সঙ্গে। এদের দুটিকে আমার ভারী ভাল লেগে গেল।

চা-খাওয়া শেষ হলে বৃদ্ধা উঠল। একটা এ্যালবাম টেনে নিয়ে আমাকে ছবি দেখাতে লাগল। প্রথমে দেখাল লোয়ার সার্কুলার রোডে কবরখানায় তার স্বামীর কবরটি। অত দরিদ্র অবস্থার মধ্যেও তার স্বামীর কবরের উপর চমৎকার কার্ভিং করিয়ে দিয়েছে সে অনেক টাকা খরচ করে। বৃদ্ধা রুমালে চোখ মুছে বললে, এখন জীবনে আমার একটিমাত্র সাধ আছে—একবার ক্যালকাটায় যাবার। জানি এ বয়সে এই সামর্থ্য নিয়ে ক্যালকাটায় যাবার আশা কতো দুরাশা—তবুও মন মানে না মাই বয়। তুমি ক্যালকাটায় গেলে এই কবরস্থানটায় দুটি ফুল দিয়ে এসো—

সন্ধ্যের চা খাবার জন্যে আর বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে ছিল না। তাই থেরেসা প্রস্তাব করতেই তাদের সঙ্গে সেটা সেরে নিতে রাজী হয়ে গেলুম।

স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা ইংরেজদের মতো দিনে লাঞ্চ আর সন্ধ্যেতে ডিনার খায় না। এরা দিনেতেই ডিনার অর্থাৎ প্রধান খাওয়াটা সেরে নেয়। সন্ধ্যের সময়ে কাজ থেকে ফিরে খায় হাই-টী। অবশ্য হাই-টীর উপকরণ যা তা অনেক সময়ে ডিনারের কাছাকাছি যায়। কিন্তু মিসেস মরিসন প্রত্যেকটি ফার্দিং থেকে লাভের অংশ রাখত বলে বোর্ডারদের ভাগ্যে এক টুকরো মাছ আর গোটাকতক আলুভাজা ছাড়া আর কিছু জুটত না। ম্যাকারুনী কি স্পিঘেটীও চলত প্রায়ই মার্জারিন দেওয়া। এ সবে খরচ অনেক কম।

থেরেসার মা বিদেশী অতিথি পেয়ে আতিথেয়তা করল ভালভাবে। কড মাছের সঙ্গে চাল দিয়ে বানাল 'কিচ্‌রী'। বললে, ইণ্ডিয়ান ডিশ—ক্যালকাটায় থাকতে খানসামার কাছে শিখেছিল। বুঝলাম এ খিচুড়ীরই অপভ্রংশ। স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে এ আমাদের দেশী খিচুড়ী থেকে অনেক তফাৎ হলেও খেতে কিন্তু আদবে খারাপ নয়। তার সঙ্গে এলো ডাক্ রোস্ট। তারপর একটা সুইট। এর পর বৃদ্ধার নিজের হাতে গড়া পেস্ট্রি আর বিস্কিট তো আছেই। অপূর্ব স্বাদু পেস্ট্রি আর বিস্কিট তৈরী করে বৃদ্ধা। থেরেসা খুঁজেপেতে কোন উৎসবের দিনের অবশিষ্ট একটা বোতল উপুড় করে একটা ছোট পেগ শেরীও বাড়িয়ে দিল।

অনাবিল সৌহার্দ্য আর প্রীতি নিয়ে যখন থেরেসাদের বাড়ি থেকে বার হব তখন রাস্তায় ঘাটে অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধেছে। থেরেসা বললে, চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই আজ সন্ধ্যেতে। সেখানে গেলে তোমার দুনিয়ার সব লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। আশা করি তোমার কোন এন্‌গেজ্‌মেণ্ট নেই এখন—

বললাম, আদবে না। বরঞ্চ এ ভালই হবে। আমি এখানে আসা থেকেই বড় একলা হয়ে গেছি। চল কোথায় নিয়ে যাবে—

থেরেসা সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে গম্ভীর মুখে সে

আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলল। কিছুক্ষণ পরে আবার্ডিনের ইউনিয়ন স্ট্রীটের উপর দিয়ে রেলওয়ে ব্রিজ পার হয়ে এলাম। পাশেই ব্রিজ স্ট্রীট। তারই একটা বড় বাড়ির মধ্যে থেরেসা আমাকে পথ দেখিয়ে ঢুকতে বললে।

নীচের তলাটা ফিকে অন্ধকার। কোথায় যেন এক টুকরো আলো আছে। তারই একটা ছটা এসে পড়েছে এখানে। তাতে অন্ধকারটা জায়গায় জায়গায় বোধ হয় আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। থেরেসা আমার হাত চেপে ধরে বললে, এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসো আমার সঙ্গে—

অতবড় বাড়িটায় লোকজন আছে বলে আদবেই মনে হচ্ছিল না। সামনে-পেছনে চোখ সওয়া অন্ধকারে দেখলাম ঘরের পর ঘরের সারি। কিন্তু দরজা-গুলো সব বন্ধ। ফ্ল্যাটগুলো সব অন্ধকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এক জায়গায় সেটা একটা বাঁক নিয়েছে। থেরেসা তরতর করে উঠে যাচ্ছিল। ভাবে বোধ হচ্ছিল এ সমস্ত সিঁড়ির বাঁকগুলো পর্যন্ত তার মুখস্থ। এখানে তার যাতায়াত বহুদিনের।

বাঁকটার কাছে আসতেই ফিসফিস গলার আওয়াজ শুনে অন্ধকারের মধ্যে নজর করলাম। দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে সিঁড়ির হাতল ধরে। অনুমান করতে কষ্ট হল না এদের একজন পুরুষ আর একজন নারী।

একেবারে পাশ দিয়ে যেতে যেতে নারীকণ্ঠ কানে এলো—তুমি কি পাথর? আমি সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে তোমাকে এখানে আবিষ্কার করেছি তা তুমি জানো? তার কী কোন দামই নেই তোমার কাছে? আচ্ছা তা যদি না থাকে—একদিন তোমার প্রাণ দিয়েছিলাম তা তোমার মনে আছে কী—

গলার আওয়াজটা বড় আর্ত বলে মনে হল। মনের মধ্যে গোটাকতক প্রশ্নও যে ভীড় করে এলো না এমন নয়। নরম পুরুষ-কণ্ঠে জবাবও শুনলাম—আছে বৈকি। যতদিন বাঁচব তা থাকবেও। কিন্তু এ-সব কথা বলবার কী এই জায়গা—

কথাগুলো নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করতে করতে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকব। অন্ধকারে সিঁড়িতে ঠোক্কর খেলাম।

থেরেসা জোর করে হাতে টান দিয়ে বললে, ভালো করে নজর করে এসো। এই অন্ধকার সিঁড়িতে অনেক ড্রামার অভিনয় হয়। সে সবের দিকে মন দিলে ঠোক্কর খেয়ে দাঁত ভাঙবে।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধাপ কটা পার হয়ে এসে সে একটা দরজার হাতল ঘুরিয়ে খুলল। তারপর দুজনে ভিতরে গিয়ে দেখি বেশ বড় বড় খানচারেক ঘরওয়ালা একটা ফ্ল্যাট। ভিতরে আলো জ্বলছে। সামনের ঘরটাতেই একটা টেবিলের সামনে টাইপ-রাইটারে একমনে টাইপ করে যাচ্ছেন একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রমহিলা।

থেরেসা ঢুকেই অভিবাদন জানাল—গুড্ ইভ্নিং মিস্ স্কট্। ইনি মিস্টার

মৈত্রেয়। ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। আর ইনি হলেন এই আবার্ডিন বৃটিশ কাউন্সিলের সেক্রেটারী মিস স্কট্।

হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করলেন মিস্ স্কট্। বললেন, মেম্বার হয়ে যান আজই।

হরি হরি এটা তা হলে কাউন্সিলের ঘর—

মিস্ স্কট্ বোধ হয় কাজ ফেলে রাখা পছন্দ করেন না। তখনই ফর্ম ইত্যাদি বার করলেন। আমাকে মেম্বার করে নিলেন। একটু মিষ্টি হেসে বললেন, হলঘরে বসুন। আপনারা বোধ হয় একটু সকাল সকাল এসে পড়েছেন। আমি এক্ষুনি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি। এই এলাম বলে। বলেই টকাটক টাইপ করতে লাগলেন।

থেরেসা আর আমি হলঘরে ঢুকলাম। কয়েকজন নিগ্রো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা এসেছেন। শ্বেতাঙ্গিনীও জনকয়েক। বসে বসে আড্ডা চলছে। হলটার চারদিকে দেওয়ালের গায়ে নানা রকম বই সাজান। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এদেশের সম্বন্ধে হরেক রকমের বই আর ম্যাপ। তার সঙ্গে নাটক-নভেল-প্রবন্ধ-দর্শন-রাজনীতির বইও আছে। আর আছে দুনিয়ার সব দেশের জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন।

কিছুক্ষণের মধ্যে হৈ হৈ করে হল-ঘরটা ভর্তি হয়ে গেল। মেয়েপুরুষে প্রায় শখানেক লোকে হলটা সরগরম হয়ে উঠল। বেশীর ভাগ এল জোড়ায় জোড়ায়। কতক এলো দল বেঁধে। একলা এল যারা তাদের সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়।

এদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখলাম। দেখলাম ঠিক নয় কারণ তাকে না দেখেই পারা যায় না এমন রূপসী আর ব্যক্তিত্বভরা নারী সে। সে একাই এল। বসলও এক কোণ ঘেঁসে। অত মেয়ের মধ্যেও তার চেহারাখানা একরাশ শালুকের মধ্যে সহস্রদল রক্তকমলের মতো ফুটে রইল। এখানে যাদের দেখলাম তাদের বেশীর ভাগই ছাত্রছাত্রী। অন্য কাজে আসা লোক যে একেবারে নেই তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা অনেক কম।

এই সমিতির বেশীর ভাগ মেম্বারই যুবক-যুবতী। সারা দুনিয়া থেকে হয়েছে তাদের আমদানী। ইউরোপের এক রাশিয়া ছাড়া প্রায় সব দেশের ছেলেমেয়েরা আছে। আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা, আবিসিনিয়া, মিশর এখানে এসেছে। এসেছে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, বৃটিশ গায়না, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহল। এসেছে নিউজিল্যাণ্ড। এসেছে কানাডা।

মিস্ স্কট্ আমাকে আমার পরিচয় দিয়ে সভার কাছে পরিচিত করলেন।

এই সম্মেলনে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিশ্রণ। যে কোন জাত যে কোন জাতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মেলবার মেশবার, দূরের

লোককে জানবার, কাছে আনবার মতো প্রতিষ্ঠান এই বৃটিশ কাউন্সিল। সারা দুনিয়ায় বৃটিশের যে সব মিত্র দেশ আছে তাদের সব জায়গায় আছে এই কাউন্সিল।

যদিও এর অন্তর্নিহিত একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তবুও এর উজ্জ্বল দিকটা কিছুমাত্র উপেক্ষার নয়। কৃষ্টি, সভ্যতা, উঁচু দরের মানসিক ভাবের বিনিময় করার এমন পীঠস্থান বিদেশে আমার খুব বেশী নজরে পড়ে নি।

ঘরের মধ্যে হৈহৈ হচ্ছিল। এক একজন মক্ষিরাণীকে ঘিরে মৌচাক বাঁধছিল।

কেউ কেউ চাইছিল ওই ভীড়ের মধ্যেই দুজনে একলা হবার। হয় তো সারা সপ্তা কাজের দাপটে মুখ তুলতেই পায় না বেচারারা। আজ দেখা দুজনে। ওরই মধ্যে নিরিবিলিতে দুটো মনের কথা কয়ে নিচ্ছে।

কোন একটা কোণ ঘেঁসে জোর আলোচনা চলেছে রাজনীতির। বৃটিশের নিন্দা হতেই সেখান থেকে আধাআরব আধানিগ্রো বৃটিশের স্কলারশিপ পাওয়া ছেলেটি তড়াক করে লাফ মেরে উঠে এসে বসল আগুন পোহাবার ভান করে।

কেউ কেউ বা বিচিত্র দেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে ব্যস্ত। খুব দামী স্যুট-পরা গোলগাল নন্দদুলাল চেহারার আমেরিকান মিঃ এণ্ডারসন নাকিসুরে বলছে —আঁই ডোঁণ্ট থিঁঙ্ক দেঁয়ার উঁইল বি এঁনি ভাঁইঠ্যাল ছেঁঞ্জ ইন্ ম্যাঁরিকা বাঁই আঁইজেন হ্যাঁওয়ার—

থেরেসা আমার পাশে বসে যথাসাধ্য লোক চিনিয়ে দিচ্ছিল। তাদের নাম বলছিল। বলছিল কে কোন দেশ থেকে এসেছে। একজনের ওপর দৃষ্টি দিয়ে থেরেসা সহসা থেমে গেল। বললে, এই চমৎকার চেহারার ভদ্রলোককে এখানে আমি খুব কম দেখেছি। ভদ্রলোক কোথাকার লোক তাও জানি নে। থাকেন বোধহয় শহরের বাইরে কোথাও। কিন্তু ভারী সুন্দর কথা বলেন উনি। নামটাও অবশ্য আমি ভুলে গেছি—

থেরেসার দেখান ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে দেখলাম। একমনে পাইপ টানছে। আর চারপাঁচখানা জার্ণালের পাতা একসঙ্গে উল্টে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী পড়ছে। আশ্চর্য, এতো হট্টগোল আর হাসিতেও তার পড়ার কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না। ভদ্রলোক একবার হাসিভরা উজ্জ্বল মুখ তুলে সবার দিকে তাকিয়ে নিল। কিন্তু মুখের ভাবে মনে হল এ যেন একান্ত নির্লিপ্ত। এতো লোকের মাঝে থেকেও অনেক দূরের মানুষ। শিশুদের খেলা করতে দেখলে দূর থেকে প্রবীণদের মুখে যে ধরনের হাসি ফুটে উঠে, তার মুখের হাসিটা মনে হয় প্রায় কতকটা সেই রকম। আর নজর করলাম তার গ্রীসিয়ান ভাস্কর্যের মতো খোদাই করা নাক। চওড়া কপালের নীচে দিয়ে শিল্পীর হাতের অপূর্ব কারিগরির মতো নেবে এসেছে। চোখ দুটো মাঝারি। তার মণি দুটো ঝকঝকে কমল হীরের

মতোই দীপ্তিময়। চওড়া ভুরু দুটো গঙ্গা যমুনার মতো এসে মিশে গেছে ললাটের প্রয়াগসঙ্গমে। ভদ্রলোকের সারা দেহটা ঘিরে খেলা করে যাচ্ছে এক অপূর্ব ধ্যানশ্রী। একবার সেদিকে নজর দিলে আর চট করে চোখ ফেরান যায় না।

থেরেসার পাশে একটি ভদ্রমহিলা এসে বসলেন। আর আমি ভদ্রলোকের ওপর থেকে চোখ তুলে নিলাম। থেরেসা আলাপ করিয়ে দিল। ইনি স্পেন থেকে এসেছেন। নাম মিস গার্সিয়া। ডাকনাম লোলা। ইনিই আজকের সভার হিরোইন। ইনি আজ স্পেন সম্বন্ধে মুভী লেকচার দেবেন।

লোলা মেয়েটি বেঁটেখাটো। ভারী মিষ্টি দেখতে। স্বভাবটিও মনে হল খুব নরম। কথা বলে অতি ধীরে নরম গলায়। ইংরাজী উচ্চারণ তার স্পেনীয় ভঙ্গীতে শোনায় ভারী কোমল। মাথায় একমাথা ভোমরা কালো চুল। গায়ের রংটা চাঁপা ফুলের মতো। পাশে বসে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলাপ করতে লাগল।

একটু পরেই শুরু হল মুভী। মিস গার্সিয়া উঠে দাঁড়িয়ে খুব ভাঙা ইংরাজীতে আস্তে আস্তে বক্তৃতা করতে লাগল। শো চলল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। স্পেনে বিভিন্ন কলা-কৃষ্টি, লোক-লৌকিকতা, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক এবং আধুনিক উন্নতির সকল রকম পরিচয় পেলাম ছবি থেকে। তাকে আরও স্পষ্ট আর মনোজ্ঞ করল মিস গার্সিয়া। বক্তৃতা শেষ করল সুললিত গলায় দুটি স্প্যানিশ গান গেয়ে।

ছবি শেষ হতেই নানান প্রশ্ন ছুটে এলো গার্সিয়ার দিকে। ঘরের নানান দিক থেকে। গার্সিয়া হাসিমুখে যথাযোগ্য সে সবের জবাব দিতে লাগল। এর পালাও এক সময়ে ফুরালো।

এমন সময়ে ডেভিড নামে একজন ইংরেজ ছেলে উঠে দাঁড়াল। সভার অনুমতি নিল স্পেন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা বলবার জন্যে। সবাই বললে, হ্যাঁ—হ্যাঁ বল শুনি—

ডেভিড তারপরে যা আরম্ভ করল, বোধ হয় তার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। সে কেবল স্পেনের যতো কিছু কুৎসা আর কেচ্ছার কথা তালিকা মিলিয়ে বলে যেতে লাগল। স্পেনের লোক আগেও যেমন পাইরেট ছিল আজও তেমনি আছে। তাই স্পেনে চুরি ডাকাতি রাহাজানি আর মিথ্যে কথার ছড়াছড়ি। কোন সরকারি অফিসে কী হয়েছে, কোন রেল অফিস কত ঘুষ নিয়েছে, রাস্তায় কত পকেটমার সে নিজেই ধরেছে—এইসবের ফিরিস্তি দিয়ে ডেভিড সমস্ত সমিতি-টার ভিতরেই একটা কদর্য ভাবের সৃষ্টি করে ফেলল।

গার্সিয়াকে থেরেসা বললে, আপনার উচিত এসবের প্রতিবাদ করা—

ভদ্রমহিলা একে অত্যন্ত নরম স্বভাবের আর অতি মাত্রায় ভদ্র। বললে, কি

হবে ? একে তো বোঝান যাবে না। আর আমি বেশ বুঝছি—এসব আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা। স্পেনকে বৃটেন এখনো সহ্য করতে পারে না—

ডেভিড বক্তৃতা শেষ করে বসল। ঘরের প্রায় সব কটি প্রাণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে আছে। ভিতরকার আসল কথাটা বুঝতে কারও দেরী হয় নি। প্রকাশ্য প্রতিবাদ কেউ করল না। মুখ নীচু করে বসে আছি। ভাবছি গার্সিয়াকে কী বলব।

এমন সময়ে সেই বইপড়া পাইপটানা সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াল। সভার অনুমতি নিয়ে সে জলদগম্ভীর গলায় অতিস্পষ্ট আর মধুর ভাষায় বক্তৃতা করতে লাগল। শুরু করল অতীত স্পেনের গৌরব। পৃথিবীর সভ্যতায় তার অবদান। বললে, আজকের এই আমেরিকার খবরও সভ্যজগৎ পেতো না যদি স্পেন না থাকতো। বললে, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র হল স্পেন। তাই সেখানকার আলহাম্ব্রার কলা নৈপুণ্য এত বিস্ময় আর শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। তাই স্পেনের লোকসঙ্গীত, ক্লাসিকাল সঙ্গীত এত মধুর এত মনোমুগ্ধকর। আধুনিক স্পেনের কথায় বললে, সমস্ত রাজনীতি, সমস্ত বিদ্রোহ আর ঝড়ঝাপ্টা বাদ দিয়েও আমি স্পেনের সাধারণ লোকের মনে যে অকৃত্রিম ভাব ভালবাসার সঞ্চার দেখেছি—তার সাক্ষ্য আমি নিজে। আমি মাদ্রিদ আর বার্সিলোনায় যে শুধু ছিলাম তাই নয়—আমি পায়ে হেঁটে স্পেনের গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তবে একথা বলছি। সব দেশেই ভাল মন্দ আছে। সব জাতের ভেতরেই সাধু আর চোর ডাকাত আছে। এমন যে সভ্য জাত ইংরাজ—তাদের মধ্যে কী চোর ডাকাত নেই ? ভুল শুধু দেখবার। ভাল ছেড়ে মন্দ দেখবার যাদের চিরাচরিত অভ্যাস—তাদের মতলবও ঐ পথ ধরে চলে। আমি আশ্চর্য হচ্ছি স্পেনের এতো জিনিস থাকতে আমার পূর্ববর্তী বক্তা কেবল সেখানে তার পচা নর্দমাগুলিই দেখে এসেছেন।

গম্ভীর গলায় প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ে সমস্ত কথাগুলো বলে সে বক্তৃতা শেষ করল। গার্সিয়া এতক্ষণ হাঁ করে বক্তৃতা শুনছিল। সে শুধুমাত্র বললে, ডক্টর রে—এত বড় পণ্ডিত আমি দেখি নি—তার গলা দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

ভদ্রলোক বক্তৃতা শেষ করে বসতেই হাততালিতে হল ভরে গেল। আবার সকলে সহজ হয়ে বসল। আবার আড্ডা জমে উঠল। জনকতক মেয়ে আর ছেলে উঠে গেল পাশের ঘরে। নিয়ে এল চা আর বিস্কিটের ট্রে।

চা খাওয়া শেষ হতেই মিস স্কট্ আমাকে দেখিয়ে বললে, ইনি আমাদের এখানে আজ নতুন। তাই আজ এঁর ওপরেই ভার পড়ল চায়ের চাঁদা আদায় করবার

আমার হাতে দিলেন একটা টিনের কৌটা। আমি সবার সামনে সেটা

নাচিয়ে নাচিয়ে বেড়াতে লাগলাম। সবাই তার মধ্যে পয়সা ঢালতে লাগল। কোণের সেই ভদ্র মহিলাটির কাছে যেতেই সে বললে, আমি দুজনের চাঁদা দিলাম। বলে একটা হাফ ক্রাউন কৌটায় ফেললে। সাধারণ চাঁদা তিন পেনী। সুতরাং এটা একেবারে আশাতীরিক্ত। যাই হোক আমি দ্বিতীয় লোকটি কে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললে, যে পুরুষ আজ নারীর সম্মান রেখেছে তার হয়েই আমি এটা দিলাম—

বলে সুন্দর করে একটু হাসল। তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ আমার ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। মনে হল সে হাসিটা বড় ক্লিস্ট।

আমি ডক্টর রে-র কাছে গিয়ে বললাম, আপনার চাঁদাটা ঐ কোণের ভদ্রমহিলাটি দিয়ে দিয়েছেন—

সে কিছু বললে না। শুধু মুখটা তুলে ভদ্রমহিলাটির দিকে চেয়ে একটু নড করল মাত্র।

আমি আবার বললাম, আপনি কোথায় থাকেন? ভবিষ্যতে যদি আপনার দেখা পাই তবে কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করি।

সে উজ্জ্বল চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে শুধু বললে, আচ্ছা বেশ।

এদিকে ঘরের ভিতর আড্ডা জোর হয়ে উঠেছে। যাদের সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠ তারা দেখছি আস্তে আস্তে সরে পড়ছে জোড়ায় জোড়ায়। এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলছে বেশ বোঝা যায়। একটি মেয়েকে অনেকগুলি পুরুষ ছেঁকে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত কে যে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে তার জন্য চলেছে বেশ মোলায়েম কনুই ঠেলাঠেলি।

অথচ এই ঘরের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরী তার দিকে কেউ ঘেঁসছে না। বোধহয় মেয়েটির স্বভাব গম্ভীর বলে তাই। বোধহয় তার অস্মিতা সকলকেই দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছে।

অনেক রাতে হট্টগোলের মাঝখানে এক সময়ে আমি আর থেরেসা সরে পড়লাম। আসবার সময় সিঁড়ির ধারে আর অন্ধকার ল্যাণ্ডিংয়ে অনেকগুলি আলাপরত যুগলমূর্তিকে পাশ কাটিয়ে এলাম। তাদের মধ্যে একজনকে মনে হল মিস্টার শকসেনার মতো।

বড় দরজা থেকে রাস্তায় নামব আধা অন্ধকারে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এল। বিশুদ্ধ বাংলায় বললে, আপনি মিস্টার মৈত্রেয়? আপনার বাড়ি কি বাংলাদেশে—

সামনে তাকিয়ে দেখি ডক্টর রে মুচকে মুচকে হাসছে।

আমি প্রথমে ওকে ভেবেছিলাম ইটালিয়ান কী আর কিছু। অবাক হলাম বাংলা কথা শুনে। থেরেসা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, আজ আপনি না থাকলে গার্সিয়াকে ডেভিড পথে বসিয়ে দিত—

ভদ্রলোক থেরেসাকে ধন্যবাদ দিল। আমার হাত ধরে বললে, আমি একেবারে সতের আনা বাঙালী ভাই। চলুন আপনার সঙ্গে আজ রাতে আলাপ করা যাক। আমার পুরো নাম শুদ্ধসত্ত্ব রায়। বিলাতী অপভ্রংশ হয়েছে রে।

রাস্তায় তখনও বরফ জমেছিল। গভীর রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমি আর শুদ্ধসত্ত্ব আমার ঘরে ফিরে এলাম। থেরেসাকে পেঁছে দিয়ে এলাম তার বাড়িতে।

রে আর আমি দুজনে যখন আমার ঘরে এসে ঢুকলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা।

সন্ধ্যের পর থেকে ঘরে আগুন জ্বলে নি। ঘরটা ঠাণ্ডা কনকন করছে। তার মধ্যে পুরনো পুরনো চেয়ার টেবিলগুলো শীতে আরো ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। টেবিলের ওপর একটুকরো কাপড় চাপা দেওয়া আমার সন্ধ্যের খাবার—কিছু ম্যাকারুনি আর টোম্যাটো। কয়েকটা সস্তার পেস্ট্রী আর বিস্কিট। আর জুড়িয়ে জল হয়ে যাওয়া এক পট চা। শুদ্ধসত্ত্বকে বসিয়ে বাইরে থেকে খুঁজে পেতে কয়েকটা কাঠের কুঁদো নিয়ে এলাম। আগুন জেবলে দিলাম। সেই আগুনের ধারে দুজনে মুখোমুখি বসলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কতদিন আছেন ডক্টর রে?

রে-র মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। বললে, তা বেশ ক বছর হল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগেই আমি এদেশে এসেছি। কাজেই একটা যুগ যে পার হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই আবার্ডিনে রয়েছি মাত্র পাঁচ বছর।

জিজ্ঞাসা করলাম, আবার্ডিনে কোথায় আপনার বাসা—

রে এবার স্পষ্ট গলায় আমাকে বললে, দেখো ভাই, ওই আপনি আজ্ঞে গুলো তোমায় ছাড়তে হবে। এটা আমার অনুরোধ। এদেশে এসেছি অনেক দিন। এখানকার আর যাতে অভ্যস্ত হই আর না হই—এদের এই আপনি তুমির ভেদাভেদটা আমি ভুলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তা ছাড়া তুমি আমি বোধ হয় একই বয়স হব—নয় কী? তুমি আমার বাংলা নামে ডাকতে পার—

একটু থেমে বললে, ছেলে বেলায় বাঙলাদেশের বাইরে—বেনারসে মানুষ হয়েছিলাম বলে আমি খুবই বাড়ন্ত। তা ছাড়া আমার বাবার আগ্রহ ছিল—পালোয়ান রেখে আমায় তিনি কুস্তি জিমন্যাস্টিক শিখিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কতোবার কাশীর গঙ্গা সাঁতরে এপার ওপার হয়েছি। এই দ্যাখো এখনও তার প্রমাণ—বলে হাসতে হাসতে তার জ্যাকেটের হাতাটা গুটিয়ে দেখাল। দেখলাম মেদলেশ অসম্ভব চওড়া হাতের কব্জিটা। দেখলেই মনে হয় এর মধ্যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে। চামড়াটা সাদা—কিন্তু মনে হল যেন তার মধ্যে একটা পেটা লোহার ডাণ্ডা রয়েছে।

শুদ্ধসত্ত্ব আমায় এবার পাল্টা প্রশ্ন করল। এদেশে এসেছ কী করতে?—যদি বলতে কোন বাধা না থাকে—

বললাম, বিলক্ষণ, বাধা এতে কিছু নেই। তবু বলবার মতোও তো আমার কিছু নেই। বলতে পারি এসেছি মানুষ দেখতে। দুনিয়া দেখতে।

শুদ্ধসত্ত্বের মুখে আবার সেই রহস্যময় হাসিটা ঘনিয়ে উঠল। মৃদুস্বরে যেন নিজের মধ্যে আবৃত্তি করল—মানুষ দেখতে।—সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় একটা ধ্যানের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব মুহূর্তের মধ্যে ডুবে গেল। আগুনের শিখাগুলো জ্বলে জ্বলে তার সেই ধ্যানমগ্ন মুখটার ওপর আলো ফেলতে লাগল। মনে হল কোন পুরুষ মানুষ যে এতো সুন্দর হয়—তা আমি কোন দিন দেখি নি। মনে আনন্দ হল এই ভেবে—এই সুন্দর পুরুষটি এখন আমার সান্নিধ্যে। তাকে আমি ছুঁতে পারি। তার সঙ্গে কথা কইতে পারি। সে আমাকে বন্ধুভাবে সম্বোধন করছে—দাবী করছে আমার সৌহার্দ্য।

শুদ্ধসত্ত্বের ধ্যান ভাঙল। আমার মুখের ওপর একটা অত্যন্ত সুন্দর হাসির ছটা ছড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কিছু মনে কোরো না বোধিসত্ত্ব। মানুষ দেখবে বলে এদেশে এসেছ—কিন্তু দেখবার চোখ এনেছ সঙ্গে করে?

তার প্রশ্ন শুনে মনে মনে একটু বিস্মিতই হলাম। বললাম, দেখবার চোখ তো সবার সমান নয়। আমার দেখবার যেটুকু সেটুকু আমি ঠিকই দেখে নেব।

শুদ্ধসত্ত্ব আমার কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে, এই দেশে দীর্ঘদিন বাস করে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমাদেরদেশ থেকে যারা এদেশে আসে তাদের দেখবার চোখ প্রায়ই থাকে না। তাই তোমায় একথা বললাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, দেখবার চোখ প্রায়ই থাকে না বলছ কেন—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, দুশো বছরের পরাধীনতা আমাদের মনে আবর্জনার স্তূপ জমিয়েছে যে। তারাই চোখকে অন্ধ করে দেয়—

বললাম, এখন তো আমরা স্বাধীন হয়েছি—

শুদ্ধসত্ত্ব আমার কথায় প্রায় বাধা দিয়েই বললে, তুমি কী মনে কর, যে জঞ্জালের স্তূপ দীর্ঘ দুশো বছর ধরে জমেছে—তা এই দুদশ বছরে পরিষ্কার হয়ে যাবে—

প্রথমে পশ্চিমের সাদা চামড়ার লোকেরা পুব দেশে—ভারতবর্ষে গেল মাথা নীচু করে। সারা পশ্চিম জানত—সমস্ত ইউরোপ উজাড় করে যে সম্পদ পাওয়া যায় তা নাকি ভারতবর্ষের একজন রাজা বাদশার রাজকোষে থাকে। সেকালের বিখ্যাত শৌখীন ফ্রান্সের সম্রাট লুইদের, রুশ সম্রাট জারদের, ঢাকাই মসলিন, কাশ্মিরী শাল না হলে সব শৌখীনতাই বরবাদ হয়ে যেত। ভারতবর্ষের নবাব বাদশাহ রাজা মহারাজার দরবারে তখন সাদারা ঢুকত হেঁটমুণ্ডে—প্রসাদ

প্রার্থনা করে। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পথ দেখাল। ফার্ডিনান্ড-ডে-লেসেপ্‌স্‌-এর স্ট্যাচু দেখেছ—আসবার সময় পোর্ট সৈয়দে? আঙুল বাড়িয়ে দেখাল পশ্চিমের জনসাধারণকে পূবের অনন্ত ঐশ্বর্য। খাল কেটে ভারতে যাবার পথকে আরও সুগম করল সে। ভারতে এল পর্তুগীজ, ডাচ, ডেনিশ, জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ। তারপরের ইতিহাস তো আজকের বাচ্চা ছেলেও জানে। পাশার চাল উল্টে গেল। রাতারাতি সেই হেঁটমুণ্ড কৃপাপ্রার্থীরা হল ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের বণিকলক্ষ্মী অন্ধকারে রাজসিংহাসন নিয়ে এল। বণিকের মানদণ্ড একদিন রাজদণ্ড হয়ে গেল। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে খুব ছেলেবেলায় শোনা একটা গান—

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে—এদেশ তোদের নয়।
এই যমুনা গঙ্গানদী তোদেরই আজ হত যদি
তোদের বেনে গোরার সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?

শুদ্ধসত্ত্ব হঠাৎ চুপ করল। একটু থিতিয়ে গেল যেন। শেষের দিকে তার গলার আওয়াজটা জলভরা মেঘের মতো থমথমে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু সে এক মুহূর্তেই। পর মুহূর্তেই সে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, একদিন সাদাদের আমরা ঘেন্না করতাম। সাদা চামড়ার লোকেদের নাকানি চুবানির কতো গল্পই যে তুমি বৃটিশ মিউজিয়াম খুঁজলে পাবে তার ইয়ত্তা নেই। তারপর ক্ষমতা যেই তাদের করায়ত্ত হল—তখন থেকেই ঘৃণাটা উল্টে গেল। কালোরা আর মহান জাত নয়। কালোদের ঐতিহ্য নেই। সংস্কৃতি কৃষ্টি কিছু নেই। তারাও যা জানোয়ারও তাই। এই আমরা ভারতের লোকসাধারণ জানলাম দুশো বছর ধরে। হাজার বার এই ভাবটাকে তাড়াবার চেষ্টা করেও ভারতের জনসাধারণের মন থেকে মনীষীরা একে তাড়াতে পারেন নি। একথাটাকে নিশ্চয় তুমি সত্যি বলে মানবে—

অস্পষ্ট স্বরে বললাম, নিশ্চয়ই—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, ঐখানেই আমরা আমাদের জাতিগত মনের ভারসাম্য হারালাম। জঞ্জাল ঐখানেই জমা হল। ভারতের রাজনৈতিক বিক্ষোভের বেশীর ভাগটা আত্মজাগরণ, আত্মস্বাধীনতার জন্য নয়। শাসকের ঘেন্না আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ঘেন্না। একদল যারা শাসকের পক্ষে ছিল—বিপক্ষকে তারা করত ঘেন্না। কিন্তু মনে মনে সাদাদের ঈর্ষাও করত প্রচুর। এই পুজো আর ঘেন্না এর মাঝে ভারতবাসীর মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। গোরা দেখলে হয় পুজো কর। না হয় ঠ্যাঙাও। সাদারা ভারতবাসীর চোখে হয় দেবতা না হয় দানব। তারা আর মানুষ রইল না। কাজেই দুশো বছর ধরে ভারতের লোকসাধারণ সাদা মানুষ দেখবার চোখ হারিয়েছে—

প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল। বললাম, সবাই নিশ্চয় এই চোখ হারায় নি।

অনেক ভারতীয় মনীষী ইউরোপের মানবতাকে স্বীকার করেছেন। তা নিয়ে প্রচারও করেছেন—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, হ্যাঁ তা করেছেন বটে তবে তাঁরা সংখ্যায় অনেক নন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁরা নামী তাঁদের মধ্যে দু একজন ছাড়া, এমন ব্যক্তি বিরল।

তাকে বললাম, তোমার বক্তব্যটা আরও একটু বুঝিয়ে বলবে আমায়—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, তাহলে তোমাকে সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকের গল্পটা শোনাতে হয়। আমি তখন এডিনবরাতে। একদিন দেখি রাস্তায় একজন অত্যন্ত কালো মাদ্রাজী ভদ্রলোক একটি বছর বারোর এদেশী ছেলের পিছনে দৌড়চ্ছে বেশ রাগত ভাবে। ছেলেটির একে বয়স কম তায় খুব চটপটে। তার সঙ্গে দৌড়ে মোটা সোটা মাদ্রাজী ভদ্রলোক পারবে কেন। কিন্তু সে পিছু ছাড়ল না। সমানে দৌড়ে চলল। ছেলেটিও এ গলি ও গলি করে একটা বাড়ির মধ্যে টুপ করে ঢুকে পড়ল। শুনলাম ছেলেটি নাকি ভদ্রলোককে ব্ল্যাকী বলে সম্বোধন করেছিল, তাতে ভদ্রলোক তাকে শাস্তি দেবার জন্য ধরতে ছুটেছে। ছেলেটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে ভদ্রলোক বাইরের ঘণ্টি বাজাল। একজন স্কট ভদ্র-মহিলা এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, কী চাই? এদিকে রাস্তাতে লোক জমা হয়েছে ভদ্রলোকের পিছনে। ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এ বাড়িতে একটা বছর বারোর ছেলে থাকে। সে কি এইমাত্র বাড়ি ঢুকল?

গিন্নী বললে, হ্যাঁ। কেন বলত—

মাদ্রাজী ভদ্রলোক বললে, সে আমায় ব্ল্যাকী বলে অপমান করেছে। সে কি তোমার ছেলে—

ভদ্রমহিলা তখুনি সেই ছেলেটির কান ধরে ভিতর থেকে বার করে আনলেন। রাস্তায় জমা সমস্ত লোকের সামনে তাকে শাস্তি দিলেন। মাদ্রাজীও প্রতিশোধ নিয়ে খুশী মনে চলে গেল। কিন্তু গোল বাঁধল তার পরের দিন থেকে। ঐ কালো মোটা মাদ্রাজী পাড়ায় বিখ্যাত হয়ে গেল। আশপাশের বাড়ির গিন্নীরা ছোকরারা তাকে রাস্তায় দেখলেই আড়চোখে তাকাত। ফিসফিস করে অথচ সে শুনতে পায় এমনিভাবে বলত, ঐ দেখ, ঐ সেই ব্ল্যাকী যাকে ব্ল্যাকী বলার অপরাধে মিসেস রস তার ছেলেকে শাস্তি দিয়েছিল।

এক সপ্তার মধ্যে সেই ভদ্রলোকের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সে সেই পাড়া ছাড়তে বাধ্য হল।

আসলে কমপ্লেক্স্টা এই দুশো বছর ধরে আমাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে কিনা—তা যাবে কোথায়—একটুতেই সেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ক্ষেপে যাই। ভাবি এই বুঝি আমায় ঘেন্না করল—অপমান করল—

বললাম, ভারতীয়কে ব্ল্যাকী বললে, কী অপমান করা হল না।

শুদ্ধসত্ত্ব প্রশান্ত মুখে বললে, সব সময়ে না। বিশেষ করে বাচ্চারা কী পাড়াগাঁয়ের লোকেরা—যারা ক্বচিৎ কালো চামড়ার মুখ দেখেছে অথবা আদবে দেখে নি—তারা অপমান করবার জন্যে বলে না। কালো চামড়া দেখলেই তারা তাকিয়ে থাকে—অবাক হয়। আমি এমন সব জায়গায় গিয়েছি যেখানে ছোট ছেলেরা দুনিয়াতে যে কালো চামড়া আছে তাই জানে না। আমি বাসে যেতে যেতে স্পষ্ট শুনেছি একটা বাচ্চা তার মাকে বলছে, মা দেখো লোকটা কয়লার খনিতে কাজ করে আসছে—এখনও স্নান করে নি। তার মা তার মুখ চেপে ধরেছে। কাজেই সব সময়ে যে অপমান করবার জন্যেই বলে এমন নয়। অথচ এই কথাটাতেই আমাদের বুকের পুরোনো ঘা-টা টনটন করে ওঠে—

বললাম, সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, না তা অস্বাভাবিক নয় বটে। তবে অস্বাভাবিক যা তা হল—ঐ ঘা বয়ে এদেশে আসার ইচ্ছেটা। এদের সঙ্গে একসঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলবার ইচ্ছেটা। মানুষ বোঝে না, নিজে সুস্থ না থাকলে সুস্থ লোকদের সঙ্গে এক হয়ে চলা যায় না। মেলামেশা করা তো দূরের কথা।

—এই সাদাকালোর ভেদাভেদের ভোগ তোমাকে এদেশে ভুগতে হয় নি নিশ্চয় তাই তুমি অমন কথা বলছ, বললাম আমি।

—তোমার ধারণা ঠিক নয়। বললে শুদ্ধসত্ত্ব।—আমার রংটা সাধারণ ভারতীয়ের থেকে অনেক চড়া বটে কিন্তু এদেশের ভাষায় আমি ডার্ক। অত্যাচার যা যা হবার তা হয়েছে। তা হোক ওতে আমি আদবে গ্রাহ্য করি নি। গোড়া গুড়ি থেকেই ঠিক করেছিলাম এই কম্‌প্লেক্‌স্‌টা মন থেকে তাড়াব। এখন আমার এদের ডার্ক, ব্ল্যাকী বলায় কিছু মনে হয় না। আমি হেসে বলি, আমি যদি ডার্ক হই, তোমরা তবে হোয়াইট। আর সত্যি কথা বলতে কী একটু আধটু রংয়ের ওপর দুর্বলতা সে কি আমাদের নিজেদের মধ্যে-ই নেই। এদেশকে দোষ দিলে চলবে কেন—

—আমরা নিজেরা কি আমাদের ব্ল্যাকী বলি? এ তুমি কী বলছ শুদ্ধসত্ত্ব—বিস্মিত হয়ে বললাম।

শুদ্ধসত্ত্ব একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললে, তা বলি না বটে। কিন্তু কয়লা কালো ছেলের বিয়ের সময় ফরসা টুকটুকে মেয়ে তাবৎ ভারতবর্ষের ছেলের বাপ চেয়ে থাকে না কি? যে ছেলের রং ফর্সা সে কি বিয়ের বাজারে বেশী টাকায় বিকোয় না? রূপ বলতেই কী আমাদের সাধারণ ভারতীয়ের মনে ফর্সা ধবধবে একটি চেহারা প্রথমেই ফুটে ওঠে না। এ কম্‌প্লেক্‌স্‌ আমাদের মনে ঢুকে বসে আছে ভারতে আর্যসভ্যতার শুরু থেকেই। কাজেই এদেশের যদি একটু আধটু কোথাও দুর্বলতা থাকে—সেটাকে চোখ খুলে না দেখলেই ভাল। তুমি নিজে কালো কি ধলো একথা ভুললে আস্তে আস্তে ওরাও ভুলে যাবে তোমার রংটা কী—

শুদ্ধসত্ত্বর কথাগুলো এতো সত্যি যে তাদের আর কিছু দিয়েই ঠেকান গেল না। আমি মুগ্ধ হলাম। বললাম, মানুষ দেখবার চোখ কেমন করে খোলে তা আমায় একটু বলবে ?

শুদ্ধসত্ত্বের নিরাসক্ত কণ্ঠে এবার বোধ হয় ভাবের ছোঁওয়া লাগল। রাতও প্রায় তিনটে বেজে গেছে। ওর খেয়াল নেই। আবেগভরা গলায় বললে, মানুষকে দেখতে হয় এক অখণ্ডরূপে। আমার এই বয়সের মধ্যে এই একটা মস্ত অভিজ্ঞতা ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন। সে দেখার মধ্যে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান রেখো না ভাই। দ্বিধা আর ঘৃণা থাকলে সে দেখা সম্পূর্ণ হবে না কোন দিন। আর তা হলে মহামানবের আসল রূপটা থেকে তুমি চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকবে।

একটু থেমে নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে গভীর গলায় শুদ্ধসত্ত্ব বলতে লাগল, মানুষকে জানতে গেলে তাকে বাইরে থেকে কখনো দেখো না। অন্তরে তার সঙ্গে এক হবার সাধনা কর। তা সে সাদা হোক, কালো হোক, হলদে হোক। তবেই একদিন মহামানবের আসল রূপটা সম্পূর্ণ হয়ে তোমার চোখে ধরা পড়বে।

আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল, তোমার মহামানবটি কে—

শুদ্ধসত্ত্ব তন্ময় হয়ে বলে গেল, সে তো কোন একজন ব্যক্তি নয়। সর্ব দেশকাল জুড়ে যে সংখ্যাহীন মানুষের অনন্ত শোভাযাত্রা চলেছে—সেইটাই হল মহামানবের আসল রূপ। সে আনন্দে হাসে, শোকে কাঁদে, ভালবাসা পেতে চায়। মনের দরজা খুলে দেবার জন্যই মনের মানুষ খোঁজে। আমার অনুরোধ বোধিসত্ত্ব তুমি বাইরে থেকে মানুষকে দেখো না ভাই। তা যদি দেখো তাহলে কালা-ধলার তর্কে, শিক্ষা সভ্যতার জটিলতায়, আচার আচরণের হাজার ভিন্নমুখী পথে তুমি হারিয়ে যাবে।

আমি শুদ্ধসত্ত্বকে আবার বাধা দিলাম। বললাম, শিক্ষা সভ্যতা ছাড়া কী কোন জাতকে সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় বলে তুমি মনে কর ?

শুদ্ধসত্ত্ব গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—শিক্ষা সভ্যতা বলতে তুমি যা বুঝছ তা দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে মাত্র গুটিকতক মানুষকেই জানা যাবে—সমগ্র মানুষ জাতটাকে নয়—

জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ—

শুদ্ধসত্ত্ব জবাব দিল, কারণ অত্যন্ত সোজা। পুঁথিগত বিদ্যে কী তালিম দেওয়া ছকে ফেলা আচার আচরণ—যাদের আমরা শিক্ষা সভ্যতা বলে সাধারণতঃ মনে করি তারা হল মানুষের বাইরের পালিশ—অত্যন্ত ঠুনকো রূপ। ও পথে এগুলে তোমার আসল জায়গায় পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। হয়তো কোনদিন পৌঁছতেই পারবে না। আর যেখানে দেখবে শিক্ষা সভ্যতা সেখানেই দেখবে

তার মাপকাঠি। এরা হল অঙ্গাঙ্গী। অথচ এই মাপকাঠিটা যে ধাতুতে গড়া সেটাতে উঁচু-নীচুর খাদ মেশানো থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাকে বর্জন করতে পারে নি। তাই সাধারণ শিক্ষিত-সভ্য মানুষের মন দম্ভ-ঘৃণার কমপ্লেক্সে সব সময়েই আচ্ছন্ন। মানুষকে জানবার চেনবার সবচেয়ে বড় পথ সব রকম মানুষের সঙ্গে অকৃত্রিম আত্মীয়তা বোধ। তাতেই কেবল ধরা পড়ে সব দেশের সব কালের মানুষের প্রীতি, আর ভালবাসায় ভরা আসল রূপটি।

শুদ্ধসত্ত্ব থামল। এবার আমার মনে হল শুদ্ধসত্ত্ব অনেক অনেক দূরের লোক। ইচ্ছে করলেই তাকে ধরা ছোঁওয়া যায় না।

হঠাৎ পর্দার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে ঘরে ঢুকল। সকাল হয়েছে। আমার মনেও আলো এসে পড়েছে। শুদ্ধসত্ত্বের কথাগুলো জ্যোতির্ময় হয়ে ফুটে উঠছে সেখানে।

শুদ্ধসত্ত্ব উঠে দাঁড়াল। বললে, সকাল হয়েছে। আমি আজ আসি ভাই। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। একটি রাত্রি যে বিনিদ্র অবস্থায় চলে গেল তার কোন ছাপই তার মুখে পড়ে নি। আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। প্রথম রাতে যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি অম্লান।

॥ ৯ ॥

জমাটি আড্ডা বসেছিল ডিনার টেবিলে। অন্যদিনে সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। দুপুরের ডিনার খায় যে যার কাজের জায়গায়। শনিবার রবিবারের ডিনারের আয়োজন হয় বাড়িতেই। বাড়িওয়ালী মিসেস মরিসন আর বাড়ির মেড মিসেস বেকশ্লি সকাল থেকেই তৎপর থাকেন রান্নাবান্নার আয়োজনে।

সুন্দর ক্রীম দেওয়া টোম্যাটো সুপ পেয়ে সবাই হৈ-হৈ করে উঠেছিল। মিসেস মরিসনকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভাল ভাল কথা বলছিল। কেবল রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের মুখখানাই একটু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তাতে বুঝতে পেরেছিলাম এটা ওর আদবেই মনঃপূত হয় নি। নিতান্ত নিরাসক্তভাবেই রুটি টিপছিল আর ধীরেসুস্থে সুপের চামচ মুখে তুলছিল।

আজ সে আমার পাশেই বসা। কাজেই জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করতে অসুবিধে হল না, ব্যাপারটা কী—

রবার্ট রুটি চিবোতে চিবোতে অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলে, কতদিন যে স্কচ্ ব্রথ্ খাই নি। টোম্যাটো সুপ হচ্ছে জানলে বাইরের রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসতাম।

শকসেনা একবার ইংরেজী ছেড়ে হিন্দীতেই আমাকে উপদেশ দিল, সুপ খেতে গিয়ে যেন সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে শব্দ করো না—আর রুটি চিবোতে চপাৎ চপাৎ শব্দ না হয়। এ দুটোই আমাদের বড্ড বদভ্যাস—

ওদিকে শ্যামল গোটাকতক টানেই প্লেট শেষ করে হ্যাঙলার মতো এদিকওদিক তাকাচ্ছে। তাই দেখে পামেলা তার পাতে আর এক হাতা সুপ ঢেলে দিতেই মিসেস মরিসনের মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। পামেলার সেদিকে চোখ পড়তেই সে এতটুকু হয়ে সরে গেল। রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

সিলভিম্যান শ্যামলের দিকে চেয়ে একটু রসিকতা করে বললে, আজকাল বুঝি পামেলাকে খুব সিনেমা ঘুষ দিচ্ছ মিটার—

শ্যামলের কানমুখ রক্তাভ হয়ে উঠল।

হঠাৎ সিলভিম্যান প্রসঙ্গ পালটে বললে, শুনতে পেলাম এবাড়িতে নাকি একজন মহিলা বোর্ডার এসেছেন? সত্যি নাকি—মাম—

মিসেস মরিসন কিছু বলবার আগেই সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল।

শকসেনা অভিমান ক্ষুব্ধ গলায় বললে, মাম এটা আমাদের আগে জানান উচিত ছিল না কি—

মিসেস মরিসন বললে, হ্যাঁ, গতকাল তিনি এসেছেন।

জোসেফ গর্ডন খাওয়া ফেলে মিসেস মরিসনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বয়স কত যদি জিজ্ঞাসা করি তা হলে কী খুব খারাপ করব—

মিসেস মরিসন কৃত্রিম ক্রোধের ভান করে বললে, নিশ্চয়ই। যতই হোক মহিলার বয়স জিজ্ঞাসা তুমি কিছুতেই করতে পার না।

জোসেফ হেসে বললে, তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি তিনি কী করেন?

মিসেস মরিসন হেসে বললে, না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। ভদ্রমহিলা উলওয়ার্থের দোকানে কাজ করেন। আজ ছুটিতে বাড়ি গেছেন। আবারগেল্ডিতে—

জোসেফ হতাশ হবার ভঙ্গী করে বললে, তাহলে তো তেরো থেকে তেষট্টি যে কোন বয়সেরই হতে পারে—

রবার্ট এবার গম্ভীর হয়ে টিপ্পনী কাটল, তোমার কাছে তো দুটো বয়সই চিরকাল সমান বলে জানতাম। নয় কী—

সিলভিম্যান একটু রসান দিয়ে বললে, বল তিন থেকে তিরাশি—

মিস্টার আর মিসেস মরিসন এদের এই সব আলাপ বেশ উপভোগ করছিল। হঠাৎ মিস্টার মরিসন বোকার মতো হাসতে হাসতে বললে, সে গুড়ে বালি। ভদ্র মহিলার স্বামী আছে ছেলে পুলে আছে—

মিসেস মরিসনও সেই সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

সিলভিম্যান বললে, সেই এলসির মতো নাকি। তারও তো শুনেছিলাম—

ছেলে মেয়ে স্বামী সব কিছুই ছিল।

রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝলাম না। তাই খুব আস্তে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাসলে যে—

রবার্ট তেমনি গলা নামিয়েই বললে, এখন থাক। পরে বলব—

শনি রবি দুটো দিন কাটিয়ে সোমবার সন্ধ্যাবেলাতে যখন হাইটীর জন্যে সকলে খাবার টেবিলে জমা হলাম মিসেস মরিসন আলাপ করিয়ে দিল। ইনি আমাদের এখানে নতুন বোর্ডার—নাম মিসেস ক্যাথলিন মায়ার—

আমরা সবাই একে একে গুডউইস্ করলাম।

লম্বা ছিপছিপে শরীর ক্যাথলিন মায়ারের। মুখখানাতে এক সময়ে বোধ হয় কিছু শ্রী ছিল। এখনও তার রেশ লেগে রয়েছে চোখে, চিবুকে। চুলগুলো ফাঁপিয়ে ওপরে তোলা। লো-কাট গাউনের বুকের কাছটা অনেকটা খোলা। তা থেকে তার ঈষৎ ঢলে পড়া যৌবনের অনেকখানিই উপচে পড়েছে। শরীরের গঠনটা চমৎকার। সরু কোমর। ঘন সুগঠিত নিতম্বের রেখা খুবই সুস্পষ্ট। ঠোঁট দুটি লিপস্টিক রঞ্জিত।

ক্যাথলিন মায়ার বিশেষ কথা কইল না। সবার সঙ্গে ঈষৎ হাস্য বিনিময় করে ধীরে সুস্থে খেতে বসল। বসেই কিন্তু চট করে আবার উঠে দাঁড়াল। নড়বড়ে চেয়ারের ফাঁকে তার গাউনের একটা কোণ ঢুকে গিয়েছিল। তাকে সযত্নে টেনে বার করল—মিসেস মরিসনকে দেখিয়ে দেখিয়ে।

ওদিকে ছেলের দল চুপ। রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ড গম্ভীর মুখে কেবল আলু-ভাজা তুলতে লাগল কাঁটায় বিঁধে। বেঁধবার ভঙ্গী এমন মনে হয় যেন তার শত্রুকে সে শূলে বিদ্ধ করে মারছে।

জোসেফ গর্ডন চুপ করে থাকলেও উসখুশ করছে বেশ বোঝা গেল। একবার বিষম খাবার ভান করল। সিলভিম্যান চোরা চাউনি চালাতে লাগল মায়ারের দিকে।

শুধু শ্যামলকে দেখলাম নির্বিকার চিত্তে বসে বসে মাছভাজা চিবোতে।

হঠাৎ শকসেনা লাফিয়ে উঠল তার চেয়ার থেকে। টী পটটা টেনে নিয়ে তা থেকে চা ঢালতে লাগল ক্যাথলিন মায়ারের কাপে। অত্যন্ত গা ভেজা হাসি হাসতে হাসতে সে বললে, আপনি আজ আমাদের এখানে নতুন—সুতরাং চা ঢেলে দেওয়া আমাদেরই কর্তব্য।

মিসেস মরিসন মৃদুস্বরে বললে, আমি বাড়ির গিন্নী এখানে বসে আছি। কর্তব্য যা তা সবই আমার—

মিসেস মরিসনের কথায় শকসেনা ঘা খাওয়া শামুকের মতো গুটিয়ে গেল। চুপ করে নিজের জায়গায় কুঁচকে বসে চা খেতে আরম্ভ করে দিলে। শ্যামলের

অস্পষ্ট মন্তব্য শুনলাম—বেশ হয়েছে—

রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড একটা বিদ্রুপের হাসি ঠোঁটের এক পাশ থেকে অপর পাশে নিয়ে গিয়ে যেন টপ করে গিলে ফেলার ভান করল। সিলভিম্যান আর জোসেফ গর্ডন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল।

গভীর রাতে আমার ঘরের বাইরে কিছু একটা আওয়াজ শুনে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের দরজাটা খোলাই থাকে। পর্দার আড়াল দিয়ে দেখলাম আমার ঘরের সামনে যাকে আমি এতদিন দেওয়ালের অংশ বলে ভুল করেছি—সেটা দেওয়াল নয় একটা ঘরের দরজা। সেই দরজাটা খুলে গিয়ে ভিতরের সবুজ আলো দেখা যাচ্ছে। লাল রঙের পর্দাটা একপাশে সরে যাওয়াতে দেখলাম একটা প্রাণী বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দুহাতে মুখ ঢেকে। যেন একটা সিলুয়েট ছবি। আরও দেখলাম রাস্তার দিকের যে দরজাটা পর্দার আড়ালে লুকোন থাকে সেই পর্দাটা সরে গিয়ে দরজার সবটা দেখা যাচ্ছে। কেউ যে ও দরজাটা খুলে দিল তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

একটু পরেই দেখলাম সে উঠল। প্রায় অর্ধনগ্ন বেশ। মাথার চুল অবিন্যস্ত।

দেখলাম ক্যাথলিন মায়ার আমার ঘরের সামনের গলি দিয়ে বার হয়ে চলে গেল বাথরুমের দিকে।

রাতে অনেকক্ষণ আর ঘুম হল না। কেবলই মনে মনে ভাবতে লাগলাম এতো রাতে বাইরের দরজা খুলে ক্যাথলিন মায়ার কোথা থেকে এল ?

॥ ১০ ॥

মেঠো পথ ধরে একলা চলেছি। অন্ধকারটা এতক্ষণ আবছা ছিল, হঠাৎ যেন গাঢ় হয়ে এলো। চাঁদটা বোধ হয় একখণ্ড মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। এতক্ষণ যে পঞ্চপর্বত পিছনে ফেলে এসেছি মনে হল তারাই যেন হুমড়ি খেয়ে রাস্তাটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ডাইনের বিপুল পাহাড়ের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে গেছে বাঁয়ের অজাতশত্রুর গড়ের পাঁচিলটা। গড়ের কোন অস্তিত্বই আজ নেই। শুধু পড়ে আছে পাথরের দেওয়ালটা, কবরখানার অতি প্রাচীন কংকালের মতো।

মনে হল আমার সামনে পথটা যেন অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। চলতি পা দুটো থামল না। কিন্তু মনের ভিতরে পিছিয়ে যেতে লাগলাম স্মৃতির পিছুটানে।

আজকের জ্যাকের সঙ্গে সেদিনের জ্যাকের কী কোন পার্থক্য বিশেষ করে নজরে পড়েছে ? তা পড়েছে বৈকি। চেহারার আর শুধু কী চেহারা—

জ্যাকের সঙ্গে দেখা হল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে, তার মধ্যেই সে মনের

মধ্যে একটা আশ্চর্য অনুভূতির সঞ্চার করে গেল। সে অনুভূতি প্রশান্তির।

জ্যাকের এই প্রশান্তিটা আবার্ডিনে থাকতে মোটেই চোখে নি।

জ্যাককে দেখেছি সদাচঞ্চল, বিষম ছটফটে জীব। কেবল মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে সে একটা প্রবীণতার ভান করত মাত্র। সেটা তার সঙ্গে হৃদ্যতাটা একটু বেশী হতেই আমি টের পেয়েছিলাম। আর এও জেনেছিলাম ওপরে সে চঞ্চল হলেও মনে যদি একটা কিছু সে ঠিক করে, তবে সে তা করবেই।

অধ্যাপক ম্যাকিণ্টর কথা প্রসঙ্গে হাসতে হাসতে আমাকে একদিন বলেছিলেন, সুবিধে অসুবিধে বলে কোন কথা জ্যাকের ডিক্সনারীতে পাবে না। ওর কথা, যা ভেবেছি তা করতে হবে। তা সে যেমন করেই হোক না কেন?

—এই দ্যাখ না—বলে আমাকে ছোট একটি ঘটনা শুনিয়ে দিলেন।

—আমি ছিলাম অক্সফোর্ডে। সেখানে জ্যাক আমার কাছে কাজ করতে এল ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ নিয়ে। কিন্তু আমার টার্ণ অক্সফোর্ডে শেষ হতেই আমি আবার আবার্ডিনে চলে আসব বলে ঠিক করলাম। জ্যাক স্কলারশিপ ছেড়ে দিয়ে চলে এলো আমার সঙ্গে এখানে। পয়সাকড়ি ওর কিছু নেই। কী ভাবে ওর চলবে তাও একবার ভাবল না। আমি নিজেই ওকে জিদ করেছিলাম অক্সফোর্ডে থেকে পি, এইচ-ডি করবার জন্য। আমাকে বললে, আমি যখন আপনার কাছে কাজ করতে আসি তখন ঠিকই করে ফেলেছিলাম আপনি ছাড়া আর কারুর কাছে যাব না। ব্যস যা ভাবা, সেই কাজ। এমন পাগল আর দেখেছো—

বলে প্রোফেসর তাঁর বিরাট এক বোঝা পাকা চুলে ভরা রুক্ষু মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসেছিলেন সেদিন। তাঁর সে হাসি থেকে ঝরে পড়েছিল জ্যাকের ওপর তাঁর অনাবিল স্নেহ।

জ্যাককে বলতে শুনেছি কতবার—আমার মা বেঁচে নেই। কিন্তু সে অভাব প্রোফেসার ম্যাকিন্টরের কাছে আসা থেকে আমার একদিনও মনে পড়ে নি।

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ছিল অগাধ প্রীতির, অসীম বন্ধুত্বের। প্রোফেসরের সঙ্গে জ্যাকই আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন।

তারপর থেকে প্রায়ই যেতাম তাঁর কাছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের অনেক কথাই আলোচনা করতেন প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর। অকুণ্ঠ চিত্তে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। ধার ধারতেন না কোন সংকীর্ণ রাজনীতি বা স্বদেশপ্রীতির।

প্রোফেসর ছিলেন কায়মনোবাক্যে জ্ঞানতপস্বী। অধ্যাপনা ছিল তাঁর পেশা। নেশা ছিল গভীর অধ্যয়নের আর তারও চেয়ে গভীর চিন্তার। তাই সব সময়েই তিনি ডুবে থাকতেন নিজের অন্তরের মধ্যে। রাস্তায় যখন চলতেন তখন কোন কিছুই তাঁর নজরে পড়ত না। কতবার যে গাড়িচাপা থেকে তিনি দৈবাৎ বেঁচে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মিসেস ম্যাকিন্টরকে এই নিয়ে ঝামেলা পোয়াতে

হত বড় কম নয়।

একদিন এই রকম ঝামেলার ভিতর প্রোফেসরকে আবিষ্কার করলাম ব্রিজ স্ট্রীটের চৌমাথার ওপর। মনে আছে তার কদিন আগে থেকেই বিচ্ছিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাস্তায় জমা বরফের স্তূপগুলো সেই বৃষ্টিতে নরম হয়ে গলে যাচ্ছে। ভেজা বরফের সঙ্গে জমেছে কাদা। দারুণ নোংরা হয়ে উঠেছে শহরের পথ ঘাট। আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে আঁতের ভিতরটা পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছে।

এত নোংরা আর ঠাণ্ডার মধ্যেও কিন্তু রাস্তায় লোকের ভীড়ের অন্ত নেই। ক্রীস্‌মাস এই এসে গেল বলে। চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। দোকানে দোকানে সাজ সাজ রব। ইউনিয়ন স্ট্রীটের আগাগোড়া সব দোকানগুলোতে কোনিফারের ডাল পুতে তাতে হরেক রকমের আলোর বাল্ব দিয়ে সাজিয়েছে শো-কেশ। তুলোয় মুড়ে দিয়ে কৃত্রিম বরফ বানিয়েছে। আর দোকানগুলোর বাইরে তো আলোর সাজের অন্ত নেই। তাই দেখতেই বাস্তায় চলেছে দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা।

সন্ধ্যের পরে রাস্তায় গা গলান প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে ব্রীজ স্ট্রীটের চৌমাথায়। সেখানে কোন রকমে পথ করছি এমন সময়ে রাস্তার মাঝে হৈহৈ শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভীড় জমে গেল দারুণ ভাবে।

একটা ডবল ডেকার প্রচণ্ড এক ব্রেক দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঝাঁকানি খেয়ে বাসটা প্রায় উল্টে যাবার যোগাড়।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একি এযে প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর। সেই ঢলঢলে ছেঁড়া ময়লা ওভারকোটটা গায়ে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা রুক্ষ পাকা চুল। বড় বড় চোখ দুটিতে বিষম অসহায়ের দৃষ্টি।

দুটো পুলিস এসে দুহাত ধরেছে প্রোফেসরের। ভেবেছে লোকটা বদ্ধ মাতাল। ওর মাতলামীর জন্যেই না আজ একবাস লোক আর একটু হলে বিপদে পড়ত। যদি বাসটা উল্টে যেত—

বাস ড্রাইভার হর্ণ দেওয়া সত্ত্বেও প্রোফেসর কিচ্ছু শুনতে পান নি। দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তার ওপরে। আমি দৌড়ে গেলাম প্রোফেসরের কাছে।

বললাম, একি প্রোফেসর আপনি—এখানে এ সময়ে এতো ভীড়ে—

পুলিস দুটিকে প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের নাম বলতেই তারা তক্ষুনি—মাফ করুন প্রোফেসার চিনতে পারি নি—বলে বাউ করতে করতে সরে গেল। বহু কৌতূহলী দর্শক মজা দেখে হাসতে লাগল। কিন্তু প্রোফেসরের কোন বিকৃতি নেই।

কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করল, আরে এই প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর—

কথাটা তাঁর কানে যেতেই গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকেই ভগবান

পাঠিয়েছেন। আর বাপ মায়ে ঐ নাম দিয়েছে—

আমাকে দেখেই পরম উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আরে এই যে বোধি। যাক বাঁচা গেল। এখন বলত জ্যাক-এর ঠিকানাটা কী ? আমাকে একবার সে বলেছিল বটে। তার বাড়িতেও দু-একবার গেছি বটে কিন্তু এখন যেন সব গোলমাল লাগছে। আমি কিছুতেই রাস্তা চিনতে পারছিনে। তবে এই জায়গাটা দিয়েই যেন গিয়েছিলাম মনে হয়—

একটু আগেই যে একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে, প্রোফেসরের চোখে-মুখে হাব-ভাবে তার কোন লক্ষণই আর নেই।

বললাম, জ্যাকের বাড়িতো এখানে নয় প্রোফেসর। যদিও আমি সেখানে কখনও যাই নি তবু যতদূর মনে হয় সে তো একেবারে উল্টো দিকে। একেবারে ব্রিগ-ও-ডনের (ব্রিজ-অব্-ডন) কাছে।

প্রোফেসর বললেন, তাই নাকি। দেখতো সব গোলমাল হয়ে গেছে আমার। ছোকরা আজ দুদিন আসছে না। তার একটা স্কলারশিপের জোগাড় করেছি। খবরটা আজ এসেছে। তাকে খবরটা দিয়ে আসি বলে বার হলাম। কিন্তু—বলে প্রোফেসর মাথা চুলকাতে লাগলেন।

বললাম, চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাই তার কাছে—

প্রোফেসর খুশী হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মতো। বললেন, যাবে ? বেশ বেশ চল—

জ্যাকের সঙ্গে আমারও কিছুদিন দেখা হয় নি। সেই যে সপ্তাখানেক আগে একবার ইউনিভারসিটি স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তারপর এই কদিন আমি তার আর কোন পাত্তা পাই নি।

প্রোফেসরকে নিয়ে উঠে বসলাম একটা দোতলা ট্রামের মাথায়। এক পাশের একটা সীটে দুজনে বসতেই ম্যাকিণ্টয় বললেন, খবর শুনেছো—

জিজ্ঞাসু চোখে চাইলাম।

প্রোফেসর হো হো করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসতে হাসতে বললেন, জ্যাক খুব শিগগির এন্‌গেজড্ হচ্ছে।

—তাই নাকি ? শুনি নি তো—

—হ্যাঁ। মেয়েটির নাম—ঐ দেখ—বেমালুম ভুলে গেছি। মাথা চুলকো তে লাগলেন প্রোফেসার। ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ।

আস্তে আস্তে বললেন, তা যাই হোক শুনলাম মেয়েটির পয়সা-কড়ি আছে যথেষ্ট—

তারপর কিছুক্ষণ কোন কথাই বললেন না। হঠাৎ নিজের মনেই হো হো করে একবার হেসে উঠে বললেন, কিন্তু মেয়েটি স্কট। কাজেই পয়সা-কড়ি তার থাকলেও জ্যাকের তাতে খুব সুবিধে হবে কি না কে জানে—

আপনি নিজে স্কট হয়ে স্কটদের ওপর এমন অবিচার করছেন কেন প্রোফেসর—জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রোফেসর রহস্যভরা গলায় বললেন, তুমি এখনো তো স্কটদের চেনো না। শোনো তবে ছোট একটা গল্প। একবার লণ্ডনের সঙ্গে গ্লাসগোর ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে লণ্ডনে। দু দলই ফাইন্যালে উঠেছে। জানোতো কী ভয়ানক উৎসাহ এখানকার লোকের ফুটবল খেলার ওপর। দলে দলে লোক রিটার্ণ টিকিট কেটে স্কটল্যাণ্ড থেকে খেলা দেখতে গেল লণ্ডনে। এই আবার্ডিনের দুজন ছাত্রও ছিল সে দলে। দুই বন্ধু। তাদের একজনের আবার ছিল হার্ট খারাপ। রাতে ট্রেনের ভিতর স্কটিশ দলের কথা চিন্তা করতে করতে সে এত উত্তেজিত হল যে সেখানেই হার্টফেল করল। সকালে চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে পৌঁছে অপর বন্ধু তাকে ডাকতে গিয়ে দেখে সে অক্কা পেয়েছে। বন্ধু কি করে। ছেলেটা মরুক আর যাই করুক তাকে তো ফিরিয়ে আনতে হবে। নৈলে রিটার্ণ টিকিটের অপব্যয়। অপর প্লাটফর্ম থেকে সেই সময়ে ট্রেন ছাড়ছিল আবার্ডিনের। অপর বন্ধুটি তখন তার মরা বন্ধুর দেহটা কাঁধে ফেলে রিটার্ণ টিকিট বাগিয়ে নিয়ে এসে আবার্ডিনের ট্রেনে চেপে বসল। মাঝ রাস্তায় চেকার উঠেছে। সে দেখে একটা মরা লোককে একটা সীটে ঠেস দিয়ে বসিয়ে একটা ছোকরা তাকে ধরে আছে। চেকার জিজ্ঞাসা করল—এ তোমার কে?

বন্ধু মুখ না তুলে গম্ভীর গলায় বললে, আমার বন্ধু—

চেকার হেসে বললে, এ যে কাবার হয়ে গেছে—

বন্ধু ঠিক তেমনিভাবে গম্ভীর গলার উত্তর দিলে—ও কাবার হয়েছে তা কি? ওর টিকিট তো এখনো কাবার হয় নি—বলেই আবার প্রোফেসর হে হো করে হেসে উঠলেন।—এই হল খাঁটি স্কট স্বভাব। পয়সার অপব্যয় করবে না।

আমিও হেসে ফেললাম গল্প শুনে। পরে বললাম, খুব খুশী হলাম প্রোফেসর আপনার কাছে জ্যাকের খবর শুনে। যাক আজই গিয়ে আমি ওকে কনগ্রাচুলেট করব।

প্রোফেসর আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন। ধীরে সুস্থে বললেন, দাঁড়াও। অত তাড়াতাড়ি কিসের? জ্যাকের ব্যাপার তো। চার্চে সার্ভিস করতে যাবার আগেও আমার এ সম্বন্ধে খুব ভরসা নেই।

—কেন প্রোফেসর। জ্যাক তো সে রকম লোকই নয়। ওর তো যা ভাবনা তাই কাজ। তবে—

—সেকথা হাজার বার সত্যি। তবে কী জান? জ্যাকের এই সঙ্গিনী নির্বাচন সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু আছে কি না অক্সফোর্ডে—বলেই প্রোফেসর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বাইরের দিকে চেয়ে। আপন মনেই বললেন, এ ব্যাপারটার ওপর ওর নিজেরই কোন হাত নেই। না হলে সেই

মেয়েটি—আহা কী যে নাম—হ্যাঁ হ্যাঁ এ্যানিটা বোস—জান বোধি, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতাটাই হচ্ছে আসল কথা—সবটাই বোধহয় নির্ভর করে তারই ওপরে।

অনীতা বোস। নামটা শুনে একটু চমকে উঠলাম। বাঙালী মেয়ে। কৌতূহলটা নিবিড় হয়ে উঠল।

এদিকে ট্রাম ঢিকোতে ঢিকোতে চলেছে জনাকীর্ণ রাস্তার ওপর দিয়ে। কখনও দাঁড়াচ্ছে। কখনও এগোচ্ছে মন্থর গতিতে। আমাদের সঠিক জায়গায় পেঁছিতেও দেরী অনেক।

—অনীতা বোস কী কলকাতার মেয়ে—আমি জিজ্ঞাসা করলাম। প্রোফেসর তখনি সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির এম, এ। আমার কাছে অকস্‌ফোর্ডে রিসার্চ করতে এসেছিল। এমন অদ্ভুত মেধাবী মেয়ে আমি কখনও দেখি নি বোধি। আর ইংরেজী ভাষায় তার যা দখল ছিল তাতে করে সে এদেশের যে কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে পারত। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল তার দর্শনের সূত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করে আবার সমন্বয় করার ক্ষমতা। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেই তো জ্যাক এপিস্টেমোলজিতে রিসার্চ ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্য দর্শন নিয়ে পড়ল। কী অদ্ভুত যে তার ব্যক্তিত্ব ছিল। সত্যি কথা বলতে কি তার ব্যক্তিত্ব আমাকেও মাঝে মাঝে আকর্ষণ করত—

প্রফেসর বুঁদ হয়ে নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন সেই অনীতা বোসের কথা।

—দেখতে ছিল কালো। মানে সাধারণ ভারতীয়দের থেকেও কয়েক পোঁচ কালো। তা বললে কিন্তু তার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। এ্যানিটাকে দেখে আমার খালি মনে পড়ত বৃটিশ মিউজিয়ামে রাখা দক্ষিণ ভারত থেকে নিয়ে আসা কষ্টি পাথরের দেবীমূর্তির কথা। শিল্পীর ভাস্কর্যে যে অদ্ভুত লাবণ্য থাকে সেইটাই ধরা পড়েছিল এ্যানিটার চেহারায়। কালো মেয়ে যে এতো সুন্দর হয় তা আমার আগে কোনদিন চোখেই পড়ে নি।

এ্যানিটার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই দেখলাম জ্যাকের কিছুটা পরিবর্তন হল। তার অত্যন্ত প্রিয় এপিস্টেমোলজি ছেড়ে এক কথায় চলে এল প্রাচ্য দর্শনে। আগে ও ছিল ভারী অহঙ্কারী বুদ্ধিবাদী। তুমি তো সে জ্যাককে দেখ নি। পরকে কূট তর্কে ঘায়েল করতে পারলে ও আর কিছু চাইত না। এ্যানিটার সঙ্গে আলাপের বছর খানেক পর থেকে দেখলাম সে ঔদ্ধত্যটা অনেক কম।

মোট কথা ভেতরে বাইরে জ্যাকের পরিবর্তনটা এমনভাবে হল যে আমার চোখে সেগুলো বেশ স্পষ্ট হয়েই পড়তে লাগল। এ্যানিটার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল খুব বেশী। ওদের দুজনকে প্রায় সময়ই এক সঙ্গে দেখা যেত। জ্যাককে আমি প্রশংসাই করতাম এজন্য। ভেবেছিলাম দুজনে বোধহয় এন্‌গেজড হবে।

জ্যাক আমাকে একদিন যেন আভাসে এমন একটা কথা জানিয়েও ছিল।

এ্যানিটা ছিল কিন্তু বড় চাপা। তার কাছ থেকে অবশ্য কোন কথাই আমি শুনি নি। কিন্তু আমি এটা জানি যে এ্যানিটা যখন তার বাপের বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে অস্থির তখন জ্যাক তাকে প্লেনে কলকাতা যাতায়াতের ভাড়া দিয়েছিল তার বাড়িখানা বিক্রি করে। তাই ভেবেছিলাম হয়তো শেষ পর্যন্ত বিয়ে হবে, ওরা সুখী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী যে হল—বলে প্রোফেসর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পকেট থেকে রুমালটা বার করে একবার নাকটা ঝেড়ে নিলেন। বললেন, তাই বলছিলাম এ ব্যাপারটায় জ্যাকের হয়তো নিজের কোন হাত নেই—

অনেক কথাই প্রোফেসরকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গন্তব্যে পেঁাছে গিয়েছি বলে আর কোন কথা বলার সুযোগ হল না। ডনের ব্রীজ পার হয়ে এসেই জ্যাকের বাড়ির নম্বর দেখতে পেলাম। বেল টিপলাম। প্রোফেসর এতক্ষণ পরে আবার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তাই তো বটে। এই বাড়িটাই তো। এর চিহ্নটাও মনে রেখেছি। ঐ দরজার সামনে সিনেমার পোস্টার লাগাবার জায়গাটা—

দরজা খুলে দাঁড়াল সে-রাতের বাসে-আসা সোনালী চুলে ভরা ঝাঁকড়া-মাথা মেয়েটি।

চিনতে আমার বিন্দুমাত্রও কষ্ট হল না। তবে এবার দেখলাম তার চুলের ছাঁটটা পুরুষের মতো নয়, মেয়েলী। চেহারাটা সে রাতের তুলনায় অনেক ভাল বলে মনে হল। চোখের দৃষ্টি অনেক প্রকৃতস্থ। গালে বেশ একটু লালচে আভাও লেগেছে। দরজা খুলেই বললে, কাকে চাই—

—জ্যাক আছে? যদি থাকে বলুন প্রোফেসর ম্যাকিন্টর আর বোধি এসেছে দেখা করতে—

মেয়েটির চোখ দুটো দপ করে একবার জ্বলে উঠল। কিন্তু কথা না বলেই ভিতরে ঢুকে গেল। পরক্ষণেই দেখি গলায় মাথায় স্কার্ফ জড়ান জ্যাক দৌড়ে আসছে।—আসুন, আসুন স্যার। এসো বোধি, এসো ভিতরে এসো—

বলতে বলতে এসে আমাদের দুজনের হাত জড়িয়ে ধরল। তারপরই তড়াক করে লাফ মেরে সরে গেল। বললে, আমার ভয়ানক সর্দি হয়েছে। অতি ছোঁয়াচে ব্যায়রাম। কাছে এসো না তোমরা। দুএকদিন একটু টেম্পারেচরও হয়েছিল। আজ আর নেই। আজ একটু ভাল—

ঘরে গিয়ে বসলাম। এটা অবশ্য শোবারও ঘর।

গ্যাসের আগুনে মেয়েটি নির্বাক হয়ে লাল মদ গরম করছে। জ্যাকের সর্দির ওষুধ। সামনে ধরা আছে এক টাব গরম জল। ফুটবাথের জন্যে।

জ্যাক আলাপ করিয়ে দিল। এই যে স্যার, এই অদ্রে পিয়ার্সন। আর ইনি

স্বনামখ্যাত প্রফেসর ম্যাকিন্টর। আর এ আমার ভারতীয় বন্ধু, বোধি। তুমি একে চেনো না। কিন্তু বোধি তোমাকে চেনে অদে্‌। সেই রাতে লণ্ডন থেকে গ্লাসগো অবধি আমরা একসঙ্গেই এসেছি।

মেয়েটির গলা দিয়ে আচমকা একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এলো। কিন্তু সে এগিয়ে এসে আমাদের দুজনের সঙ্গেই সেকহ্যাণ্ড করল।

প্রোফেসর বললেন, ভারী খুশী হলাম তোমায় দেখে। আমি বললাম, তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

জ্যাকের দিকে ফিরে বললাম, প্রোফেসরের কাছে যা শুনলাম তা যদি সত্যি হয় তবে তোমাদের দুজনকে আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেখলাম অদে্‌ অন্য দিকে একটু মুখ ঘুরিয়ে নিল। বোধ হয় লজ্জায়। জ্যাকের মুখখানা আরও লাল হয়ে উঠল।

সে বললে, থ্যাংক ইউ—

জ্যাকের কাছ থেকে ফেরবার সময় প্রোফেসর বললেন, যাক ভালই হল। জ্যাকের দরকার ছিল একজন মাদারলি লেডীর। মেয়েটা তাই। বোধ হয় বয়সে জ্যাকের থেকে কিছু বড়ই হবে। তা হোক আমি নিশ্চিন্ত।

আমি আর কোন কথা বললাম না। প্রোফেসরকে তাঁর বাড়ি পেঁীছে আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আর বরফের স্তূপ ভাঙতে ভাঙতে রাস্তা হাঁটতে লাগলাম। মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে।

অনীতা বোস। কে সে মেয়ে? সে প্রোফেসর ম্যাকিন্টরের মনেও নাড়া দিয়েছে। জ্যাকের তো কথাই নেই। আর তার শেষ পর্যন্ত হলই বা কী।

জ্যাকের এই পরিণতি—এই আধাবয়সী নিউরোটিক একটি মেয়েকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু কেমন করে এ সব সম্ভব। একি জ্যাকের পরহিত প্রবৃত্তি। না এর মধ্যে লুকিয়ে আছে কোন প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা। হয়তো বা অনীতা বোসের ওপর। হয়তো বা নিজেরই ওপর।

নানান কথা মনে মনে তোলপাড় করতে করতে বাড়ি এলাম। জ্যাকের অতীত সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। সেই অন্ধকার পর্দা ভেদ করে একটু আলো যখন এলো তখন দেখলাম সেটা কী বিষম বেদনাদায়ক।

॥ ১১ ॥

আবার্ডিনের যে একটা বিশেষ রূপ আছে তা প্রথম কদিন নজরেই পড়ে নি। কুয়াশার ঘোমটার আড়ালে সে বেশ কদিন আমার দৃষ্টি থেকে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল। পরে সে রূপ দেখে বারবার ভেবেছি যে তাকে গ্রেট বৃটেনের অন্যান্য জায়গা থেকে রীতিমতো আলাদা করে দেখা যায়।

আবার্ডিন বলতে যে সব লোক অজ্ঞান হতেন ডক্টর রোজ ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি বলতেন, কি সুন্দর মাঝারি রকমের ঝকঝকে পরিষ্কার শহর আমাদের দেখছ? এ লণ্ডন এডিনবরার মতো বড় শহর নয় যে সব কিছু তোমার এখানে হারিয়ে যাবে। আবার খুব ছোটও নয়। দশ স্কোয়ার মাইল এই শহরের বেড়। এক এক করে গুনে যাও দেখবে এই শহরে আছে সাতশ ষাটটা ছোট বড় রাস্তা, গলি-ঘুঁজি। এই শহরে বাস করে প্রায় পৌনে দুলক্ষ লোক।

একটু থিতিয়ে গিয়ে আবৃত্তি করতেন—

মাই শিলভার সিটি বাই দ্য সি
দাই হোয়াইট ফুট রেস্ট্‌স্‌ অন্‌ গোল্ডেন স্যাণ্ড।
এ রেডিয়্যাণ্ট রোব এন্‌ সার্কেলস্‌ দী
অব্‌ উডি হিল্‌স্‌ এ্যাণ্ড গার্ডেন ল্যাণ্ড্‌স্‌।

আবৃত্তি করার পরেই ডক্টর রোজের ভাষা কাব্যিক হয়ে যেত। চোখ বুজে বলতেন, উত্তর সাগরের ধারে বেলা বালুকায় সে এলিয়ে দেয় তার সোনালি চুল। রোদলাগা নীল সাগরের জল আস্তে আস্তে ধুয়ে চলে যায় তার চূর্ণ কুন্তলের রাশ। বাতাসে ভাসে তাদের হাল্কা চপল ছন্দ—

বলতে বলতে গলার আওয়াজ পাল্‌টে যেত ডক্টর রোজের। —এই আবার্ডিনই হল আসল স্কটল্যাণ্ড তা কি জান? এখানে খাঁটি হাইল্যাণ্ড আর খাঁটি লোল্যাণ্ড—এই দুয়ে মেশামেশি হয়ে গেছে। আসলে আবার্ডিন শহরটা লোল্যাণ্ডে হলেও এ হল হাইল্যাণ্ডে ঢোকবার তোরণ। তাই ছুটির দিনে কি উৎসবে দোকানে বাজারে কিল্ট আর বনেটের ছড়াছড়ি। এ শুধু আজকের কথাই বলছি না এ সেই রাজা উইলিয়ম দ্য-লায়নের সময় থেকেই। তিনিই তো প্রথম চার্টার করে স্কটল্যাণ্ডের প্রথম ডেভিডের হাতে এই আবার্ডিন শহরের ভার তুলে দেন। তখন থেকেই এই শহরের পত্তন।

এর পরেই বক্তৃতার ঢঙে ডক্টর রোজ বলতেন, কঠিনে কোমলে মেশামেশি হয়ে এক অপূর্ব প্রকৃতি গড়ে উঠেছে এই আবার্ডিনে। উত্তর সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিকে দেখবে ডনের শীর্ণ স্রোত। উপলবিষম পথে অনবরত ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কর্কশ হয়ে উঠেছে তার আওয়াজ। ডনের দিকের সমস্তটাই রুক্ষ, বন্ধুর। শুধু পাথর আর খোয়া-নুড়ির রাজত্ব। গাছপালা কম। সবুজের শোভা বিরল। দুধারেই নজরে পড়বে বড় বড় গ্রানাইটের কোয়ারি। গ্রানাইটেই তৈরী হচ্ছে আবার্ডিনের বাড়িঘর রাস্তাঘাট। গ্রানাইটের কোয়ারিগুলো থেকে শুধু পাথরই উঠছে না, উঠছে শক্ত চক্‌চকে রুপোর পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স। লাখে লাখে—কোটিতে কোটিতে—

অবাক হয়ে যেতাম ডক্টর রোজের আবার্ডিন প্রীতি দেখে। অদ্ভুত লাগত

এই ভেবে এই শহরের এত খুঁটিনাটি ইনি জানেন। আর এত ভালবাসেন এই শহরকে।

একথা তাঁকে জানালেই তিনি আরও কোমল হয়ে উঠতেন। বলতেন, আবার্ডিন সায়ার বলতে যাকে আমরা বুঝি সে হল রয়াল ডী সাইড। এই ডান দিকে সেই রাজত্ব। ডাইনে দেখ ডী নেমে আসছে। সুন্দরী ডী। কুল কুল করে মিষ্টি কলধ্বনি বাজছে তার প্রতিটি ঢেউয়ের অঙ্গভঙ্গিমায়। এই শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে এই ডাইনের সারা অঞ্চল। এ অঞ্চল হল রাণীর। শুধু রাণী ব্যালমোরালে এসে থাকেন বলেই নয়। তার অজস্র পত্র পল্লবের রূপসজ্জা দেখবার মতো জিনিস। ডী ধরে বরাবর এগিয়ে যাও—মাইলের পর মাইল, তোমার চোখ জুড়িয়ে দেবে চিরসবুজ কোনিফার, ডগলাসফার আর ইউ গাছের ঘনশ্যাম রূপ। ঢালু জমির উঁচু নীচু বুকে জড়িয়ে আছে এই সবুজ বনের বাহারে আঁচল। এর তুলনা গ্রেট বৃটেনে তুমি খুব বেশী পাবে না।

আরও বলতেন ডক্টর রোজ।—ডী আর ডন। এই দুয়ের বিপরীত সত্তায় তৈরী হয়েছে আবার্ডিনের মন। একদিকে তাই এর দেখতে পাবে উজ্জ্বল গ্রানাইটের ভীষণ মসৃণ কোণের পর কোণ তোলা গথিক প্রথায় তৈরী আধুনিক ম্যারিশ্যাল কলেজ—বিজ্ঞান সাধনার মন্দির। আর অপরদিকে পুরোনো আবার্ডিনের প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন ছায়াচ্ছন্ন সুন্দর আশ্রম, আর্টস্ পড়বার কিংস্ কলেজ। অথবা চতুর্দশ শতকের তৈরী সেণ্ট মাথার ক্যাথিড্রাল। এ রকম অপূর্ব পেলব আর নয়নাভিরাম কার্ভিং এ তল্লাটে কেন সারা বৃটেনে খুঁজে পাবে না—

একটু চুপ করে কী ভাবতেন ডক্টর রোজ। তারপর আবার শুরু করতেন। —আবার্ডিনের কালচার তাই তৈরী হয়েছে এই দুই বিপরীত ধারায়। বস্তুবাদের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ। বেনিয়াবুদ্ধি আর অর্থগৃধ্নুতার সঙ্গে,প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা—

শহরের মাঝখানকার রাস্তাগুলোর বেশীর ভাগ রপ্ত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কাস্‌লগেটের চৌমাথা থেকে ইউনিয়ন স্ট্রীট ধরে বরাবর হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই বন এ্যাকরড টেরাস্ পর্যন্ত।

শহরের ভিতরকার এইটেই হল সবচেয়ে বড় আর প্রধান রাস্তা। এর ওপরে হরেক রকমের দোকান। নানান রকমের বাতি জ্বালা শো কেসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কাতারে কাতারে পুরুষ নারী। রাস্তার ফুটপাতের উপরই এদের সবচেয়ে বড় আড্ডাখানা।

সন্ধ্যার পর সুন্দরীরা বয় ফ্রেণ্ডদের জন্যে এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বাসের দিকে চেয়ে। ছেলেরা পরিমিত পদক্ষেপে পাইচারী করে গাল ফ্রেণ্ডদের অপেক্ষায়।

মাঝে মাঝে দল পাকিয়ে আড্ডা দেয় পাবলিক বার থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা

লোকগুলো। চীৎকার করে হাসে, রেসের গল্প করে। এর উপর দিয়েই আবার চলে হাতে হাত রেখে কর্তা গিন্নী। কী ভবিষ্যৎ বিয়ের স্বপ্নে বিভোর বন্ধু-বান্ধবী।

দিনের বেলায় কিন্তু আবার্ডিনের রূপ অন্য রকম। সকালে বার হলেই দেখা যাবে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই ছুটছে। কাজ-কাজ-কাজ। বাসের স্ট্যাণ্ডে ছোট ছেলেরা দাঁড়িয়ে স্কুলে যাবার জন্যে। পনেরো ষোল থেকে ছয় সাত সবাই আছে তাদের মধ্যে। অফিসের বাবুরা দাঁড়িয়েছে। কারখানার মজুররা দাঁড়িয়েছে। দোকানদার মেয়েরাও ভীড় করেছে। সবাই চলেছে কাজে।

সবাই এক পাড়ার লোক। দেখা হলেই এদের মধ্যে অনেকে গুডমর্নিং জানায়। ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কালো চামড়ার দিকে। একটু বড়রা তাদের চিমটি দিয়ে সজাগ করে দেয়। কানে কানে বলে দেয়, অমন করে তাকাতে নেই, অভদ্রতা হয়।

কোন পরিচিত মুখ বৃদ্ধা একটু হেসে বলেন, ভেরী কোল্ড, ইজন্‌ট্‌ ইট সো? ঘাড় নেড়ে বলি, ইয়েস, ভেরী ব্লিক—

এক একটা বকিয়ে বুড়োর উৎসাহ কমে না। বাসে উঠে পাশে বসেই গল্প জুড়ে দেয়। কানাডায় কী ভীষণ শীত। সে কানাডায় ছিল যেন কোন এক সময়ে। তার কাছে এ আবার্ডিনের শীত তো কিছুই নয়।

তবুও গরম দস্তানার মধ্যে হাতের আঙুলগুলো জ্বালা করে। কানের আর নাকের ডগা অসাড় হয়ে যায়। রাস্তার পথচারীরা কদাচ হাঁটে। দৌড়য় বেশীর ভাগ। মেয়েরা চলে নাচের ভঙ্গীতে। শরীর যতটা গরম রাখা যায়। এর মধ্যেই চলে সারাদিনের কাজ। এক রুটিনে চলে আবার্ডিনের জীবন।

ছোট্ট শহর। এ শহরে তাই উত্তেজনাও কম। তবে এখানে এসে থেকে অনুভব করছি এ যেন আমার আয়ত্তের মধ্যে। একে জানতে চিনতে পারব। লণ্ডনের মতো বিরাটত্বের মধ্যে এর সব কিছু ধরা ছোঁওয়া হারিয়ে যায় নি।

আবার্ডিনকে ক্রমশঃ বেশ আপনার বলে মনে হতে লাগল। আস্তে আস্তে পরিচয় হতে লাগল এর সমাজের সঙ্গে। পাড়া-প্রতিবেশীরা আমার সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে উঠল। ইঁট দাঁড় করান সাউথ কন্‌স্টিটিউসন্‌ স্ট্রীটটা, এই অঞ্চলটার প্রায় সব দোকানদার আর বেকার বুড়োগুলোর মুখ আমার চেনা হয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকলে দুদিক থেকে আপ্যায়ন পাই। কেউ কেউ সামনে পড়লে রাস্তার উপরেই দুদণ্ড কথা বলে নেয়। তা সে যা কিছু নিয়েই হোক না কেন।

রাস্তার উপর প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হয় মিস্টার ডবসনের সঙ্গে। ছিয়ানব্বই বছরের বুড়ো। চোখে এই পুরু লেন্স। তবু বোধ হয় কিছুই দেখতে পায় না মিঃ ডবসন। ঠুক ঠুক করে ফুটপাতের উপর দিয়ে হাঁটে।

মোড় পর্যন্ত পেঁছিতে তার লাগে অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা। বুড়ো চলে আর দাঁড়ায়।

মিঃ ডবসনকে দেখলেই আমি গুড উইস্ করি। ডবসন তার হাই পাওয়ারের আড়ালে চোখ দুটোকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে তাকায়। বীভৎস লাগে।

দাঁত পড়ে যাওয়া মুখটা আরও বেশী হাঁ হয়ে যায়। গুড উইস্ জানিয়ে একটু হেসে ফেলে। বলে, আজ এত সকাল সকাল যে বোধি।

অবশ্য এ প্রশ্নটা বুড়ো রোজই আমাকে করে। তারপরেই বলে, দেখ তো কটা বাজল—বলে ট্যাঁক থেকে গার্ড-চেনে আটকানো কোন মান্ধাতার আমলের এক পকেট ওয়াচ বার করে সামনে ধরে। সময়টা বলি আর বলি, তোমার ঘড়ি যে দেখি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বলে মিঃ ডবসন—

খুব খুশী হয় ডবসন। হাত তুলে একটু দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে। তারপর বহুবার বলা সেই গল্পটা আবার আমাকে শোনায়। গলা কেঁপে যায় বুড়োর। তবুও অনর্গল বকে যায় বুড়ো ডবসন।

—সে সেই লর্ড ক্যাম্বারল্যাণ্ডের আমলের কথা। সেই যে গো যাকে তোমাদের দেশে বলত কুম্ভীরসায়েব। এদিকে হয়েছে কী বৃটীশরাজ ব্যাটেলিয়ানের পর ব্যাটেলিয়ান পাঠাচ্ছে। ভরতপুরের দুর্গ যেমন তেমনি রয়ে যাচ্ছে। তার কেউ কিছু করতে পারে না। এমন ভয়ানক দুর্ভেদ্য সেই দুর্গ। ভারতীয় জ্যোতিষীরা গুনে বলেছিল, যখন দুর্গের খালে কুমীর আসবে—তখনই জানবে দুর্গের পতন হবে। কিন্তু ক্যাম্বারল্যাণ্ড সেই দুর্গ শেষ পর্যন্ত জয় করল। লোকে বললে সায়েব কুম্ভীরসায়েব বলেই একাজ করতে পারলে—হা-হা-হা। যখন আমি ইম্পিরিয়াল সার্ভিস গ্রুপ-এ ছিলাম তখন এই গল্পটা শুনেছিলাম। সেকি আজকের কথা ? আমাকে কমাণ্ডার সব সময়ে 'নম্বর ওয়ান' বলে ডাকত। আমার গতি ছিল ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়।

একটু থেমে বুড়ো ডবসন বলে, উঃ কী ঠাণ্ডাই না পড়ছে দিন দিন। আমার আবার বড্ড বাত কী না। দেখ না পা-টা নাড়তেই পারিনে। তা তোমাদের দেশে বাতের ওষুধ বেশ ভাল পাওয়া যায়—বুঝলে হে। একবার একজন সৈন্যের হাঁটুতে বাত হল। সে একটা লোক ডেকে নিয়ে এলো। লোকটা একটা গরুর ফাঁপা শিং তার হাঁটুতে বসিয়ে মুখ দিয়ে চুষতে লাগল। এমন চোষা চুষল যে দেখি পরে সে জায়গায় বদরক্ত বেরিয়ে গেছে। আশ্চর্য। লোকটার বাত সেরে গিয়েছিল।

আর দেখা হয় বুড়ী মিসেস ওগিলভির সঙ্গে। তারও অবস্থা ডবসনের মতো। এক পায়ে গোদ। তবুও তাকে হাট-বাজার, দোকান-পশার সব করতে হয়। বুড়ীর সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করে, ফুইরিয়ে ডিন (হাউ ডু ইউ ডু ?) বলেই আধা গ্যালিক আধা ইংরাজীতে মেশান ভাষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করে যায়। শেষে বলে, আর পারিনে বয়। স্বামী গিয়েছে অনেকদিন। ছেলে-

মেয়ে সব আছে—তবুও তারা একবার উঁকি দিয়ে দেখে না। এই দ্যাখো না সেদিন জ্বরের ধমকে খাট থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তা কতক্ষণ যে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম বলতে পারিনে—তুমি একদিন বিকেলে আসবে আমার ওখানে—একটু চা খাবে? ভাল প্যান কেক তৈরী করেছি।

এরা ছাড়াও রাস্তায় আছে কতকগুলি চিরস্থায়ী জীব। যাদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরা দলে ভারী। প্রায় জন-পনেরো-ষোল। ফুটপাথেই এদের সব। খেলা-ধুলো নাচ-গান। এদের মধ্যে চার-পাঁচ বছর থেকে আছে বারো-তেরো অবধি। ছেলে এবং মেয়ে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই এরা দূরে থেকে হাত তোলে।—গুড্ মর্ণিং—কোনদিন পকেট থেকে চকোলেট বার করি। কোনদিন শুধু গালে টোকা মেরে আদর করে এগিয়ে যাই।

পাশের বাড়ির মিসেস ম্যাকফারসনের পাঁচ বছরের ছেলেটি খুব টগরা। বলে, কোথায় তোমার বাড়ি? বলি, ইণ্ডিয়াতে। ছেলেটা আঙুল দেখিয়ে বলে, ইউ আর ব্ল্যাকি। আমিও তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি, ইউ আর হোয়াইটী—

ছেলেটা থতমত খেয়ে চমকে যায়। আমি হো-হো করে হাসতে থাকি। আশপাশের ছেলে-মেয়ের দল আমাদের ঘিরে মজা দেখে।

বড় একটা দশ এগার বছরের মেয়ে বলে, বেশ বলেছ মিস্টার—

মেয়েটা বিধবা মিসেস জনস্টনের। ভাসা ভাসা চোখ দুটি। কিন্তু মুখে আর চেহারায় সব সময়ে তার কেমন একটা রুগ্ন ছাপ লেগে থাকে। বোধ হয় মিসেস জনস্টনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয় বলেই।

মেয়েটা কিন্তু ভারী বুদ্ধিমতী। ঐ দলের ভেতরেই সে বুদ্ধির জোরে সবাইকে চালায়।

একদিন দেখি ফুটপাথে দড়ি টাঙিয়ে ওরা যেন কী একটা করছে। একটা বুড়ো এই নিয়ে হাঙ্গামা লাগিয়েছে। একটা ছোট বছর দশেকের ছেলেও তার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করছে। এমন সময় মেয়েটা সেখানে হাজির। বুড়োর কাছে গিয়ে তার হাত ধরে দড়িটা লাফিয়ে গেল। তার বললে, এটুকু করে ঝামেলাটা বাঁচিয়ে যাও না গ্র্যাণ্ড-পা। বাচ্চারা একটু খেলছে তাতে বাধা দাও কেন?—যেন কতকালের বুড়ী।

আবার্ডিনের জীবন চলে বিচিত্র গতিতে। সাগরের ঢেউয়ের উপরকার রূপটা যেমন চঞ্চল—তেমনি নীচে তার স্রোতবেগ অনেক কম—অনেক ঢিমে। আবার্ডিনেরও তাই। কর্মচঞ্চল আবার্ডিনকে চোখে পড়বে এক নজরেই। আবার তার আড়ালে একটা ঢিমে তেতালায় জীবন স্রোতও যে চলে সেটা বুঝতে কিছুটা গভীরে যেতে হয়।

বৃদ্ধদের জীবনের স্রোত এখানে প্রায় থেমে এসেছে বললেই চলে। কেউ তাদের পোঁছে না। কেউ তাদের সহানুভূতি দেখায় না। তারা সব কাজের

বাইরে। তাই ওল্ড এজ্ পেন্সন্ সম্বল করে—আর কবরখানার হাতছানির দিকে তাকিয়ে তাদের দিন কাটে।

না, বার্ধক্যের স্থান নেই এদেশে। জরা এদেশের পাপ—এদেশের লোকলজ্জা। বুড়োরা তাই চোখে চশমা হাতে পুরু লেন্স নিয়ে লাইব্রেরীতে সারা দিন বসে থাকে। কখনও ঝিমোয় কখনও পড়ে। কী যে পড়ে তা কেউ বলতে পারবে না। যা পায় তাই পড়ে। হয়তো বা কিছুই পড়ে না। ছানিপড়া চোখে ঘড়িটা পর্যন্ত দেখতে পায় না। তবুও নিজের খাবারের জোগাড় নিজেকে করতে হয়।

বাতে আর জরাতে জীর্ণ শরীর টেনে টেনে চলে মিঃ ডবসন আর মিসেস ওগিলভির দল। রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেলে—কবর দেবার জন্য আছে সরকার। কিন্তু তার আগে কেউ চোখে দেখবে না। এদের প্রাণধারণের সংস্থান আছে, কিন্তু নেই কোন প্রাণরস। নেই স্নেহ, নেই মমতা, ভালবাসা। নাতী-নাতনী, ছেলে, ছেলের বৌ নিয়ে শ্রদ্ধা আর আদর যত্নে কাল কাটাতে কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধাই এখানে বড় একটা পায় না। সংসার তাদের মরুভূমি।

ভাবি, মৃত্যুর দরজায় এসে এই ভয়াবহ সঙ্গীহীনতা ওদের মৃত্যু বিভীষিকাকে কী ভীষণভাবেই না বাড়িয়ে দেয়।

সেদিন পামেলার কাছেও সেই কথাই শুনলাম। মিস্টার মরিসনের বুড়ো বাপ নাকি এই রাস্তায় একটা বাড়িতে একলা থাকত। কয়েকটা বাড়িরই ব্যবধান। কিন্তু ছেলে-বৌ তাকে উঁকি দিয়ে দেখত না পর্যন্ত।

একদিন রুটি কিনতে গিয়ে বুড়ো বরফের উপর পা পিছলে পড়ে গেল। সর্বশরীর তার ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। বুড়োকে ধরাধরি করে লোকে এনে দিয়ে গেল মিস্টার মরিসনের কাছে।

পামেলা বললে, যে ঘরে তুমি রয়েছ সেই ঘরে, যে খাটটায় তুমি শোও সেই খাটের উপর তাকে শোয়ান হল। বুড়ো মুখটা থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। মুখটা একেবারে থেঁতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মরিসন কর্তা-গিন্নী স্থির করেছিল পরের দিন সকালে হাসপাতালে দেবে। কিন্তু ভোরে ঘর খুলতেই শোনা গেল বুড়োর গলায় কী-রকম একটা বীভৎস ঘড় ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। আমি সামনে যেতে আমার কাছে একটু জল চাইলে। জল দিলাম। বুড়ো দুঢোক খেতে খেতেই মরে গেল। কী ভয়ানক দৃশ্য। আমার মনে হলে এখনও ভয় হয়—বলে পামেলা কেঁপে উঠল।

ইতিমধ্যে দরজা ঠেলে শ্যামল ঘরে এসেছে। বললে, আজ আর বার হচ্ছিনে দাদা। বেশ ভাল করে একটু আগুন কর তো পামি।

পামেলা আগুন করবার জন্যে কয়লা আনতে বাইরে গেল। ফিরে এল কয়েকটা কাঠের কুঁদো নিয়ে। মুখখানা বিষণ্ণ।

শ্যামল বললে, কী গিন্নী কয়লাও কন্ট্রোল করছে নাকি এই শীতে—

সকাল থেকেই আজ কুয়াশা জমেছে বাইরে। ধোঁয়াটে অন্ধকারে সারা শহরটা ছেয়ে গেছে। আমার বেসমেন্টের ঘরে অন্ধকার আরও জমাট বেঁধেছে। ঘরে আলো জেবলে বসে আমরা গল্প করছি লাঞ্চের পর। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল।

কম্ ইন্ প্লিজ—বলতেই ঘরে ঢুকল মিঃ মরিসন।

ভারী পায়ে ঘোৎ ঘোৎ করে ঘরে ঢুকেই দরজার পাশে আলোর সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, দিনের বেলাতে এত আলো জবালালে বেশী ঘরভাড়া দিতে হবে। ইলেকট্রিক এখানে বড় আক্রা—বলে আমাদের দিকে একটু নড করে বেরিয়ে গেল।

শ্যামল রাগে ফেটে পড়ল—ছোট লোক, ছোট লোক। না না কিছুতেই আর এখানে থাকা যায় না। চলুন দাদা উঠুন। বাড়ি দেখতে বার হব এখনই।

পামেলার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে চুপচাপ বসে রইল।

শ্যামলকে বললাম, চটছো কেন বসো। বাড়ি দেখা হবে এখন।

শ্যামল বললে, আপনি থাকুন আমি এই চললাম—

বলেই উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। রাগলে শ্যামল কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারে না।

এতক্ষণে পামেলা আবার কথা বললে। আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, মিটার এবাড়ি থেকে হয়তো আজকালের মধ্যেই চলে যাবে দেখো। রোজই আজকাল ও ঝগড়া করছে কর্তা-গিন্নীর সঙ্গে। আজ তো ও খুবই চটেছে। বোধি, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বল না ঝগড়া না করতে—

আমি বললাম, ও গেলেই বা তোমার তাতে কী—

পামেলা মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিলে—বারে, আমার তাহলে যে বড্ড খারাপ লাগবে। বড্ড মন কেমন করবে—

বললাম, মোটেই না। ওতো তোমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে। ওর জন্যে তোমার মন কেমন করতে যাবে কেন ?

পামেলা মুখ নীচু করে আমার হাতে হাত রগড়াতে রগড়াতে বললে, ও আমাকে ভালও বাসে খুব। আর আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারব না। বলেই আমার পিঠে মুখ ঢুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

শ্যামল আর পামেলার মেশামেশির ফল যে এমন হবে তা ভাবি নি। আগে ওদের ছেলেমানুষীটাই আমার চোখে পড়েছে। এখন দেখলাম ব্যাপারটা বেশ গভীরেই পেঁৗচেছে।

একটু রাত করেই শ্যামল আমার ঘরে ঢুকল। বললে, দাদা, বাসা ঠিক করে এলাম—বন্ এ্যাকরড্ টেরাসে। বেশ বাড়ি। চলুন আমরা সেখানে রান্না করে খাব। খরচ অনেক কম পড়বে। বললাম, বসো, অনেক কথা আছে—

শ্যামল বললে, এর মধ্যে কথা আবার কী ? এ রকম চামারের বাড়ি আমি থাকতে পারব না—

—কিন্তু পামেলা যে একটু আগে বলে গেল আমাকে, তোমার সঙ্গে ঝগড়া না হলে সেও থাকতে পারবে না—তার কী ?

শ্যামলের মুখটা ঝট্ করে শুকিয়ে গেল। দাঁড়িয়েছিল সে খাটটার পাশে, ধপ করে বসে পড়ল তার ওপরে।

আস্তে আস্তে বললে, কি করি বলুন তো দাদা। মেয়েটাকে আমিও যে বড্ড ভালবেসে ফেলেছি। আমি সুমতি দিদির কাছে লিখেছিলাম ওর কথা। তিনি কিন্তু অন্য কথা বলেন। বলেন ও-সব দিকে মন না দিয়ে কাজকর্ম শেষ করে দেশে চলে এসো। আরে মন কী অমনি দিই। আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, বন্ধু নেই। আমার যে কাটবে কেমন করে সে কথা তো কেউ বোঝে না। শুধু কাজ কর কাজ কর করে উপদেশ ঝাড়ে। শেষে সুমতি দিদিও যে ঐ রকম ধরনে চিন্তা করতে আরম্ভ করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

তা ছাড়া মিসেস বেকশ্নি আর পামেলাকে দেখলে আমার ভারী কষ্ট হয়। তাই ঠিক করেছি ও একটু বড় হলেই ওকে আমি বিয়ে করব। কী ইনোসেণ্ট দেখেছেন দাদা—ওর বয়সী মেয়ে এত সরল এদেশে পাবেন না। তাই তো ওকে আমি এত ভালবাসি।

বললাম, আর কটা দিন এখানে থেকে একেবারে ক্রীসমাস পার করে নতুন বছরে বাড়ি পাল্টিও—বুঝলে।

শ্যামল চিঁচিঁ করে বললে, আচ্ছা তাই হবে।

॥ ১২ ॥

কোন লোক যে এতো অল্পেতে চটে ওঠে আর এতো অল্পেতে নরম হয় এ ডক্টর রোজকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

ডক্টর রোজের নাম জানে না আবার্ডিনে কেন স্কটল্যাণ্ডে এমন লোক বিরল। তবে তিনি সিলভার রোজ নামেই আপামর সাধারণের কাছে পরিচিত। এ নামের কারণ হল তাঁর মাথার আজন্ম পাকাচুল। সেদিন সকালে শুদ্ধসত্বর সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। শুদ্ধসত্ব বলেছিল, এদেশে যখন এসেছ তখন এখানকার প্রাচীন ইতিহাস তোমার জানা দরকার, শোনা দরকার।

আর সেজন্যেই আজ সকালে আমরা এসেছিলাম ডক্টর রোজের কাছে। অবশ্য শুদ্ধসত্বের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল।

ডক্টর রোজের এণ্ডারসন ড্রাইভের বাড়ির দরজায় গিয়ে কলিং বেল টিপতেই

একটি মোটা মতো মহিলা কোমরে এ্যাপ্রণ জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। আমাদের দেখেই তাড়াতাড়ি নেমে এসে—হ্যালো ডক্টর, সুপ্রভাত—কেমন আছ—বলতে বলতে শুদ্ধসত্ত্বের হাত জড়িয়ে ধরলেন।

শুদ্ধসত্ত্বও পরম ঘনিষ্ঠভাবে মহিলাটির হাত জড়িয়ে ধরল। আমার পরিচয় পেশ করে মহিলার পরিচয় দিয়ে বললে, ইনি হলেন মিসেস রোজ—মিসেস রোজ এসে আমার করমর্দন করলেন।

শুদ্ধসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর রোজ বাড়িতে আছেন ?

মিসেস রোজের মুখ এবার শুকিয়ে গেল। বললেন, খবরের কাগজে এক প্রবন্ধ লিখেছেন প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর তাই দেখা থেকে চটে কাঁই হয়ে আছেন। ভাল করে ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত করলেন না।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, তাই নাকি ? চলুন তো দেখি কী রকম রেগেছেন—

মিসেস রোজ আমাকে আর শুদ্ধসত্ত্বকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। বাইরের ড্রইং রুমে কোন লোক দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল গণ্ডা কতক খবরের কাগজ এখানে ওখানে ছড়ান।

মিসেস রোজ এদিক ওদিক দেখে বললেন, এইতো এখানে ছিলেন। দেখি বাড়িতে আছেন কী না—বলে ভিতরে ডুব মারলেন। কিছুক্ষণ পরে বার হয়ে এলেন। বললেন, আসুন ডক্টর, ভিতরে আসুন।

আমরা দুজনে দুখানা ঘর টপকে বাড়ির পিছন দিকটায় চলে এলাম। সেখানে নানা রকম গাছে ঘেরা ছোট্ট এক টুকরো বাগান। সেই বাগানের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড হলঘর। তারই মধ্যে আমরা এসে ঢুকলাম। সারা ঘরটা নতুন পুরোনো নানা বইয়ে ঠাসা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তি, লাঠি, বল্লম, তীর-ধনুক, ক্রসবো। আছে বন্দুক, পিস্তল। কয়েক রকমের ঘড়ি একদিকে জমা করা। একদিকে কতকগুলো মাটির পাত্র, ধাতু পাত্র। সব কিছুর উপর একটা কেমন প্রাচীনত্বের ছাপ। দেখলে মিউজিয়মের কথা চট করে মনে হয়। সেই সব স্তূপীকৃত জিনিস, কাগজপত্র আর বইয়ের গাদার ফাঁকে দেখতে পেলাম শুধু পাকা চুলে ভরা মাথার একটা অংশ।

শুদ্ধসত্ত্ব সেই সব পুরোন জিনিসের কাগজপত্রের স্তূপ টপকে আমাকে নিয়ে অগ্রসর হল। মিসেস রোজ ঘরের দরজা থেকেই বিদায় নিলেন। ভিতরে এসে দেখলাম একটি বেঁটে খাঁটো ভদ্রলোক একরাশ পাকা চুলে ভরা মাথাটা নীচু করে একটা বিরাট বইয়ের পাতায় নিবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। আমরা যে ঘরে ঢুকেছি সে শব্দ তাঁর কানে পেঁাছায় নি।

শুদ্ধসত্ত্ব সটান গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বললে, গুড মর্নিং ডক্টর রোজ।

বেশ স্পষ্ট দেখলাম ডক্টর রোজ ভুরু কুঁচকে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে শুদ্ধসত্ত্বের

মুখের দিকে চাইলেন। উইস্‌টা ফিরিয়েও দিলেন না। একটুখানি নিরীক্ষণ করে শুদ্ধসত্ত্বের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেই থাকতেই দেখলাম তাঁর মুখের বিরক্তির ভাবটা অনেকটা কমে গেল। তবুও সম্পূর্ণ গেল বলে মনে হল না। এবার তিনি কথা বললেন।—ডক্টর রে এলেন কখন—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, এইমাত্র আসছি। অবশ্য টেলিফোন করে সময় ঠিক করে আসাই আমার উচিত ছিল—

এবার ডক্টর রোজ যেন অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, না না সেকি। আপনি হলেন ডাক্তার। বিশেষ করে আমি যখন আপনার রুগী তখন যখন খুশী আপনি আমায় দেখতে আসতে পারেন। কিন্তু পাজী লোকগুলো আমায় ভাল থাকতে দেবে না—বলতে বলতে প্রায় গর্জন করে উঠলেন ডক্টর রোজ।

—জানেন তো অব্যাপারেষু ব্যাপারম্‌ আমি আদবে সহ্য করতে পারি না। তাই আমি এডিনবরা ইউনিভার্সিটির কাজই ছেড়ে দিয়ে এলাম। সত্যের ব্যাপারে, গবেষণার ব্যাপারে কারুর সঙ্গে আমি আপোষ করতে রাজী নই। তুমি দর্শনের অধ্যাপক আছ, বেশ ভাল কথা, দর্শন পড়াও যত খুশী। দার্শনিকের বুলি কপচাও দিনরাত আমি কিছু বলতে যাব না। কিন্তু গ্যালিক্‌ ভাষার তুমি কী জান হে যে কাগজে মন্তব্য করতে যাও ? এই দেখুন না কী রকম বোকার মতো সব কথা লিখেছে—

বলতে বলতে একটা খবরের কাগজের পাতা ডক্টর রোজ মেলে ধরলেন শুদ্ধসত্ত্বের সম্মুখে। আমি চুপচাপ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত লোকটাকেই দেখছি। লোকটার কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্রও কৌতূহলও নেই।

শুদ্ধসত্ত্ব এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজের উপর। তারপর সবটা পড়ে নিয়ে বললে, না-না প্রোফেসর ম্যাকিন্টরের মতো বিদগ্ধ দার্শনিকের এভাবে কথা বলাটা আদবে উচিত হয় নি। বিশেষ করে যখন তিনি নিজে ভাষাবিদ্‌ নন। এ প্রবন্ধটা দেখে অনেকটা ছেলে মানুষের লেখা বলে মনে হয়। অন্ততঃ প্রবন্ধে ছেলে মানুষী যে যথেষ্ট করা আছে তার প্রমাণ প্রচুর। এতে আপনার মতো লোকের নজর দেওয়াটাও উচিত হবে কিনা সেইটাই ভাববার কথা।

দেখি ডক্টর রোজের মুখের ভাব কখন পাল্টে গেছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে ডক্টর রোজ হো হো করে হাসতে লেগেছেন। ঠিক বলেছেন ডক্টর, বুড়ো বয়সে ছেলে মানুষী। নইলে বলে কিনা গ্যালিকভাষা যে বলে সেই-ই অসভ্য। ওটা হল অসভ্যদের ছাপ। আসলে নিজে গ্যালিকের 'গ' ও জানে না কিনা তাই।—বলে হো হো হাসতে লাগলেন ডক্টর রোজ।

শুদ্ধসত্ত্ব ঠিক আসল জায়গাতেই ঘা দিয়েছে। ডক্টর রোজ হাসি থামাতেই শুদ্ধসত্ত্ব বললে, ইনি হলেন আমার বন্ধু বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। এসেছেন ভারতবর্ষ

থেকে। বাড়ি কলকাতায়—

বাধা দিয়ে ডক্টর রোজ বললেন, কলকাতার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের আত্মিক সম্পর্ক আছে—খবর রাখেন কী ? বলে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন।

বললাম, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন—

ডক্টর রোজ মৃদু মন্দ হাসি হাসতে হাসতে বললেন, বৃটেন তা ইংলণ্ড হোক বা স্কটল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডই হোক সে যে ভারতের শোষক এই ধারণাই ভারতবাসী সাধারণতঃ করে থাকে। অবশ্য কথাটা যে খুবই সত্যি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু এক এক জন এদেশী সেই শোষণের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন ওদেশের লোকদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে। তাঁরা রাজ্যশাসন বুঝতেন না। বুঝতেন মানব হৃদয়ের অনুশাসন। আপনি কী ডেভিড হেয়ারের কথা শোনেন নি ? অতবড় মানব প্রেমিক এযুগে বিরল। হেয়ার গিয়েছিলেন কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা করতে। হয়ে গেলেন বেঙ্গল রেনেসাঁর একজন বড় আহ্বায়ক। বাঙালীর জন্য তিনি অর্থ দিয়েছেন, বিদ্যা দিয়েছেন। এমনকি প্রাণ পর্যন্ত—

বললাম, বাঙলার চিরস্মরণীয় লোক তিনি। তাঁর কাছে বাংলার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁকে বাঙালী কোনদিন ভিন্ দেশী বলে ভাবে নি।

ডক্টর রোজ বললেন, এই হল খাঁটি স্কটের প্রকৃতি। সে একসঙ্গে স্বদেশ প্রেমিক আর বিশ্ব প্রেমিক। আপনি বোধ হয় নতুন এদেশে এসেছেন। তাই আপনাকে প্রথমেই অনুরোধ করছি যদি অজ্ঞ অন্ধ সাদা লোকের কাছ থেকে কোন ঘৃণা বা কোন অন্যায় আচরণ পান তবে তাকে ক্ষমা করবেন ডেভিড হেয়ারের নামে।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, বাঙালী কবি ডেভিড হেয়ারের সম্বন্ধে যে প্রশস্তি গেয়েছেন—তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর ওপর বাঙালীর মনোভাব।

বলে সত্যেন দত্ত মশাইয়ের সনেটটা গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল শুদ্ধসত্ত্ব—

দুর্গতি দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মতো
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ শুভ্র জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে।
জন্মি খৃষ্টান কুলে খৃষ্ট নামে তরাতে তরিতে
চাও নাই। ···তুমি হে নাস্তিক, তুমি নর সেবাব্রত।

গমগম্ করে বাজতে লাগল শুদ্ধসত্ত্বের গলার আওয়াজ। চল্‌তে লাগল আবৃত্তি।

চোখ বুজে আবৃত্তি করছে শুদ্ধসত্ত্ব। শেষে এসে পড়ল শেষের দুটো ছত্রে—

মনুষ্যত্ব-ধর্মে পূত—হে নাস্তিক ! আস্তিকের গুরু।

শুদ্ধসত্ত্ব চুপ করতেই ডক্টর রোজ বললেন, চমৎকার কবিতা। কিন্তু

কিছুতো বুঝলাম না। ডক্টর আপনার কণ্ঠস্বরের লালিত্য, কাব্যের ব্যঞ্জনাটুকু উপলব্ধি করতে সাহায্য করল।

শুদ্ধসত্ত্ব তখুনি কবিতাটা ইংরাজীতে অনুবাদ করে শোনাল।

ডক্টর রোজ দু চোখ বুজিয়ে উপভোগ করলেন কবিতার প্রতিটি শব্দ। চোখ খুলে বললেন, এই অনুবাদটা আবার্ডিনের ইউনিয়ন স্ট্রীটের চৌমাথার উপর যেখানে কবি বার্নস্-এর স্ট্যাচু আছে সেখানে পাথরের ফলকে খোদাই করে বাঁধিয়ে রাখা উচিত। সংকীর্ণচেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে এ বুঝিয়ে দেবে যে মনুষ্যত্বধর্ম দেশ কাল পাত্রের বিচার করে না।

একটু থেমে পরক্ষণেই বললেন, কিন্তু কী চমৎকার কবিতা। তোমরা বাঙালীরা হলে প্রাক আর্য প্রোটো অস্ট্র্যালয়েড আর আর্য জাতের শংকর কিনা। তাই তোমাদের মনে এতো কাব্য, এত শিল্প রস আসে। ভারতবর্ষের আদিম বাসিন্দা প্রাক-আর্যদের রূপসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ, সূক্ষ্ম রস ও কাব্যকৃতি নাকি যথেষ্ট ছিল। অন্ততঃ গর্ডন চাইল্ড আর মর্টিমার হুইলারের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করে একথা মনে হয়েছে। তার সঙ্গে পেয়েছ সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের উত্তরাধিকার। তোমাদের কাব্য যে উৎকৃষ্ট জিনিস হবে তাতে আর সন্দেহ কী?

একটু চুপ করে থেকে ডক্টর রোজ হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার কাছেই আমরা হলাম এই সেদিনের অর্বাচীন। তা প্রাক-আর্য মহেঞ্জোদরো হরপ্পা সভ্যতার কাছে যে আমরা কী—কথা শেষ না করেই আবার হো হো করে হাসতে লাগলেন।

চট করে হাসি থামিয়ে বড় বড় দুচোখে প্রচুর রহস্য ঘনিয়ে এনে ডক্টর রোজ বললেন, তা নয়, হয়েছিল কী জান—বলে তিনি আবার চুপ করলেন।

ইতিমধ্যে মিসেস রোজ ঘরে ঢুকেছেন। হাতে চায়ের ট্রেতে স্যাণ্ডউইচ আর চা। আমাদের সামনে একটা টেবিলে রেখে বললেন, একি সব দাঁড়িয়ে কেন, বসুন আপনারা।

এবার ডক্টর রোজের একটু হুঁশ হল। আরে আরে তাই তো। আপনারা সব দাঁড়িয়ে আছেন। বসুন ডক্টর, বসুন মিঃ মৈত্রেয়—বসুন, বসুন—

আমরা ঘরের এক ধারে গোটা কতক সোফাসেটী দখল করে বসলাম। মিসেস রোজ চা ঢালতে লাগলেন। বাইরে যেটুকু আলো ছিল হঠাৎ কমে এল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তুষারপাত।

ডক্টর রোজ সেদিকে চেয়ে বললেন, তা হলে ডক্টর, আজ আর চট করে বেরুনো আপনার হবে না। ঘর গিন্নীকে বলি। আপনার সেই প্রিয় খাদ্য টোড-ইন্-দি-হোল রান্না করুক। ডিনারটা এখানে সারুন।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কড়ার আপনার সঙ্গে। স্কটল্যাণ্ডের আদি ইতিহাস শোনাতে হবে আমার বন্ধুকে।

ডক্টর রোজ হো হো হেসে উঠে বললেন, এতে কড়ার করার কী আছে। আমি তো বলতেই যাচ্ছিলাম। চা-টা শেষ হোক আবার আরম্ভ করব।

আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই চা খাওয়া শেষ করলাম।

ডক্টর রোজ একটা বিরাট চুরুট ধরিয়ে এসে আমাদের সামনে একটা সোফাতে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন—

—জানেন তো পুরাতত্ত্ব হল একটা বিজ্ঞান। তার কারণ বিজ্ঞানে যেমন তথ্য ছাড়া সত্য নেই এখানেও তাই। এখানে অস্বাভাবিক কল্পনার কোন স্থান নেই। ব্যক্তিগত রাগ, অনুরাগের কোন সুযোগ এখানে নেই। প্রাচীনকে জানতে গেলে, প্রাচীন পদ্ধতির উপর আস্থা রাখতে হবে। প্রাচীন ভাষাকে আয়ত্ত করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা কোন প্রাচীন জিনিসকেই অসভ্য বলে ঘৃণা করা চলবে না। ম্যাকিন্টর কোনদিন পুরাতত্ত্ববিদ্ হতে পারবে না।

শুদ্ধসত্ত্ব বোধ হয় ধারণা করেছিল আবার কোন দিকে ঘোরে ডক্টর রোজের কথা। তাই তাড়াতাড়ি বললে, বৈজ্ঞানিক ভাবে সেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি আপনারা তিনটে ভাগে ভাগ করেছেন না—

ডক্টর রোজ বললেন, হ্যাঁ। সেই কথাই তো বলছিলাম। সবার প্রথমে হল প্রস্তর যুগ, তারপর তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগ, সব শেষে লৌহযুগ। আমরা এখন সেই যুগের সবচেয়ে গৌরবময় সময়ে বাস করছি। এই প্রস্তর যুগও বৈজ্ঞানিকরা আবার তিন ভাগে ভাগ করে দেন—আদি প্রস্তর, মধ্য প্রস্তর আর নব্য প্রস্তর—

এবার তিনি উঠে গিয়ে দেওয়ালে টাঙান অনেকগুলো ছবির থেকে একটাকে নামিয়ে বললেন, এই দেখ। আদি প্রস্তর যুগে ইংলণ্ডের মানুষ—

ছবিতে দেখলাম—বনমানুষের ছাপ লাগা, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, বিস্তৃতহনু, উলঙ্গ—বর্তমান মানব গোষ্ঠীর এক পূর্বপুরুষ একটা বিরাট পাথরের চাঁই তুলে ছুঁড়ে মারছে একটা লোমশ গণ্ডারের দিকে। তারই গৃহিণী—সেও উলঙ্গ, গুটি কয়েক শিশুর সঙ্গে একখণ্ড হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। দূরে ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে চরছে দু একটা ম্যামথ।

ডক্টর রোজ বললেন, এই হল আদি প্রস্তর যুগে দক্ষিণ ইংলণ্ডের মানুষের অবস্থা। স্কটল্যাণ্ডে সে সময়ে মানুষ ছিল না। সমস্তটাই ছিল বরফে ঢাকা।

তারপর একদিন সেই বরফের স্তূপ গলতে আরম্ভ করল। বহু বছর ধরে গলে তারা সমুদ্রের জলকে বাড়িয়ে দিলে। তাই তো স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্র তীর এতো উঁচু। বরফ গলে যাওয়ার পর একদল লোক দক্ষিণ ইংলণ্ড থেকে এখানে এসে বাসা বাঁধল। এই হল মধ্য প্রস্তর যুগের কথা। তারা না জানত কোন ধাতুর ব্যবহার—না জানত চাষ বাস। পশুপালনও তারা জানত না। কেবল জন্তু জানোয়ার পাথর দিয়ে কিম্বা পাথর ঘসা অস্ত্র দিয়ে মেরে, অথবা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে—উদরপূর্তি করত। তাদের সেই সব অস্ত্র সমুদ্রের ধারে ধারে

খুঁজলে আজও পাওয়া যায়। এই দেখুন—

বলে ডক্টর রোজ ঘরের কোণে জড়ো করা কতকগুলো পাথরের স্তূপ ঘেঁটে একটা পাথরের চাঁই এনে আমাদের দেখালেন। দেখলাম মসৃণ করে ঘসা, কতকটা বল্লমে ফলার মতো একটা ভারী চওড়া পাথর।

ডক্টর রোজ হেসে বললেন, এই পাথরটাই কটা ম্যামথ আর লোমশ গণ্ডার মেরেছে তা কি কেউ বলতে পারে? এগুলো, ওবানে, ওরামুসেতে সমুদ্র পিছিয়ে যাওয়াতে পাওয়া যাচ্ছে। সুনার্ট লেকের চারপাশে, ফোর্থ নদীর খাড়ির ধারে, টে নদীর মোহনায় তিমি মাছের কঙ্কালের সঙ্গে এই জাতের মানুষের কঙ্কালও একত্রে পাওয়া গেছে।

—এই সময়ে এই জাতীয় লোক ছাড়া আরও এক দলের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা চকমকি পাথর ব্যবহার করত। তাদের বাস ছিল আয়ার সায়ারের সমুদ্র তীরে। টুইড, টে, ডি নদীর উপত্যকায়। তারা উত্তরে কায়েথলেন সায়ার থেকে অর্কনি দ্বীপ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

শুদ্ধসত্ত্ব পরম আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু তাদের তো আমরা সভ্য বলতে পারি না। আসল সভ্যতার সূত্রপাত কবে কোথায় প্রথম হল—

ডক্টর রোজ বললেন, আসল মানব সভ্যতার সূত্রপাত সর্বপ্রথমে হয় পূর্ব দেশে—মিশর, এশিয়া মাইনর, মধ্যএশিয়া, ভারতবর্ষ ও চীনে। সে অঞ্চলে খৃষ্ট জন্মাবার খুব করেও সাত হাজার বছর আগে—নব্যপ্রস্তর যুগের শুরু। এই নব্যপ্রস্তর যুগেই আমাদের অতি বৃদ্ধ পিতামহের দল সর্বপ্রথম প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সেই যে যুদ্ধ শুরু হল—যাকে আমরা বলি সভ্যতা—তা আজও চলেছে নিদারুণ ভাবে। মানুষ এখন জিতে গেছে—প্রকৃতিকে তার চাকর বানিয়ে ফেলেছে। আজকের যে উন্নততর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা—তার বীজ কিন্তু লুকিয়েছিল সেদিনকার মানুষের মধ্যে। তাদের সেই মাটি খুঁড়ে চাষ বাস করার প্রথম প্রচেষ্টায়। তারপর রোদ বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে গৃহ নির্মাণের পদ্ধতিতে। লজ্জা নিবারণের জন্যে বস্ত্রাদি তৈরীতে। পান-আহারের জন্যে মাটির পাত্র নির্মাণে অথবা সমুদ্রে ভাসবার জন্যে কাঠ চিরে নৌকো বানানোর ব্যাপারে। এই সমস্ত কিছু তারা করে গেছে পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে। আজ ভাবতে পারেন এ কথা—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা বিরাট অন্ধ শক্তি যেন তার অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পাবার জন্যে যা কিছু হাতের কাছে পেয়েছে—মাটি, কাঠ, পাথর—তাই নিয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

রোজ বললেন, যে কথাটা বললেন ডক্টর সেটা একেবারেই মিথ্যে নয়—তবে ওকথাটাকে আরও একটু এদিক ওদিক করলে ভাল হয়। যেমন সেই একই অন্ধ শক্তি আজও অভিব্যক্তির পথ খুঁজে মরছে। আজও পরীক্ষা নিরীক্ষা

করছে এ্যাটম্‌, ইলেকট্রিসিটি আরও অন্যান্য ভৌত পদার্থ নিয়ে—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই বিংশ শতকের শেষার্ধেও কী সেই শক্তি অন্ধ থেকে গেছে ? তা কি আজও পথ খুঁজে পায় নি বলে আপনি মনে করেন ?

ডক্টর রোজ নির্বিকার চিত্তে বললেন, নাঃ আদবেই নয়। যেদিন সে শক্তি অন্ধতা থেকে মুক্তি পাবে—তার দুচোখ খুলবে—সেদিন তার সভ্যতা বিচার-লোপ পাবে। এই পথ খুঁজে মরাই তো হল বৈজ্ঞানিক সভ্যতা।

চুরুটে দুটো টান দিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে ডক্টর রোজ বললেন, ম্যাকিন্টর যদিও গ্যালিক ভাষায় গণ্ডমূর্খ তবুও দার্শনিক হিসাবে ওর বেশ ভাল চিন্তা আছে। ওই আমাকে একদিন বলেছিল, যতদিন না মানুষ এই বস্তুর মধ্যে বস্তুর অতীত প্রাণ শক্তির সন্ধান পাবে ততদিনই সে অন্ধই থেকে যাবে—তা তার স্পেস আর টাইমের উপর যতই অধিকার জন্মাক না কেন। কথাটা ভাববার মত বটে—

বলে একটু গম্ভীর হলেন ডক্টর রোজ। যেন এখনই সেই কথাটা ভাবতে বসলেন তিনি। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই হেসে উঠে বললেন, বলছিলাম ইতিহাস, আটকে গেলাম দর্শনের চড়াতে। এই দার্শনিক লোকগুলো বড় সাংঘাতিক। তাই তো ওদের কিছুতেই আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

শুদ্ধসত্ত্ব ডক্টর রোজের গল্পের খেই ধরিয়ে দিল। বললে, পূব দেশের সভ্যতাই কী এদেশে এসেছিল ? না এদেশ তার নিজস্ব সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগে ?

ডক্টর রোজ হাঁ হাঁ করে উঠলেন।—এদেশে শস্যবীজ কোথায় ? এদেশে জঙ্গল কোথায় যেখানে বুনো গরু ছাগল, ভেড়া পাওয়া যাবে। এ সব দেশ তো বরফে ঢাকা। হয়েছিল কি জানেন ? খৃষ্ট জন্মাবার আড়াই হাজার বছর আগে সেই পূবদেশ থেকে আগন্তুকরা সভ্যতা নিয়ে এল ইংলণ্ডের দক্ষিণে। ততদিনে আপনাদের ওদিকে সভ্যতা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সেখানে তখন প্রস্তর যুগ পার হয়ে লৌহ যুগ চলেছে মাথা উঁচু করে। নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক হাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশে। তাদের শেষ অভিযান বোধহয় হয়েছিল দক্ষিণ ইংলণ্ডে। স্কটল্যাণ্ডে এরা এসেছে আরও অনেক পরে। এই সব লোকরা ছিল—আইবেরিয়ান অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। তাদের রং ছিল শ্যামল, চুল ছিল কোঁকড়ানো।

ব্রোঞ্জ বা তাম্রযুগের মানুষেরা আরও একটু উন্নত হল সভ্যতায়। এরা বাণিজ্য করে তামা, ধুনোর আঠা, এই সব আনতে লাগল এদেশে। কারণ তামা কী টিন এখানে পাওয়া যায় না। আসলে তাম্রযুগের চিহ্ন স্কটল্যাণ্ডে খুবই কম।

কিন্তু এদের এই ধারা পাল্টাল বীকার-মানব গোষ্ঠী আসাতে। এরা এল আক্রমণকারী হয়ে। এদের পর স্কটল্যাণ্ডে আসে আর্ণ-মানব গোষ্ঠী। এরা মৃতদেহ পুড়িয়ে একটা পাথর কী মাটির পাত্রে তার ভস্মটুকু সমাধি দিত। এরা

সব এসেছিল তাম্র যুগে। কিন্তু আসলে যে আধুনিক সভ্যতা তার সূত্রপাত হয় লৌহযুগে। এই লৌহযুগ খৃষ্ট জন্মাবার দুশো বছর আগেও এদেশে আসে নি। সেটা এল তারও পঞ্চাশ বছর পরে। সেই সময়ে কতকগুলি বিজেতার দল স্কটল্যাণ্ডে এসে হাজির হল। এরা যে ভাষায় কথা বলত তার নাম কেল্টিক। সুতরাং এই গোষ্ঠী কেল্ট নামে পরিচিত হল। এরা শুধু নতুন ধাতব যন্ত্রপাতি এনে ফেলল তাই নয়, এরা নতুন পদ্ধতিতে চাষ বাসও শুরু করল। লোহা থেকে হরেক রকম যন্ত্রপাতি তৈরি করে তারা তাদের সমাজের প্রত্যেকটি লোকের কাছে সেগুলি সহজ প্রাপ্য ও সস্তা করে তুলল। বন, জঙ্গল পরিষ্কার হতে লাগল। ছোট ছোট গ্রাম ও শহরের পত্তন হল। পয়ঃ-প্রণালী খনন করা হল। পাথর ভাঙার কাজ, কাঠের কাজ, কাপড় চোপড় বোনার কাজ, আরও অনেক সস্তায়, সহজে, প্রচুর অল্প শ্রমে অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে চলতে লাগল। হাল দিয়ে কেল্টরা জমি চাষ করল। পশু-পালন ত ছিলই। ভেড়াদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পশম পেতে লাগল তারা। তা থেকে অন্নবস্ত্রের উন্নতি হতে লাগল। বয়নশিল্প অধিকতর প্রতিষ্ঠা পেল। কেল্টরা ছিল ভীষণ যুদ্ধপ্রিয়জাত। ঘোড়ায় টানা রথ তারা ব্যবহার করত। অবশ্য সবাই নয়—কেবল দলপতিরাই ঐরকম রথ রাখত। এই কেল্ট জাতের গায়ের রঙ ছিল সাদা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দীর্ঘ, চুল ছিল লাল। এরাই এদেশে আধুনিক সভ্যতার পত্তনীদার বলা যায়। এই কেল্টরা পরে অনেকগুলো শাখায় ভাগ হয়ে যায়। একটা শাখার নাম ছিল মাইলেশিয়ান। এরা স্কোশিয়া বা আয়ারল্যাণ্ডে বাস করত বলে চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে এদের নাম হল স্কট। এদেরও গায়ের রঙ সাদা, চুল বাদামী। আরও একটা শাখা অবশ্য ছিল কেল্টদের। তারা তাদের গা উল্কি দিয়ে নানান রঙে রাঙিয়ে রাখত। রোম্যানরা তাদের নাম দিয়েছিল পিক্ট্। ৪৩ খৃষ্টাব্দে রোম্যানরা ইংলণ্ড জয় করে তাদের সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ বলে ঘোষণা করে। এই সময় থেকেই এদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ শেষ হয়ে ইতিহাসের পত্তন হয়। এরও চল্লিশ বছর পরে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের শ্বশুর এগ্রিকোলা তাঁর সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে এসে পড়ে। তার নৌবহর গ্রেট বৃটেনের উত্তর ভাগ ছেয়ে ফেলে। তারপর মনস্ গ্রেপিয়াস্-এর যুদ্ধে সে বৃটনদের পরাজিত করে তার রাজত্বের পত্তন করে।

একটানা কথা বলার পর ডক্টর রোজ থামলেন। আমরা দুজনে একান্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলাম। হঠাৎ ডক্টর রোজ ঘড়ির দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলেন—ওহো, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। বেলা প্রায় সওয়া একটা—

ঠিক সেই সময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল ঝনঝন করে। মিসেস রোজ বেরিয়ে এসে বললেন, ডক্টর রে, আপনাকে কে টেলিফোনে খুঁজছে।

শুদ্ধসত্ত্ব গিয়ে ফোন ধরল। মিনিট দুই পরে ফিরে এসে বললে, আমায় মাফ করুন ডক্টর রোজ। আপনাদের সঙ্গে ডিনার খাওয়া হল না। এক্ষুনি আমায় যেতে হবে। একটি রোগীর রক্তবমি হচ্ছে। নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।

ডক্টর রোজ বললেন, এক্ষুনি যেতে পারেন—তবে আপনাকে সাবধান করছি, কোনদিন রোগীর রক্তবমি থামাতে আপনার না রক্তবমি হয়।

শুদ্ধসত্ত্ব সেই দারুণ তুষারপাতের মধ্যেই বার হয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে ডক্টর রোজ শুধু বললেন, অদ্ভুত লোক—

॥ ১৩ ॥

মনে পড়ল সেই রাতের কথা যে রাতে জিমির মুখে শুনেছিলাম জ্যাকের জীবনের সেই অদ্ভুত ইতিহাসটুকু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কথা ছিল ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে জিমি আর জ্যাকের সঙ্গে বসে কফি খাব আর গল্প করব। কিন্তু সন্ধ্যার টীতে বসতে যাবার আগেই জ্যাকের টেলিফোন পেলাম। অদ্রের 'ফ্লু' হয়েছে—কাজেই সে ঘর থেকে বার হতে পারছে না। জিমিকেও সে টেলিফোন করেছিল। তাকে বাড়িতে পায় নি। সুতরাং যেন আমি ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে যথারীতি গিয়ে জিমিকে জ্যাকের কথা বলি।

ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে গিয়ে প্রথমে জিমির পাত্তা পেলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। আধঘণ্টা বাদে জিমি এল। এসে আমাকে গুড উইস্ করে জ্যাকের কথা জিজ্ঞাসা করল। বললাম সব কথা।

শুনে জিমি খুব চটে গেল। এমনিতেই সে এসেছে বেশ একটু রঙীন অবস্থায়। বললে, জ্যাকের মতো এমন স্ত্রী-আসক্ত জীব আমি দুনিয়ায় দেখি নি। মেয়েছেলে পেলে যেন ওর দুনিয়া ভুল হয়ে যায়। তাও তো দেখলাম সেদিন। একটা আধবুড়ীর সঙ্গে কোর্টশিপ চালাচ্ছে। ছি-ছি।

আমি বললাম, সে যাই হোক, জ্যাক আমাদের বন্ধু লোক। সে যখন তাকে পছন্দ করেছে তার সম্বন্ধে আমাদের উক্তিগুলো একটু সংযত হলে ভাল হয় না।

জিমি আমাকে প্রায় ধমকে উঠল।—জ্যাককে এ কথা বলবার অধিকার আমার আছে। আমি তার বাল্যবন্ধু—

আমরা দুজনে গিয়ে একটা কোণের টেবিল দখল করে বসলাম। এদিকে আলোটা অনেক কম। সন্ধ্যের হোটেল একেবারে প্রায় ভর্তি। একজন, দুজন, চারজন, এক একদলে বসে কফির আড্ডা জমিয়েছে এখানে সেখানে। জিমি পকেট থেকে একটা ড্রাই-জিনের শিশি বার করে বললে, চলবে ?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—না।

জিমি আর দ্বিরুক্তি না করে শিশিটা মুখের ওপর আড় করে দিলে। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে শিশিটা আবার পকেটস্থ করে বললে, এ জিনিসের আস্বাদ নিলে না জীবনটাই বৃথা গেল তোমার। ওমর খৈয়াম কী বলেছেন জানতো? এক ফ্লাস্ক সুরা আর কয়েক টুকরো রুটি পেলেই জীবনটা কেটে যাবে সুখে। রুটি দুচার টুকরো যাই হোক না কেন সুরার পরিমাণ বেশ বড় একটা ফ্লাস্ক ভর্তি না হলে জীবনই রসহীন। জ্যাক সুরাতে খুব বেশী আসক্ত নয়, নারীতেই তাকে শেষ করবে দেখছি—

বয় কফি দিয়ে গিয়েছিল। ধূমায়িত কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জিমি বেশ খানিকক্ষণ ঝিম মেরে রইল। বুঝলাম নেশাটা ওর বেশ জমে এসেছে। কিছুক্ষণ পরে রক্তচক্ষু মেলে জিমি আমার দিকে তাকাল। তারপর রুক্ষ ভাষায় বললে, ওর সঙ্গে তুমি তো মিশছো মাত্র কটা দিন। আমি ওকে জানি ওর তের বছর বয়স থেকে। এই আবার্ডিনের কনভেণ্টে যখন ও এসে ভর্তি হল তখন থেকে। তারপর অক্সফোর্ডেও একসঙ্গে আমরা পড়াশুনো করেছি। গোড়া থেকেই দেখছি ওর একটা সেক্সুয়াল পারভারসন্ আছে। যত রাজ্যের বস্তাপচা মেয়েছেলের সঙ্গে ওর ভাব ভালবাসা জমে। এই মেয়ে মানুষটা তো শুনি দুদুটো পুরুষের ঘর করেছে। এটা তো সবারই জানা। আরও যে কত পুরুষের সঙ্গে কত রাত কাটিয়েছে তার হিসেব হয়তো কেউই জানে না।

বললাম, তা হোক। জ্যাকের মতো দরাজ মনের লোক খুব কম দেখেছি—

জিমি একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে গম্ভীর ভাবে বললে, দরাজ না হাতি। আসলে বোকা। যতবার আমি টাকা ধার চেয়েছি ওর কাছ থেকে বিনা প্রশ্নে ও আমায় দিয়েছে এবং ফেরত চায় নি। এখনকার দিনে টাকা ধার দিয়ে ফেরত না চাওয়ার মতো বোকামী আর কী হতে পারে? তবে কে জানে এই মেয়েছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হলে ও আর আমায় টাকা ধার দিতে পারবে কি না? এখন থেকেই তো এ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করতে শুরু করেছে।

এতোক্ষণে বুঝলাম জিমির রাগের কারণ। তবুও একটা কৌতূহল মনের মধ্যে মাথা চড়া দিয়ে উঠল। জ্যাকের অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতে। বললাম, জ্যাক যে সমস্ত মেয়ের সঙ্গে মিশেছে তাদের সবাই যে বস্তাপচা একথা তোমায় কে বললে—

জিমি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রক্ত চক্ষু মেলে আমার দিকে এমন-ভাবে তাকাল যেন সে আমার এই অজ্ঞতা কিছুতেই ক্ষমা করবে না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ভীনার গল্প শুনেছ?

—না।

জিমি বললে, তাই জ্যাকের সম্বন্ধে অত বড় বড় কথা বলছ। শুনলে

বুঝতে জ্যাক কী চরিত্রের লোক। তার ওদিকটা তুমি কিছুই জান না। জানলে থুথু ফেলতে তার নামে—

হিহি করে একটা কুৎসিত হাসি হাসতে হাসতে সে বললে, ভীনার মতো মেয়ে দিয়ে যার সেক্স-এ হাতেখড়ি—তার বরাতে বউ হিসেবে বত্রিশ হাত ফেরতা বুড়ী ছাড়া আর কি জুটবে বল ?

বারবার এই কথাটার পুনরাবৃত্তি সত্যি সত্যি আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। আর একটু আগে জ্যাকের সম্বন্ধে জিমি যা মন্তব্য করল সেটাও খুব প্রীতিপ্রদ লাগল না। তবুও সে সব চেপে গিয়ে জিমিকে বললাম, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো ভীনার গল্পটা আমায় বলতে পার। শুনে বুঝব জ্যাক কী চরিত্রের লোক।

জিমি বললে, পারি। কিন্তু অতক্ষণ বকলে আমার গলা শুকিয়ে উঠবে। তারপর গলা ভেজাবার জন্য কয়েক বোতল বিয়ার জোগাতে হবে তোমায়। কী রাজী আছ ?

—আনন্দের সঙ্গে।

জিমি তক্ষুনি লাফ মেরে উঠে আমায় হাত ধরে টেনে তুললে। প্রায় জোর করেই হোটেল থেকে বার করে নিয়ে এল আমাকে। খুব তাড়াতাড়ি রেলওয়ে ব্রীজটা পার হয়ে গলির মধ্যে একটা পাবলিক বারে আমাকে এনে বসালো। সেখানে জিমি বোধ হয় চেনা খদ্দের। সে গিয়ে বসতেই দোকানের বুড়ো মালিক পিপে খুলে কালো রঙের ফেনায়িত ড্রাফ্‌ট বিয়ার জগ ভর্তি করে তার সামনে ধরে দিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল—তোমায় কী দেব ?

জিমি গম্ভীর মুখে বললে, ও নাবালক। ওকে সাইডার থাকে তো এক গ্লাস দাও—

এক চুমুকে জগটার অর্ধেক করে প্রায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জ্যাকের গল্প বলতে লাগল। কবি-সাহিত্যিক জিমি। গল্প বলার আর্ট তার ভারি সুন্দর। জ্যাকের গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল না এ আমাদের পরিচিত জ্যাক। মনে হচ্ছিল এ যেন আরেকজন গল্পের নায়ক।

জ্যাকের আসার কিছুদিন আগেই জিমি ভর্তি হয়েছিল কনভেণ্টে। পরে জ্যাক এসে ভর্তি হল সেখানে। ছেলেরা শিক্ষকরা সবাই শুনল জ্যাক নাকি সেই বয়সেই অনেক ক্রাইম করে সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। সে একটি চীজ্। জ্যাক মুখ গোমড়া করে থাকে অষ্টপ্রহর। কারুর সঙ্গেই কথা বলে না। খেলাধুলোও করে না। পড়াশুনো না করলেই নয় তাই করে। আর বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ বসে কী ভাবে।

সবাই ভাবল পাড়া গাঁ থেকে এসেছে কিছুদিন এখানে থাকলেই ও সব সেরে যাবে। তা কোথায় কী ? বেশ কয়েক মাস কেটে গেলেও জ্যাকের কোন

পরিবর্তন হল না।

কোন ছেলেই তার সঙ্গে মেশে না। মানে মিশতে ভরসা পায় না।

সেই সময়ে জিমি নিজে থেকে গিয়ে ভাব জমাল জ্যাকের সঙ্গে। প্রথমে তো জ্যাক কিছুতেই মুখ খুলবে না। জিমিও ছাড়বার পাত্র নয়। জিমি জ্যাকের সঙ্গে প্রায় অষ্টপ্রহর লেগে থাকতে আরম্ভ করল। শেষে দুজনে ভাব হয়ে গেল। ভাব হল—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জ্যাক মনের কথা কাউকেই বললে না। এমন কি জিমিকেও নয়।

এমন সময় কনভেণ্টে এক নতুন শিক্ষক এলেন, ফাদার টিসল ডেভিস।

ফাদার টিসল ডেভিসের নজর দু দিনেই জ্যাকের উপর পড়ল। ফাদার ডেভিস জাতে আইরিশ। ভারী আত্মিক আর জীবনরসিক লোক। সত্যিকারের চোখখোলা একটি দরদী মন। ফাদার কয়েক দিন লক্ষ্য করে দেখলেন, জ্যাক কারুর সঙ্গে মেশে না। কথা বলে না। খেলে না। শুধু চুপচাপ বসে থাকে এক জায়গায়। যেন কী একটা ভাবে অহরহ।

ফাদার জ্যাককে প্রতি বিকেলে সঙ্গে করে নিয়ে হেজেল হেডের জঙ্গলের দিকে বেড়াতে যেতে লাগলেন। জ্যাকের সঙ্গে তিনি প্রায় সমবয়সী বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। শেষে এমন হল যে ফাদারকে না হলে জ্যাকের চলত না।

বিয়ারের জগে চুমুক দিতে দিতে জিমি বলতে লাগল, ফাদার ডেভিস তখন থেকেই জ্যাককে কী চোখে দেখলেন বলতে পারি না। তিনি জ্যাককে মায়ের মতো যত্ন করতেন। বাপের মতো শাসন করতেন। ওস্তাদ কারিগরের মতো শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এমনিতে সব ছেলেকেই তিনি ভালবাসতেন—স্নেহ করতেন। তবে জ্যাকের উপর তাঁর স্নেহটা ছিল যেন সব চাইতে বেশী। কিন্তু বললাম না, জ্যাক ছিল একটি চীজ—

একদিন কনভেণ্টে হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। জ্যাককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তার পরের গল্পটা বহু বছর পরে জ্যাকের কাছ থেকে শুনেছি অক্সফোর্ডে। সে অকপটে সব কথাই আমার কাছে বলেছিল একদিন। জ্যাকের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি সেই গল্পটাই তোমায় বলছি শোন। এর জন্যে অবশ্য তুমি আমাকে আরও গোটাকতক শিলিং বেশী দেবে কয়েক বোতল বিয়ারের দাম হিসাবে।

জ্যাক তো ফাদার ডেভিসের সেই অপূর্ব ভালবাসা, কনভেণ্টের নিয়মতন্ত্র সব ফাঁকি দিয়ে একরাতে 'দি আবার্ডোনিয়ানে' চেপে বসল লণ্ডন যাবে বলে। তখন তার বয়স কতই বা হবে তেরো-চোদ্দ বছর।

আবার্ডিন থেকে আসতে ট্রেনে একটা লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল। লোকটা মাঝ বয়সী, পেশায় রাজমিস্ত্রী। সে জ্যাকের সঙ্গে একটু একটু করে গল্প করে তার হালচালের আভাস পেয়ে গেল। জ্যাককে লুকিয়ে আশ্রয় দেবার

নাম করে এনে ফেলল লণ্ডনের ইস্টএণ্ডের এক কুখ্যাত পাড়ায়। একটু থেমে জিমি আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—

তুমি কী সেই পাড়াটা দেখেছ? জায়গাটা যদিও লণ্ডনে তবুও মনে হবে না আদবেই যে তুমি লণ্ডনে আছ।

আমি যে একজন ভারতীয় সে কথা সে ভুলে গিয়েই জিমি বলতে লাগল—সেটা এক অদ্ভুত জায়গা। সেখানে বিলাতী আবহাওয়াটাই আদবে ঢুকতে পায় নি। রাস্তা-গুলিগুলো ঘিঞ্জি তো বটেই—বেশ নোংরা। কদর্য কাদা প্যাঁচ পেঁচে। আর সারা অঞ্চলটা জুড়ে যারা বাস করে তাদের বেশির ভাগই ব্ল্যাকী, নিগার, ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রো। তারা আচার জানে না—আচরণ জানে না। তারা কদর্য ভাষায় গালাগালি করে একে অপরকে, মারামারি করে। গুণ্ডামী রাহাজানি কিছুই বাদ নেই সেই পাড়ায়। সভ্যতার কোন বালাই নেই সেখানকার বাসিন্দাদের। তাই ও রাস্তার ওপর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কৃপাদৃষ্টি সব সময়েই। সেই রাজমিস্ত্রীটা জ্যাককে নিয়ে গিয়ে সেইখানেই তুলল। জ্যাক তো জীবনে কালো লোক দেখে নি। ভাবল ওরা বুঝি কয়লার খাদে কাজ করে। রাজমিস্ত্রীটা বুঝিয়ে দিল ওরা হল পুবের লোক—ব্ল্যাকী, নিগার, অসভ্য, জন্তু-জানোয়ারের জাত। আমরা হচ্ছি ওদের রাজার জাত।

সে জ্যাককে নিয়ে যে বাড়িতে তুলল, জ্যাক দেখল, সেই বাড়ির বেশীর ভাগ বাসিন্দাই ঐ সব কালো লোক।

জ্যাক আমাকে বলেছিল, জিমি আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওরাও আমাদের মতো খায়, কথাবার্তা বলে, গল্প করে, হাসে। ওদের ধরন-ধারণ আমাদের থেকে কিছু তফাত বটে, কিন্তু জন্তুর সঙ্গে ওদের কোন সাদৃশ্য না পেয়ে আমি সত্যিই বড় হতাশ হয়েছিলাম—বলে জিমি মাতালের মতো হা হা করে হাসতে শুরু করে দিল। তারপর গ্লাসে আর একটা চুমুক মেরে বললে পরে ঐ সব কালো লোকদের সঙ্গে জ্যাকের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হল। যে লোকটা জ্যাককে আশ্রয় দিয়েছিল সে তার মস্ত উপকার করল। জ্যাকের পকেট খালি করে যে ক পাউণ্ড তার ছিল, নিয়ে রাতারাতি সে উধাও হল। আর বাড়িওয়ালা পরের দিনই জ্যাককে দিলে গলা ধাক্কা।—হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসির চোটে জিমির চোখে জল এসে গেল। রুমালে মুছে নিয়ে সে বললে, বুঝতেই পারছ জ্যাকের অবস্থা। চোখে সে তখন অন্ধকার দেখছে। দুনিয়ায় যে এমন অসৎ লোক থাকতে পারে তার কোন ধারণাই জ্যাকের ছিল না। সারাদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে লাগল কিছু না খেয়ে। এদিকে আবার পুলিশেরও ভয় ছিল খুব। পাছে ধরে কনভেণ্টে নিয়ে যায়।

পেটের খিদের কাছে দুনিয়ার কিছুই কিছু নয়। দুদিন ডাহা উপোস দেবার পর জ্যাক রাস্তার ধারে একটা পার্কের রেলিংএ মাথা রেখে প্রায় অজ্ঞান

হবার মতো হল। থেকে থেকে উঠতে লাগল তার বমির বেগ। অথচ পেটে কিছুই নেই। সে এক অসহ্য অবস্থা। কয়েকজন লোক পাশ দিয়ে চলে গেল শুধুমাত্র তাকিয়ে।

কিন্তু একজন লোক সে আর এগিয়ে গেল না। জ্যাকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তাকে ধরে তুলে নিয়ে গেল তার পেটিকোট লেনের বাড়িতে। লোকটা কালাআদমী। ঝিঁকুট-কালো তার গায়ের রং। তবে তার মনটা ছিল ভারী ভাল। সে খাইয়ে দাইয়ে জ্যাককে চাঙ্গা করে তুলল। সেইজন্যেই তো জ্যাক কালো দেখলেই এতো গলে যায়।

লোকটার নাম আলিবক্স। বাড়ি তার পূর্ববঙ্গে—সিলেটে। তার কালো কুচকুচে গোলগাল মুখে পাকান এক জোড়া গোঁফ। সে পরত একটা বেগুনী রঙের জ্যাকেট আর টকটকে লাল টাই। তার স্ত্রী একটা প্রকাণ্ড হাতির মতো চেহারার ককনী ইংরেজ মেয়ে।

আলিবক্সের সম্পত্তির মধ্যে একটা ইণ্ডিয়ান সুইটস্-এর দোকান। আর তার সঙ্গে রেস্টুরেণ্ট। ঘরে ইংরেজ স্ত্রীর গর্ভে জন্মান তেরোটা ছেলেমেয়ে। বুঝতে পারছ কী ব্যাপার। প্রথম প্রথম তাদের দেখে তো জ্যাকের গা ঘুলিয়ে উঠত। তারপর যা হয়। আস্তে আস্তে সব সহ্য হয়ে গেল। গিন্নীর তো একে ঐ শরীর। তারপর অতগুলো কাচ্চা-বাচ্চার জন্ম দিয়ে সে স্বভাবতই হাঁপিয়ে পড়ে ছিল। কাজেই সে আর নড়ে বসত না। বাড়িটা তাই যৎপরোনাস্তি নোংরা, যেন শুয়োরের খোঁয়াড়।

মানুষ এক আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে যেমন হয়, জ্যাকেরও তাই হল। সে ওসবে আর কিছু মনেই করত না। সে দেখত এরা তো এই অবস্থার মধ্যেও বেশ আনন্দেই আছে।

আলিবক্সের বেশ দুপয়সা ছিল। পেটিকোট লেনের বাড়িটা তার নিজের। সেটার একটা ফ্ল্যাটে সে থাকত নিজে। বাকী ফ্ল্যাট কটা ভাড়া দেওয়া। সেখানে থাকত নানা রকমের বাসিন্দা। তাদের হালচালও অদ্ভুত।

সারাদিন সে সব ফ্ল্যাটে লোকের সন্ধান পাওয়া যেত না। দিনের বেলায় আলিবক্সের ফ্ল্যাট ছাড়া আর সমস্ত বাড়িটাকে মনে হত ভুতুড়ে বাড়ি। রাতে সেই সব ফ্ল্যাটগুলো জেগে উঠত। অবশ্য এই অবস্থা ওখানকার তাবৎ বাড়িগুলোতেই দেখা যেত। ঘরে ঘরে জ্বলত বাতি। নাচ-গানের আওয়াজ উঠত। আসা যাওয়া করত হরেক রকমের লোক। সাদা, কালো, হলদে, তামাটে। আসত নিজের গাড়িতে, ভাড়াটে ট্যাক্সিতে, পায়ে হেঁটে। একটা ব্যাপার দেখে জ্যাক খুবই অবাক। এই পাড়ায় যারা আসত সেই সব লোকদের চলা-ফেরায় কেমন যেন একটা সন্দিগ্ধ ভাব।

আলিবক্স কিছুদিনের মধ্যেই জ্যাককে তার দোকানের বয় করে দিল।

সেখানে সে আরও জনা-আষ্টেক ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে বসে ইণ্ডিয়ান সুইট্‌স্‌ তৈরী করা শিখতে লাগল। তার পড়াশুনো নরকে গেল। নিজেদের কৃষ্টি সভ্যতা সব কিছু সে ভুলল। বৃটিশ জাত যে দুনিয়ার সেরা কৃষ্টিসম্পন্ন জাত সে কথাও সে ভুলল। অবশ্য জ্যাক আমার কথা কোন দিনই মানে নি। সে বলে বিভিন্ন চরিত্রের লোক দেখার বিপুল অভিজ্ঞতা কজনের ভাগ্যে হয়—

তা হোক সে ভাগ্য জ্যাকের। আমি তাতে কিছুমাত্রও ঈর্ষান্বিত নই। কিন্তু তার ভবিষ্যৎটাও যে সেই সঙ্গে গোল্লায় যাবার ব্যবস্থা হতে লাগল সেই ভিয়ান ঘরের মধ্যে বসে, সে ধারণাই তখন তার ছিল না। বোধ হয় আজও হয় নি। না হলে ঐ রকম একটা মেয়েমানুষ এনে সে নিজের ঘরে রেখে দেয়। তার সঙ্গে যারা কাজ করত তারা সবাই চিটাগং, নোয়াখালি আর সিলেটের মুসলমান। তারা কেউই পড়াশুনোর ধার ধারত না। এদেশে এসেছিল জাহাজের খালাসী হয়ে।

তাদের আলোচনার সবচেয়ে বড় উপকরণ মেয়েমানুষ। জ্যাকের যখন বয়স কম ছিল, সে তাদের হাসি, ইংগিত এসব বুঝত না। কিন্তু ক্রমশই তার চোখ ফুটতে লাগল। সেও এসব বিষয়ে পোক্ত হয়ে উঠল। একটা শিক্ষা সে সেই ভিয়ান ঘরে বসে পেল তা হল যে-কোন মেয়েমানুষ ঘটিত ব্যাপারেই পুরুষের বাহাদুরী।

বলতে বলতে জিমি একটু চুপ করল। গ্লাসের সবটুকু পানীয় শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল।

বললে, আলিবক্‌সের কারখানার যে সবচেয়ে পুরোনো আর ওস্তাদ কারিগর, তার নাম মিঞা সায়েব। মিঞা সন্ধ্যেবেলায় ভাল একটা স্যুট পরে চোখে সুর্মা টেনে, সামনের পাব থেকে পাকি ছ কোয়ার্ট ড্রাফ্‌ট বিয়ারে গলা ভিজিয়ে অন্দরে গিয়ে ঢুকত। আর ঠিক সেই সময়ে আলিবক্‌স সাহেবও তার বেগুনে রংএর কোট আর লাল রংএর টাই চাপিয়ে চোখে সুর্মা এঁকে, হাতে ছড়ি নিয়ে অন্দর ছেড়ে নামত রাস্তায়। এ নিয়ে অন্য অন্য লোকগুলো মুখ টিপে হাসত। বহুদিন পর্যন্ত এ রহস্যের কিছুমাত্র বোঝে নি জ্যাক।

একটা সন্ধ্যেতে কী কারণে জানি না অন্দরে ঢুকে জ্যাক দেখে অবাক কাণ্ড। মিসেস্‌ আলিবক্‌স, যে কিনা সারাদিন কাটিয়ে দেয় আড়িয়ে গড়িয়ে জীবনে বিতৃষ্ণ ভাব নিয়ে, সন্ধ্যের পর তাকে চিনতেই কষ্ট হল। অর্ধনগ্ন বেশবাসে, রং-ঢং-এ মিসেস্‌ যেন বেশ খানিকটা বয়স কমানর ভান করছে। আর মিঞা তার সেই বিরাট দেহটা ধরবার চেষ্টা করছে আলিঙ্গনের মধ্যে।

দৃশ্যটাতে এমন একটা কিছু ছিল যার জন্যে সেই ব্যাপারটা দেখা থেকে জ্যাকের শরীরের ভেতরে একটা জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল। যখন তখন শিরায় শিরায় রক্তের ঢেউগুলো তার ফুলে উঠতে লাগল। কেমন যেন একটা মাতলামি

ভাব ঠেলে উঠতে লাগল তার বুকের ভিতর থেকে। একটু একলা হলেই সমস্ত চিন্তা এসে যেখানে জমা হত সেখানে সে দেখতো একটা অর্ধনগ্ন মেয়ে মানুষের দেহ। তখন জ্যাকের বয়স পনেরো। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে ঠোঁটের উপর। মাথা ঝাড়া দিয়েছে সে অনেকখানি। দেখলে তাকে বয়সের থেকে অনেকখানি বড় বলেই মনে হত।

জ্যাক তার এই ভাবনাটাকে সম্পূর্ণ নিজের ভেতরেই লুকিয়ে রেখে দিত। কিন্তু যখন সেটা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ক্রিয়া শুরু করত তখন মেজাজ যেত ভয়ানক খারাপ হয়ে। তখন কারুর কথা, কারুর চোখ রাঙানী এসব গ্রাহ্য করত না। উল্টে ভীষণ রাগ করে বসত অন্যের উপরেই। মিঞা সাহেব ওর পিছনে লাগত ভয়ানক। কাজেই তার সঙ্গে জ্যাকের খটাখটি লাগত কথায় কথায়।

একদিন ঐরকম একটা সময়ে সন্ধ্যের দিকে জ্যাকের সঙ্গে দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল মনিরুদ্দি নামে একজন কারিগরের সঙ্গে। সে রাগের চোটে তার নাকের উপর একটা ঘুষি মেরে ছিটকে রাস্তায় বার হয়ে পড়ল। এক রোখে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে। অত কিছু দেখে নি। রাগটা একটু পড়তে সে দেখল আবছা আঁধারে পেটিকোট লেনের মধ্যে আসা যাওয়া করছে অনেক লোক। বেশীর ভাগই তাদের স্ত্রীলোক।

বহু পুরুষ রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে সেই বাড়ির ওপর তলার ফ্ল্যাটে উঠে যাচ্ছে। এদিকে রাগটা একটু কম হতেই ভয় আর অনুতাপ দুই-ই এসেছে মনে। জ্যাক ভাবল মিঞা সাহেব যদি জানে একবার যে আমি মনিরুদ্দির নাকে ঘুষি মেরেছি তবে আমার পিঠের চামড়াটা কী অক্ষত থাকবে? আর একটু অনুতাপ বেচারি মনিরুদ্দির জন্যে। তারও দোষ খুব বেশী ছিল না। দুই ধাক্কায় বিচলিত হয়ে জ্যাক ঠিক করল কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে একটু রাত করেই দোকানে ফিরবে।

পরিচিত গলি ছেড়ে সে আশপাশের গলির মধ্যে ঘুরতে লাগল। বড় রাস্তায় জ্যাক কদাচিৎ বার হত। ভয় ছিল পুলিশের।

গলির ভিতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার মনে কেমন একটা অনুভূতি এল। আবছা আবছা মনে হতে লাগল এসব গলির রাস্তাগুলো সন্ধ্যের পর তার জন্য যেন নিষিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে ছোটবেলায় তার বুড়ী দায়ের মুখে শোনা শয়তানের ইভকে আপেল খাওয়ানোর গল্পটা মনে হল। নতুন একটা দৃষ্টি দিয়ে সে আবছা অন্ধকারে ঢাকা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিগুলোকে দেখতে লাগল।

একসঙ্গে একজায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলি মেয়ে। সাজের ঢংটা অনেকখানি সে-রাতে দেখা মিসেস আলিবক্স-এর মতো। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

সিগারেট খাচ্ছিল। অনেক লোক সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তাদের দেখতে দেখতে। লোকগুলো যেন চোখ দিয়ে তাদের গিলে খাচ্ছিল। কেউ বা দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে একজনকে হাত বাড়িয়ে সঙ্গী করে নিয়ে আবার এগিয়ে যাচ্ছিল।

একটু দূরে থেকে জ্যাকের আলিবক্‌স সায়েবকে চিনতে কষ্ট হল না। সে একটা সুঁটকী হাড় বার করা মেয়েকে নিয়ে শিস্‌ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

জ্যাকের তখনকার অবস্থা বুঝতেই পারছ। একটা তীব্র আকর্ষণ তাকে ধীরে ধীরে সেই সব মেয়েদের কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলল। একটা ওর ঠাকুরমার বয়সী মেয়ে ওর কোমর জড়িয়ে বললে, একটা পাউণ্ড দাও। চল পার্কের কোণায় অন্ধকার থেকে ঘুরে আসি—

জ্যাক তো প্রথমে বুঝতে পারে না তার কথা। সে বললে, কী বলছ?

শুনে সমস্ত দলটা খি-খি করে হেসে উঠল।

তাদের গলায় যে শব্দটা উঠল সেটা শুনে জ্যাকের মনে হলো যেন একদল করাতি করাত দিয়ে কাঠ চিরছে। তারপর একজন তার গালে মৃদু আঘাত দিয়ে বললে, জাস্ট এ কিড্‌—

মেয়েগুলোর রকম-সকম দেখে জ্যাকের ততক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটার ওপরে দারুণ বিতৃষ্ণা এসে গেছে। চোখের কোণেও আস্তে আস্তে জল জমছে বেশ বুঝতে পারছে। তাই কিছু না বলে পিছন ফিরে চলে যাবার জন্যে সে পা বাড়াল।

দু একপা এগিয়ে যাবার পরই একটা মেয়ে এসে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। বললে, প্লিজ, তুমি রাগ কোরো না। ওরা অনেক বিচ্ছিরি। এসো আমার সঙ্গে গল্প করবে এসো—বলেই সটান জ্যাকের মুখের পানে চোখ তুলে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে ফিক করে একটু হেসে বললে, তোমার নাম জ্যাক না? তুমি আলিবক্‌সের দোকানে কাজ কর না?

জ্যাক বলে, হ্যাঁ—

ততক্ষণে মেয়েটি তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। চলতে শুরু করেছে সামনের রাস্তায়।

সে বললে, চল, আমি আলিবক্‌সের বাড়িতে ওপরের ফ্ল্যাটে থাকি। একসঙ্গেই বাড়ি যাই চল—

মেয়েটি তাকে ঘরে নিয়ে গেল। এতদিন এ বাড়িতে থেকেও কোনদিন জ্যাক ওপর তলায় ওঠে নি। মেয়েটি ঘরে ঢুকে তাকে বসিয়ে আলো জ্বালল।

মেয়েটির সমস্ত চেহারাটা তার চোখে পড়ল এবার ভালভাবে। চোখের কোল দুটোতে কালি ঢাকতে যদিও সে প্রচুর পাউডার ঢেলেছিল, তবুও সবসুদ্ধ

মিলিয়ে তার মুখখানা ছিল বেশ মিষ্টি। বয়সে জ্যাকের থেকে সে বড়ই। কিন্তু কতো যে বড় তা তখন জানবার বয়স তার ছিল না।

মেয়েটার নাম বিচিত্র। অন্ততঃ আজ পর্যন্তও ভীনা নামটা বৃটিশ মেয়েদের ব্যবহার করতে খুব বেশী শুনেছি বলে মনে পড়ে না। ভীনা সেই সন্ধ্যেবেলা জ্যাককে তার ঘরে বসিয়ে আদর করে চা তৈরী করে খেতে দিল। কাছে বসে আস্তে আস্তে তার সমস্ত পূর্ব ইতিহাসটুকু আদ্যোপান্ত সংগ্রহ করে নিল। সরল বিশ্বাসে তার কাছে জ্যাকও তার সমস্ত কথা উজাড় করে সেদিন বেশ হাল্কা বোধ করল।

জিমি এবার একটু উঠে লেভেটরী থেকে ঘুরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মালিক বিয়ার ভর্তি করা জগ জুগিয়ে দিল তার সামনে। সে তৃষ্ণার্ত পশুর মতো তার নাকটা ডুবিয়ে দিলে বিয়ারের ফেনায়। চোঁচোঁ করে খানিকটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে আবার বলতে শুরু করল জ্যাকের কাহিনী।

ভীনার সঙ্গে জ্যাকের আলাপটা ক্রমশঃ জমে উঠতে লাগল। রোজই সন্ধ্যের পর তার ঘরে গিয়ে সে টোকা মারে। কোনদিন ঘরে তাকে পায় কোনদিন পায় না। ঘরে থাকলেও সব দিন তার ঘরে জ্যাককে সে ডাকে না। দরজা ফাঁক করে জ্যাককে দেখে সে একটু হাসে। বলে একটু পরে আসতে রাত করে। আড়ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে জ্যাকের চোখে পড়ে ঘরের ভিতর বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন লোক।

সে একটু রাত করে আবার তার ঘরে যায়। এবার ভীনা তাকে ভিতরে টেনে নেয়। আলমারী খুলে প্রথমে বার করে কতকগুলো বইপত্তর। জ্যাককে সে পড়াতে বসে। গুরুগিরি করে। শক্ত শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সে তার জবাব দিতে পারে না। উত্তর দিতে না পারলে ভীনা তাকে মারে। পরক্ষণেই আবার আদর করে চুমু খায়।

আবার মারে, আবার আদর করে। এইভাবে সেই মেয়ে জ্যাককে নিয়ে মেতে ওঠে। তার আদর যতো বাড়ে ততই সে মদ খায় জোর করে। তাকেও খাওয়ায়। তারপর জ্যাকের গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে থাকে।

রোজই এই কাণ্ড চলে। জ্যাককে সে মদ আর সিগারেট দুয়েতেই পাকা করে তুলেছিল। আর—আর—বলেই জিমি একটু চুপ করে থেকে নীচু গলায় বলে ফেলল, নারী শরীরের মাদকতার প্রথম স্বাদ জ্যাককে দিয়েছিল ভীনাই। জ্যাক আমার কাছে সে কথা স্বীকার করেছে।

মানুষের মন বোঝার বয়স তখন জ্যাকের নয়। যদিও সে তখন রীতিমতো মাথা ঝাড়া দিয়েছে। হয়ে উঠছে একজন সত্যিকারের হাইল্যাণ্ডার। সাধারণের থেকে হাইল্যাণ্ডাররা মাথায় অন্ততঃ দু ইঞ্চি উঁচু হয়। তাই পনেরো ষোল বছর বয়সেই জ্যাককে দেখাত একটি জোয়ান মর্দ। সে রোজ রাতে পালিয়ে

যেত ভীনার ঘরে নিতান্ত নেশার টানে। মদের নেশা নারীদেহের নেশা। নেশা অবশ্য ভীনারও লেগেছিল। তরুণ নধর, জোয়ান, হাইল্যাণ্ডার দেহের নেশা। সে না যাওয়া পর্যন্ত ভীনাও ছটফট করত। তাকে পেলে সে স্বস্তিতে ঘুমোতে পারত।

জ্যাকের সঙ্গে যারা কাজ করত তারাও কেউ রাতে ঘরে থাকত না। কাজেই তারাও জ্যাকের পাত্তা রাখত না। একদিন রাত করে ভীনার ঘরে সে ঢুকতে যাবে দরজার কাছে ধাক্কা খেয়ে গেল একজন লোকের সঙ্গে। সে ছিট্‌কে গড়িয়ে পড়ল। লোকটা এসে তাকে টেনে তুলল। জ্যাকের নাকটা একেবারে ছেঁচে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ভীনার দরজা খুলে লোকটা তাকে তার বিছানায় শুইয়ে জল দিতে আরম্ভ করল।

ভীনাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ঘরে আসছিল মনে হল, এ তোমার কে ?

ভীনা নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল, ও আমাদের রেস্টুরেন্ট বয়। রাতে খাবার দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করতে আসে—

শুনে সেদিন জ্যাক নাক ছেঁচার ব্যথার থেকে অনেক বেশী ব্যথা পেয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধিকার সম্বন্ধেও সে বেশ একটু সজাগ হয়েছিল। অজান্তেই তার মধ্যে এমন একটা ভাব এসে গিয়েছিল যেন তাকে না হলে ভীনার একটি রাতও চলবে না। সেখানে ভীনাকে সে কল্পনা করত তার প্রেয়সী বলে যার ওপর তার অধিকার আশা করত অন্ততঃ বারো আনা। বাকী চার আনার জন্যে সে সন্ধ্যেবেলাটা তাকে ছেড়ে দিতে রাজী ছিল।

এসব অবশ্য ছিল তার নিছক কল্পনা। প্রথম যৌবনের হাল্কা রঙীন কল্পনা। যার না ছিল কোন ভিত্তি, না ছিল কোন গুরুত্ব।

গুরুত্ব যে কিছু ছিল না, সেটা প্রথম সেদিন সে টের পেল ভীনার কথায়। কিন্তু চৈতন্য জ্যাকের হয়েও হল না। নেশায় তখন সে আকণ্ঠ ডুবে আছে। সুতরাং ও ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে যথাপূর্ব ভীনার ঘরে যাতায়াত করতে লাগল।

ব্যাপারটা দাঁড়াতে লাগল অন্যরকম। দিন দিন তাকে পড়াবার ভান করে ভীনার প্রহারের মাত্রাটা যেন ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল। একদিন সে একটা লাঠির বাড়ি জ্যাককে এমন মারল যে তার পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত বার হয়ে পড়ল।

অবশ্য আদরটাও সেই অনুপাতে তার সেদিন উদ্দাম হয়েছিল সন্দেহ নেই। দুটোতেই জ্যাক হাঁপিয়ে উঠতে আরম্ভ করল কয়েক দিনের মধ্যেই।

অত মারও সে আর সহ্য করতে পারছিল না। আর অত আদরেও তার দম আট্‌কে আসত। এত সত্ত্বেও তার ঘরে যাওয়া আসা তার একটুও কমে নি।

ভীনার এই মার আর আদরের চোটে জ্যাকের শরীর দিন দিন শুকিয়ে উঠতে

লাগল। ওদিকে তার ওপর ভীনারও আকর্ষণ যেন আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল।

শেষে ভীনার এক নিগ্রো বয় ফ্রেন্ড জুটল। ছোকরা থাকত অনেক দূরে। সন্ধ্যের রোজগার শেষ হলে জ্যাককে নিয়ে সে যেত সেই ছোকরার বাড়িতে। সেখানে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলে জ্যাক সামনের বেসমেণ্টে যাবার সিঁড়িতে অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করত ভীনার জন্য। অনেক রাত হয়ে যেত। ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আসত। শীতে ঠকঠক করে সে কাঁপত বসে বসে। গভীর রাতে সে ছোকরা যখন তাকে দরজা খুলে বার করে দিত তখন ভীনার অবস্থা একতাল মাংসের কিমা। তার যেন আর হুঁশ থাকত না। তখন ট্যাক্সি ডেকে তাকে বয়ে আনতে হত বাড়িতে। রোজ এই ব্যাপার চলত। রোজই জ্যাক সঙ্গে যেত। রোজই তাকে ট্যাক্সির ভাড়া গুণতে হত। রোজই তাই জ্যাক পয়সা চাইত মিঞা সায়েবের কাছে। শেষে একদিন মিঞা সায়েব সব ব্যাপারটার হদিশ পেয়ে গেল। প্রথমে জ্যাককে সে কোন কিছু না বলে চুপ করে রইল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় মিঞা জ্যাককে ডেকে বললে, ভীনাকে গিয়ে বলগে আজ রাতে তার ঘরে যাব।

ভীনাকে গিয়ে জ্যাক সেকথা বলতেই ভীনা রাগে জ্বলে উঠল।—পাজি, নচ্ছার, বুড়ো শকুনি ও আমার ঘরের দিকে পা বাড়ালে আমি ওকে খুন করব। একটু লজ্জাও নেই দামড়া গাধাটার। সেদিন রাস্তায় ধরেছিল। হাতে কামড়ে দিয়েছি এমন জোরে টের পেয়েছে বাছাধন। কেন আলিবক্সের বৌয়ের জালার মতো শরীরে কী সব রস শুকিয়ে গেছে নাকি—

জ্যাক মনে করল হয়তো বুড়ো বলেই মিঞাকে ভীনা বরদাস্ত করতে পারে না। পরে সে জেনেছিল তার কারণ ছিল অন্যরকম।

যাই হোক জ্যাক ফিরে গিয়ে মিঞাকে সে কথা বলতেই মিঞা বাঘের মতো গজরাতে লাগল। জ্যাককে বললে, এই ছোকরা তুই যদি ওই ঘরে যাবি তো তোরই একদিন কী আমারই একদিন।

এত কথা জ্যাককে বলা বৃথা। সে যেমন রাতে ভীনাকে নিয়ে যেত তেমনি সে-রাতেও নিয়ে গিয়েছে। রাত প্রায় দুটোর সময় আধা অজ্ঞান ভীনাকে বাড়িতে এনে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলছে এমন সময়ে ভীনার ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা লোক। ছুঁচোল দাড়ি হাতে ঠেকতেই জ্যাক বুঝল লোকটা মিঞা। মিঞার কোমরে একটা ছোরা সব সময়েই বাঁধা থাকত। জ্যাক সেটা জানত। তাই আর কালবিলম্ব না করে সেই ছোরাটা হাতিয়ে নিয়ে গায়ের জোরে সেটা সে বসিয়ে দিল মিঞার শরীরে।

কোথায় যে লেগেছিল তা সে জানে না। তবে চটচটে রক্তে সমস্ত যে ভেসে

গেল এটা বুঝতে দেরী হল না। মিঞা অ্যাঁক করে একটা শব্দ করে এলিয়ে পড়ল। জ্যাক তাড়াতাড়ি ভীনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিল।

এত কাণ্ডেও ভীনার মদের ঘুম ভাঙে নি। সে নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোতে লাগল। আর জ্যাক বাথরুমে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

একটু পরেই শোনা গেল বহু লোক জমেছে সিঁড়িতে। তারা উঠে আসছে উপরে। তারপর তারা এসে ঢুকল ভীনার ঘরে। জ্যাক ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি তার লোপ পায় নি। তখুনি বাথরুমের স্কাই লাইটের ভিতর দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়ল বাড়িটার উল্টো পিঠে। রেন পাইপ বেয়ে এসে সে ঢুকল নিজের ঘরে। রক্তরাঙা জামা কাপড়গুলো কয়লার ঘরে কাঠের পাটাতন তুলে তার নীচে রেখে এল।

নীচে মহা হট্টগোল। মিসেস আলিবক্‌স্ চীৎকার করে কাঁদছে। তবে এটা বোঝা গেল যে মিঞা অজ্ঞানই হয়েছে ছোরার ঘা খেয়ে। আঘাতটা খুব সাংঘাতিক নয়। তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে।

কে যেন পুলিশে সংবাদ দিয়েছিল। পুলিশ এসে তারপর দিন বাড়ি তল্লাসী ক'রে কয়লার ঘরের পাটাতনের নীচ থেকে পেল জ্যাকের জামা কাপড়। তাকে তারা তক্ষুনি ধরে নিয়ে গেল।

কোর্টে কেস উঠল। জ্যাক সব কথা খুলে বললে। শুনে গভর্ণমেণ্টের উকীল, যে, তার হয়ে লড়ছিল ভীনাকে সাক্ষী মানলে। ভীনা সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপক্ষপাতে স্বীকার করল যে জ্যাক ভয়ানক শয়তান ছেলে। মিঞাকে খুন করার মতলব নাকি তার আগে থেকেই ছিল ইত্যাদি।

শুনে সেদিন কোর্টে বীভৎস বিকৃত গলায় চীৎকার করে উঠেছিল জ্যাক—মিথ্যে, মিথ্যে, ভয়ানক মিথ্যে—

চীৎকারের চোটে তার সেদিন গলা ফেটে বেরিয়েছিল রক্ত আর চোখ ফেটে বার হয়ে এসেছিল লোনা জল।

কোর্টে গিয়ে জ্যাকের পূর্ব ইতিহাস সব বার হল। পুলিশের কাছ থেকে হদিস নিয়ে কোর্ট তার বাবাকে টেলিগ্রাম করে আনায় লণ্ডনে। রিফরমেটরীতে চালান না করে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে তার বাবাকে হুকুম দেয়। কোর্টের হুকুম মানবার জন্যেই তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। শুনেছি সেদিন ট্রেনে যেতে যেতে একসঙ্গে বসে তার বাবা তার দিকে একবারও ফিরে চায় নি। শুধু জানলার বাইরে উল্টো দিকে চেয়ে অনবরত থুথু ফেলেছিল মুখ বিকৃত করে।

যার নিজের বাবাই তার ছেলের সম্বন্ধে এরকম ঘৃণা পোষণ করত সে যে কী

তা বোধ হয় তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না।

এদিকে গল্প বলতে বলতে জিমির তিন জগ বিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ জগ ভর্তি করতে ইঙ্গিত করে সে এবার কনুই দুটো টেবিলের ওপর রেখে দুহাতে রগ চেপে একটুখানি ঝিম মারল।

ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বললে, জ্যাক আমার বন্ধু লোক বটে তা বলে তো আর তাকে একজন চরিত্রবান লোক বলতে পারি না।

বললাম, ভীনা না হয় ছিল বস্তাপচা। কিন্তু অনীতা বোস? তুমি তার নাম শুনেছ?

ঝিম মেরে যাওয়া জিমি হঠাৎ যেন ইলেকট্রিকের শক খেলো। তার হাত দুটো ঝপ করে টেবিলের ওপর পড়ে গেল। রক্তচক্ষু দুটো অস্বাভাবিক ভাবে বড় করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—তাকে তুমি জানলে কী করে? তাকে চেনো নাকি?

—না। তবে শুনেছি তার কথা—

জিমি আবার তার পুরনো অবস্থায় ফিরে এল। বললে, ওঃ, শুনেছ। তা হলে তার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না। তা শুনেছ কার কাছে?

—প্রোফেসর ম্যাকিন্টারের কাছে—

জিমি এবার হি হি করে তার সেই অভ্যস্ত কুৎসিত হাসিটা হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বললে, তা হলেই বোঝ। যে মেয়ে গুরু শিষ্য দুজনকে একঘাটে জল খাওয়াত, সে কী চীজ্—

টপ করে হাসি থামিয়ে খুব গম্ভীর হবার ভান করে বললে, জ্যাক আর ম্যাকিন্টর দুজনেই পারভার্টেড। ঐ কেলোকিষ্টি বজ্জাত মেয়েটার ফাঁদে তারা অনায়াসেই পড়ে গিয়েছিল। এদিকে ন্যাকা তো। হুঁহুঁ বাবা, কে সে মেয়ে তো এ মিঞাকে ভোলাতে পারে নি—

বলে সে নিজের বুকের ওপর বার দুই টোকা মারল।

মনটা ভয়ানক বিগড়ে যাচ্ছিল জিমির ওপর। মনে হচ্ছিল জিমির ঐ কুৎসিত হাসিটা থেকে রাশি রাশি পোকা ঝরে পড়ে কিলবিল করে আমার শরীরে উঠছে।

জিমিই শেষ পর্যন্ত আমায় উদ্ধার করলে। বললে, রাত অনেক হল। এবার তুমি যাও। পয়সাটা দিয়ে যেতে ভুলো না যেন। আমার পকেটে পাই পয়সাটি নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি উঠছ না?

জিমি বললে, উঠব সেই বারোটায় দোকান বন্ধ হলে। ভাল কথা দোকানদারকে আরও গোটা পাঁচেক শিলিং দিয়ে যাও, লক্ষ্মী ছেলে।

পকেট থেকে কটা শিলিং দোকানদারের হাতে গুঁজে দিয়ে লাফ মেরে পাব

থেকে বার হয়ে এলাম।

রাস্তার কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসেও মাথার জ্বলুনিটা কম পড়ছিল না। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

ভীনা আর অনীতা। জ্যাকের জীবনের দুজন নারীর কথা ভয়ানক বেশী করে মনে পড়ছিল। ভীনাকে জিমি যেভাবে আঁকল তাতে তাকে ঠিক তেমনি ভাবে নিতে মন আপত্তি করে নি। অনীতার কথায় কিন্তু কিছুতেই মন সায় দিতে চাইছিল না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের গলা থেকে যে শ্রদ্ধার সুর শুনেছিলাম অনীতা সম্বন্ধে তাতে জিমিকে ভয়ানক মিথ্যাবাদী, শঠ বলে মনে হচ্ছিল। তারপর অনীতার নাম শুনেই জিমির সেই চমকে চাওয়া। মনে মনে ভাবছিলাম নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু একটা গোপন রহস্য আছে। সে কথা জিমি আদবেই আমার কাছে ভাঙল না অত মদ খাওয়া সত্ত্বেও।

॥ ১৪ ॥

রবিবারের ডিনারে ক্যাথলিন মায়ার উপস্থিত ছিল না বলে তার সম্বন্ধে আলোচনাটা বেশ একটু প্রবল হয়ে উঠেছিল।

জোসেফ গর্ডন গম্ভীর মুখ করে বললে, মাম বলেছিলেন মিসেস মায়ার উলওয়ার্থে কাজ করে। আবার্ডিনের উলওয়ার্থের দোকান ঢুঁড়েও তো কই মিসেস মায়ারের সন্ধান পেলাম না। ও কোথাকার উলওয়ার্থে কাজ করে মাম ?

মিসেস মরিসন কিছু জবাব দেবার আগেই সিলভিম্যান ঠাট্টা করে উঠল জোসেফকে—আজকাল তাহলে ডিনারের সময়টা উলওয়ার্থের দোকানেই ঢুঁড়ে বেড়াও তুমি, কেমন ?

শকসেনা বললে, তাই আর ডিনারের ছুটিতে আজকাল তোমায় কারখানার ক্যাণ্টিনে দেখি না।

জোসেফ মৃদু হেসে বললে, তোমাদেরও তো কিছু কমতি দেখিনে। সেদিন উলওয়ার্থে থেকে এক ডজন বাজে টাই কিনে এনেছে ম্যান। আর শকসেনা তো গোটা দুদিন ধরেই উলওয়ার্থের দোতলা চারতলা ভেঙেছে। কিছু কিনেছে কি না জানি।

শকসেনা বললে, মোটেই দুদিন না। মাত্র পরশু দিন গিয়েছিলাম। জুতোর নীচের একটা শুকতলা কিনতে।

জোসেফ শুধু গম্ভীর মুখে—হুঁ, বলে আপনমনে খেতে লাগল।

মিসেস মরিসন বললে, আমি কী আর খোঁজ করতে গিয়েছি কে কোথায় কাজ করে। আমাকে সে যা বলেছে তাই বলেছি তোমাদের কাছে।

রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড কোন কথা বলছিল না। শুধু মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল আমার আর মিসেস মরিসনের মুখের দিকে। তার সে চাউনীতে ভরা ছিল বিশেষ রহস্য। মুখের ভাবটা সে যথাসম্ভব নিরাশক্ত করেই খেয়ে যাচ্ছিল। মিঃ মরিসন এক মুখ ম্যাসড্ ট্যাটি (আলু চটকান) আর মিন্স্ড মীট (মাংসের কিমা) চিবোতে চিবোতে অস্পষ্ট ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল, একজন মহিলার সম্বন্ধে তোমাদের এরকম কৌতূহল মোটেই ভাল নয়। বিশেষ করে তিনি যখন এখানে উপস্থিত নন।

জোসেফ গর্ডন বললে, তাই তো তার সম্বন্ধে আলোচনা করছি। থাকলে কী আর করতাম?

সিলভিম্যান বললে, সে আপনারা যাই বলুন—ক্যাথলিন মায়ার কিন্তু পাড়াতেও যথেষ্ট সন্দেহের কারণ হয়েছে।

মিসেস মরিসন এবার বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? তুমি কিছু শুনেছ নাকি—

সিলভিম্যান বললে, না শুনলে বলব কেন? ওপারের ফুটপাথে বোরিস টেট-এর দোকানে পরশু রাতে সিগারেট কিনতে গিয়েই শুনলাম—ক্যাথলিন মায়ারের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। ওরা আমাকে দেখেই আলোচনা থামিয়ে দিলে। সব কথা কানে এল না। শুধু শুনলাম অনেক রাতে মায়ার বাড়ি ফেরে একা একা। দোকানের ছোকরা কটা প্রায়ই দেখে। আচ্ছা মাম অত রাতে ওকে দোর খুলে দেয় কে?

মিসেস মরিসনের মুখ এবার রাঙা হয়ে উঠল। সে বললে, ওরা নির্ঘাৎ ভুল দেখেছে। সে মিসেস মায়ার নয়। বোধ হয় আমাদের পেছনের বাড়ির জেন হবে। তার যা সুনাম পাড়ায় তাতো সবাই জানে।

শ্যামল এতক্ষণ একমনে পুডিং খেয়ে যাচ্ছিল। এবার হি-হি করে হাসতে হাসতে বললে, ওঃ জেনকে নিয়ে যা মজা হয়েছিল একবার। জানেন দাদা—গতবারে খ্‌স্‌মাসে জেন এ বাড়িতে এসে শকসেনার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে হুইস্কির বোতল তুলে ধরেছিল। শকসেনারও খুব নেশা লেগেছিল। জেনের ওদিকে খেয়াল নেই সে দাঁড়িয়েছে কড়িকাঠে বাঁধা মিস্‌ল্‌টো লতার নীচে। শকসেনা তখন—

বলেই শ্যামল ঝপ করে থেমে গেল। কথাটা বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে তার চোখ দিয়ে হাসি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওদিক থেকে মিস্টার মরিসন শ্যামলের না বলা কথাটা বলে ফেলল। —শকসেনা জেনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে দিয়েছে—

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—প্রচণ্ড হাসিতে মিঃ মরিসনের প্রকাণ্ড দেহটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আমি একটু বোকার মতোই প্রশ্ন করলাম তাতে হয়েছে কী?

হাসবার কী আছে ? মিঃ মরিসন বললে, হাসি আসে তার পরের ঘটনায়। শোন আমি বলছি—ব্যাপারটা। এখানে নিয়ম হল যদি কোন ছেলে কোন মেয়েকে মিস্‌ল্‌টো গাছের নীচে চুমু খায়—খৃসমাস ইভে—তবে সেই মেয়ে সেই ছেলেকে দেবে একটা টাই। আর ছেলে তার হাতের দস্তানা খুলে তাকে দেবে। এইভাবে আগে এখানকার পেগ্যানদের এন্‌গেজমেণ্ট্‌ হতো আর কী। তা সে রাতে জেন টাই কোথা পাবে ? জেন শকসেনাকে তার মাথার চুলের ফিতেটা খুলে দিলে। শকসেনা দিল তার দস্তানা।

বলে এক দলা পুডিং তুলে মিঃ মরিসন চিবোতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর—

মিঃ মরিসন পুডিং-এর তালটা গলাধঃকরণ করে বললে, তারপরের দিন সন্ধ্যেতে শকসেনা গেছে জেনের ঘরে। এই যে আমাদের পাশের বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যায়। গিয়ে দেখে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অনেকক্ষণ পরে ডাকাডাকি করে দরজা খুলে জেন মুখ বাড়াল। শকসেনা বললে, আসতে পারি কি ? জেন তাকে একদম চিনতেই পারলে না প্রথম। হুইস্কির নেশায় যার সঙ্গে আলাপ, নেশা ছুটে গেলে তাকে চেনা খুবই মুস্কিল বৈকি ! বললে, কোন দরকার আছে—

শকসেনা তো থ'। বললে, না ডার্লিং—

শকসেনা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কী একটা আপত্তিকর শব্দ করল। সে দিকে কান না দিয়েই মিঃ মরিসন বললে, ডার্লিং আমি তোমার কাছে এসেছিলাম আমার পুরোন দস্তানা ফিরিয়ে নিয়ে নতুন একজোড়া দিতে।

এতক্ষণ জেন কিন্তু শকসেনাকে ঘরে ঢুকতে দেয় নি। এবার তাকে ঘরে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকে শকসেনার চোখ কপালে উঠেছে। সেখানে বসে আছে ইয়া এক চৌগোঁপ্পা ক্যাপ্টেন। জেন আলাপ করিয়ে দিয়ে বসতে বললে। তারপর জোড়াদশেক দস্তানা শকসেনার সামনে ফেলে দিয়ে বললে দেখোতো তোমার কোন জোড়াটা। হুইস্কিতে কাল এমন মাথা ভারী হয়ে উঠেছিল যে আজ আর বুঝতেই পারছিনে কোনটা কার। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকেও কাল দস্তানা পেয়েছি—বলে দেখিয়ে দিল সেই ক্যাপ্টেনকে।

শুনেই শকসেনা এক দৌড়ে সেখান থেকে বাড়িতে এসে হাজির। গল্প শুনে তো আমরা হেসেই বাঁচিনে। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

শকসেনা এদিকে শ্যামলকে গালাগাল করতে আরম্ভ করেছে এই প্রসঙ্গ তোলার জন্য।

সবাই হাসিতে যোগ দিয়েছে। দেয় নি কেবল মিসেস মরিসন। তাঁর মুখ-খানা পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। মিসেস মরিসন বললে, জেনকে এ পাড়ার সবাই চেনে—

সিলভিম্যান বললে, তাই তো মনে হচ্ছে বোরিস টেট আর তার ছোকরারা আর যাই ভুল করুক জেন আর ক্যাথলিন মায়ারে ভুল করবে না। জেন মিসেস মায়ারের চেয়ে অনেক বেঁটে খাটো।

মিসেস মরিসন এবার গম্ভীর হয়ে বললে, রাত্তিরে ভুল হওয়া এমন বিচিত্র কিচ্ছু নয়। আর তা ছাড়া দোকানের ঐ ছোকরাগুলো যা মদ খায়। মদের ঝোঁকে কী দেখতে কী দেখেছে—

পাড়ার ছেলেরা যাই দেখুক আমার সামনের ঘরের ভাড়াটে ক্যাথলিন মায়ার যে প্রত্যেকদিন গভীর রাতে বাসায় ফেরে তা আমি বুঝতে পারি। প্রায় অনেক রাতে কোন না কোন শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখি রাস্তার দিকের দরজার পর্দা সরান। আলো জ্বলছে মিসেস ক্যাথলিন মায়ারের ঘরে।

কিন্তু খাবার টেবিলে আমি কোন রকম মন্তব্য করলাম না।

এরই দু একদিন পরে বাড়ি থেকে বার হয়ে ফুটপাথের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ছেলেমেয়ের দল সেখানে খেলা শুরু করে দিয়েছে। দড়ি টাঙিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে কী সব করছে। দূর থেকে খেয়াল করি নি। কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়তেই মিসেস জনস্টনের দশ বছরের মেয়েটা আমার হাত জড়িয়ে ধরল—গুড মর্নিং আংকল—আংক্‌ল্‌ বলতে ওকে কে শিখিয়েছে কে জানে ?

তাড়াতাড়ি গুড উইস্‌টা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, দাঁড়াও আমি আসছি—

পাশের দোকান থেকে চট করে কিছু টফি কিনে এনে মেয়েটার হাতে দিলাম। মেয়েটা অকুণ্ঠভাবে ঠোঙাটা নিয়ে তার সঙ্গীদের মধ্যে বিলোতে লাগল।

একটা নিজের মুখে পুরে বললে, তুমি খুব ভাল লোক। তোমার মতো লোক এ পাড়ায় নেই—

—কেন, টফি দিই বলে বুঝি—

মেয়েটি সোজাসুজি বললে, তা নয়, তুমি আমাদের ভালবাসো তাই—

তারপর সে আমার হাত দুটো ধরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা তুমি গরীব না বড় লোক—

প্রশ্নটার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তবুও বললাম, আমি আদবেই বড় লোক নই।

মেয়েটি সরল চোখ তুলে বললে, তবে যে মা বলে ইণ্ডিয়ানরা খুব বড় লোক হয়। তাদের অনেক পয়সা থাকে—অনেক ধনরত্ন থাকে—

—সবার নয়। সেখানে অনেক গরীব লোকও আছে—

মেয়েটি ঝাঁকানি দিয়ে বললে, তা তুমি গরীবই হও আর বড় লোকই হও তুমি আর ও বাড়িটায় থেকো না—বলে মিসেস মরিসনের বাড়িটা আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দিলে।

খুব কৌতুহল হল। মেয়েটাকে একপাশে নিয়ে এলাম। ছেলেমেয়েদের খেলা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বলত—

মেয়েটি বললে, ও বাড়িটা নাকি খারাপ। মা আর মিঃ টেট সেদিন বলাবলি করছিল আমি শুনেছি। আচ্ছা ও বাড়িতে কী ভূত টুথ কিছু তুমি দেখলে—

বললাম, কৈ না-তো—

—তা হলে বোধ হয় গুণ্ডা কী ডাকাতদের ওই বাড়িটার উপর নজর পড়েছে। মেয়েটি গম্ভীর ভাবে বললে, ওটাতে তোমার আর থেকে কাজ নেই বুঝলে? তুমি না হয় অন্য একটা বাড়িতে সরে পড়।

মুখে একটু ভয় পাবার ভান করে বললাম, হ্যাঁ তা যদি হয় তবে তো সরে পড়তেই হবে।

—তা তুমি যদি সব কিছু জানতে চাও আমার মাকে জিজ্ঞাসা কর না, বললে মেয়েটি।

মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ তা তোমার মার সঙ্গে একটা পরামর্শ করলে ভাল হতো। কিন্তু এখন তো আমায় একটু জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে। পরে আসব'খন কেমন?

সামনের পথে পা বাড়ালাম। মেয়েটিও গিয়ে খেলায় যোগ দিলে।

গলির মুখ ঘুরতেই পড়ে গেলাম মিসেস ওগিলভির খপ্পরে।

বেতো পা নিয়ে বুড়ী আস্তে আস্তে চলছিল তার বেরালের জন্যে মাংস কিনতে। আমাকে দেখেই বললে, গুড মর্নিং, এই যে বোধি—এতদিন কোথায় ছিলে? দেখতে পাই নি যে—

বললাম, কেন এইতো মাত্র চার পাঁচ দিন আগেই তোমার সঙ্গে দেখা হল—

বুড়ী হিসেব করে বললে, ও তাইতো। তা এখন চলেছ কোথায়? নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজে নয়। এস, আজ আমার ঘরে এস। কাল চমৎকার প্যান কেক বানিয়েছি। এসে একটু চা খেয়ে যাও—

বুড়ী ধরেছে ঠিক তার বাড়ির সামনেই। কাজেই আর এড়িয়ে যাওয়া চলল না। বললাম, চল। কিন্তু বেশী দেরী করব না। আমায় একটু কাজে যেতেই হবে।

বুড়ী বললে, মোটেই দেরী হবে না। এই যে এই দরজা। এসো এসো।

বুড়ী ওগিলভি আমাকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকল।

ঘরে সম্বলের মধ্যে একটা বিছানা, একটা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল আর একটা আলমারি। সেই ঘরেরই খানিকটা পার্টিশন দিয়ে রান্নাঘর করা হয়েছে। আমাকে বুড়ী তার শোবার ঘরে বসিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল। বুড়ীর বেরালটা

কোথায় ছিল লাফিয়ে এসে বুড়ীর পিছন পিছন ধাওয়া করল।

বুড়ী বিড়বিড় করে বকতে লাগল—ও ডিয়ার, চিঙ্গিল্লা, তোমার মাংস একটু পরে আনব। দেখছ না বাড়িতে গেস্ট এসেছে। ওরকম অভদ্রতা করে না। সোনা আমার চুপ করে বসো এক জায়গায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়ী কিছু প্যান কেক আর চা করে এনে আমার সামনে একটা টিপয়ে সাজিয়ে দিলে। বললে, খাও। প্যান কেক খেয়ে বললাম, চমৎকার—

বুড়ীর তাল তোবড়ানো মুখ আনন্দে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। বললে, এক সময়ে আমার প্যান কেক তৈরীতে নাম ছিল, জান—

একটু থেমে গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা মরিসনদের বাড়ির নামে রাস্তা ঘাটে এতো কানাঘুষো শুনি তুমি তো ও বাড়িতে থাক—কিছু জান না ?

—কই না, কিছুই তো জানি না—

বুড়ী তখনই বলে উঠল, অবশ্য সে কথা জানবার আমার দরকারই বা কি বল ? ওসব লোকেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু—

আমি নিঃশব্দে চা খেতে লাগলাম। একটু চুপ করে থেকে বুড়ী আবার জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা ক জন বোর্ডার এখন আছে ও বাড়িতে ?

চা খেতে খেতে বুড়ীর প্রশ্নের জবাব দিলাম। বুড়ী আবার একটু চুপ করে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম ওর পেটে কৌতূহল বদ হজমের চোঁয়া ঢেকুরের মতো এখুনি আবার উদগার তুলবে। মনে মনে মজা পাচ্ছিলাম খুব।

যা ভাবলাম তাই-ই হল। বুড়ী আমায় এবার জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা ও বাড়ির বোর্ডাররা সব ছেলে, না মেয়েও আছে ?

বললাম, কিছু দিন হল একটি মহিলা এসেছেন।

বুড়ী এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হল। বললে, ও তাই। তোমাকে আর দুখানা প্যান কেক দিই—কী বল ?

—যা দিয়েছ এই-ই যথেষ্ট—

নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল বুড়ী।—বোর্ডার রেখে মরিসন গিন্নী বেশ দু পয়সা রোজগার করে। ওদের কী অবস্থা ছিল—নিজেই তো দেখেছি। আর কী হল তা-ও তো দেখছি—গলার স্বর তুলে আমায় আবার জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা যে মেয়েটি ও বাড়িতে এসেছে, শুনি নাকি তার চালচলন মোটে ভাল নয়। কথাটা সত্যি ?—বলে আমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ হবার ভান করে বুড়ী।

বললাম, এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই জ্ঞান নেই—

বুড়ী এবার একটু চটে গেল। বললে, কী রকম ব্যাটাছেলে তুমি ? বাড়িতে একটা জোয়ান মেয়েছেলে রয়েছে—তার সম্বন্ধে কিচ্ছু খোঁজ রাখ না ? নাঃ

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না—

এবার আমি একটু গম্ভীর হলাম। বললাম, মিসেস ওগিলভি এদেশে তো দেখি স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা অবাধ। আচ্ছা, এদের এই মেলামেশায় কী সত্যি সত্যি কোন নিয়ম কানুন, কি সামাজিক বাধাবাধি আছে ?

মিসেস ওগিলভি দুচোখ বড় বড় করে বললে, ও মা তা আর নেই ? যে কোন মেয়ে যে কোন ছেলের সঙ্গে রাস্তায় মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু যে কোন একজন মেয়ের ঘরে কোন পুরুষ যাক দেখি। নিন্দের চোটে পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে যাবে। একজন ছেলে একজন মেয়ের সঙ্গে বলরুমে নাচতে পারে। তা বলে তারা দুজনে একঘরে নির্জনে থাকবে বিয়ে না হতেই—এ আমরা ত ভাবতেও পারতাম না। এখন তো সমাজে যা তা হচ্ছে। ছেলে মেয়েগুলো উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত করছে। কে কার কথা শোনে বল ?

বললাম, কেন এখানে তো এনগেজড্ হয়ে এক সঙ্গে থাকার রেওয়াজ আছে—

মিসেস ওগিলভি বললে, আগে ছিল না এখন এসব হচ্ছে। তুমি কী একে সুনীতি বল ? আসলে সমাজের বাঁধনটাই ঢিলে হয়ে গেছে। দেখো না—আমাদের সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে রকম ভালবাসার সম্পর্ক ছিল—এখন তো তার কিছুই নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ?

মিসেস ওগিলভি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল এই প্রশ্নে। আমার কাপে আরও খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে বললে, এক একটা মেয়ে বিয়ের আগে ছত্রিশ হাত ফেরতা হয়ে আসে। আর একটা ছেলে বিয়ের আগে কমসে কম পঞ্চাশটা মেয়ে চাখে। কাজেই একজন পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করে তার ওপর তার সব সময়ে সন্দেহ থাকে। সেই মেয়েও করে সেই পুরুষকে সন্দেহ। আমি তো এই পাড়ায় আজন্ম কাটালাম। এ পাড়ার নাড়ী নক্ষত্র আমি জানি বোধি। এখানকার শতকরা পাঁচটা ফ্যামিলী আছে কিনা সন্দেহ—যারা ঝগড়াঝাঁটি না করে—সত্যিকারের আনন্দ নিয়ে ঘর করে। তোমাদের বাড়ির গিন্নী তো কর্তার সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে। জানো না ?

বুড়ী হি-হি করে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে বললে, তবে নতুন যে মেয়ে বোর্ডারটি তোমাদের ওখানে এসেছে তার ব্যাপার শুনি অন্য রকম। তোমার জোয়ান বয়স—তাই একটু সাবধান করছি—

চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। আমি খুব খুশী হবার ভান করে, মিসেস ওগিলভিকে অজস্র ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠলাম। মিসেসও চলল তার বেরালের জন্য মাংস কিনতে।

॥ ১৫ ॥

সেদিন ভোরবেলা গিয়েছিলাম আবার্ডিনের মাছের বাজার দেখতে।

থেরেসা বলেছিল, আবার্ডিনে এসেছ মাছের বাজার দেখবে না? গ্রানাইট, মাছ আর পশুপালন—আবার্ডিনের লক্ষ্মীকে অচলা করে বেঁধে রেখেছে।

বলেছিলাম, নিশ্চয়ই। মাছের বাজার না দেখলে আবার্ডিন দেখাই তো বৃথা হবে।

তাই সেদিন ভোর সাতটায় উঠে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়েছিলাম মাছের বাজার দেখতে। এখানে শীতকালে আলো ফোটে অনেক দেরীতে। কিন্তু শহর জেগে ওঠে পাঁচটা থেকেই। ঘোড়ায়টানা গাড়ি নিয়ে চলে দুধওয়ালারা। পাড়ায় পাড়ায় দুধ বিলি করে। রুটিওয়ালা, সব্জীওয়ালা সব বাড়িতেই বরাদ্দ করা। হুইলব্যারো ঠেলে চলে রাস্তায়। আর বাড়ির দরজায় দরজায় টোকা মেরে জিনিস নামিয়ে দেয়।

বাস চলতে থাকে সেই ভোর পাঁচটা থেকে। সাতটার সময় বাসে উঠেই দেখি নানা বয়সের মেয়েতে বাস ভর্তি। এরা সব মাছের বাজারের মেয়ে। থেরেসাকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল।—গুড মর্নিং। রাতে কেমন ঘুমিয়েছ?

থেরেসা তাদের সঙ্গে একটু কথা বলেই, আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

কথা বলব কী—দারুণ শীতে আমার বুকের ভিতর গুরগুরিয়ে উঠতে লাগল। বললাম, এই ভোরে তোমরা রোজ কাজে যাও?

থেরেসা বললে, যার যা কাজ। ফিস মার্কেট শুরু হবে সাড়ে সাতটা থেকে। তার আগে সমস্ত মাছ বেছে, সাজিয়ে স্টলে ধরে দিতে হবে না? যাকে ফিলে কাটতে হবে, তাকে সেগুলো শেষ করতে হবে না? দোকানে দোকানে চালান দেবার জন্য মাছ কেটে টুকরো করে বাক্স ভর্তি করতে হবে না? তা না হলে সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে গরম গরম মাছ ভাজা তোমাদের পাতে পড়বে কেমন করে?

বললাম, বটেই তো। কিন্তু এই যে সব সুন্দরীরা চলেছে মাছের বাজারে এরাই কী সেসব করবে?

থেরেসা বললে, এখানকার মাছের ব্যবসা প্রকাণ্ড। দুনিয়ার মাছের বাজারের সঙ্গে আবার্ডিনের মাছের বাজার টেক্কা দেয়। এই প্রকাণ্ড ব্যবসার মধ্যে এক জাহাজ চালিয়ে মাছ ধরা ছাড়া, জাল বোনা থেকে শুরু করে মাছ প্যাক করা অবধি সব কাজই মেয়েরা করে। এসব মেয়েদেরই কাজ। লক্ষ লক্ষ মেয়ে এই কাজে অন্নসংস্থান করে।

বাস ইউনিয়ন স্ট্রীট দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ মাঝখানে এসে মোড় নিল।

যে রাস্তাটা সোজা উত্তরে ডক এলাকার ভিতর দিয়ে সমুদ্র থেকে কেটে আনা খালটার ব্রীজ টপকে চলে গেছে সেইটা ধরে এসে মাছের বাজারের সামনে থামল।

শহরের মধ্যে দোকানে রাখা মাছ দেখে কিন্তু মাছের বাজারের কোন ধারণাই করা যায় না। দোকানে মাছ থাকে সাজান গোছান কাঁচের বাক্সের মধ্যে। সব কিছুই থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাছ কিনতে গেলে দোকানী মেয়েরা তাকে কুটে, মুছে, ওজন করে, প্যাক করে দেয়। দোকানী মেয়েদের সাজ পোশাক পরিষ্কার। লিপস্টিক মাখান ঠোঁটে খরিদ্দারের মন ভোলান হাসিটুকুও মাছের সঙ্গে ফাউ পাওয়া যায়।

মাছের বাজারে এসে মালুম হল—হ্যাঁ, এতো ঠিকই মেছো বাজার বটে।

সমুদ্র থেকে কেটে আনা খালটার ধারেই বিরাট চত্বর জুড়ে প্রকাণ্ড শেড। সেই শেডের একদিকে খাল আর একদিকে রাস্তা। খালের ওপর সারি সারি দাঁড়িয়ে মাছ ধরা জাহাজ।

থেরেসা আমাকে দেখাতে লাগল—ঐগুলো ট্রলার। ওতে জাল ফেলে সমুদ্রের তলাকার মাছগুলো টেনে তোলে। ঐ গুলো ড্রিফটার—ওরা সমুদ্রের ওপরে ভাসা জাল দিয়ে ভাসা মাছ ধরে—

গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। লোকে জায়গাটা লোকারণ্য। সবারই পায়ে উরু অবধি টেনে তোলা গামবুট। গায়ে রবার বা চামড়ার এ্যাপ্রন। হাতে চামড়ার দস্তানা। কারুর হাতে বেলচা। কারুর হাতে ফিলে কাটার ছুরি। শেডের একদিকে দাঁড়িয়ে আছে লরীর দল। বাক্সে প্যাক করেই লরীতে ভর্তি করা হবে মাছ।

মাছের গন্ধে সে জায়গার বাতাসটা ভরে উঠেছে। নীচে রাস্তার বরফে, কলের গুঁড়ো বরফে, কাদায়, মাছের গায়ের নালসানিতে এক বীভৎস ব্যাপার করে তুলেছে। তবু কারুর এতটুকু ঘৃণা নেই। সবাই পরম আগ্রহে তারই উপর দিয়ে গিয়ে মাছের নমুনা দেখছে।

হঠাৎ থেরেসা থমকে দাঁড়াল। গুড মর্নিং স্যর,—বলে সামনে যে লোকটিকে সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। লম্বা রোগা এক ভদ্রলোক। তীক্ষ্ম নাক, মুখে বিরাট চুরুট। মাথায় ফেল্টহ্যাট। হাতে ছড়ি। এখানে যারা ঘুরছে ফিরছে কাজ করছে সবার মাথায় পশমী বনেট। কাজেই ফেল্টহ্যাট পরা মাথা এখানে চট করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গুড্ মর্নিং—বলে ভদ্রলোক সেটা ফিরিয়ে দিতেই থেরেসা আমার পরিচয় পেশ করল। ইনি হলেন বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। কলকাতা থেকে আবার্ডিনে এসেছেন। তা আবার্ডিন মানেই হল মাছের বাজার। তাই এঁকে মাছের বাজারে নিয়ে এসেছি। আর ইনি হলেন ম্যাক ফিসারীর অন্যতম কর্তা মিস্টার

ম্যাকলাউড। আমি ও'রই অধীনে কাজ করি।

মিস্টার ম্যাকলাউড হাসিমুখে করমর্দন করলেন। বিরাট চুরুটটা দাঁতে চেপে একটু অস্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলেন, মাছে তোমার ইণ্টারেস্ট আছে ?

বললাম, এদেশে যখন ইণ্টারেস্ট নিয়ে দেখতে এসেছি তখন বেচারা মাছেরাই বা বাদ যাবে কেন ?

মিস্টার ম্যাকলাউড হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, মাছেরা আবার্ডিনে বড় একটা বেচারা নয়। এখান থেকে বছরে প'চিশ লক্ষ পাউণ্ডের মাছ বিক্রি হয় বৃটেনে, বৃটেনের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকায়, অন্যান্য দেশে। এই বেচারাদের ধরবার জন্য এখানে এই এক আবার্ডিনের বন্দর থেকেই চারশ জাহাজ উত্তর সাগরের জল চষে বেড়ায় সারা বছর। সরকার সেই সব মাছ ধরা জাহাজদের সাহায্য করার জন্যে এই একটু দূরে টোরীতে গবেষণাগার মেরীন লেবরেটরী খুলেছেন। সেই লেবরেটরীর জাহাজ সমুদ্রে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে। সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে তারা খবর পাঠায় কোথায় কখন কত গভীর জলে কোন মাছের ঝাঁক চলেছে।

তাজ্জব বনে গেলাম মিস্টার ম্যাকলাউডের কথা শুনে।

মিস্টার ম্যাকলাউড বললেন, চলুন আপনাকে বাজার দেখাই।

এতক্ষণে বাজার শুরু হয়ে গেছে। গুঞ্জন উঠছে ফিস শেডের ভিতর থেকে। আমাকে মিস্টার ম্যাকলাউডের হাতে ছেড়ে দিয়ে থেরেসা কাজে চলে গেল।

মিস্টার ম্যাকলাউড আমাকে নিয়ে ঢুকলেন মাছের শেডের মধ্যে। শেডের বাঁধান সিমেণ্ট করা দৌড়দার চত্বরের ওপর হাজার হাজার খোলা বাক্স সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাছ ভর্তি। কতো রকমের মাছ।

মিস্টার ম্যাকলাউড বললেন, ঐ যে বাঁ দিকে রূপোর পাতের মতো ঝকঝকে মাছগুলো দেখছেন ওগুলো হেরিং।

দেখি অনেকটা আমাদের ইলিশের মতো, একটু আকারে ছোট এক জাতের মাছ।

মিঃ ম্যাকলাউড বলে চললেন, হেরিং এখন খুব বেশী ধরা পড়ছে না। কিন্তু আর দুটো মাস অপেক্ষা করুন। তখন বাজার একা হেরিং-রাই রাখবে। হেরিং-এর দল আটল্যাণ্টিক থেকে ঝাঁক বেঁধে ঢুকবে ডোভারে। ইংলিশ চ্যানেল, ডগারস্ব্যাঙ্ক, ফার্থ অব ফোর্থ পার হয়ে আসবে আমাদের আবার্ডিনের ধারে ক্রোম্যাটী, মারেফার্থ অঞ্চলে। ততক্ষণে সাজসাজ রব পড়ে যাবে। সেই ডোভার থেকে আয়ারল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড থেকে স্কটল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড থেকে শেটল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড—

ভবঘুরে জোয়ান মেয়েরা যাদের এদেশে বলে 'হেরিং কোয়াইন' (কোয়াইন

অর্থে ছুঁড়ী) তারাও দলে দলে ঘুরবে হেরিং-এর পিছু পিছু। যে সব শেড আর স্মোকিং শপগুলো এখন অকেজো হয়ে আছে সেগুলোতে কাজ চলবে পুরোদমে। হেরিং কোয়াইনরা দল বেঁধে ঘুরবে আয়ারল্যাণ্ড থেকে স্কটল্যাণ্ড অবধি। ফিলে কাটবে, স্মোকিং করবে, নুন মাখাবে, মাছ প্যাক করবে। ওরাই ঐ কাজে সিদ্ধ হস্ত। ঐ এক জাত। এদেশে থাকলে 'হেরিং কোয়াইন' যে কী চীজ বুঝতে পারবেন—

মিঃ ম্যাকলাউড বাঁ চোখটা কুঁচকে মুচকে হাসলেন। তারপর বললেন, ঐ দেখুন মাঝখানে যে সব মাছ এলো রয়েছে ওগুলো হল কড্। ঐ ডান দিকের সারে হল ফ্ল্যাট ফিসের দল—সোল, লেমন সোল, রুখ, ড্যাব এই সব। ফিস এণ্ড্ চিপসের কারবারীদের ঐ মাছগুলো একচেটে। তারপর দেখুন ফ্ল্যাট ফিসের রাজা হ্যালিবাট-দের। হ্যালিবাট খুব দামী মাছ। এবারে আমার জাহাজে দুশো বাক্স হ্যালিবাট এসেছে।

এমন সময় একজন লোক এসে মিঃ ম্যাকলাউডের সঙ্গে কী সব কথা বললে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—আসুন আসুন মিস্টার—কী যেন নাম আপনার ? আসুন এই ডকের ধারে। আমার একখানা জাহাজ আসছে সতেরো দিন পরে। আসুন দেখি কী নিয়ে এসেছে—

আমাকে নিয়ে মিঃ ম্যাকলাউড ডকের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এ দিকে বাজারে শেডের মধ্যে লোক জমা হয়েছে প্রচুর। মাছের এখানে দাম করা কারি নেই। ফিসারী বোর্ড থেকে দাম বেঁধে দেওয়া হয় প্রত্যেক দিন। রোজ সকালের কাগজে তা ছাপা হয়। সেই অনুপাতেই মাছ বিক্রি চলে।

মাছ বিক্রির সঙ্গে চলছে অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি খেউড়। মেয়েরাও কম যাচ্ছে না। এখানকার লোকদের কথাবার্তার ধরন ধারণও সভ্য জগতের বলে মনে হচ্ছে না। এখানে বড় ছোট ভেদ কিছু নেই। সবাই সমান। সবাই জেলে —সবাই মেছো।

মিস্টার ম্যাকলাউড অধীর আগ্রহে ডকের ওপর পায়চারী করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—আমাদের দেশের লোকে কোন কোন মাছ খায়। কী মাছ বেশী চলে ? ইত্যাদি। আমিও সাধ্যমত জবাব দিতে লাগলাম।

এই মেছো বাজারের ডকে পর পর সাতখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললাম, এ সব জাহাজ কত দিন সমুদ্রে মাছ ধরে ?

মিঃ ম্যাকলাউড বললেন, সাত, দশ, পনেরো, এমন কী এক সঙ্গে তিন চার মাসও।

বলেন কী ?—বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।—মাছ পচে যায় না—

মিঃ ম্যাকলাউড বললেন, এদের প্রত্যেকের ভিতর আছে কুইক্ ফ্রিজিং প্ল্যান্ট। তার মধ্যে টাটকা মাছ ঢেলে দিয়ে সাধারণ টেম্পারেচর থেকে টেম্পারেচর একেবারে ঝপ করে মাইনাস বত্রিশ ডিগ্রীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো জমে যায়। সে মাছ আর ছমাসের মধ্যে পচবার ভয় নেই। তা ছাড়া এ শীতের দেশ। ধরুন না কেন যে সব জাহাজ উত্তরমেরু অঞ্চলে মাছ ধরতে যায় তাদের তো দু তিন মাস এমনিতেই লাগবে আসতে যেতে মাছ ধরতে।

মনে মনে কল্পনা করতে লাগলাম। সেই বরফ জমা সমুদ্রে কীভাবে এরা মাছ ধরে বেড়ায়। একটুখানির মধ্যেই মিঃ ম্যাকলাউডের জাহাজ জেটিতে ভিড়ল। হৈহৈ করে নাবিকরা সব দড়ি দড়া বেঁধে ফেলল।

একজন ছুঁচোল দাড়ি, পাকান গোঁফ লম্বা চেহারার জোয়ান প্রৌঢ় এসে গুড উইস করে দাঁড়াল মিঃ ম্যাকলাউডের সামনে। মিঃ ম্যাকলাউডও পরিচয় দিলেন—ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং। ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং বিরাট থাবায় আমার হাতটা নিয়ে ঝাঁকনি দিল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় গিয়েছিলেন মাছ ধরতে ?

আর্মস্ট্রং বললে, এবার খুব ভাল কড মাছ পেয়েছি আইস্ল্যান্ড আর নরওয়ের মাঝামাঝি জায়গায়।

মিঃ ম্যাকলাউডের দিকে ফিরে বললে,এবার মনে হচ্ছে কড্রা খুব তাড়াতাড়ি ডিম ছাড়বে। ঐ জায়গাটাতেই ডিমভরা কড্ পেয়েছি অনেকগুলো।

থেরেসা আজকে সকাল সকাল কাজ থেকে বার হয়ে এসেছে। বাসে আমার পাশে বসে আমার সিটের পিছন দিকে হাত রেখে সে ঠিক বাচ্চা মেয়ের মতো কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল অপর সীটের ওপর আরও কয়েকটা মেয়ের দিকে। তারাও ফিস মার্কেটের মেয়ে। আমাকে থেরেসার পাশে দেখে তারা সবাই একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মুচকে হাসল ওর দিকে চেয়ে। তাদের ইঙ্গিতটা আমার চোখ এড়াল না।

থেরেসার ছেলেমানুষী ভাবটা এতক্ষণে চলে গেল। মুহূর্তে সে সচেতন হল যে সে একজন মহিলা। তাড়াতাড়ি হাতটা গুটিয়ে নিয়ে আমায় বললে, আমাকে তুমি মাফ কর বোধি।

বললাম, কী হল ? মাফ করবার হল কী ? আজ একটা অদ্ভুত দুনিয়া দেখলাম তো তোমারই কৃপায়। তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ও বললে, তা দিতে হয় দিও। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছি। মাছের বাজারের কথাবার্তা, চালচলন অতি জঘন্য। তুমি কিছু মনে কর নি তো ?

বললাম, সে কথা তোমাকে আর নতুন করে বলতে হবে না। ইংরেজীতে

তো একটা কথাই আছে বিলিংস্‌গেট কালচার। বিলিংস্‌গেট তো লণ্ডনের সবচেয়ে বড় মাছের বাজার।

থেরেসা বললে, এই মেছোবাজারের ছেলেমেয়েদের দেখে পাছে এখানকার সাধারণ কালচার বিচার করে বসো তাই আমার ভয়।

বললাম, মেছো বাজার হল মেছো বাজার। সারা দুনিয়াতেই মেছো বাজারের কালচারের ধারা বোধ হয় একই রকম। ও সম্বন্ধে ভাবব আবার কী?

থেরেসা বললে, কী জানি সারা দুনিয়ার খবর রাখি না। এখানকার কথা বলছি। মাঝে মাঝে আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগে। মনে হয় কাজ ছেড়ে দিই। তবে অনেক দিন ধরে কাজটা করছি আর মাইনেও এখানে ভাল। তাই ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এদের একটা জিনিস আমার একেবারেই বরদাস্ত হয় না। এদের কথাবার্তায়, ইংগিতে আচরণে, হাসি গল্পে কেবল একটিমাত্র কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটা হল স্ত্রী-পুরুষের জৈবিক মিলন। এছাড়া আর কোন কথা নেই। অশ্রাব্য খিস্তির মধ্যে তো ও কথা থাকবেই। আবার হাসি গল্পের মধ্যেও সেই একই কথা। বিশেষ করে তো জাহাজের নাবিকরা।

বললাম, যাদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় যাদের দিনরাত, যাদের দিন কাটে বছরের মধ্যে দশ মাস স্ত্রীসংসর্গ ছাড়া, তাদের ভিতর ওটা দেখা যাবেই। এ হল মানুষের সবচেয়ে পুরোনো অভ্যাস। একে মানুষ ছাড়বে কেমন করে?

থেরেসা চটে উঠল।—কেন, একজন স্ত্রী আর একজন পুরুষে কী শুধু ঐ একটা সম্বন্ধই দুনিয়ায় হয়? বন্ধুত্ব বলে কী কিছু নেই?

বললাম, থাকবে না কেন? যে বন্ধুত্ব করতে পারে তার কাছে আছে। ওরা পারে না তাই ওদের কাছে নেই।

বলতে বলতে বাসটা এসে রিজেন্ট কীর মোড়ে দাঁড়াল। আমরা দুজনেই নামলাম।

থেরেসা বললে, মিঃ ম্যাকলাউডকে দেখলে? দেখে মনে হয় কী সারা গ্রেট বৃটেনে ওনার কারবার? লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের মালিক উনি। ওঁর গ্রীমস্‌বী, হাল, লোয়েস্টাফ আর আবার্ডিনে প্রায় দুশ ট্রলার আছে।

বললাম, সত্যি বড় চমৎকার ভদ্রলোক। দেখে কিন্তু মোটেই মনে হল না উনি অত টাকার মালিক। এ হে বলতে ভুলে গেছি তোমাদের ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়ে গেল। আজ আমায় সে নেমন্তন্ন করল সন্ধ্যে বেলায়—তার সঙ্গে খেতে।

থেরেসা বললে, আর্মস্ট্রং লোক ভারী ভালো। কিন্তু তার সঙ্গে তুমি খেতে পারবে না। তার খাওয়া মানেই তো হল পিপে পিপে মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হওয়া।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একাই রাস্তা হাঁটছিলাম প্যাংহিয়ান রোড খুঁজে বার করতে। জায়গাটা ডক এলাকার মধ্যে। বিস্তৃত ডক এলাকা সন্ধ্যাবেলা নিস্তব্ধ। দূরে দূরে জাহাজগুলো অন্ধকারে ভুতের মতো মাস্তুল তুলে ঝিমোচ্ছে। আমি রাস্তা হাঁটছিলাম সেগুলোকে ডান দিকে ফেলে।

এদিকে জন মানুষের যাতায়াত খুব কম। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর। শুধু কয়েক জোড়া মূর্তি চোখে পড়েছে এদিক সেদিক। দেয়াল ঠেস দেওয়া অথবা দাঁড়িয়ে আলাপ করা অবস্থায়।

প্যাংহিয়ান রোডের শেষ সীমানার সামনে ডকের যে অংশ সেখানে বাঁধা আছে ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং-এর জাহাজ। কথা আছে আমি সেখানে এলে দুজনে বার হব কোন হোটেলের উদ্দেশ্যে। আমার মনের মধ্যে প্রবল একটা ইচ্ছে জেগেছে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ভাব জমাতে। ওর কাছ থেকেই শুনব উত্তর মেরু অঞ্চলের কথা। ও তো বছরে অন্ততঃ তিন চার বার সেখানে মাছ ধরতে যায়।

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে রাস্তা চলেছি। হঠাৎ প্রায় ধাক্কা খেতে খেতেই সামলে গেলাম। খেয়াল করি নি যে ওটা দুটো মানুষের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহ। ওটাকে ছিপছিপে অন্ধকারে দেয়ালের অংশ বলেই ভুল করেছিলাম। দূরের একটা জাহাজ থেকে লম্বালম্বিভাবে জোল্‌সো একটু আলো এসে পড়ে এই ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল। আমি, এক্‌স্‌কিউজ মি,বলতেই মানুষ দুটো পরস্পর আলিঙ্গন শিথিল করল মুহূর্তের জন্য। আর সেখানে সেই অল্প আলোয় আমার মনে হল আমি মিসেস ক্যাথলিন মায়ারকে দেখলাম। কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্য।

আর একটু হেঁটে এসে পেঁছালাম প্যাংহিয়ান রোডের মোড়ে। সেখানে আসতেই দেখলাম রাস্তায় পায়চারী করছে ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং। আমি কাছে এসে গুড উইস্‌ করতেই ক্যাপ্টেন বললে, চল যাই। তোমার জন্য চিন্তা হচ্ছিল। এই রাস্তায় একা চলে আসা একটু মুস্কিল বৈকি। মেয়েছেলেরা পাকড়াও না করে ছেড়ে দিল যে ?

আর্মস্ট্রং হাসি মুখে আমাকে নিয়ে যে পথে আমি এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে হাঁটতে লাগল। দুচারটে গলি পার হয়ে একটা গলির মধ্যে আমায় এনে ফেললে। ঘিঞ্জি গলি। ভয়ানক নির্জন। লোকজন অত্যন্ত কম। আলোও খুব পর্যাপ্ত নয় এখানে। একটু অবাক হয়েই হাঁটছিলাম। আর্মস্ট্রং বললে, সাবধান, যেখানে যাচ্ছি—সেখানে অনেক সুন্দরী আছে। তাদের থেকে সাবধান হোয়ো। আমি তোমাকে আমাদের নাবিকদের বিচিত্র জীবনের কিছু দেখাব তাই তোমায় এখানে এনেছি। আশা করি ভুয়ো মর‍্যালিটির খাতিরে তুমি তাদের ঘেন্না করবে না ? তবে সুন্দরীদের সম্বন্ধে সাবধান—

বললাম, এতো করে বারণ করছ কেন—

আর্মস্ট্রং চড়া গলায় বললে, মাই ইয়ং ফ্রেন্ড, দুনিয়ার সব মেয়েমানুষ হল ভয়ানক বজ্জাত, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক। তাদের খপ্পরে খবরদার পোড়ো না। কদাচ বিয়ে কোরো না। মেয়েমানুষের থেকে মদ ঢের ভাল। কখন ছলনা করে না।

আর্মস্ট্রং একটা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু হাতড়ে তার দরজার হাতলটা ধরে চাপ দিতেই—সেটি ভিতরে খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক গান বাজনার আওয়াজ এসে কানে ঢুকল। ভিতরে দেখলাম আলোর রেখা।

দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকেই একটা ঘরে এলাম। ঘরটা প্রায় দেশলাই বাক্সের মতো। ঢুকতেই একটা লালমুখো প্রচণ্ড জোয়ান লোক ঝপ করে এসে আর্মস্ট্রং-এর কাঁধটা চেপে ধরল। আর্মস্ট্রং গুড উইস্ করে বললে, কেমন আছ জো ? প্রায় তিন সপ্তা পরে দেখছি। একটুও পাল্টাও নি যে ?

জো আর্মস্ট্রং-এর ওভার কোটটা ততক্ষণ নামিয়ে নিয়েছে। নিয়ে একটা হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখছে।

ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে সে জবাব দিলে—এখানকার এই খোড়-বড়ি-খাড়া আর ভাল লাগছে না মিঃ আর্মস্ট্রং। আমাকে এবার সমুদ্দুরে নিয়ে চল।

আর্মস্ট্রং আমার পরিচয় দিতেই জো এসে আমার গা থেকে ওভার কোটটা খুলে নিল। আমরা দুজনে এবার ঘরের কোণায় একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেলাম।

নীচের হলটা বেশ বড় সড়। চেয়ার টেবিলগুলো সব প্রায় ভর্তি। জোড়ায় জোড়ায় বসেছে সবাই। কেউ বা আবার কারুর গায়ে হেলান দিয়ে। মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এখানে যেন কোন ভেদই নেই। মেয়েদের সাজ পোশাক অতি সংক্ষিপ্ত। ছেলেরা যথাসম্ভব ভাল সাজে সেজেছে। সবারই সামনে পানীয়ের গ্লাস। ঘরের কোণে একজন প্রকাণ্ড ভুঁড়িওলা, মাঝ বয়সী পুরুষ আর একজন নারী বসে সব ব্যবস্থা করছে। টাকা জমা নিচ্ছে।

ঘরের শেষের দিকে একটু অন্ধকার। সে জায়গাটা ফাঁকা। সেখানে দুএক জোড়া ছেলে মেয়ে নাচছে। তাদের সঙ্গে একর্ডিয়নে সংগত করছে দু একজন।

আর্মস্ট্রং আমাকে নিয়ে গিয়ে কোণের সেই পুরুষ আর নারীটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।—মিস্টার আর মিসেস বেনেট। তোমার যখন যা দরকার হবে এরা সব কিছু জোগাতে সব সময়েই প্রস্তুত। বলতে গেলে তোমার সমস্ত রকম মেজাজ খারাপের দাওয়াই জোগাড় করে দিতে এঁদের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হবে না। অথচ সস্তায় পাবে সব কিছু।—তা ছাড়া ঝামেলার হাত থেকে রেহাই—

বলে একটা চোখ কুঁচকে একটা ইংগিত করল। ইনি আমার বন্ধু মিঃ মৈত্রেয়। ভারতবর্ষের লোক। খদ্দের করে দিলাম। অতএব পুনরাগমনায়চ—

ঘরটা মদের গন্ধে, চুরোটের ধোঁয়ায় অদ্ভুত গুমোট হয়ে উঠেছে। তবে লোক-

গুলোরও যা অবস্থা তাতে তারা যে এখন কোথায় তাই তাদের খেয়াল আছে কিনা সন্দেহ।

আমি আর আর্মস্ট্রং গিয়ে একজায়গায় বসলাম। দুটি দল নাচছে। তাদের নাচের মধ্যে নাচটাই বড় কথা নয়। এ ঘরের মধ্যে চুম্বন বেশ অবাধ। এক জায়গায় তিন চার জন পুরুষ মিলে হাসতে হাসতে একটা টোম্যাটোর মতো মেয়েকে চুমু খেতে লাগল যেখানে সেখানে। সেও দাঁড়িয়ে সেই চুমু উপভোগ করতে লাগল হাসিমুখে। তারপর তার দেহটাকে নিয়ে যেন টানাটানি ছেঁড়াছিড়ি লেগে গেল সেই কজন লোকের মধ্যে।

আর্মস্ট্রং প্রথমেই আর্ডার দিলে কিছু খাবারের। খাবার হাতে করে এল স্বয়ং মিসেস বেনেট। পাতলা মাজা চেহারা মিসেস বেনেটের। মুখে একটি অতি মিষ্টি হাসি। বললে, আমি নিজে তৈরী করলাম তোমার জন্যে। তুমি তো নতুন। দেখো পছন্দ হয় কিনা।

দেখলাম এদেশের তুলনায় অনেক ভাল রান্না। হামবুর্গার যে এতো সুস্বাদু হয় তা আগে জানা ছিল না। ধন্যবাদ দিলাম মিসেসকে।

এরপর পানীয়। আর্মস্ট্রং যে কত ধাপের লোক মিস্টার আর মিসেস বেনেট তা খুব ভালই জানেন।

পানীয়ে চুমুক দিয়ে আর্মস্ট্রং বললে, আমি দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায় ট্রলারে মাছ ধরে বেড়িয়েছি। ভারতবর্ষের সমুদ্রে যখন মাছ ধরি তখন বোধ হয় তুমি জন্মাও নি। সেই সময়ে একবার আমার ট্রলার সারাবার দরকার পড়ায় গিয়েছিলাম বোম্বায়ে। চমৎকার শহর। সেখানে ছিলাম প্রায় দিন সাতেক। সেখানকার মেয়েরা ছিল বড় নরম। মনে আছে।

—আমি বোম্বাই সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই না। উত্তর মেরু সম্বন্ধে কিছু বল—

আমার কথায় কান না দিয়ে আর্মস্ট্রং আবার বলতে আরম্ভ করল, একটা মেয়ের সঙ্গে মাত্র পাঁচ রাত ছিলাম। তাতেই সে আমাকে প্রায় বিয়ে করা স্ত্রীর মতো আদর যত্ন করতে আরম্ভ করেছিল। চলে আসবার সময় ভারি কান্নাটাই কেঁদেছিল। সব মেয়েই হল বিশ্বাসঘাতকের জাত। ওসব কান্নাটান্না হল সাময়িক ছলনা।

বলে হুইস্কীর পাত্রে চুমুক দিল মিঃ আর্মস্ট্রং।

বললাম, যেতে কতদিন লাগে আসল আর্কটিকে—

আর্মস্ট্রং বললে, ওসব কথা বলতে এখন ভাল লাগছে না। আর্কটিকে তো কেবল বরফ, বরফ—সবই বরফ। সমুদ্রের জলটা পর্যন্ত সময় সময় জমে জমাট বেঁধে যায়। ঠাণ্ডায় আমাদের জীবন বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। বৃষ্টি পড়ে জমাট শিলার খণ্ড। সে সব জায়গায় যাওয়া আর মৃত্যুকে চোখে দেখা একই

কথা। ওখানকার কথা কী আর শুনবে ?

আর্মস্ট্রং হুইস্কির পেগটা এক চুমুকে শেষ করে, পাত্রটা ফিরিয়ে দিল মিসেস বেনেটকে। মিসেস বেনেট তক্ষুনি পাত্রটা ভর্তি করে আর্মস্ট্রং-এর সামনে রাখল।

আর্মস্ট্রং তাতে একটা চুমুক দিয়ে বললে, যা বলছিলাম তোমাকে। এখানকার মেয়ে কাউকে বিশ্বাস কোরো না। সব দুশ্চরিত্র, বজ্জাত। না হলে ঘরের বৌকে ঘরে এসে পাওয়া যায় না—এমন তাজ্জব—

হো হো করে হল ফাটা একটা বীভৎস হাসি হেসে উঠল মিস্টার আর্মস্ট্রং।

পরপর তিনটে হুইস্কী আর তিনটে বিয়ার চড়িয়ে আর্মস্ট্রং নেশাটাকে বেশ পাকিয়ে নিল। মনে পড়ল পাঁড় মদ্যপ জিমির কথা—হুইস্কির পর বীয়ার! ওরে বাপরে—বিষ—সেই বিষই নীলকণ্ঠ হয়ে পান করছে আর্মস্ট্রং অম্লান বদনে।

এদিকে নাচের বাজনা খুব ঝনঝনিয়ে বাজতে আরম্ভ করেছে। নাচের জায়গায় যেন হুল্লোড় লেগে গেছে। অর্ধনগ্ন স্ত্রী-দেহগুলো নিয়ে সুরাসক্ত উন্মত্তের দল যেন পাগল হয়ে উঠেছে।

তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ধরে জো নিয়ে গেল ওপরে। বুঝলাম দোকানের মালিকের হুকুম আছে। খুব যখন হুল্লাড় বাড়তে থাকে, তখন তাদের কিছু কিছু ধরে বাইরে বার করে দেয় জো। একটা দল জড়াজড়ি করতে করতে উপরে উঠে গেল।

মিঃ বেনেটের রেস্টুরেণ্ট ছেড়ে যখন উঠলাম তখন রাত একটা। অনেক ধস্তাধস্তি করেও আর্মস্ট্রং-এর কাছ থেকে উত্তর মেরু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শোনা গেল না।

যে লোকগুলো এখানে এসে হুল্লোড় করছে সবাই নাবিক। নাবিক খদ্দেরদের নিয়েই বেনেটের এই রেস্টুরেণ্ট চলে। তবে বাইরে থেকে এ বাড়ির কিছুই বোঝা যায় না।

আর্মস্ট্রং বেশ প্রচুর মদ্যপান করলেও চলনে তার পা একটুও টলতে দেখা গেল না। দুজনেই বার হয়ে এলাম। একটু এগিয়ে আর্মস্ট্রং। পিছনে আমি।

রাস্তায় পড়েই আর্মস্ট্রং বলে উঠল, এদিকে এসোতো দেখি। কী যেন একটা রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে।

আর্মস্ট্রং তার পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজল। কিন্তু নাঃ, সেটা সে রেস্টুরেণ্টে ফেলে এসেছে। তাই নীচু হয়ে ভাল করে দেখে জড়িত স্বরে বললে, আরে একটা মানুষ পড়ে এই জল কাদায়—দেখতো দেখতো মাই ফ্রেণ্ড কী হয়েছে ওর—

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্টে ঘুরে ফিরে দেখলাম। মানুষই বটে। জলে

কাদায় মাখামাখি হয়ে ঠান্ডায় সে দেহটা পড়ে আছে। গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলাম।

—মিঃ আর্মস্ট্রং, আসুন একে ধরাধরি করে নিয়ে যাই বাইরে। এখানে পড়ে থাকলে মরে যাবে—

গায়ে হাত দিয়েই বুঝেছি দেহটা একটা স্ত্রীলোকের। কথাটা আর্মস্ট্রংকে বলতেই ইচ্ছে করল না প্রথমে। যদি স্ত্রীলোক শুনে বলে ওঠে—চল চল মরুক গে—

আর্মস্ট্রং বললে, লোকটা অতিরিক্ত মদ খাবার ফলেই বোধ হয় অচেতন হয়েছে। হয়তো ঐ ওখানে যারা নাচছিল তাদেরই একজন।

বলতে বলতে সে একাই সেই দেহটা দু হাতে তুলে নিলে কাঁধের উপর। নিয়েই বললে, আগে বোঝ নি মাইফ্রেন্ড—এ একজন মেয়েছেলে—

মেয়েছেলেটার গা থেকে তখন বমি আর মদের গন্ধ মিশিয়ে বিশ্রী একটা বোটকা গন্ধ বার হচ্ছিল। আমি সেই আবছা অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারলাম সেই অজ্ঞান মেয়েটার গায়ে পরম দরদের সঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে আর্মস্ট্রং বললে, গায়ের ওভারকোটটাও নেই। বোধ হয় কেউ কেড়ে নিয়ে সটকান দিয়েছে। বুকের আর্ধেক আর পিঠের আর্ধেক একেবারে খোলা। নির্ঘাৎ ফুসফুস জমে মারা যাবে—

বলেই তাকে আবার নামাল আর্মস্ট্রং। তারপর নিজের ওভার কোটটা খুলে তার গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিয়ে তাকে আবার কাঁধে তুলল। শেষে এসে পড়লাম প্যান্হিয়ান রোডের মোড়ে। এখানে বেশ খানিকটা আলো দেখতে পাওয়া গেল। সেই আলোতে দেখলাম মিস্টার আর্মস্ট্রং-এর কাঁধে যার শরীরটা ঝুলে আছে সে আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা মিসেস ক্যাথলিন মায়ার। আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বার হয়ে এল। আর্মস্ট্রং ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কী ?

—একে আমি চিনি। আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে—

ক্যাথলিনের মুখে মাথার চুলে বমি লেগেছিল। বিশ্রী গন্ধে তার কাছে ঘেঁসা যাচ্ছিল না।

সেই রাতে আর্মস্ট্রং তার শরীরটা বয়ে চলল প্যান্হিয়ান রোড ছাড়িয়ে। কিছুদূর আসবার পর একটা ট্যাক্সি পেয়ে তার হাতলটা চেপে ধরলাম। আর্মস্ট্রংকে বললাম, এর মধ্যে ওকে শুইয়ে দাও। আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি—

সে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার জাহাজে। আমি ক্যাথলিন মায়ারকে এনে ফেললাম সাউথ কনস্টিটিউশন স্ট্রীটের মিসেস মরিসনের বাড়িতেই। রাস্তার দিকের দরজাটার হাতল ধরে ঘোরাতে দেখি সেটা খোলাই রয়েছে। ট্যাক্সির

ভাড়া মিটিয়ে সন্তর্পণে ক্যাথলিন মায়ারকে এনে ফেললাম তার ঘরে।

বাথরুম থেকে গরম জল এনে যথাসম্ভব তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে তার অচৈতন্য দেহটা ঠেসে দিলাম বিছানার মধ্যে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো বেজে গেছে কখন। সারা পাড়া নিশুতির মধ্যে ডুবে আছে।

নিজের ঘরে এসে এবার বিছানা নিলাম। কিন্তু ঘুম চোখের ধার ঘেঁসেও এলো না। বারবার মনে পড়তে লাগল নারীবিদ্বেষী আর্মস্ট্রংকে। বারবার চোখের ওপর ভাসতে লাগল তার সেই অজ্ঞান নারী দেহটার ওপর পরম দরদের সঙ্গে হাত বোলান। মনে পড়তে লাগল ক্যাথলিন মায়ারকে।

॥ ১৬ ॥

পরের দিন ঘুম ভাঙল অনেক দেরীতে। ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে দেখলাম বাইরে বেশ আলো। যদিও টিপ টিপিনি বৃষ্টির কামাই নেই। কম্বলের ভিতর শুয়ে শুয়েই একটু গড়াতে লাগলাম। অলস মগজের ভিতর দিয়ে গতরাতের কথাগুলো স্বপ্নের মতো ভেসে যেতে লাগল। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

নিশ্চয় মিসেস মরিসন কী মিসেস বেক্‌লি। ব্রেকফাস্টের সময় উৎরে যাবার জন্য বোধ হয় তাড়া লাগাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকল ক্যাথলিন মায়ার। পরনে একটা ড্রেসিং গাউন। মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত। চোখ দুটো ঘোর লাল, ফোলা ফোলা।

রাতের খোঁয়াড়ি এখনও ভাঙে নি মিসেস মায়ারের। মিসেস মায়ার গুড উইস্‌ করেই বললে, ক্ষমা করুন, এই অবস্থায় আপনার ঘরে ঢোকার জন্য। আমি বড় বিপদে পড়েছি। আচ্ছা, এই রুমালটা কি আপনার?

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে রুমালটার এক কোণে 'ম' অক্ষরটা তুলে সে আমায় দেখাল।

গত রাতে ওর মুখ মাথা সাফ করতে নিজের রুমালটাকেই ব্যবহার করেছিলাম। সেটি আর আনা হয় নি। মনে পড়ল সেকথা। আর মনে পড়ল আমার রুমালের কোণায় শুধুমাত্র 'ম' অক্ষর লেখার জন্যে লণ্ডনে রাণীকে আমি কী ঠাট্টাটাই-না করেছিলাম। রাণীও সমানে জবাব দিয়েছিল—রোমে যখন থাকবে তখন রোম্যানদের মতো ব্যবহার করতে শেখো। উপাধির আদ্যক্ষর দিয়েই লোকের পরিচয়।

আমি বলেছিলাম, তাতো বুঝলাম। কিন্তু ওটা বাংলা 'ম' হলো কেন—রাণী সে কথার জবাব না দিয়ে শুধু লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল।

বললাম, এটা আমারই বটে। তুমি কী বাংলা অক্ষর পড়তে জানো?

ক্যাথলিন মায়ার বললে, না। এটা তো হিন্দী 'ম'—

বললাম, হিন্দী 'ম' আর বাংলা 'ম' প্রায় একই রকমের। তুমি তাহলে হিন্দী জান?

ক্যাথলিন মায়ার তাড়াতাড়ি বললে, একেবারেই না। এই 'ম' অক্ষরটা খালি চিনি মাত্র। আমার এক ভারতীয় লোকের সঙ্গে জানা শোনা ছিল। তার হাতের আংটিতে এই অক্ষরটা লেখা দেখেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে মায়ার বললে, আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো কাল রাতে কী আপনিই আমাকে এ ঘরে এনেছেন—

চট করে হাঁ বলা আমার পক্ষে একটু কঠিন হল।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে ক্যাথলিন মায়ার বললে, আপনার চুপ করে থাকা থেকেই বুঝতে পারছি আপনি আমাকে বাসাতে বয়ে এনেছেন। আচ্ছা দয়া করে বলবেন কোথা থেকে কী অবস্থায় আমাকে আপনি নিয়ে এলেন— বিশ্বাস করুন আমার কিছু মনে নেই—

বললাম, সে আমি বেশ জানি। তোমার তখন কিছু বোধ করবার অবস্থা ছিল না—। কিন্তু কি হবে সে সব কথা জেনে—

মিসেস মায়ার এবার আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করল—আপনি জানেন কী আমার গায়ের ব্যাজার হেয়ারের কোটটা কোথায় গেল? যে কোটটা ঘরে রয়েছে সেটা তো একটা পুরুষের কোট—

তোমাকে আমি আর আমার এক বন্ধু রাস্তায় কুড়িয়ে পাই। তোমার তখন অচেতন্য অবস্থা। সে সময়ে তোমার গায়ে কোট ছিল না। আমার বন্ধুই তাঁর কোটটা খুলে তোমাকে চাপা দিয়েছিলেন। ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

মিসেস মায়ার হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। দু হাতে মুখ ঢেকে সে আমার দিকে পিছন ফিরে বসল।

একটু পরে কান্না ভেজা গলায় বললে, বিশ্বাস করুন, গত রাতে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—মাত্র একটা কোট তো? কত আর দাম—বিদ্রূপভরা সুরে বললাম কথাগুলো।

ক্যাথলিন মায়ার আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল—না না মাত্র একটা কোটই শুধু নয়। ওর পকেটে আমার যথাসর্বস্ব ছিল। কাল রাতে যে লোকটার সঙ্গে মিস্টার বেনেটের ওখানে নাচছিলাম আপনি তাকে দেখেছিলেন কী?

—মিস্টার বেনেটের ওখানে যে আপনি ছিলেন তা আমি খেয়ালই করি নি।

মিসেস মায়ার বললে, আমি কিন্তু আপনাকে দেখেছিলাম। যে লোকটার সঙ্গে কাল ওখানে নাচছিলাম সে লোকটা আমায় জোর করে কতকগুলো মদ গিলিয়ে আমার সর্বনাশ করে গেছে। আমি আমার গলার লকেটসুদ্ধ চেনটা

খুলে সেই ওভার কোটের গোপন পকেটে রেখেছিলাম। আর কিছু টাকাও তার সঙ্গে ছিল। সব আমার নিয়ে গেছে শয়তান।

আবার হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল—মিসেস মায়ার।

কি বলে যে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছি না। অবস্থাটা আমারও বেশ সঙ্গীন। ভাবছি এই অবস্থায় ঘরে যদি শ্যামল কী শকসেনা কী অন্য কেউ এসে পড়ে কী ভাববে?

ভাবতে ভাবতেই দরজাতে টোকা পড়ল। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। তবুও উঠে দরজা খুলে দিলাম।

মিসেস মরিসন গুড উইস্ করেই বললে, কি ব্যাপার বোধি, এগারটা বাজে তোমার ঘুম ভাঙছে না। দু দুবার ডেকে গেছি এর মধ্যে—

বলতে বলতে সে ঘরে ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়াল ক্যাথলিন মায়ারকে দেখে। তারপরেই হি হি করে জঘন্য হাসি ছড়িয়ে চোখের একটা অত্যন্ত কদর্য ইঙ্গিত করে আমায় বললে, তোমাদের ভাব সাব হয়ে গেছে—বাঃ বাঃ খুব খুশী হলাম। এখন বোধহয় আর জানালার ধারে বসে একলা সময় কাটাতে হবে না। কি বল? আমায় জিন আর লাইম খাইও একদিন—

॥ ১৭ ॥

ডক্টর সিলভার রোজ গল্প করছিলেন। আমরা পরম আগ্রহে শুনছিলাম। আমি আর জ্যাক। ডক্টর রোজ বলছিলেন, লোক জাত জাত করে মরে কিন্তু জাতের এখন আছেটা কী? এদেশী একটা লোককে দেখে কেউ চট করে বলুক দেখি—সে স্কট, পিক্ট, এ্যাংলো-স্যাকসন্, না নরম্যান জাতের বংশধর। সব এক জায়গায় এসে মিলে গেছে, মিশে গেছে। এরা জানে না যে সব ঘেঁটে ঘুঁটে তৈরী হয়েছে একটা সাধারণ মানুষ জাত—যার রক্ত খুঁজলে আদিম জাতের সব কটার পাত্তা পাওয়া যাবে। এমন কি আইবেরিয়ান শ্যামলা লোকদের অস্তিত্বও যদি সেখানে থাকে তো আমি খুব বেশী অবাক হব না—

আজ সকালের সুন্দর রোদটা সমুদ্রের তীরে বালির উপর যেন হলদে রঙের একখণ্ড গালচে বিছিয়ে দিয়েছে। যদিও হাওয়াটা খুব ঠাণ্ডা কনকনে তবুও মনোরম রোদ আবার্ডিনের প্রায় অর্ধেক বাসিন্দাকে এই সমুদ্রের তীরে এনে ফেলেছে। আজ কাজের দিন। তা সত্ত্বেও অনেকে কাজ কামাই করে চলে আসছে এখানে।

মনোরম সকাল দেখে আমি আর জ্যাক এসেছিলাম বেড়াতে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ডক্টর সিলভার রোজের সঙ্গে। আমাকে দেখেই তিনি উৎসাহিত হয়ে

উঠলেন—এই যে ইণ্ডিয়ান জেণ্টলম্যান্, কী যেন নাম তোমার—সেদিন তো শোনান হয় নি। এসো এসো তোমাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি গল্প বলব বলে—

আমি উৎসাহিত হলাম। জ্যাক আমার গা টিপে আস্তে আস্তে বললে, আমার পরিচয় এখন পেশ কোরো না, খবরদার—

একটা বেঞ্চিতে কজন বসে পড়লাম। ডক্টর গল্প বলতে লাগলেন। এমন গল্প শোনাবার আগ্রহ খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছি এদেশে।

ডক্টর রোজ বলে যাচ্ছিলেন, মনে আছে তো পাঁচ শতকে আয়ারল্যাণ্ডের ডালরিয়াডা থেকে স্কটরা আর্গিলে এসে নতুন ডালরিয়াডা রাজ্যের পত্তন করল। পিক্টরা সরে গেল হাইল্যাণ্ডের ভিতর দিকে। তারপর অবশ্য স্কটদের সঙ্গে ঠোকা ঠুকি প্রায়ই চলতে লাগল। ওরাও ভুলে গেল যে ওদের উৎপত্তি স্থল একটা। সেটা হল কেল্ট জাত।

বললাম, ডক্টর, দয়া করে আজ স্কটল্যাণ্ডের সভ্যতা সম্পর্কে কিছু বলুন। শুনতে পাই রোম্যানরা নাকি এদেশে সভ্যতা আমদানী করে?

ডক্টর রোজ একটু হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, বাজে কথা। রোম্যানরা এদেশে এসেছিল লুট পাট করে কিছু নিয়ে যেতে। সভ্যতা বিলোতে তাদের বয়ে গেছে। তা ছাড়া সভ্যতা প্রচার করতে হলে সে দেশে দীর্ঘদিন বাস করতে হয়। রোম্যানরা তাদের ভোগৈশ্বর্য ছেড়ে এই কঠিন শীতের দেশে এসে পড়ে থাকবার পাত্রই ছিল না। তারা রাজ্য জয় করে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে বৃটনদের হাতে সমস্ত কিছুর ভার দিয়ে চলে গিয়েছিল। শুধু স্কট আর পিক্টদের অত্যাচার থেকে রাজ্য বাঁচাবার জন্য তারা একটা বিরাট পাঁচিল তুলেছিল। তার নাম রোম্যান পাঁচিল। কিন্তু সে পাঁচিল শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। স্কট আর পিক্টরা সে সব উড়িয়ে দিয়েছিল।

একটু থেমে ডক্টর রোজ বললেন, আসল সভ্যতা আসে এদেশে খৃষ্ট ধর্ম আসার সঙ্গে। সেণ্ট নিনিয়ান যখন প্রথম গ্যালাওয়েতে ঢুকলেন তাঁর সঙ্গেই এল সভ্যতার প্রথম রশ্মি। এর বেশ কিছুদিন পরে আরও বেশী করে সভ্যতার আলো এসে পড়ল স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকে—সেণ্ট কোলাম্বা আসার সঙ্গে। কিন্তু সভ্যতা সচেতন কোন স্কট ভদ্রলোকের নাম যদি তুমি আমায় করতে বল তবে সবচেয়ে আগে আমি নাম করব একাদশ শতকের স্কট রাজা ম্যাল্কম্ ক্যানমোরের। তাঁর ইতিহাস ভারী চমৎকার। শুনবে—

জ্যাক আর আমি এক সঙ্গে বলে উঠলাম, নিশ্চয়। বলুন, বলুন—

ডক্টর রোজ তাঁর মুখ থেকে মোটা চুরুটটা নামিয়ে নিলেন। পকেট থেকে টফি বার করে আমাদের হাতে দিলেন একটা একটা। নিজের মুখে পুরলেন একটা। বললেন, তা হলে গোড়া থেকেই শুরু করছি।

রোম্যানরা চলে যাবার পর বৃটনরা সীমান্ত রক্ষা করতে পারল না। রাজ্য

চলে গেল স্কট আর পিক্টদের কাছে। রাজ্য নিয়ে আবার স্কট আর পিক্টদের মধ্যে দারুণ লড়াই বাধল—এই স্কটল্যাণ্ডে। এদিকে রাজ্য হারিয়ে বৃটনরা জার্মানীর উত্তরদিক থেকে বলশালী যুদ্ধনিপুণ কতকগুলি লোককে নিয়ে এলো তাদের রাজ্য উদ্ধার করতে। এইসব লোকেরা এ্যাংলো-স্যাকসন। এরা এসে সারা দক্ষিণ বৃটেন ছেয়ে ফেলল। শেষে তারা বৃটনদের সঙ্গেই লড়াই করে তাদের হটিয়ে দিয়ে সমস্ত জায়গা দখল করে নিলে। তারাই দক্ষিণ বৃটেনের নাম বদলে নতুন নামকরণ করেছিল ইংল্যাণ্ড।

এদিকে তো রোম্যান পাঁচিলের ওপাশে লড়াই চলছিল স্কটদের সঙ্গে পিক্টদের। স্কটরা শেষ পর্যন্ত পিক্টদের মেরে সাবাড় করে দিলে। বাকী যারা ছিল তারা পাহাড় জঙ্গলে পালিয়ে গেল। কেউ কেউ বা চলে গেল অর্কনি, শেটল্যাণ্ড দ্বীপে। মোট কথা তারপরে পিক্টদের নামও কেউ আর শুনতে পেল না স্কটল্যাণ্ডে।

বৃটেনে এ্যাংলো-স্যাক্সনরা বেশ নির্বিবাদে কিছুদিন ভোগ দখল করবার পরই তাদের এক নতুন শত্রুর দল এসে জুটল সেখানে। এই নতুন দলের নাম নরম্যান। এরা যদিও দল বেঁধে এল ফ্রান্স থেকে তবুও আসলে ওরা ফ্রেঞ্চ মোটেই নয়। ওরা খাঁটি নর্স-জাতের লোক—নর্ডিক। ওরা প্রথমে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন থেকে দলবেঁধে আসে ফ্রান্সের উপকূলে। তারপর ফ্রান্সের রাজাকে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে খানিকটা জায়গা কেড়ে নিজেদের কলোনী করে। এই কলোনীর নাম ওরা দিয়েছিল নরম্যান্ডি—১০৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর—

ডক্টর রোজ যেন সমস্ত ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন এই রকম প্রত্যয় নিয়ে বলে চললেন সেই প্রাচীন ইতিহাস। তাঁর বলবার ধরনে উত্তর সাগরের তীর, অত লোকের যাতায়াত, সব আমাদের চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে বিদায় নিল। আমরা চলে গেলাম সুদূর অতীতে। দেখতে লাগলাম সেই সব ঘটনা প্রবাহকে।

রাজা হ্যারল্ড তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। বীর্যবান প্রথিতযশা বীরপুরুষ রাজা হ্যারল্ড। প্রকাণ্ড শরীর। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। বর্মাবৃত হয়ে থাকলে দেখায় যেন একটা টাইটান জাতের দৈত্য। সৈন্যদলের মধ্যে রাজাকে চেনা যায় অনায়াসে। তাঁর মাথা থাকে সবার উঁচুতে।

রাজা হ্যারল্ড সবে একটা যুদ্ধ শেষ করে একদল নরওয়ের জলদস্যু তাড়িয়ে একটু জিরোচ্ছিলেন এমন সময়ে দুঃসংবাদ এল, নরম্যাণ্ডির অমিততেজা ডিউক উইলিয়ম তাঁর ভীষণ সৈন্যদল নিয়ে এসে পড়েছেন সামনে। দূত বললে, সে গুনে দেখেছে দলে আছে ষাট হাজার বাছা বাছা যোদ্ধা।

সদ্য জলদস্যুদের তাড়িয়ে হ্যারল্ড তখন বেশ কমজোরী। তবুও হ্যারল্ড

একথা শুনে সিংহের মতো হুংকার দিয়ে উঠলেন। যা সৈন্য আছে সব সাজিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন উইলিয়মকে বাধা দেবার জন্য।

হেস্টিংসের কাছে দু দলে সাক্ষাৎ। ডিউক উইলিয়ম নিজে একজন খুব ভাল যোদ্ধা। তা ছাড়া তাঁর দলে যে ষাট হাজার লোক তিনি এনেছেন তারা প্রত্যেকে এক একজন ধুরন্ধর তীরন্দাজ। তাদের হাতে রয়েছে ক্রশবো—নতুন ধরনের অস্ত্র। তা থেকে তীর ছুঁড়লে বহুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য ভেদ করা যায়।

ইংলণ্ডের লোকেরা তখনও 'ক্রশবো' কাকে বলে জানে না। তারা এনেছে সাধারণ ধনুক আর তীর।

যুদ্ধ বেঁধে গেল। সারাদিন ঘোর যুদ্ধ চলল। দুদলের তীরে আকাশ ছেয়ে গেল। ইংলণ্ডের পক্ষে লোক মরতে লাগল ভীষণ তবুও কিন্তু উইলিয়ম-কে তারা কিছুতেই এগুতে দেবে না। এদিকে মরণ পণ করেছে রাজা আর তাঁর সৈন্যদল।

শেষে নরম্যানদের একজন সৈন্য দূরে একটা গাছের উপর থেকে দেখল ইংলণ্ডের সৈন্যদলের দিকে চেয়ে। তার নজর পড়ল একজন বিরাট উন্নতকায় যোদ্ধার ওপর যার মাথাটা সবার উপর জেগে আছে। সেইই ঘোড়ার পিঠে বসে সৈন্য চালনা করছে। সৈন্যটি আর কাল বিলম্ব না করে তার ক্রশবোতে একটা শক্ত ফলাওয়ালা বিষাক্ত তীর লাগিয়ে সন্ধান করল সেই উন্নত শিরকে।

হঠাৎ বজ্রের মতো একটা তীর এসে বিঁধল রাজা হ্যারল্ডের কপালে। মাথাটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। তিনি তক্ষুনি ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সূর্য তখন বাঁদিকে পশ্চিমে ঢলেছে।

রাজাকে পড়তে দেখে ইংলণ্ডের সমস্ত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যে যেখানে পারল পালিয়ে গেল আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে।

ডিউক উইলিয়ম—উইলিয়ম-দি-কনকারার, বিজেতা উইলিয়ম নাম নিয়ে বেশ কায়দা করে এসে বসলেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে।

যে সব নরম্যানরা তাঁকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের বেশীর ভাগটাই ভাগ করে দিলেন। নরম্যান জমিদারে ইংলণ্ড ভরে গেল।

পুরোনো বাসিন্দা এ্যাংলো-স্যাকসনরা মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে উইলিয়মের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সব বৃথা। উইলিয়ম কঠিন হস্তে সে সব দমন করলেন। শেষে তিনি আরও ভীষণ হয়ে উঠলেন এ্যাংলো-স্যাকসনদের ওপর। তিনি তাদের যা কিছু জমিজমা ছিল সব কেড়ে নিলেন। যাঁরা রাজকার্যে ছিলেন তিনি তাঁদের সেখান থেকে তাড়ালেন। পদমর্যাদা কেড়ে নিলেন। আর নরম্যানদের উঁচু পদে বসিয়ে সর্বময় কর্তা করে দিতে লাগলেন।

কিন্তু দুনিয়ায় সব কিছু ক্রিয়ারই ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে। বলে ডক্টর রোজ একটু থামলেন। আমাদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।—যখন এই ভীষণ অত্যাচার চলছিল ইংলণ্ডে তখন কিন্তু ছদ্মবেশে ভালও এল। নরম্যানরা ছিল এদিকে অনেক উঁচু সভ্য জাত। তারা নিয়ে এল শিল্পকলা। নিয়ে এল স্থাপত্য ভাস্কর্য। তারা ইংলণ্ডে দুর্গনির্মাণ পদ্ধতি প্রচলিত করল। তার আগে ইংলণ্ডের লোকেরা কাঠের বাড়িতে বাস করত। লম্বা লম্বা ক্রশবোর ব্যবহার, নতুন ধরনের যুদ্ধ রীতি এ্যাংলো-স্যাকসনরা শিখল নরম্যানদের কাছ থেকে। পরে এইসব কৌশল আয়ত্ত করে ইংরেজরা খুব ভাল ভাল তীরন্দাজ তৈরী করেছে নিজেদের মধ্যে। জয় করেছে বহু বড় বড় যুদ্ধ।

নরম্যানদের সামাজিক রীতি-নীতি, চাল-চলন ছিল অনেক উঁচু। তা ছাড়াও জাতীয় স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় নরম্যান ব্যারণরা তা খুব ভালই বুঝতেন। রাজাকে আইনের বাইরে এতটুকু যেতে দিতে বা কথা বলতে তাঁরা সুযোগ দিতেন না। নানা দিকে স্কুল বসল। ইংলণ্ডে বড় বড় শহর তৈরী হল প্রথম।

এদিকে হল কী—উইলিয়ম দি কনকারারের অত্যাচারে অনেক এ্যাংলো-স্যাকসন পালিয়ে এসে স্কটল্যাণ্ডে আশ্রয় নিলে। তারা ইতিমধ্যেই নরম্যানদের কাছ থেকে বেশ কিছু সভ্য চাল চলন শিখেছিল। তাই নিয়েই তারা স্কটল্যাণ্ডে এল। এই হল স্কটল্যাণ্ডে আসল সভ্যতার পত্তন। এ্যাংলো-স্যাকসনরা শিক্ষা-দীক্ষায় নরম্যানদের অনেক নীচে থাকলেও স্কটদের থেকে তারা ছিল অনেক ওপরে।

এখন এই যে এ্যাংলো-স্যাকসন দল স্কটল্যাণ্ডে এল সে দলের দলপতি হিসাবে এলেন স্যাকসন রাজ-বংশের একজন যুবক রাজা—নাম এড্‌গার এথেলিং। সম্প্রতি রাজ্য হারিয়েছেন উইলিয়ম দি কন্‌কারারের অত্যাচারে। আসলে ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারী হবার কথা তাঁরই। সেই যুবক রাজার সঙ্গে এলেন তাঁর দুই সুন্দরী যুবতী ভগ্নী—মার্গারেট আর ক্রীস্টিয়ানা।

তাঁদের রাজ্যহারা অবস্থায় দেখে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ম্যাল্‌কম্‌ ক্যানমোর পরম সমাদরে তাঁদের জায়গা দিলেন নিজের দুর্গে।

এই পর্যন্ত বলেই ডক্টর রোজ নিজের মনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আসলে হয়েছিল কী জান—

বলে কণ্ঠস্বর নীচু করে রহস্য করার মতো হাসতে হাসতে তিনি বললেন, যুবক রাজা ম্যাল্‌কম্‌ মুগ্ধ হয়েছিলেন রাজকন্যা মার্গারেটের রূপে।

মার্গারেট শুধু যে সুন্দরী ছিলেন তা নয়—তিনি ছিলেন অতিশয় শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না, একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের নারী।

রাজা ম্যাল্‌কম্‌ ক্যানমোর প্রণয়াসক্ত হয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন—১০৬৮ খৃষ্টাব্দে। রাণী মার্গারেট তাঁর স্বভাবে, অস্মিতায়, বুদ্ধিতে সব সময়ে প্রভাব

বিস্তার করে রেখেছিলেন তাঁর স্বামীর ওপরে।

এই মার্গারেটই সর্বপ্রথম স্কটল্যান্ডের রাজ-বংশে আদব কায়দা, ভদ্র চাল চলনের আমদানী করলেন। শুধু তাই নয় স্কটদের তিনি ইংরাজী শিখতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁর ছেলেদের নাম রাখলেন ইংরাজীতে। আর পত্তন করলেন—স্কটল্যান্ডের বংশ অনুযায়ী টার্টানের।

মার্গারেট একজন সত্যিকারের মহিয়সী মহিলা। অনেকে তাঁকে সেন্ট মার্গারেট বলে ডাকত। তাঁর স্বামী ম্যালকম্ যুদ্ধে গেলেন উইলিয়মের বিরুদ্ধে। মতলব উইলিয়মকে পরাজিত করে এডগার এথেলিংকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতে তিনি মারা পড়লেন।

যখন তিনি যুদ্ধে যান রাণী তখন মৃত্যুশয্যায়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরলে রাণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাবা আর বড় ভায়ের খবর কী? তাঁরা কেমন যুদ্ধ করছেন?

ছেলে চুপ করে রইল, উত্তর দিলে না।

মা তাকে জোর করলেন।—ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বল। আমি তোমার মা তোমার কর্তব্য আমার কাছে সত্য কথা বলা—

ছেলে মুখ নীচু করে ধরা গলায় জবাব দিলে—বাবা আর এডোয়ার্ড যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

মায়ের মুখ দিয়ে বার হল—করুণাময় ঈশ্বর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন তিনি সন্দেহ নেই।—বলে ডক্টর রোজ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, কিন্তু—

বলে চুপ করলেন আবার।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করল—আবার কিন্তু কি ডক্টর—

ডক্টর রোজ বললেন, সবই তাঁর ছিল ভাল—কেবল গ্যালিক ভাষা তিনি পছন্দ করতেন না—এইটাই কিছুতে বরদাস্ত করা যায় না।

জ্যাক আমার দিকে জনান্তিকে চেয়ে মুচকে হাসল।

ডক্টর রোজ বলতে লাগলেন, রাণী মার্গারেট গ্যালিক ভাষা তুলে দিলেন স্কটল্যান্ড থেকে। সেই থেকে স্কটল্যান্ডে ইংরেজী চলছে। কেল্টিক চার্চ-গুলোকেও তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। আসলে তাঁরই সময় থেকে স্কটরা যাকে বলে প্রভিন্সিয়াল তাই হল। তিনি যদি গ্যালিককে তখন অমন তাচ্ছিল্য না করে রাজমর্যাদা দিতেন ম্যাকিন্টরের সাধ্যি কী গ্যালিককে অসভ্য ভাষা বলে আজ গালাগালি দেয়—

আমরা এবার হেসে উঠলাম। ডক্টর রোজ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়েই বললেন—কটা বেজেছে দেখতো হে—

ঘড়িতে দেখি একটা বাজে।

ডক্টর রোজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, উঃ ভয়ানক খিদে পেয়েছে। এখান থেকে বাড়ি যেতে আরও প্রায় আধ ঘণ্টা নেবে। তোমাদের পাল্লায় পড়ে সকাল বেলা ভাল জ্বালাতন—

বলে সত্যি সত্যি বিরক্ত মুখ করে পিছন ফিরে বাস রাস্তার দিকে হনহন করে এগুতে লাগলেন।

জ্যাককে বললাম, তখন পরিচয় দিতে বারণ করলে কেন—

জ্যাক বললে, বুঝলে না? একবার যদি পরিচয় পেতেন উনি যে আমি প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের ছাত্র তাহলে তোমার ইতিহাস শোনার দফা গয়া হয়ে যেত। কিন্তু কী অদ্ভুত স্মরণ শক্তি ভদ্রলোকের। সন তারিখ শুধু নয় সব ঘটনার খুঁটিনাটি এমন জীবন্ত ভাবে মনে রেখেছেন যে ওঁর মুখে শুনলে মনে হয় যেন আমরা ঘটনার মধ্যেই রয়েছি।

বললাম, সত্যি। এখানকার কালচারের পিছনে যে এত কথা আছে আগে তা জানতাম না।

জ্যাক আর আমি সমুদ্রের ধার ছেড়ে এবার শহরের দিকে চলতে লাগলাম। রাস্তাটা সাউথ কন্‌স্টিটিউসন স্ট্রীটের পাশ দিয়ে চলে গেছে। মিসেস মরিসনের বাড়ির কাছে আসতেই জ্যাক বললে, তুমি ডিনারের খোঁজ কর গিয়ে। আমি এখন চললাম।

বলেই একটু দৌড়ে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল।

ঘরে এসে দেখলাম—আমার টেবিলের উপর খাবার ঢাকা রয়েছে। আর রয়েছে একটা খাম আমার নাম লেখা।

তাড়াতাড়ি খামটা খুলে পড়ে ফেললাম। এক চিলতে কাগজে লেখা আছে—

ডিয়ার মিস্টার, আমি এ বাড়ি ছেড়ে আজই চলে যাচ্ছি। যাবার আগে আপনাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাচ্ছি। আশা করি আমাকে আপনার মনে থাকবে। আমার কথা যতটুকু আপনি জানেন দয়া করে কাউকে বলবেন না।—ক্যাথলিন মায়ার।

ক্যাথলিন মায়ারের আসা থেকে আর যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত চিত্রগুলো চট করে মনের সামনে ভীড় করে এল। অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে খাবারের ঢাকনা খুলে খেতে শুরু করলাম।

॥ ১৮ ॥

সকালে ঘুম না ভাঙতেই জ্যাকের আবির্ভাব। ঘুম এখানে একটু দেরীতেই ভাঙে। বিশেষ শীতকালে। আটটা, সাড়ে আটটার আগে বিছানা ছাড়া এক কষ্টকর ব্যাপার।

মিসেস বেকশিল্প ঠেলা দিয়ে আমায় তুলে দিল। বললে, তোমার বন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে।

ধড়মড় করে উঠে জামা কাপড় না বদলেই দরজার বাইরে উঁকি দিলাম। হো হো করে হাসতে হাসতে জ্যাক আমায় সুপ্রভাত জানাল। তারপর রহস্যের ছলে বললে, কাল রাতে কোথাও পার্টি ছিল নাকি হে? মনে হচ্ছে মাথাটা তোমার এখনও বেশ ভারী হয়ে আছে—

জ্যাককে টেনে নিয়ে এসে ঘরে বসালাম। বললাম, এত সকালে, কি ব্যাপার?

জ্যাক বললে, এত সকাল বড় একটা নয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ প্রায় নটা বাজে।

ঘরটার ভিতর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, বাপরে, কী ঠাণ্ডা ঘরটা। এর মধ্যে তুমি আছ কেমন করে? বাড়িওয়ালী কি একটু আগুনও দেয় না? এ ঘরে থাকলে দু মাসের মধ্যে হয় তোমার বাতে ধরবে না হয় কোনদিন নিউমো-নিয়ায় মরবে। এ ঘর পাল্টাও—

বললাম, রাজী আছি। ভাল দেখে আস্তানা দেখে দাও, চলে যাব। কিন্তু এখনও তো তুমি বললে না এত সকালে এদিকে আসার কারণটা কী—

জ্যাক বললে, সাধ করে কী আর এই তিন মাইল ঠেলে এসেছি বৃষ্টিতে ভিজে। আমার প্রোফেসরের খোঁজ করছি শহরের এমাথা থেকে ওমাথা। তিনি ট্রাউজার জ্যাকেট সব ফেলে রেখে একটা ব্যারাকুটা চাপা দিয়ে ঘর থেকে যে কোথায় চলে গেছেন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। চল চল, ব্রেকফাস্ট সেরে চট করে আমার সঙ্গে বার হও দিকি। দেখি এতক্ষণে পুলিশে তাঁকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেছে কিনা। সারা শহর তো তোলপাড় করলাম—

মুখ হাত ধুয়ে তখুনি প্রস্তুত হলাম। বেকশিল্পকে ডেকে ব্রেকফাস্ট দিতে বললাম চটপট। ব্রেকফাস্ট আসতেই দুজনে ভাগ করে নিয়ে খেতে বসে গেলাম।

খেতে খেতে বললাম, কী কাণ্ড প্রোফেসরের, ট্রাউজার না পরে রাস্তায় বার হলেন। সত্যি সত্যি কী তাঁর মাথাটা খারাপ হল নাকি—

জ্যাক বললে, আরে, আর বোলো না কেচ্ছার কথা। সকালে ঘুমিয়ে আছি নিঃসাড়ে, কানের কাছে ঝনঝন করে উঠল টেলিফোন। উঠে ফোন ধরলাম। শুনি মিসেস ম্যাকিন্টর ডাকছেন। এখুনি যেতে হবে তাঁর বাড়িতে। ভাবলাম প্রোফেসারের বুঝি অসুখ বিসুখ কিছু হয়েছে। যেমন ছিলাম তেমনি জামা-কাপড় পরে নিয়ে দে দৌড়। গিয়ে দেখি মিসেস ভীষণ চিন্তিত মুখে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। আমাকে দেখে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কী? প্রোফেসারের কি কিছু হয়েছে? তিনি কোথায়—

তা মিসেস কোন কথা বলেন না। খালি কাঁদতে থাকেন আর ওয়াড্রোবের

মধ্যে ঝোলান দু জোড়া স্যুট দেখান। দু জোড়া স্যুটের এক জোড়া আনকোরা নতুন, আর এক জোড়া দেখেই চিনলাম প্রোফেসর গত ছমাস নিত্য সেটা পরতেন। অনেক কষ্টে মিসেসের কাছ থেকে উদ্ধার করলাম শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা। প্রোফেসর গত ছমাস যাবৎ ঐ একটা স্যুট গা থেকে নামান না। মিসেস মাঝে মাঝে জিদ করেন নতুন স্যুটের অর্ডার দেবার জন্যে। তা কিসে কি! প্রোফেসর নির্বিকার। কিছুদিন আগে মিসেস একরকম জোর করে এক দর্জি এনে কর্তার মাপ দিয়ে একটা সুটের অর্ডার দিয়েছেন। দুদিন আগে সেই স্যুট তৈরী হয়েও এসেছে। মিসেস অনুরোধও করেছেন পুরোনটা ছেড়ে নতুনটা পরতে। কিন্তু প্রোফেসর শুনেছেন ঐ পর্যন্তই। যেমন কোন কথা তাঁর মনে থাকে না এও তাঁর মনে নেই। গিন্নী শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে গত রাতে কর্তা বিছানায় যেতেই পুরোন স্যুটটা ওয়াড্রোবে ঢুকিয়ে চাবি দিয়েছেন। সকালে গিন্নী ঘুম থেকে উঠে পড়বার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেন কর্তা ঘরে নেই। এ ঘর ও ঘর খোঁজ করে কর্তাকে দেখতে না পেয়ে গিন্নীর মাথায় বজ্র ভেঙে পড়েছে। কর্তা এই এতো সকালে গেল কোথায়? তা ছাড়া স্যুট রইল ওয়াড্রোবের মধ্যে—তার চাবিও গিন্নীর কাছে। কর্তা তা হলে শ্লিপিং স্যুট পরে বার হলেন নাকি? পড়ার ঘরের আলনায় ঝুলত যে ব্যারাকুটাটা সেইটাই কেবল ঘরে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশে টেলিফোন করে পরে আমায় ডেকেছেন।

আমরা খাওয়া শেষ করে বার হয়ে পড়লাম। রাস্তায় নেমে জ্যাক বললে, এ সব লোককে নিয়ে তাদের গিন্নীদের কি বিপদ দেখো দিকি নি। বলে হো হো করে হাসতে লাগল।

কোথায় কোথায় খোঁজ করলে—

জ্যাক বললে, আজ সকালে তাঁর একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এই তোমাদের পাড়ায় 'স্যালভেশন আর্মির' কার্যালয়ে। সেখানেই খোঁজ করতে এসেছিলাম। তা দেখি তাদের অফিসের দরজাটার সামনে এখনো তালা ঝুলছে।

কিংস্ কলেজে তাঁর ঘরটায় খুঁজে দেখেছ—

—না, তা দেখি নি। কিন্তু এত সকালে প্রোফেসর তো কখনো কলেজের দিকে যান না।

কথা বলতে বলতে আমরা ইউনিয়ন স্ট্রীটের মোড়ে এসে পড়লাম। তারপর কিংস কলেজে যাবার বাসে উঠে বসলাম।

কিংস্ কলেজে ঢুকে আমরা দুজন খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রোফেসর ম্যাকিন্টরের স্টাডির দিকে ছুটে গেলাম। দেখি সেখানে প্রোফেসর দরজার দিকে পিঠ করে নীচু একটা টেবিলের ওপর রাখা একটা খোলা বইয়ের মধ্যে ডুবে বসে আছেন।

জ্যাক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, যাক বাঁচা গেল। উনি এখানেই রয়েছেন—

কলেজ তখনো শুরু হয় নি। কলেজ কম্পাউণ্ডে গোলমাল অনেক কম। কাজেই প্রোফেসরের ধ্যান বেশ জমাট বাঁধবার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের দুজনের পায়ের শব্দ প্রোফেসরের কানেও গেল না।

আমি নীচু গলায় বললাম, জ্যাক, উনি এখন বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন, ওঁকে বিরক্ত করা কী ঠিক হবে ?

জ্যাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—বিলক্ষণ। এখুনি ওঁকে ধরে না নিয়ে গেলে মিসেস আমার মুখ দেখবেন না আর এ জন্মে।

বলতে বলতে জ্যাক গিয়ে প্রোফেসরের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, গুড মর্নিং স্যর—

আমিও জ্যাকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

প্রোফেসর বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে গুড্ উইস্ ফিরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, পেয়েছি হে—

জ্যাক বললে, স্যর, আমরাও পেয়েছি। সকাল থেকে আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে এখানে এসে আপনাকে পেয়েছি। তাও এই বোধি বললে বলে। না হলে হয় তো আরও ঘুরতাম আজে বাজে জায়গায়।

প্রোফেসর যেন ঘুম থেকে উঠলেন। বললেন, কেন ? আমার এত খোঁজ-বার দরকারটা হোল কেন—

তারপর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সুরে বললেন, আমি কী ভগবান হয়ে গেছি নাকি। বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

জ্যাক বললে, না স্যর, সকালে আপনি বাড়ি থেকে বার হয়ে এসেছেন জামা কাপড় না পরে—

কথাটা শোনা মাত্রই প্রোফেসর তাঁর পায়ের দিকে তাকালেন। তারপর তাঁর মুখ ছাইয়ের মতো পাঁশুটে হয়ে গেল।

আমতা আমতা করে বললেন, ওহে, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। একদম খেয়াল করি নি। রোজই ঘুম থেকে উঠে স্যুটটা গলিয়ে নিই। সেটা আমার বিছানার মাথার কাছে আলনায় ঝোলান থাকে। আজ সেটা সে জায়গায় ছিল না। গিন্নীও তখন ঘুমোচ্ছে কাজেই আর জাগাই নি। স্টাডিতে গেছি আজ অনেক সকালে। কতকগুলো চিন্তা গতরাত থেকে এমন পেয়ে বসেছিল যে তাদের সুষ্ঠু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত মনটা বড় ছটফট করছিল। স্টাডিতে দু চারটে বই দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল হল—কলেজের স্টাডিতে রয়েছে এ সম্বন্ধে কয়েকজন অথারিটির লেখা বেশ কয়েকখানা বই। তাই আর দেরী না করে চটপট পায়ে হেঁটে চলে এলাম কলেজে। রাস্তাটা তখন বেশ নির্জন ছিল। অবশ্য এখন বুঝতে পারছি কলেজের দারোয়ানটা কেন আমায় দেখে অত মুখ টিপে টিপে হাসছিল। ওঃ বড্ড ভুল হয়ে গেছে হে ! ইস্ কী লজ্জার কথা—

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাদের জিমি আসলে এর জন্যে দায়ী। ওঃ এমন মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে ছোকরা গতকাল সন্ধ্যা বেলা থেকে যে আমার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। সাংঘাতিক ছোকরা—

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে প্রোফেসরকে তোলা হল। যদিও বাড়ি তাঁর কিংসু কলেজ থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা, তবুও এ অবস্থায় তো রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

প্রফেসরকে নিয়ে বাড়িতে পেঁছিতেই মিসেস ম্যাকিন্টর তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর মাথাটা রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললেন। প্রোফেসর মুখের ওপর অপ্রস্তুতের হাসি টেনে বোকার মতো আমাদের দিকে চাইতে লাগলেন বারবার।

জ্যাক থানায় টেলিফোনে খবর দিল প্রফেসরকে পাওয়া গেছে বলে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে প্রফেসর এসে তাঁর স্টাডিতে বসলেন। আমরা আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলাম।

প্রফেসর তাঁর বিরাট ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, আজ একটা ড্রামার অভিনয় হয়ে গেল, কী বল। ভাগ্যিস বেশী লোকে টের পায় নি। পেলে কিন্তু বেইজ্জতির চূড়ান্ত হত। প্রেসের লোকেরা খবর পায় নি তো—

বলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উঁচু হাসি হাসতে লাগলেন।

জ্যাক বললে, আপনার এ অবস্থার জন্যে জিমিকে দায়ী করছেন কেন ?

প্রফেসরের মুখের হাসি চট করে থেমে গেল। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর মুখ। ভুরু কুঁচকে বললেন, করব না ? সেই তো কাল সন্ধ্যে বেলা আমাকে তাদের সাহিত্য সভায় সভাপতি হবার জন্যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। দুটো ঘণ্টা যা অকথ্য যন্ত্রণা ওরা আমায় দিয়েছে তা আর বলার নয়। প্রথমে তো কয়েকজন মিলে কাব্য পাঠ করল। সে সব কবিতার আগাগোড়া, মাথামুণ্ডু আমি কিছু উদ্ধার করতে পারলাম না। তারপর হল জিমির প্রবন্ধ পাঠ। বিষয় কাব্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করল—কেমন লাগল জিমির প্রবন্ধ ?

প্রফেসর বললেন, প্রবন্ধের প্রথম দিকটা মন্দ লেখে নি ছোকরা। তা ছাড়া জিমির বলবার ঢংটাও বেশ উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ মাঝ পথে এসে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিলে। বললে, যে সব কাব্য সাহিত্যে তাৎকালীন পারিপার্শ্বিক সমস্যা ও তাদের সমাধানের কথা লেখা থাকে না তারা মহৎ সাহিত্য নয়। এই কথাটাকে ধরে জিমি—গ্যেটে, শিলার, স্পিটেলার, ব্রাউনিং, ডন্, মিল্টন্ কতক কতক পরিমাণে সেক্সপীয়রেরও মুণ্ডুপাত করে ছাড়ল। বললে, এদের বেশীর ভাগের মনোবৃত্তি হল পলায়নী। সমস্যা এড়িয়ে যাওয়াই ছিল এদের কাজ।

তাই অবাস্তব কাল্পনিক কতকগুলো চরিত্র ধরে নাড়াচাড়া করে গেছেন এঁদের কেউ কেউ। কেউ বা করছেন দুনিয়া ছাড়া রোমাণ্টিসিজমের চর্চা—যাদের বলা চলে অসার মানসবিলাস। জিমির কথা শুনে তো আমার চোখ কপালে উঠেছে।

বলতে বলতে ভয়ানক বিস্মিত হবার ভান করলেন প্রফেসর। সত্যি সত্যি তাঁর বড় বড় দুটো চোখ আরও বড় হয়ে উঠল।

আমরাও এ কথায় কম অবাক হলাম না।

জ্যাক বললে, জিমির এমন কথা বলবার কোন অধিকার নেই।

প্রফেসর বললেন, কেন নেই? মনস্তত্বের ছাত্র হয়ে তুমি এ কথা বলছ কেমন করে। সকলেরই সব কথা বলার অধিকার আছে, যতক্ষণ সেকথা অন্যের মর্যাদায় আঘাত না করে। তবে কথা কী জান? দুনিয়াটা তো একটা অচল নিরপেক্ষ পদার্থ। তাকে যে যেভাবে দেখবে তার কাছে সে ধরা দেবে ঠিক সেই রকম ভাবেই। আমার দুনিয়া আমার কাছে। তোমার দুনিয়া তোমার কাছে। জিমির দুনিয়া জিমির কাছে। গতকাল ঐ কথা শোনা থেকে আমার মাথার মধ্যে বেজায় তর্কের ভীড় জমেছিল। তাদের যদি আমি সাহিত্য সভায় বার করতাম তা হলে হয়তো ঝড় বইতো। কিন্তু সামলে নিয়েছিলাম ঐ আগের কথাটা ভেবে। তাই সভাপতির ভাষণে সেই কথাই বললাম। বললাম, জিমির দুনিয়া ছাড়াও আরও অনেক দুনিয়া তো আছে। সেটাও জিমির ভেবে দেখা উচিত ছিল প্রবন্ধটা লেখার আগে। যাঁদের কাব্যকৃতিকে জিমি নস্যাৎ করল তার প্রবন্ধে, তাঁদের কাব্য আজও এত অগুনতি বিদগ্ধ লোককে আনন্দ আর প্রেরণা দিচ্ছে যে তাদের মিথ্যে বলে অস্বীকার করতে কিছুতেই পারি না। সেদিক থেকে যে কাব্যের নমুনা আজ এই সভায় শুনলাম তাদের চেয়ে যে তারা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এ কথা বলার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

আমি বললাম, এ সম্বন্ধে তো সার কথাই আপনি বলে এসেছেন। তবে এতো চিন্তা কেন?

প্রোফেসর বললেন, গতকাল বললাম ঐ কথাগুলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এল কতকগুলো প্রশ্ন। জিমির কথা তো এক দিকে সত্যি। এঁরা কেউই তাঁদের বর্তমান কোন সমস্যা নিয়ে লেখেন নি। তাহলে তাঁদের কাব্যের আসল প্রয়োজনীয়তাটা কোথায়? কোন সমস্যা বা তার সমাধানের পথ না থাকলেও এত দিন ধরে এত বিদগ্ধ লোক কেন তাঁদের কাব্যকৃতিকে এত পছন্দ করেন? এ কথাগুলো ভাববার কথা বৈকি! তাই গত কাল থেকে ভাবতে ভাবতে এতো আনমনা হয়ে গেছি যে সকালে একটা বীভৎস কাজ করে ফেলেছি একেবারে অজান্তে তা খেয়ালই হয় নি। তবে আমি এখন পরিতৃপ্ত। আমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছি। এখন হাজারটা জিমির চীৎকারেও আমার বিশ্বাস ভাঙবে না।

জ্যাক বললে, কোথায় পেলেন সে প্রশ্নের জবাব—

প্রফেসর হাসিমুখে জবাব দিলেন—মহামনীষী ইয়ুং-এর কাছ থেকে। যে সমস্যা জিমি সেদিন তুলেছিল সেটা হল আসলে মনস্তত্ত্বের সমস্যা—বাইরের নয়। এই দেখ বইটা আমি আসবার সময় সঙ্গে করেই এনেছি।

বলতে বলতে তিনি বাঁ হাতের বগলদাবা থেকে একটা বই বার করলেন। তারপর আপন মনে কয়েকটা পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। একটু পরেই বলে উঠলেন, এই যে এই খানটায় পড়ে দেখ।

তাঁর আঙুল দিয়ে দেখান জায়গাটা পড়লাম—আমি আর জ্যাক। সেখানে ইয়ুং লিখেছেন—**We cannot, therefore, afford to be indifferent to the poets, since in their principal works and deepest inspirations they create from the very depths of the collective unconsciousness, voicing aloud what others only dream. But what the poets proclaim is only the symbol in which they sense aesthetic pleasure, without any consciousness of its true meaning.**

আমরা প্রোফেসরের মুখের দিকে তাকালাম সবিস্ময়ে।

প্রোফেসর বললেন, এই হচ্ছে আসল কথা। এই আনন্দানুভূতি যে কাব্যে যত বেশী সে কাব্য তত মহৎ।

প্রোফেসর এবার থামলেন। তাঁর মুখের ওপর খেলা করতে লাগল রহস্যময় একটুকরো হাসি। যেন তাঁর এ থামা আসলে থামা নয়। তিনি যেন আরও কিছু বলবার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছেন।

জ্যাক আর আমি দুজনেই চুপ করে বসে আছি। ঘরের টাইমপিস ঘড়িটা কেবল টিকটিক আওয়াজ করে চলেছে একভাবে।

একটু পরেই প্রোফেসর কথা বললেন। মুখের সেই হাসিটুকু বজায় রেখেই খুব গম্ভীর স্বরে বললেন, জিমির প্রবন্ধের জবাব খুঁজতে গিয়ে আজ সকালে আমার পরম লাভ হল। অনেক দিনের পুরনো কতকগুলো প্রশ্নের ভারী সুন্দর মীমাংসা পেলাম।

বলে আবার চুপ করলেন। মুখে তখনও সেই রহস্যময় হাসি।

জ্যাক জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে প্রোফেসরের মুখের দিকে তাকাল। আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম প্রোফেসর কী বলেন তারই জন্যে।

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, প্রশ্নগুলো তোমাদের সম্বন্ধেই বোধি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমাদের সম্বন্ধে আপনার কী প্রশ্ন থাকতে পারে প্রোফেসর—

প্রোফেসর আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিলেন না। বললেন, প্রশ্নের কথা পরে বলছি। এখন একটু নিজের কথা বলি। বহুকাল আগে একবার আমি ইণ্ডোলজি নিয়ে পড়াশুনো করেছিলাম। রিজ ডেভিড্‌স্‌, বাই গাড্ডেৎ, পল পিলিয়ট, সাভানা, প্রিন্সেপ্স, ম্যাক্‌স্‌মুলার, উইটারনীজ আমি একের পর এক শেষ করতে লেগেছিলাম। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অবশ্য নয়। পড়তে ভাল লাগত তাই পড়তাম। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যে কোন লেখা পড়বার সময় দেখেছি একটা রোম্যান্স আমায় পেয়ে বসত। পুরোন গল্প শোনবার রোম্যান্স অনেকটা রূপকথার মতোই আমার মনকে মুগ্ধ করত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। খুব বেশী যদি এ সম্বন্ধে করে থাকি তো ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ইণ্ডোলজী সেক্‌সনে গিয়ে মাঝে মাঝে অবসর বিনোদন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী ভারতীয় দর্শন আর অধ্যাত্মবিদ্যা যতবার পড়বার চেষ্টা করছি, ততবার তারা আমার কাছে ভীষণ ধোঁয়াটে বলে মনে হয়েছে।

আপন মনে কথা বলতে বলতে প্রোফেসর হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, তখন কী ছেলেমানুষীই না করেছি। ইণ্ডিয়ান সেক্‌সনে যাবার সময় আমি আমার সহকর্মী কোন-না-কোন অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। তারপর মিউজিয়ামের মূর্তিগুলো দেখবার সময় এক এক করে আমার বড় বড় গালভরা নামের থলি উজাড় করতাম সেই বেচারাদের ওপর।—ঋগ্বেদ, আরণ্যক, কঠোপনিষদ, হিরণ্যগর্ভ, মহাভারত, বিচিত্রবীর্য, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ—আরও বহু বহু। বোঝ একবার সে বেচারাদের অবস্থা। এই হল একটা দিক। আর অন্য দিকে আমি আমার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভারতীয় দর্শনকে বিচার করতে গিয়ে তাকে অনেকটা অযৌক্তিক ভূতুড়ে দর্শন বলে ধরে নিয়েছিলাম। মনে মনে আমি ভারতীয় দর্শনকে কৃপার চোখে দেখতাম। ম্যাক্‌স্‌মুলার, উইণ্টারনীজ কেন যে ভারতীয় দর্শন বলতে অজ্ঞান হতেন বুঝতে পারতাম না।

বলতে বলতে আবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমরা সবিস্ময়ে প্রোফেসরের এই আপন মনে খেলা দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ প্রোফেসর গম্ভীর হয়ে গেলেন দারুণভাবে। বললেন, আমি এই ফাঁকা কথার ফুলোন বেলুন ঘাড়ে করে হয়তো সারা জীবনই ঘুরতাম যদি একজন এসে এটাতে পিন ফুটিয়ে না দিত।

প্রোফেসর আবার একটু থামলেন। তারপর আপন মনে বলতে লাগলেন, ভারতীয় যারা এদেশে আসে পড়াশুনা করতে, তারা দেখেছি এদেশী ভালমন্দ সব কিছু সম্বন্ধেই বড্ড বেশী ভাবালুস। অক্‌স্‌ফোর্ডে থাকতে ভারতীয় ছাত্র আমার কম নজরে পড়ে নি। কিন্তু বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে খুঁজে পাই নি ভারতীয় হিসেবে। যেমন সাধারণ লোকে চিন্তা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডিগ্রী নেব, বড় একটা কিছু কাজকর্ম করব, তাতে পয়সারও সুরাহা হবে, সমাজেও প্রতিপত্তি হবে, সেই ধারণাই ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রবল দেখেছি। কদাচিৎ দু একজনকে দেখেছি যারা জ্ঞানচর্চাকে জীবনের তপস্যা হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু তার বেশী ব্যতিক্রম আমার নজরে পড়ে নি কোনদিন।

প্রোফেসরের গাম্ভীর্য সরে গিয়ে হঠাৎ সেখানে এক টুকরো ভারী মিষ্টি হাসি দেখা দিল।

বললেন, আমার বরাত সুপ্রসন্ন বলতে হবে, আমি এমন একজন ছাত্রী পেয়েছিলাম যে শুধু আমার কাছ থেকে শিখতেই আসে নি—আমাকে শেখাতেও এসেছিল। আমি অনিতা বোসের কথা বলছি—

বলেই তিনি জ্যাকের দিকে তাকালেন। দেখলাম জ্যাকের মুখ মুহূর্তে লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল। সে মুখ নামিয়ে বসল।

প্রোফেসর বলে চলেছেন, সেই মেয়ের সঙ্গে আলোচনার পর থেকে আমি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার মত পাল্টালাম। বলি শোন সে গল্প।

আমি তখন অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজের পাশ্চাত্ত্য দর্শন আর মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। তবে সবাই জানে আমার ইণ্ডোলজি সম্বন্ধে বেশ দখল আছে। তাই মাঝে মাঝে প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিই।

একদিন সন্ধ্যাবেলাকার একটা সাধারণ লেকচারে ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে একটা আলোচনা শেষ করে আমি আমার স্টাডিতে ফিরে আসছি, একটি কালো মেয়ে এসে আমাকে ধরল মাঝপথে।

স্যর, আপনি যা বললেন সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনার একটু সুযোগ হবে কি—

—নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তুমি তো বক্তৃতার হলে একটাও প্রশ্ন আমায় কর নি—

মেয়েটি বললে, এ বিষয়টা এতো গভীর আর এর প্রশ্নগুলোও এতো সূক্ষ্ম যে হল ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝখানে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে আমার কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। আমায় মাফ করুন স্যর।

আমি মেয়েটির কথায় খুবই অবাক হলাম। একটু দাঁড়িয়ে চিন্তা করে দেখলাম যে, বিষয়টা সত্যই যতোটা হাল্কাভাবে আমি নিয়েছি ততটা হাল্কা নয়। তাছাড়া ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা তার ইতিহাসের দিকটা। তার স্বরূপটা ব্যাখ্যা করেছি অল্প দুকথায়। বলেছি ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলো ধারা যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না বলে সব সময়ে বুদ্ধি-গ্রাহ্য নয়। তবে ভারতীয় দর্শন যে খুবই প্রাচীন দর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই —ইত্যাদি।

মেয়েটিকে নিয়ে আমি আমার স্টাডিতে ফিরে এলাম। মনে পড়ল লেকচার হলে মাঝে মাঝে তাকে দেখেছি। কিন্তু আমার যেমন অভ্যাস সবই আমি

ভুলে যাই তেমনি তাকে ভুলেও গিয়েছি। স্টাডিতে এনে তাকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে আমি তার সামনে জানলার উপর চেপে বসলাম মুখোমুখি।

বললাম, এইবার বল তোমার কী বক্তব্য।

মেয়েটি বললে, আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে স্যর, আপনি ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের ওপর একটু অবিচার করেছেন, ভারতীয় দর্শন কোন জায়গাতেই অযৌক্তিক নয়।

আমি মনে মনে একটু গরম হলাম। আমার অহংকারে রীতিমতো আঘাত করল মেয়েটির কথা। তবু বাইরে সেটা প্রকাশ না করে পরিহাস ছলে জিজ্ঞাসা করলাম—ভারতবাসী আজও তাদের প্রাচীন আধ্যাত্মদর্শনে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নাকি ?

মেয়েটি আমার চোখের ওপর চোখ তুলে জবাব দিল—সম্পূর্ণভাবেই করে—।

এতক্ষণে আমার তার চোখের ওপর নজর পড়ল। মাঝারি ধরনের ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার চোখ। দৃষ্টিতে কোন রকমের চাঞ্চল্যের লেশও নেই। দেখেই বুঝলাম মেয়েটি বুদ্ধিমতী তো বটেই বেশ একটা উঁচু অস্মিতার অধিকারিণী সে। তারপর আমার চোখের দৃষ্টি তার চোখ থেকে সারামুখে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বৃটিশ মিউজিয়মে রাখা দক্ষিণ ভারত থেকে আনা সেই অপূর্ব দেবীমূর্তিটার কথা—যার ভাস্কর্যে মুগ্ধ হয়ে আমি বেশ কয়েকবার গেছি তাকে দেখতে।

কিন্তু বাইরে আমার মনোভাবের কিছুমাত্র প্রকাশ না করে আগের মতোই পরিহাসতরল গলায় বললাম, তাইতেই বোধ হয় ভারতবর্ষে ভেল্কীর প্রচলন এতো বেশী। আচ্ছা তোমার কী এগুলোকে অবাস্তব বলে মনে হয় না।

বলেই বেশ বুঝতে পারলাম কথাটা বলা ভাল হল না। আরও বুঝলাম মেয়েটির দুটো কান এ কথায় ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। সে দুটো হাত তার কানের ওপর বুলিয়ে নিল। তারপর খুব নরম গলায় আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল—আপনি অবাস্তব বলতে কী বোঝাতে চাইছেন স্যর—

বললাম, যে সমস্ত তথ্যের সঙ্গে মানুষের জীবনের বা দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই তারাই অবাস্তব। যেমন ভূতুড়ে গল্প।

মেয়েটি আমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললে, আমায় মাফ করবেন স্যর,ভারতীয় হিসাবে আমার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত—

বললাম, তাতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোমার কথার যুক্তি তো কিছু পাচ্ছি না। শুধুমাত্র ভাবালুষতা দিয়েই তো একটা তথ্যকে সত্য বলে প্রমাণ করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন অকাট্য যুক্তির, বুঝলে।

তারপর গলাতে খানিকটা অনুকম্পার সুর মিলিয়ে বললাম, তোমরা ভয়ানক কল্পনাবিলাসী—

দেখলাম মেয়েটির চোয়াল দুটো একটুখানির জন্যে শক্ত হয়ে উঠল। তার চোখ দুটো দিয়ে মনে হল তীব্র একটা আলো ঠিকরে বার হচ্ছে।

মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আমাকে আবার নরম গলায় প্রশ্ন করল—আচ্ছা, লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে শিক্ষিত হতে আসে কেন। তার দরকারটা কী—

বললাম, শিক্ষা না পেলে আমরা কেমন করে বুঝব আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী—

সে হঠাৎ আমাকে একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন করে বসল যার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।—আপনি তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আপনি আমায় দয়া করে বলবেন কী আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী?

প্রশ্নটা শুনে আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। কারণ অনেকদিন ভেবে অনেক পড়াশুনো করেও আমি সত্যি বলতে কি জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থির ধারণা কিছু করতে পারি নি। কিন্তু সে কথার বিন্দুমাত্রও আভাস বাইরে দিলাম না। শুধুমাত্র কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলাম। পরে বললাম, জ্ঞানচর্চা। অন্ততঃ একজন অধ্যাপকের তাই হওয়া উচিত—

মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে বার হল—শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা—

বললাম, হ্যাঁ, জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চাতে আমি বিশ্বাসী। যেমন লোকে বিশ্বাস করে আর্টস্ ফর্ আর্টস্ সেক্—

আমার কথাগুলো সে চুপ করে শুনে গেল। তারপর বললে, আপনি ইন্ডোলজিতে সুপণ্ডিত শুনেছি। আপনাকে এ সব কথা বলা বাহুল্য, তবু বলছি, প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাপকরা কিন্তু আপনার মতো কথা বলতেন না। ভারতীয় ভাষায় অধ্যাপককে বলা হয় আচার্য। সব কিছু লব্ধ জ্ঞানকে জীবনে চর্যা করতেন তাঁরা। ছাত্রেরা তাঁদের কাছে শিখত কেমন করে জ্ঞানলব্ধ সত্যকে জীবনের প্রতিটি কাজে আরোপ করতে হয়। তাই তাঁরা যে সত্যগুলিকে কাব্যে, সাহিত্যে রূপ দিয়ে গেছেন সেগুলি হল তাঁদের জীবন দিয়ে উপলব্ধ সত্য। আর সেইগুলি হল ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন। এ দর্শন শুধু মানস বিলাসেরই উপকরণ নয়। এ তাদের সাহায্য করত মনের সবরকম জড়তা ও কমপ্লেক্স্ থেকে মুক্তি পেতে। সৎকাজে সাহায্য করতে—

কথাগুলো সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে সেই অদ্ভুত মেয়েটি এমন একটা অদ্ভুত গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিল যে তারা সটান আমার মনে এসে ধাক্কা দিয়েছিল। সেই সময়েই টের পেয়েছিলাম আমার মনের ফাঁকা অহংকারের বেলুনটায় সে পিন ফুটিয়ে দিল। সেটা চুপসে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর থেকেই বারবার প্রশ্ন জাগত মনে, মনুষ্যত্বের প্রকৃত অর্থ কী? কেমন করে তা লাভ করা যায়? আর প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে সত্যিকারের কী আছে

যা জীবনে আরোপ করলে সেই লক্ষ্যে পেঁছান যায় ?

আজ জিমির প্রবন্ধের জবাব খুঁজতে গিয়ে ইয়ুং-এর এই নতুন সংস্করণের বইটা আমার হাতে ঠেকল। উল্টে-পাল্টে দেখি এতে **type problem in poetry** চ্যাপ্টারে ইয়ুং বিশ্ব কাব্যের একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ রসাল মনোবিশ্লেষণ এর আগে আমার নজরে পড়ে নি। এর মধ্যেই আজ খুঁজে পেলাম ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা। তাইতো সকালে অত জমে গিয়েছিলাম কলেজ স্টাডিতে। ব্রেকফাস্টের কথা মনেও ছিল না। বেদ, উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইয়ুং কিন্তু বড় সাংঘাতিক কথা বলেছেন আমাদের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্পর্কে—যদিও আমি বিশ্বাস করি ইয়ুং-এর কথাগুলো ঠিক জ্বলন্ত আগুনের মতোই সত্যি। শোন আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি এই অংশটুকু।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বইটার কয়েকখানা পাতা উল্টে গেলেন। তারপর পড়তে লাগলেন—

Our western air of Superiority in the presence of Indian understanding is a part of our essential barbarism, for which any true perception of the quite extraordinary depth of those ideas and their amazing Psychological accuracy is still but a remote possibility. In fact we are still so uneducated that we actually need laws from without and a task master or Father above, to show us what is good and the right thing to do……why is this? Because under the barbarian's thin skin of culture the wild beast lurks in readiness amply justifying his fear. But the beast that is caged is not thereby conquered, There is no morality without freedom.

এখানে এসেই প্রফেসর থেমে পড়লেন। বললেন অনীতা সেদিন ঠিক এই কথাটাই উচ্চারণ করেছিল আমার বেশ মনে আছে—**There is no morality without freedom.** আশ্চর্য ! কীই বা তার বয়স তখন। কিন্তু তখনই তার চিন্তা পথ নিয়েছিল মহামনীষী ইয়ুং-এর চিন্তার পাশে পাশে। যদিও সে তখন পাশ্চাত্ত্য মনোদর্শনের খবর খুব বেশী কিছুই রাখত না। সে অক্সফোর্ডে এসেছিল পাশ্চাত্ত্য মনোদর্শন পড়বে বলে। সে যদি তখন ইয়ুং-এর কথাগুলো ঘুণাক্ষরেও জানত তবে বোধ হয় সব ফেলে রেখে আবার সাগর পাড়ি দিয়ে ফিরত সেই দিনই।

বলে প্রফেসর হো হো করে আবার হেসে উঠলেন। পরে বললেন, সব জিনিসের ভাল মন্দ আছে। জিমির প্রবন্ধের ঠেলা আমাকে আজ শেষ পর্যন্ত রত্নখনিতে এনে পেঁাছিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যেটুকু দ্বিধা আমার ছিল, ইয়ুং পড়ে সেটুকু নিঃশেষ হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের লক্ষ্যও যে কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও আমার মনে তর্ক ঘুচেছে।

জ্যাক প্রফেসরকে প্রশ্ন করল—কী হওয়া উচিত বলে আপনি স্থির করলেন ?

প্রোফেসর গভীর গলায় বললেন, সাইকোলজিক্যাল এ্যাক্যুরেসি অর্থাৎ একটা ভরাট নিখুঁত আনন্দময় মনের অধিকারী হওয়া। সে মন হাজার দ্বন্দ্বের দোলাতেও দুলবে না। দুঃখের আঘাতে, ঈর্ষা-মোহ-প্রলোভনে থাকবে অনড় অচল। মনের এই অবস্থাই হল পূর্ণ শান্তি—সুপ্রীম ব্লিস। এ লক্ষ্যে পেঁাছান বড় সোজা কাজ নয়। তবে একে যদি লাভ করতে চাও তাহলে ভারতীয় আধ্যাত্মবিদ্যা হল তার সবচেয়ে বড় পথ।

প্রোফেসর থামালেন। তাঁর চোখে মুখে একটা দিব্য আলো খেলা করছিল। তাঁকে মনে হচ্ছিল পরম পরিতৃপ্ত সুন্দর একটি মানুষ। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হঠাৎ কেন জানি না শুদ্ধসত্ত্বের চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠল।

॥ ১৯ ॥

সেদিন দুপুরে বন্ এ্যাকর্ড্ টেরাসে গিয়েছিলাম একটা বাড়ি দেখতে। বাড়িটা পছন্দ হল না। ক্ষুণ্ণমনে ফিরে আসছিলাম। মিসেস মরিসন-এর বাড়িটা এখুনি ছাড়তে পারলে ভাল হয়। ইদানীং বোর্ডিং খরচ বেশী হচ্ছে বলে অজুহাত দেখিয়ে মিসেস মরিসন ছুটির দিনে সারাদিন ঘরে আলো জ্বালাতে দেন না। অথচ এ দেশে এই ধোঁয়া আর কুয়াশার রাজত্বে ঘরে আলো না জ্বাললে পড়াশোনার কাজ কিছু চলে না। মিস্টার মরিসন সারা দিন ঘরের দরজায় দরজায় টোকা দিয়ে তদারকি করে বেড়ান কোন বোর্ডার আলো জ্বালল কিনা। ঘরে যদি আলো জ্বলে তো তিনি ঘরে ঢুকে সটান আলো নিভিয়ে দেন।

বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেবার কথা। এমন সময় মনে হল, আমাকে কে যেন ডাকল। পাশে তাকাতেই দেখি লম্বা ওভারকোট পরা, মুখ ভরা গোঁফ-দাড়ি, মাথায় পাগড়ী এক পাঞ্জাবী শিখ। বয়স হবে বড় জোর বছর ত্রিশ। আমি চোখ তুলে তাকাতেই তার গোঁফ দাড়ির জঙ্গল চিরে সাদা পরিপাটী দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়ল। আমায় জিজ্ঞাসা করল—হোয়েন কাম্, হোয়ার ক্যাম্, হোয়াই কাম্ ?

তার চোখ দুটোর দিকে চেয়ে মনে হল সে দুটো খেঁকশেয়ালের চোখের

মতো ধূর্তামীতে ভরা।

বুঝলাম লোকটি এখানে আর যাই করতে আসুক না কেন শিক্ষা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে সে আসে নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দিন কতক আগে 'ইভনিং নিউজের' একটা খবর। বেশ বড় বড় হরফে আবার্ডিন-এর ইভনিং নিউজ ঘোষণা করেছিল—ইদানীং আবার্ডিন শহরে ইণ্ডিয়ানদের বড় উপদ্রব হয়েছে। তারা যে শুধু পেডলারের (ফিরিওয়ালার) বেশে স্যুটকেশ হাতে নিয়ে ভদ্রলোক-দের অন্দর মহলে হুটহাট ঢুকে পড়ে মহিলাদের বিরক্ত করে তাই-ই নয়, তারা মেয়েদের আণ্ডারওয়ার, নাইলনের মোজা, ব্রেসারি, রুমাল এই সব জলের দরে বিক্রী করে বাজারের ভাল দোকানগুলোকে লোকসান খাওয়াচ্ছে। আর যাই হোক, ফিরি করতে তো আর এস্টাব্লিস্‌মেন্ট কস্ট লাগে না। এছাড়াও এই সব ইণ্ডিয়ানদের অন্যান্য কু-কীর্তির চোটে আবার্ডিনের শান্ত আবহাওয়া একটু চঞ্চল হয়েছে।

বলে ইভনিং নিউজ একটা খবর দিচ্ছে—সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাসল্‌ গেটের চৌমাথায় একজন ইণ্ডিয়ান পেডলার মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে একটা মেয়ের হাত ধরে টানে। তারপর হৈ-হৈ বাঁধে। মারামারি হয়। সে নাকি চার পাঁচটা লোকের নাক ফাটিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ছুরি বার করে। শেষে পুলিশ এসে সে হাঙ্গামা মিটোয়।

সেদিন খবরটা পড়ে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এখানে যে আর কোন ভারতবাসী আছে তা আগে আমার ধারণা হয় নি। তাছাড়া খবর দেখে মনে হচ্ছিল তারা একজন দুজন নয়—বেশ একটা দল। শিখটিকে দেখে হঠাৎ আমার সেইকথা মনে হল। হাসিমুখে তার অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কী কর? ব্যবসা?

সে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে—নো, পামিস্ট্রি।

তার চোখ দুটো ধূর্তামীর হাসি হাসতে লাগল।

আমি তাজ্জব বনে গেলাম। বেশ একটা কৌতূহলও লাগল। এই সুদূর দেশে এসে শুধুমাত্র হাত দেখে লোকটা রোজগার করছে। তাও ইংরেজী ভাষা তার বিশেষ আয়ত্তে নয়।

আমি এবার হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা করলাম—কী নাম? কোথা থেকে এসেছ?

সে যেন স্বর্গ হাতে পেল মনে হল। খুব খুশী হয়ে জবাব দিল—মেরা নাম কর্তার সিং। মোকান গুরুদাসপুর, পঞ্জাব—

বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েই কর্তার সিংয়ের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। তার কাছেই খবর পেলাম, এই আবার্ডিনে প্রায় শ খানেক শিখ আছে যারা পেডলারের ব্যবসা করে। পাঞ্জাব ভাগ হয়ে যাবার পর তারা এই পথে জীবিকা নিতে

বাধ্য হয়েছে। তাদের বেশীর ভাগ থাকে বন্ এ্যাকরড্ টেরাসের কাছে একটা পাড়াতে। তবে সবাইকে এখন আর পাওয়া যাবে না। তাদের একটা বড় দল সকাল বেলাতেই রোজ বেরিয়ে যায় বাসে করে দূর দূরান্তর পল্লী বা ছোট ছোট শহর অঞ্চলে। ফেরে রাত্রে কিম্বা হয়তো দুচার দিন পরে।

কর্তার সিং আমাকে কিছুতেই ছাড়ল না। বললে, বিলায়েতে এসে হিন্দুস্থানীতে বাত্‌চিজ্ হরগিজ কেউ করে না। সবাইতো সাবলোক বনে যায়। তুমিই দেখি একমাত্র ভদ্দর আদমী যে এখানে হিন্দুস্থানীতে বাত্‌চিজ্ করল। তা চল আমাদের আস্তানায়। এক সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে আর অনেকের সঙ্গে আলাপও হবে।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে পাড়ার মধ্যে এলাম। এ অঞ্চলটা নিম্ন মধ্যবিত্তের পাড়া। অন্তত এর বাড়িগুলো তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। বেশীর ভাগই একতলা আর পুরনো। এখানকার বাসিন্দাদের অবস্থাও ঐ বাড়িগুলোরই মতো। তাদের চেহারায় আর পোশাক পরিচ্ছদেই সেকথা মালুম হয়। কর্তার সিং আমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। এক চিলতে একটা সরু লম্বা ঘরে ছোট ছোট চেয়ার টেবিল পাতা। তাতে প্রায় জনা-কুড়ি-পঁচিশ লোক ঠেসাঠেসি করে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে।

আমি আর কর্তার সিং গিয়ে একটা খালি টেবিল দখল করলাম।

চর্বি গলান গন্ধের সঙ্গে মাংস আর ডিমের গন্ধ মিশে ঘরের ভিতরকার বাতাসটা ভারী হয়ে উঠেছে। চার পাঁচটা মেয়ে খাবার পরিবেশন করছে। যদিও তাদের সবারই ঠোঁটে লিপস্টিক আর গালে রুজের প্রলেপ তবুও খোলা হাত দুটো থেকে বেশ বোঝা যায় যে তাদের রং ফ্যাকাশে। স্বাস্থ্যও কারুর খুব একটা ভাল নয়। তাদের এ্যাপ্রনগুলো টেবিল ক্লথের মতোই নোংরা। খরিদ্দার-দের বেশীরভাগই দাড়িওয়ালা পাগড়ীমাথায় শিখ। কিছু কিছু সাদা চামড়াও যে নেই তা নয়। তবে তারা নিতান্ত নগণ্য। খরিদ্দাররা খাচ্ছে আর অপক্ষপাতে খেলো হাসি ঠাট্টা করছে দোকানের মেয়েগুলোর সঙ্গে। তাদের কথাবার্তা আর মুখচোখের ভঙ্গী সব সময়ে শ্লীলতা মেনে যে চলছে না তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু মেয়েগুলোও কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

কর্তার সিং গোস্ত কাবাব আর পরোটা অর্ডার দিল। তার সঙ্গে সেমায়ের ফিণী। আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, এডিনবরা, গ্লাসগোর কথা জানি না। কিন্তু সারা স্কটল্যাণ্ডে বোধ হয় এই একটা দোকান যেখানে তুমি খাঁটি ইণ্ডিয়ান রান্না পাবে। তা ছাড়া দামও খুব সস্তা। এই দোকানের রাঁধুনী বুড়ী এক পাঞ্জাবী ফৌজী সর্দারের বৌ। লাহোরে ছিল প্রায় পঁচিশ বছর। দোকানের মালিকও সে—নাম মিসেস খান। গুরুমুখী আর উর্দু বলে মাতৃভাষার মতো।

গরম গরম খাবার এসে গেল। যে মেয়েটা খাবার নিয়ে এল প্রথমেই আমাকে দেখে একবার ফিক করে হেসে চোখ মটকালো। তারপর পিছন ফেরবার সময় কর্তার সিংকে চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করল—আমি কে? কর্তার সিং ইশারাতেই আশ্বাস দিল—পরে বলব।

গরম গরম পরোটা আর কাবাব ভারী উপভোগ করছিলাম। কর্তার সিং খেতে খেতেই গল্প করে যাচ্ছিল। নানান কথা। আশ্চর্য লাগল এই ভেবে যে, সে একবারও আমার সম্বন্ধে জানতে চায় নি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে। কেবল সেই প্রথমে তিনটি প্রশ্ন করেছিল—হোয়েন কাম, হোয়্যার কাম্, হোয়াই কাম্? —তা তাও আমার মনে হয় কেবল আমার সঙ্গে আলাপের মুখপাত হিসেবেই সে কথাগুলো জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরের অপেক্ষাও সে করে নি। লোকটা নিজের কথা শোনাতেই পঞ্চমুখ। কী করে সে বিলেতে এল। জাহাজ ভাড়ার টাকা খুড়োকে ঠকিয়ে কেমন করে জোগাড় করল। কী করে সে এই বিলেতী মুখ্খুগুলোর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পয়সা রোজগার করছে। সে তার সেই সব অতি জরুরী খবরগুলো আমায় শোনাতে লাগল। তার কথা শুনে মনে হল সে বেশ ভালই রোজগার করে।

নানা কথার ফাঁকে এক সময়ে তার চোখে ধূর্ত হাসি হাসতে হাসতে সে বললে, একটা চেম্বার খুলব ঠিক করেছি ব্রীজ স্ট্রীটের চৌমাথায়। গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইয়োগী, পামিস্ট এণ্ড্ এ্যাস্ট্রোলজার নাম দিয়ে। একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রাখব দোভাষী যে আমাকে সব কথা হিন্দুস্থানীতে বুঝিয়ে দেবে আর ইংরেজীতে খদ্দেরকে আমার কথা বলবে। মিসেস খান আমাকে এই মতলবটা দিয়েছে। তার একটা মেয়েকে সে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে দিতে রাজী আছে।

হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করল—তুমি কী বল?

আমি একটু বিপদে পড়লাম। এদিক ওদিক চাইতে লাগলাম উত্তর দেবার আগে। হঠাৎ আধা-অন্ধকার কোণে নজর পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। সেখানে দেখলাম, জ্যাকের প্রণয়িনী অদ্রে পিয়ার্সন একটা শিখের সঙ্গে খেতে খেতে গল্পে এত মশগুল যে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও সে আমাকে চিনতে পারল না।

আমি নিজেই কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম।

আমাদের খাওয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কর্তার সিং চায়ের অর্ডার দেবার আগেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে সর্দারজী। আমায় মাফ করতে হবে। আমার ভয়ানক জরুরী একটা এনগেজমেণ্ট আছে এক্ষুনি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে আমি শীঘ্রই দেখা করব—

বলেই উঠে বেরিয়ে এলাম। কর্তার সিংও আমার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের

বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে আগের মতোই ধূর্ত হাসি হেসে বললে, মনে হল তুমি ঐ কোণের মেয়েটাকে চেন।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, লণ্ডন থেকে আমরা এক বাসে গ্লাস্‌গো এসেছিলাম, তাই মুখটা চেনা লাগল।

কর্তার সিং বললে, ও আমাদের প্রীতম্‌ সিং-এর গার্ল ফ্রেণ্ড। ওর সঙ্গে নাকি প্রীতম্‌ সিং-এর অনেক আগে লণ্ডনে আলাপ ছিল। যাক্‌ গে—

কর্তার সিং আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, আচ্ছা তুমি তাহলে আবার এসো, কেমন? এখানে এই দোকানে খোঁজ করলেই আমার পাত্তা মিলবে।

বলেই সে আবার দোকানে ঢুকে পড়ল। আমি ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়লাম দোকান থেকে।

পরের দিন বিকেল চারটে নাগাদ গেলাম মিসেস খানের দোকানে। তখন খুব বেশী ভীড় ছিল না। দেখলাম এক পাশে কর্তার সিং একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে এদেশী একটি শ্রমিক লোকের হাতের চেটোটা দেখছে খুব মন দিয়ে।

হোটেলের একটা মেয়ে কর্তার সিং-কে ডেকে আমায় দেখিয়ে দিলে। কর্তার সিং আমাকে একধারে বসবার ইঙ্গিত করে আবার সেই লোকটার হাতের চেটোর ওপর ঝুঁকে পড়ল।

অনেকক্ষণ হাতটা নেড়ে চেড়ে ঘুরিয়ে দেখে দুচোখ বুজিয়ে চুপ চাপ ভেবে নিয়ে সে আস্তে আস্তে কতকগুলো কথা বলতে লাগল নীচু গলায়। আমি দূরে থেকে সে সব কথা শুনতে পেলাম না, কিন্তু লোকটার মুখ দেখে বুঝলাম কর্তার সিং তাকে ভাল ভাল কথাই বলছে।

হাত দেখা শেষ হলে লোকটা তার পকেট থেকে একটা এক পাউণ্ডের নোট বের করে কর্তার সিং-এর হাতে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কর্তার সিং এবার আমার কাছে উঠে এল। বললে, গতকাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। তুমি কী করতে এসেছ এখানে, পড়াশুনো করতে—

—না।

কর্তার সিং বললে, তাহলে কী কাজকর্ম করতে এসেছ?

—তাও না।

—তোমার খরচ চলে কেমন করে? দেশ থেকে আসে—

—সে সুবিধে নেই—

কর্তার সিং তখন তৃপ্তির হাসি হেসে বললে, ও বুঝেছি, রোজগার করে পড়াশুনো করতে চাও, তাই না? তা আমি তোমাকে একটা রোজগারের হদিশ দিতে পারি। তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজটা করবে?

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? মিসেস খানের মেয়ের কী হল?

কর্তার সিং একটা কটূক্তি করল। বললে, মিসেস খানের মতলব খারাপ।

মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে গছাতে চায়।

হেসে বললাম, ভালই তো, স্ত্রী প্রাইভেট সেক্রেটারী হলে একটা খরচ তো বেঁচেই যায়।

—তাকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় ক্ষুর দেওয়া ভাল। বললে কর্তার সিং।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, তার সঙ্গে তো তোমার আলাপ আছে।

—আলাপ আছে বলেই তো বলছি। সময় কাটাবার জন্যে এক আধটা রাত্তির তার সঙ্গে ফুর্তি করা যায়। সে রকম ফুর্তি এ পাড়ার কোন ছোঁড়াটা ঐ মেয়েটার সঙ্গে না করেছে? তা বলে বিয়ে—

—আপত্তি কিসে?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—ওরা খৃষ্টান, গরু খায়—কর্তার বললে।

একটু হেসে জিজ্ঞেস করল—তা তোমার কটা গার্ল ফ্রেণ্ড হল?

—একটাও না।

কর্তার বললে, সে কি? এদেশ হল ফুর্তির দেশ। আরে ভাইসাব—

কচ-কচ কচৌড়ি খিয়া করো,
দুধ বাতাসা পিয়া করো,
জেনানা লেকে মৌজ করো।

না করলে দেশে গিয়ে আফসোস করতে হবে বলে দিচ্ছি।

আমি আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে আসল কথাটা পাড়লাম। কর্তার সিং যতই ধূর্ত হোক আমার কৌতূহলের বিন্দুমাত্রও সে ধরতে পারবে না।

বললাম, হ্যাঁ তা খাস্তা কচুরিই বটে। কাল তো দেখলাম তোমাদের প্রীতম সিং-এর সেই মেয়ে বন্ধুকে। ওকে যদি খাস্তা বল তো—

—ওর কথা বাদ দাও। বললে কর্তার সিং। ও হল লণ্ডনের অনেক পোড় খাওয়া মাল। প্রীতম সিং একটু আবার পাকা জিনিস পছন্দ করে কিনা, নৈলে ওর জুৎ হয় না। তা ছাড়া ওদের জানাশোনাও অনেক দিনের। মেয়েমানুষটা লণ্ডনে থাকতে একটা নিগ্রো ব্যবসাদারকে ফাঁসিয়ে অনেক টাকা হাত করেছিল। প্রীতম সিং বোধ হয় তার কিছু হাতাবার তালে আছে। ওকে জপাচ্ছে আমেরিকা নিয়ে যাবে বলে। আমেরিকায় প্রীতম সিং-এর ভাইয়ের ব্যবসা আছে।

আমি মনে মনে আঁতকে উঠলাম। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ না করে চায়ের অর্ডার দিলাম। আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে দেখলাম একজন বিশ বাইশ বছরের তরুণ শিখ এসে কাছে দাঁড়াল। কর্তার সিং আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, নেতাজীর দেশের লোক। খুব ভাল লোক, বুঝলে যোগীন্দর সিং। খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—কী করতে এসেছ এখানে?

সে অপক্ষপাতে বুক চিতিয়ে জবাব দিল—স্ফুর্তি করতে—

কর্তার সিং রসিয়ে রসিয়ে বললে, তা সেদিক দিয়ে আমাদের যোগীন্দরের বাহাদুরী আছে। ওর বয়সে আমরা যা পারি নি ও তাই করে নিলে—

যোগীন্দর সিং আমাদের সামনে আর দাঁড়াল না। রেস্টুরেন্টের একটা মেয়ের দিকে চোখ মটকে কী একটা রসিকতা করে তার সঙ্গে দূরে একটা টেবিলের ওপর মুখোমুখি বসল।

কর্তার সিং বললে, সাংঘাতিক ছেলে। পঞ্চ-মকারে কারুর সাধ্যি নেই ওকে টপকে যায়। ওকে সামলাতে ওর বুড়ো বাপ ভারতবর্ষ থেকে ছুটে এসেছে এখানে। তারপর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললে, বাপকে দেখলে কিন্তু তুমি একদম অবাক হবে। ভারতবর্ষ থেকে এদেশে এসেছে জাহাজে কেবল ছাতু আর চানা খেয়ে। এখানে এসেও নিজে রান্না করে খায় নিরামিষ। দিবারাত্র গ্রন্থসায়েবজীকে পুজো করে। ভগৎ আদমী। ভারী ভাল লোক। তার নিজের অতবড় ব্যবসা সবই নিজে তৈরী করেছিল। ছেলেকে পাঠিয়েছিল এখানকার ব্যবসা দেখতে। তা ছেলের তো এই দশা। সবই নসীব, বুঝলে দোস্ত—

বললাম, তোমরা তো ওর বড় ভাইয়ের মতো। ওকে একটু সামলাতে পার না?

কর্তার সিং জিভে আর তালুতে একটা শব্দ করে বললে, হায় ভগবান, ওকে সামলাতে স্বয়ং ভগবান পারবেন কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া এদেশে কে কার গার্জেন? ও আমার কথা শুনবে কেন? মাঝখান থেকে আমার ব্যবসাতে লোকসান পড়ে যাবে। ও আমার একজন বড় মাতব্বর।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার ব্যবসা তো পামিস্ট্রি। ও কি তোমার খদ্দের জোগায়—

কর্তার সিং এবার তার সেই ধূর্ত হাসিটা হাসতে হাসতে জবাব দিলে, তার চেয়ে বড় কারবার আমার আছে। দাওয়াই-এর কারবার।

আমি তার কথার আগাগোড়া কিছু বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কীসের দাওয়াই? এদেশে ভারতীয় ওষুধের চল আছে নাকি?

কর্তার সিং চোখ মটকে বললে, ঠেকায় পড়লেই ভারতীয় ওষুধের দরকার হয়। মেয়েছেলেরা বেসামাল হয়ে পড়লেই আমার কাছে ছুটে আসে। ছুরি নয় কাঁচি নয়—একটি শেকড়েই কাজ ফর্সা—

কর্তার সিং-এর কথা শুনে আমি আঁতকে উঠলাম। ভেতর থেকে একটা তীব্র বিরূপ মনোভাব আমাকে সেখান থেকে ঠেলে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তবুও আমি বসেই রইলাম।

কর্তার সিং আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে বললে, যতক্ষণ আমি আছি এই

আবার্ডিন শহরে, কোন ভাবনা নেই দোস্ত, চোখ বুজিয়ে স্ফুর্তি কর। তোমার কাজ না হয় আমি বিনা ফিতে করে দেব।

বলে দাঁত বার করে বিশ্রী হাসতে লাগল।

একটু পরে হাসি থামিয়ে বললে, রেস্টুরেন্টের একটা ছুকরী তোমার সঙ্গে আলাপ করবে বলে খুবই ঝুঁকেছে। আলাপ করবে নাকি ? মেয়েটা তোমায় খুশী করতে পারবে। একলা একলা অনেক সময় মন মেজাজ তো খারাপ হয়ে যায়। তখন তাকে নিয়ে একটু আধটু ফুর্তি করতে পার।

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, অনেক ধন্যবাদ তোমায় সর্দারজী। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে—

রেস্টুরেন্টের ঘর থেকে বারান্দায় বার হয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে গতকালের সেই খাবার পরিবেশন করা মেয়েটাও আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে একটা কটাক্ষ হেনে বিদ্রূপ বাণ ছুঁড়ল—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে এত ভয় ?

খিলখিল করে হেসে উঠল সে। আমি আর কোন কথা না বলে সটান রাস্তায় নেমে হাঁটা দিলাম।

এরই দুচারদিন পরে এক শনিবার সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম মিঃ টার্নারের চ্যাপেলে। বন এ্যাকরড্ টেরাসের পাড়ায়। মিঃ টার্নারের চ্যাপেলটা মিসেস খানের রেস্টুরেন্ট থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

মিঃ টার্নার বিরাট বপু, থলথলে ভুঁড়িওয়ালা, মাঝবয়সী ভদ্রলোক। মাথা-জোড়া টাক। তাঁর মুখে সব সময়ে খেলা করে লোক দেখান একটা আত্মতৃপ্তির ভাব। ভদ্রলোক কাজ করেন শ্যামলদের ফার্মে। কিন্তু প্রত্যেক শনিবার বিকেলে চ্যাপেলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধর্মকথা শোনান।

আমার সঙ্গে আলাপ হবার সময় আমাকে তিনি চ্যাপেলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। শ্যামলও অনেকদিন ধরে খোঁচাচ্ছিল।—ভদ্রলোক প্রায়ই বলেন দাদা আপনাকে নিয়ে যেতে। আজ চলুন।

এদিক ওদিক করে এড়িয়ে যাই। সেদিন আর এড়াতে পারলাম না।

শ্যামল আমাকে এনে ফেলল বন এ্যাকরড্ পাড়ার একটা মাঝারি ধরনের হলের মধ্যে। মিঃ টার্নার এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। ইতিমধ্যে অনেক শ্রোতাই এসে হাজির হয়েছে। প্রায় জনা পঞ্চাশ তো বটেই। তবে চেহারায় আর বেশবাসে এদের নিম্ন মধ্যবিত্তের পরিচয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। আড়াআড়ি করে বেঞ্চ পাতা। তারই একটাতে বসতে গিয়ে একটি ছোট মেয়ের কলকলানিতে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখি মিসেস জনস্টনের সেই রোগা মতো মেয়েটি আমার ঠিক পিছনে বসে আছে।

আমাকে দেখে সে চিনতে পেরেছে। পাশের রোগা ফ্যাকাশে প্রায় হলদে রং-এর এক ভদ্রমহিলাকে ডেকে বলছে—লুক মামি, বোধি।

আমি একটু ভালভাবে পিছন ফিরতেই মহিলাটি হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরু শুরু হাড় জিরে জিরে হাত। আমি করমর্দন করলাম।

আপ্যায়িতের হাসি হেসে মহিলাটি বললেন, আপনার অনেক গল্প আমার মেয়ের কাছে শুনেছি। আপনি ছোট ছেলে মেয়েদের ভয়ানক ভালবাসেন। আসুন না দয়া করে একদিন আমার বাসায়।

ইতিমধ্যে মিঃ টার্নার এসে ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়েছেন। এখন তাঁর মুখে সেই আত্মতৃপ্তির হাসিটুকু আর নেই। এখন অখণ্ড গাম্ভীর্য এসে সারা মুখটাকে ঘিরেছে। তিনি কথকতা বলতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্য বিষয়, বড় লোকদের ভগবানের কাছে যাওয়া কত কঠিন আর গরীবরা তাঁর কাছে পেঁছায় কতো সহজে। তিনি থিয়েটারী ঢং-এ বাইবেল থেকে গল্প বলতে শুরু করলেন। তাঁর গলা নানান গ্রামে অবলীলাক্রমে খেলা করতে লাগল।

শ্যামল আমার ডান পাশেই বসেছিল। আস্তে আস্তে মন্তব্য করল—মিঃ টার্নার বেশ বলছেন, না?

আমার বাঁদিকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বসেছিল। তার দিকে এতক্ষণ ভাল ভাবে তাকাই নি। দেখলাম, সে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছে। তারপর দু চোখ রগড়ে লাল করে রুমালটা সে পকেটে রাখতেই তাকে চিনলাম। মিসেস খানের রেস্টুরেন্টের সেই মেয়েটি, যে আমার দিকে সেদিন বিদ্রূপ ছুঁড়ে মেরেছিল।

বক্তৃতা শেষ হতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। তারপর চাঁদা করে চা খাওয়ার পালা। চা খেতে খেতে আমি সেই মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। চিনতে পার?

মেয়েটি কিন্তু এখন মোটেই চটুল নয়। সে গম্ভীর মুখে জবাব দিল—তা পারি বে কি—

পরক্ষণেই বললে, তুমি বোধ হয় এখানে এই নতুন এলে? ওঃ কী সুন্দর বলেন মিঃ টার্নার। মনে হয়ে যেন ঘটনাগুলো চোখের সামনে ঘটছে, না? তা তুমি তো কদিন রেস্টুরেন্টে আস নি। কর্তার সিং বললে, তুমি নাকি খুব কাজে ব্যস্ত?

—হ্যাঁ, তা একটু ব্যস্ত বটে। সময় হলেই যাব ওদিকে।

শ্যামলের সঙ্গে বেরিয়ে আসছি, বড় রাস্তার কাছে এসে আবার সেই মেয়েটি আমাকে ধরল। বললে, তোমার সঙ্গে কিছু জরুরী আলোচনা করতে চাই। তোমার সময় হবে? আমি তোমার বাসায় আসব। তোমার ঠিকানাটা আমায় দেবে?

শ্যামল তাড়াতাড়ি ঠিকানাটা বলে গেল। মেয়েটি তার হাত ব্যাগ খুলে একটা কাগজে লিখে নিয়ে গুড্ নাইট জানাল।

শ্যামল বললে, ছুঁড়ীটা কে ?

বললাম, রেস্টুরেণ্টের একজন সার্ভিস গার্ল।

শ্যামল বললে, তা আপনার পেছনে কেন ? দুনিয়ার এত লোক রয়েছে, আলোচনা করতে হয় যাক না তাদের কাছে।

আমি কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম।

কদিন থেকে রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ডকে দেখছি ডিনার টেবিলে খুবই চুপচাপ। কারুর সঙ্গে সে কথা বলে না। কারুর দিকে চোখ তুলে তাকায় না। গম্ভীর মুখে খাবারগুলো গিলে সরে পড়ে।

আজ মিসেস মরিসন রবার্টকে একটু খোঁচা দিল। মিসেস বেকাশিল্প স্কচ্ ব্রথের সুপ পরিবেশন করতেই মিসেস মরিসন বললেন, স্কচ্ ব্রথ খেয়েও যদি ম্যাকের মুখের ভাব না পাল্টায় তা হলে বুঝব ওর সাংঘাতিক গণ্ডগোল হয়েছে ওর গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে।

জোসেফ গর্ডন সুপের চামচ মুখে তুলতে তুলতে বলে উঠল, তা হলে মামকে বলতে হবে, ওর কতো নম্বরের গার্লফ্রেণ্ড সেটি যার সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়াতে আজ কদিন ও মুখ ভার করে আছে।

এত কথা সত্ত্বেও কিন্তু রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ডের মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হল না। যথারীতি কোঁতকোঁত করে সুপ গিলতে লাগল।

শকসেনা খুব একটা বড় রসিকতা করবার সুযোগ পেয়েছে মনে করে তার গোরাপল্টনী কায়দায় বলে উঠল, মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড বোধ হয় খুব সিরিয়সলি চিন্তা করছেন তার বিয়ের সম্বন্ধে। তা এতে চিন্তার কী আছে ? মামকে বললেই হয়। তাঁর হাতে তো অনেক মেয়ে আছে।

এই বার দেখলাম রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ডের মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল। সে কি একটা বলতে গেল শকসেনাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা না বলেই চুপ করে গেল।

শ্যামল এ সব কথার মধ্যে ছিল না। সে আপন মনে হাসছিল আর খাবার মুখে তুলছিল।

মিঃ মরিসন এবার থাকতে না পেরে একটা রহস্য করল। শকসেনার দিকে চেয়ে বলল, ভাল জিনিস এ বাড়িতে এসেও পালিয়ে যায়। তোমরা কেমন ইয়ংমেন হে ?

সবাই বুঝল কার কথা বলছে মিঃ মরিসন। মিঃ মরিসনের রসিকতায় মিসেসের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই মিঃ মরিসন

বললে, বিয়ের যদি অতই ইচ্ছে ম্যাকের মিসেস ক্যাথলিন মায়ারকে একবার চেষ্টা করলে পারত না ? যদিও গিন্নী ওকে মিসেস বলে চালাচ্ছিল, কিন্তু আমি বেশ ভাল করেই জানতাম ওর কোন দিন বিয়েই হয় নি। আর যদি বা হয়ে থাকে তো ওর স্বামী ওর সঙ্গে তিন মাসের বেশী ঘর করতে পারে নি।

মিসেস ক্যাথলিন মায়ারের কথা উঠতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সিলভিম্যান বুকটা চেপে ধরে একটা কৌতুককর ভঙ্গীতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, আ মাই সুইট হার্ট !

সবাই জানতে চাইল মেয়েটা গেল কোথায় ?

মিঃ মরিসন হা-হা করে হাসতে হাসতে বললে, নরকে।

খাওয়া শেষ হতেই যে যার ঘরে ঢুকল। আমিও এলাম আমার ঘরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনি দরজায় টোকা। বাইরে রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ডের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—আসতে পারি—

ভিতর থেকে বললাম—নিশ্চয়ই।

রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ড ঘরে ঢুকে ধীরে সুস্থে একটা চেয়ার দখল করে বসল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললে, আমার কদিনের আচরণে তুমি খুব আশ্চর্য হয়েছ বোধ হয়।

তা—না, তা—না করে জবাব দিলাম—হ্যাঁ, তা একটু হয়েছি বৈকি।

রবার্ট বললে, তোমার সম্বন্ধে আমার একটা অনুভূতি আছে। জানি না সেটা সত্যি কী মিথ্যা। আমি সেটা যাচাই করতে চাই। আমার মনে হয়, তোমার চোখ দুটো আমার সব কিছু খুঁটিনাটি দেখে। আমার মনে হয় আমার মনের তলা পর্যন্ত তারা দেখতে পায়। এটা আমি কিন্তু অনুভব করি। তাই আজ তোমার কাছে এলাম জানতে, তুমি আমার এই পরিবর্তনের কারণটা কিছু অনুমান করেছ কিনা ?

আমি একটু হেসে রবার্টের হাতটা আমার হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। বললাম, আমি তো অনেক কিছু বলতে পারি না। শুধু জানি তুমি পামেলাকে ভালবেসেছ। তাই শ্যামলের ওপর পামেলার ঝোঁক দেখে তুমি মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছ না।

রবার্ট মুখ নীচু করে আমার কথা শুনছিল। ঘাড় নেড়ে বললে, ঠিক বলেছ। আমি এ বাড়িতে রয়েছি প্রায় চার বছর। শ্যামল আসবার অনেক আগে থেকে আমি এখানকার বাসিন্দা। এ বাড়িতে আসার দু মাসের মধ্যে আমি পামেলার প্রেমে পড়েছিলাম। পামেলাও আমাকে ভালবেসেছিল। তাই এখানে এতো অসুবিধে সত্ত্বেও আমি এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারি নি। তখন আমি আর পামেলা ছিলাম বলরুমে জুড়ি। ও আমাকে ছাড়া আর কোন পার্টনার নিত না। সিনেমায় ও ছিল আমার নিত্য সঙ্গী। এ সব আমরা করতাম কিন্তু

বাড়ির লোকের চোখের আড়ালে। সেই অত ছোট বয়সেই পামেলা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমাকে ছাড়া সে আর কাউকে ভালবাসবে না।

শ্যামল আসার পর থেকে দেখতে লাগলাম ওর মানসিক পরিবর্তন হতে শুরু করল। ক্রমশঃ দেখতে লাগলাম আমাকে আর ওর ভাল লাগে না। আমি ডাকলে ছলে ছুতোয় ও আমাকে এড়িয়ে যায়। এখন তো এই গত একটা বছর ক্রমাগত দেখছি, ও কী ভাবে শ্যামলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আর শ্যামলও কী ভীষণ ঝুঁকেছে পামেলার দিকে। এদের এই দুজনের মধ্যে এখন আমি অবান্তর হয়ে গিয়েছি। তাই কদিন আগে আর সহ্য করতে না পেরে পামেলাকে তার পুরোন কথা মনে করিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম—তোমার কী মনে আছে, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না। তার উত্তরে এই চিঠিখানা পেয়েছি, দ্যাখো।

আমি কোনো কথা বলে বাধা দেবার আগেই রবার্ট তার বুক পকেট থেকে একটা খাম বার করে ফেললে। তারপর চিঠিখানা খুলে কয়েকটা লাইন পড়ল। দেখলাম লাইন কটার নীচে রবার্ট লাল কালির আঁচড় দিয়ে রেখেছে।

লাইন কটায় লেখা আছে—দু বছর আগে নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলাম। তখন আমার নিজের কোন বিচার বিবেচনা শক্তি ছিল না। সেই সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলে। ও প্রতিজ্ঞা আমার মনের কথা নয়, ওর কোন দাম নেই। তা ছাড়া আমি শ্যামলকে ভালবাসি জানতে পেরে তুমি ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছ। তুমি অতি নীচ। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা করো না।

চিঠিখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে রবার্ট দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ফোঁত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, শেষ পর্যন্ত আমায় একথাও শুনতে হল যে আমি নীচ।

বললাম, শ্যামল কী জানে পামেলা আগে তোমায় ভালবাসত—

রবার্ট মুখ নীচু করেই জবাব দিল—না। ও যদি জানত তো আমার সব সমস্যা মিটেই যেত। সরাসরি আমি ওকে বলতে পারতাম, তুমি এখান থেকে সরে পড়।

শ্যামলকে কী আমি একথা বুঝিয়ে বলব ?

রবার্টের শুকনো মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তার মুখ চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বললে, না। এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ আলোচনা করুক এ আমি চাই না।

আমি একটু চুপ করে থেকে সান্ত্বনার সুরে রবার্টকে বললাম, ভালবাসার কথা তো কেউ হিসেব করে বলতে পারে না। কার মন যে কখন কোথায় যাবে তার হদিশ পাওয়া দুষ্কর। এই যে তুমি এখন এতো কষ্ট পাচ্ছ, দেখবে

পামেলার চেয়ে আরও কোন ভাল মেয়ের সাহচর্যে এলে তাকেই হয়তো তুমি ভালবাসতে আরম্ভ করবে—

রবার্ট আমাকে বাধা দিয়ে বললে, ভবিষ্যতে কী হবে না হবে বলতে পারি না। তা ছাড়া আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছিও না। আমি কেবল আহত হয়েছি পামেলার এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে। আমার সঙ্গে পামেলার এখানেই তফাৎ। আমি হলাম খাঁটি হিলান। আমার মধ্যে ফেথ আছে। যাকে একবার ভালবাসব তার থেকে আর মন আমার সরবে না। কিন্তু পামেলা তো হিলান নয়, তাই তার ফেথ্ আর মুখের প্রতিজ্ঞা এত ঠুন্‌কো।

কথাবার্তা হয় তো আরও এগুতো। কিন্তু আমার দরজায় আবার টোকা পড়ল। মিসেস বের্কশ্লি মুখ বাড়িয়ে বললে, বোধি, তোমায় একজন মহিলা খুঁজছেন।

বলতে বলতেই সে দরজাটা ফাঁক করে দাঁড়াল। দেখি মিসেস খানের রেস্টুরেন্টের সেই মেয়েটি হাসি মুখে গুড ইভ্‌নিং জানিয়ে ঘরে ঢুকল।

রবার্ট আমাকে গুড্ নাইট জানিয়ে উঠে পড়ল।

ঘরে আমরা দু জন একলা হয়ে যেতেই মেয়েটি হাসতে হাসতে আমাকে বললে,তুমি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাব নি যে আমি তোমাকে খুঁজে বার করতে পারি ?

বললাম, না, অতটা না হলেও অন্ততঃ আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোমাকে আশা করি নি।

মেয়েটি সেই রকম হাসতে হাসতেই জবাব দিল—আজ বিকেল থেকেই আমার ছুটি। তাই ভাবলাম যাই একজন নতুন বন্ধুর কাছেই যাই। আর যাই হোক নতুন বন্ধুর সাহচর্যে যে নতুন ধরনের আনন্দ সেটা তো সব সময়ে পাওয়া যায় না।

—আমার সাহচর্যে যে তুমি আনন্দ পাবেই এমন কথা তোমায় কে বললে ? —আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মেয়েটি এবার একটু চটুলতা প্রকাশ করল। একটা চোখ মটকে বললে, সেটা আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না।

তারপরই প্রসঙ্গ পাল্টে বললে, তুমি এই বাড়িতে থাক ? এ আমার খুবই পরিচিত বাড়ি।

—এখানে কী তুমি আগে এসেছ ?

মেয়েটি বললে, আসব না কেন ? অনেক বার এসেছি।

বলেই কথাটা ঘুরিয়ে বললে, এখানে আগে আমার এক বয় ফ্রেন্ড থাকত। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ বাড়িতে থাক অথচ তুমি মেয়েমানুষ দেখলে ভয় পাও, এ কেমন কথা ?

বললাম, কে বললে আমি মেয়েমানুষ দেখলে ভয় পাই ?

মেয়েটি বললে, ভয় যদি নাই পাবে তো কর্তার সিং যেদিন আমার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল সেদিন অমন তুড়ি-লাফ খেয়ে ছুট লাগিয়েছিলে কেন ?

বলেই সে খিলখিল করে চটুল হাসিতে ভেঙে পড়ল।

বললাম, তারপর তো আমি নিজেই যেচে তোমার সঙ্গে আলাপ করেছি মিঃ টার্নারের চ্যাপেলে।

মেয়েটি কিছুমাত্র দমল না। সেরকম ভাবেই হাসতে হাসতে বললে, চ্যাপেলে তো আর ভুতের ভয় নেই। তাই আলাপ করা অনেক সোজা।

মেয়েটিকে এবার দেখলাম ভাল করে। অন্যদিনের তুলনায় আজ তার সাজ পোশাক কিছু আলাদা। স্কার্টের বুক অনেকটা খোলা। তার ওপর দেখলাম, গলায় আর কানে ঝুটো মুক্তোর সেট। মাথার চুলগুলো পরিপাটী করে ঢেউ খেলিয়ে কার্ল করা। মুখে মেক-আপের প্রাচুর্যও সেই সঙ্গে বেশ চোখে পড়বার মতো।

এতো করেও কিন্তু মেয়েটি পুরুষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে নি। আসলে তার চেহারায় এমন কিছুই নেই যা দিয়ে সে পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে। লম্বা ছিপছিপে চেহারাটায় ছিরি-ছাঁদ বলে কোন পদার্থই নেই। বুকের কাছটা তার অনেকটা পুরুষের মতো। হাত পাগুলো সরু সরু, তাদের রং ফ্যাকাশে। মুখে এতো মেক-আপ করেও লাবণ্যের ছিটে ফোঁটা সে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। মেয়েটার সারা শরীরের মধ্যে আছে দুটি মাত্র সম্বল। একটা তার হাসি আর অপরটা তার চোখের চটুল কটাক্ষপাত। সে বোধ হয় তার এই বিশেষ সম্বল দুটি সম্বন্ধে খুবই সচেতন। তাই আমার সামনে বসে সে এখন তখন কটাক্ষ করছিল আর প্রায় সব কথাতেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

আমি বললাম, দ্যাখো, তোমার সঙ্গে আলাপই হয়েছে কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হয় নি।

সে আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল—ও মাই, মাই—কী মজার লোক যে তুমি !

তারপর সোফা সেটীতে আমার পাশে এসে বসল। টেবিলের ওপর রাখা কাগজের প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তার ওপর লিখল—মিস ডোরা বুথি।

লিখে কাগজটা আমার হাতে তুলে দিল। দেখলাম তার মুখে চোখে চটুলতার চিহ্নমাত্র নেই শুধু একটু মিষ্টি হাসি খেলা করছে তার ঠোঁটে। এবার সে একটু ছড়িয়ে হাসল। মেয়েটির দাঁতগুলি ভারি সুন্দর। মুক্তোর মতো সাজান। হাসিটা আমাকে ছুঁয়ে গেল।

সে চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমার নামটা এবরে

জানতে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই। —বলে আমার নামটা মুখে উচ্চারণ করে কাগজেও লিখে দিলাম ডোরা বুথি লেখাটার নীচে। ডোরা ঈষৎ সলজ্জ হবার ভান করে আমার হাত থেকে কাগজটা নিল। সেটা ভাল করে দেখে তার নিজের নামের আমার নামের মাঝখানে বড় বড় হরফে লিখল—Loves।

আমি তার এই ব্যাপারে হো হো করে হেসে উঠলাম। ডোরা কিন্তু একেবারেই অপ্রস্তুত হল না। সেও খিলখিল করে হাসতে হাসতে আমার একটা হাত ধরে ফেললে। তারপর চট করে হাসি থামিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলে—কী হাসলে যে ?

বললাম, তোমার ব্যাপার দেখে। কতো চট করে তোমরা ভালবাসতে পার। ব্যাপারটা খুব মজার, নয় কী ?

ডোরা এবার আমার রহস্যটা বুঝতে পারল। হঠাৎ তার মুখ রীতিমতো গম্ভীর হয়ে উঠল। সে বললে, তোমাকে প্রথমদিন দেখেই আমার ভাল লেগেছে। আমি কালার্‌ড্‌ লোক পছন্দ করি। বিশেষ করে সে যদি এশিয়ার লোক হয়। তুমি একদিন আমার বাড়িতে এসো। আমি তোমাকে আমার এ্যালবাম দেখাব। তাতে আমার আগেকার বয় ফ্রেণ্ডদের ছবি আছে। তাহলেই তুমি বুঝবে আমার সত্যিকারের রুচি কিসে ?

বললাম, তোমার সঙ্গে যোগীন্দর সিং-এর ভাব নেই ?

ডোরার মুখটা হঠাৎ বিশ্রী হয়ে কুঁচকে উঠল। বললে, ওর নামও কোরো না আমার কাছে, প্লিজ। ওর নাম শুনলে আমার গা ঘিনঘিন করে।

বললাম, কেন ? তোমাদের হোটেলের অন্য মেয়েরা তো ওকে খুব পছন্দ করে।

ডোরা বললে, পছন্দ করে না ছাই। শুধু পয়সার লোভেই মেয়েগুলো ওর কাছে যায়। ওদের কী আত্মমর্যাদা বলে কোন পদার্থ আছে ?

আমি চুপ করেই রইলাম। ডোরা নিজেই বলতে লাগল—যোগীন্দর সিং একটা সেক্স পারভার্ট। মেয়েদের পক্ষে যেটা সবচেয়ে অপমানকর, তার ওপরে ওর প্রবল ঝোঁক। কিন্তু আমি ওকে ঘৃণা করি—

তারপর একটু থেমে বললে, এমন সন্ধ্যাটা ঘরে বসে কাটাবে ? চল না একটু বাইরে যাওয়া যাক।

—কোথায় যাবে ? জিজ্ঞাসা করলাম

—চল না কোন সিনেমায় যাই। বললে ডোরা

ডোরার সঙ্গে রাস্তায় বার হয়ে পড়লাম।

এখানে সিনেমাতে যাওয়ার কোন হ্যাঙ্গামা নেই। বেলা বারোটা থেকে সিনেমা শো শুরু হয়। ঘুরে ঘুরে কয়েকখানা বইয়ের শো চলতে থাকে।

কোনরকম ছেদ নেই ওই শোর। দর্শকরা যে কোন সময়ে টিকিট কেটে গিয়ে ভিতরে বসতে পারে। কোন বইয়ের শেষের দৃশ্য দিয়ে শুরু করে আবার ঘুরে এসে তার আগের দৃশ্যে পেঁছে সে স্থান ত্যাগ করে। এইটাই নিয়ম।

আমাদের পাড়াতেই গোটা তিন চার সিনেমা হল। ডোরাকে নিয়ে তারই একটাতে ঢুকে পড়লাম। ঢোকবার মুখে হঠাৎ ডোরা কাকে যেন দেখতে পেয়ে গুড় উইস্ করল। একপলকে দেখলাম, একজন লম্বা চওড়া জোয়ান লোকের কোমর জড়িয়ে ধরে মিসেস্ ক্যাথলিনমায়ার বেরিয়ে আসছে সিনেমা হল থেকে। আমি ডোরার পিছনে মুখটাকে আড়াল করলাম। ক্যাথলিন মায়ার একটু দাঁড়িয়ে ডোরাকে গুড্ উইস্ জানিয়ে যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলে গেল।

ডোরা বললে, মেয়েটাকে দেখলে? ওর নাম ফ্লোরা। একটা চীজ্। বড় বড় রইস্ আদমী ঘায়েল করতে ওর জুড়ী নেই এই শহরে।

সিনেমাতে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে ডোরা আরও মুখর হয়ে উঠল। এখন তখন সে আমার হাত চেপে ধরতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার মাথা এসে আশ্রয় নিল আমার কাঁধের ওপর।

সিনেমা দেখা শেষ করে যখন বাইরে এলাম, তখন প্রায় দশটা।

ডোরা আমাকে ধরে বসল—চল না এবার কোন পাব এ যাই। একটু গলা ভেজান দরকার। সেখান থেকে চল তোমার ঘরে যাই।

বললাম, আমার এখন একটু জরুরী কাজ রয়েছে বাড়িতে। এক্ষুনি ফিরতে হবে। আমি দুঃখিত, তোমাকে আজ রাতে সেখানে আমি নিয়ে যেতে পারছি না বলে।

ডোরা বললে, তাহলে আমার কাছে কবে তুমি আসছ?

—যে কোন দিন।

ডোরা মুখ ভার করে বললে, গুড্ নাইট্, চিয়ারিও—

ডোরাকে বিদায় দিয়ে সটান বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। বারবার মনে পড়তে লাগল, মিসেস ক্যাথলিন মায়ার তাহলে এ পাড়া ছাড়ে নি। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল এ পাড়াতেই তো তার ব্যবসা। এই ডক এলাকা ছেড়ে যাওয়া তো তার পক্ষে শক্ত।

এক মনেই পথ হাঁটছিলাম। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই রবার্ট ম্যাকডো-ন্যাল্ড কোথা থেকে এসে আমায় ধরল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথা থেকে এলে?

রবার্ট জবাব দিল—বীচ বলরুমের বারে বসে একটু গলা ভিজিয়ে এলাম। যাই বল গলা ভেজাতে আর মরা মনকে চাঙ্গা করতে মদের মতো এমন জিনিস আর নেই। চল তোমার ঘরে যাই। তোমার সঙ্গে কথা আমার এখনো ফুরোয় নি।

রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঘরে এসে বসলাম। রবার্টও সন্ধ্যাবেলাকার কথার সূত্র ধরে টান দিল। বললে, তুমি এ বাড়িতে আছ কেমন করে। এই বাড়ির গিন্নীর আসল ব্যবসাটা তুমি এতোদিনে ধরে ফেলেছ আশা করি—

বললাম, তুমি কী বলছ তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

রবার্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, এই পাশাপাশি দুখানা বাড়িই মিসেস মরিসনের। এই দুটো বাড়ির যে কোন খালি ঘরের ভাড়া সন্ধ্যেবেলাতে কতো করে হয় জানো? পুরো এক পাউন্ড দু ঘণ্টার জন্যে। কেউ কেউ পুরো রাতেরও ভাড়া দেয়। সেটা হল আড়াই পাউন্ড।

জিজ্ঞাসা করলাম—তা হলে সে আমাদের মতো বোর্ডার রাখে কেন?

রবার্ট বললে, না হলে পুলিশ যে পেছনে লাগবে। বাইরে থেকে মিসেস মরিসনের পরিচয় হল ল্যান্ডলেডী। সে বিদেশী বোর্ডারদের তার বাড়িতে রাখে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে যে আরও কতো মজার বোর্ডার রাখে তার খবর তো পুলিশ জানে না। সে খবর জানে পোর্টের জাহাজের ক্যাপ্টেনরা। এ লাইনের ভাল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে পেলে মিসেস মরিসন ডেকে নিয়ে তার বাড়িতে তাকে আশ্রয় দেয়। কেন, ক্যাথলিন মায়ারকে তুমি এত চট্ করে ভুলে গেলে। সে তো তোমার ঘরের সামনেই থাকত। কিছু দেখো নি?

বললাম, এই দারুণ শীতের রাতে কে কোথায় কী করছে তা দেখতে গিয়ে ঘুম বিসর্জন দেবার লোক আমি নই। সে কথা যাক। তুমি যে এবাড়ির সম্বন্ধে এতো কথা জেনেও এখানে পড়ে রয়েছ এইটাই আশ্চর্য।

রবার্ট বললে, এখানে আমি আছি কেবল পামেলার জন্যে। তুমি মিসেস মরিসনের সব রূপটা এখনও দেখ নি। তার আসল মতলব হচ্ছে, পামেলাকে আস্তে আস্তে তার ব্যবসাতে ভিড়োন। নানা ব্যাপারে আমি এর আঁচ পেয়েছি। আমি এখানে রয়েছি পামেলাকে রক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু—

বলে রবার্ট চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ ঘরটার মধ্যে কোনো আওয়াজ শোনা গেল না, কেবল টেবিল ক্লকের টিকটিক আওয়াজ ছাড়া।

হঠাৎ রবার্ট নৈঃশব্দ্য ভাঙল। বললে, শ্যামলের পামেলার ব্যাপারটা মিসেস মরিসনের দৃষ্টি এড়ায়নি। ওটা পাকাপাকি ভাবে শুরু হয়ে গেলেই মিসেস মরিসন ওদের দুজনের কাছ থেকেই পয়সা আদায় করবে।

আমি আঁৎকে উঠলাম—বল কী?

রবার্ট বললে, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। এ বাড়ির প্রত্যেকটি বোর্ডার পাশের বাড়ির কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে জুটে আছে। আর মাঝখান থেকে মিসেস মরিসনও পয়সা লুটছে। শকসেনার কথা অবশ্য আলাদা। গিন্নীর নিজের লোক সে। আর তার জন্যে বেশ মোটা রকম দক্ষিণে তাকে দিতে হয়। গিন্নী শুধু হার মেনেছে আমার কাছে। তাই আমাকে তাড়াবার সব রকম ফন্দি

করছে। আমিও এখান থেকে নড়ছি না, যতদিন পামেলা এখানে থাকে।

তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। না, একটা আশা করি নি আমি। যদিও মিসেস মরিসনের সম্বন্ধে এর আভাষ একটু-আধটু পেয়েছি আগেই।

বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু পামেলার সম্বন্ধে তোমার এত চিন্তা কেন? শ্যামল যদি তাকে বিয়ে করে—

রবার্ট বললে, শ্যামল যদি তাকে বিয়ে করে আমি শ্যামলের চিরকালের বন্ধু হয়ে থাকব। কিন্তু কথাটা কি জান? শ্যামল হল ভারী সরল। দুনিয়ার অনেক কিছুই সে বোঝেনা। মিসেস মরসিন যে কোন জায়গায় কী টিপ বসাবে তা শ্যামল এখনও জানতে পারছে না। পামেলা কি পামেলার মা মিসেস বেকশিওও নয়। আর শ্যামল যদি অজানতেও পামেলার জীবনে কোন ক্ষতি করে তাহলে তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না। এই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।

গুড্ নাইট্ জানিয়ে রবার্ট আমার ঘর থেকে বিদায় নিল।

আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট-এর কথাগুলো মাথার মধ্যে চিন্তার রাশি এনে ফেলল। তাদের ধাক্কায় চোখের ঘুম ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

॥ ২০ ॥

ইউনিয়ন স্ট্রীট ধরে ডক্টর রোজের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলাম বরাবর। এটা হল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক সান্ধ্য ভ্রমণ। প্রত্যেকদিন তিনি পায়ে হেঁটে তাঁর বাড়ি থেকে সমুদ্রের ধারে যান। সেখানে কয়েক চক্কর ঘুরে ইউনিয়ন স্ট্রীট ধরে হেঁটে চলে যান সোজা বন্ এ্যাকরড টেরাস অবধি। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি।

সেদিনকার সান্ধ্যভ্রমণে আমি তাঁর সঙ্গী।

যদিও রাস্তায় নোংরা কাদা আর বরফে মেশামেশি হয়ে আছে তবুও আশ-পাশের দোকানগুলোর আলোর ছটা চোখ ধাঁধিয়ে দেবার যোগাড় করেছে। আসছে কাল ক্রীসমাস। প্রায় প্রত্যেকটি দোকানেই শো-কেশে তুলো দিয়ে কৃত্রিম বরফ করে নানারকম দৃশ্য তৈরী করেছে। তা ছাড়া হরেক রকম আলোর তো কথাই নেই। তাই দেখতেই রাস্তায় ভীড় হয়েছে প্রচুর।

দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে ডক্টর রোজ বললেন, সবারই এক একটা ট্রাডিশন আছে, নেই কেবল বেনেদের।

তাঁর কথা ঠিক মতো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন একথা বললেন প্রোফেসর?

ডক্টর রোজ গম্ভীর ভাবে বললেন, বেনেরা সব সময়েই তাদের জিনিস বিক্রী

করতে এতো ব্যস্ত যে সব কিছু হুজুগেই তারা মেতে ওঠে।

আমি বললাম, ক্রীস্‌মাসকে আপনি হুজুগ বলছেন ডক্টর? আমি তো জানি ক্রীসমাস আপনাদের সবচেয়ে বড় পরব।

ডক্টর রোজ মাঝে মাঝে যে রকম জেদীর মতো মাথা নাড়েন ঠিক সেই রকম মাথা নেড়ে বললেন, কক্ষনো না।

এবার আমার অবাক হবার পালা। ভাবলাম ভদ্রলোক বলেন কি? মুখে বললাম, আমরা পুবের লোকেরা জানি, পশ্চিমের সমস্ত দেশগুলোতেই ক্রীসমাসে সমান উৎসব হয়।

ডক্টর রোজ তখনও সেই আগের ভাবে বললেন, পুবের লোকেরা জানে না স্কটল্যাণ্ডে এর ব্যতিক্রম আছে।

আমিও এবার জিদ ধরলাম। বললাম, এখানে যদি ক্রীসমাসের উৎসবে লোকেরা সাড়া না দেবে তা হলে আয়োজন কিসের?

ডক্টর রোজ বললে, সাড়াটা তুমি দেখলে কিসে? কেবল দোকান সাজানো বৈ তো নয়। তাদের কথা তো আমি আগেই বললাম। বেনেদের কোন জাত নেই, কোন ট্র্যাডিশন নেই—তবে হ্যাঁ, দোকান ছাড়াও আরও একটা জায়গায় আলো দিয়ে সাজান হচ্ছে—ঐ দেখো সেই জায়গা।

বলে তিনি হাত বাড়িয়ে রাস্তার অপর পারে ইস্ট ওয়েস্ট চার্চের দিকে নির্দেশ করলেন। তাকিয়ে দেখলাম, টিমটিমে আলোয় চার্চের বিরাট কম্পাউণ্ডটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

ডক্টর রোজের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, তবে এর আলো বাইরে নয়, ভিতরে।

তারপর বলতে লাগলেন, কিন্তু তা বলে এই সাজানো গোছান থেকে মনে করো না শহরে খানাপিনার খুব একটা ধুম পড়বে। চারদিক থেকে তোমার কাছে নেমতন্ন আসবে পার্টির। নাঃ, সে সব কিছু হবে না।

হাসতে হাসতে বললাম, এই বলে কি আপনি ক্রীসমাসের ভোজ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছেন—

প্রফেসর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি তো সাংঘাতিক লোক হে! হাঃ হাঃ হাঃ—না আমি অবশ্য সেকথা বলছিনে। আমি যে কথা বলতে চাইছি—তা হল অন্য কথা।

হাসি থামিয়ে বললেন, আসল কথাটা কি জান? ক্রীসমাস স্কটদের জাতীয় উৎসব নয়। স্কটদের জাতীয় উৎসব ৩১শে ডিসেম্বর আর পয়লা জানুয়ারীর সংযুক্ত রাত্রিটা। একে আমরা বলি হগম্যানি নাইট। ক্রীসমাস ইভে এক চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করা ছাড়া স্কটদের আর বিশেষ কিছু করণীয় নেই।

বললাম, এর কারণটা কী? স্কটরা কী ধর্মকে খুব বেশী আমল দিতে

চায় না ?

ডক্টর রোজ বললেন, না, তাও ঠিক নয়। তবে তারা চার্চের ধর্মের থেকে সবাই মিলে খোলাখুলি ভাবে নির্দোষ আনন্দ করাটাকে আরও বড় ধর্ম বলে মনে করে।

—কিন্তু—

ডক্টর রোজ আমায় বাধা দিয়ে বললেন, আমি জানি একথায় নানা তর্ক উঠতে পারে, তাই আমি কোন তর্কের কথা না তুলে শুধু একটি কথা বলছি যে এ অভ্যাসটি স্কটদের আদিকাল থেকে তাদের রক্তের ভিতর বইছে। এটাই হল তাদের একটা ট্রাডিশন—

আমরা কথা বলতে বলতে প্রায় ব্রীজ স্ট্রীটের চৌমাথায় এসে পড়েছিলাম। ডক্টর রোজ বললেন, চল ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে ঢুকে একটু কফি খাওয়া যাক।

দুজনে রাস্তাটা পার হয়ে গিয়ে হোটেলে ঢুকলাম। ডক্টর রোজ একটি আধো-অন্ধকার কোণ বেছে নিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁর সামনের সীটটা দখল করলাম। ডক্টর রোজ একপট কফি আর কিছু স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিয়ে বেশ আরাম করে বসলেন। তারপর বললেন, স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম আর সামাজিক জীবন ইউরোপের আর আর দেশের মতো এক হয়ে মিশে যায় নি। এই এতদিন পরেও এদেশে দুটো ধারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও পাশাপাশি বয়ে চলেছে। এর রহস্য জানতে গেলে আমায় পুরনো ইতিহাসের খেই ধরে টানতে হয়। তোমার যদি খুব তাড়া না থাকে কোন বান্ধবীর কাছে যাবার, তো তোমাকে আমি সেই পুরনো কথা কিছু শোনাতে পারি।

আগ্রহের সঙ্গে বললাম, আপনি নিশ্চিন্তে শুরু করতে পারেন। আমার কোন বান্ধবী আমার জন্যে আজ অপেক্ষা করছে না।

ডক্টর রোজ বললেন, চারশ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট নিনিয়ান গ্যালাওয়ে অঞ্চলে প্রথম খৃষ্টের বাণী প্রচার করেন। তার ফলে দক্ষিণের একদল পেগ্যান পিক্ট খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তারপর বহুদিন চলে গেল—ধর্ম সম্বন্ধে আর খুব বেশী কিছু সাড়াশব্দ স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে পাওয়া গেল না। স্কটল্যাণ্ডে তখন পিক্টদের সঙ্গে রোম্যানদের খুব লড়াই চলছিল। পিক্টরা প্রায়ই রোম্যান সৈন্য-দলকে মেরে ধরে স্কটল্যাণ্ড থেকে দূর করে দিচ্ছিল। তারা এসে আশ্রয় নিচ্ছিল উত্তর ইংলণ্ডে। ছয় শতাব্দীর শুরুতেই আলস্টারের গ্যালিক ভাষাভাষী স্কটরা আর্গিলে ডালরিয়াডা রাজ্যের পত্তন করল। আর সেইখানে পাঁচশ তেষট্টি খৃষ্টাব্দে সেণ্ট কোলাম্বা আইওনাকে ঘাঁটি করে খৃষ্টবাণী প্রচার করতে লাগলেন। এতে কিছুদিনের মধ্যে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের পেগ্যানরা সবাই খৃষ্টান হয়ে গেল। এই ভাবে সমস্ত স্কটল্যাণ্ডে খৃষ্টান ধর্ম ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা কেল্টিক চার্চও উঠল এদিক ওদিকে। এই হল স্কটল্যাণ্ডে খৃষ্টান ধর্ম আসার গোড়াকার কথা।

ইতিমধ্যে বয় কফির পট এনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে গেল। আমি কফি ঢাললাম কাপে। দুধ-চিনি মিশিয়ে ডক্টর রোজের দিকে একটি কাপ এগিয়ে দিলাম।

ডক্টর রোজ সেদিকে চোখ রেখে বললেন, কেল্টরা নিজেরা যেমন ছিল একটা আলাদা প্রকৃতির জাত, তাদের চার্চগুলোও হল একেবারে তাদের অনুরূপ। অর্থাৎ তারা খৃষ্টান হলেও রোমের কোন রকম অনুশাসন তারা মেনে চলত না। রোমের সঙ্গে তারা কোন সম্পর্কই রাখত না।

একটু চুপ করে থেকে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোমাকে বোধ হয় একবার বলেছি যে কেল্টিক সভ্যতার মরণ হয়েছিল ক্যানমোরদের হাতে পড়ে। ম্যালকলম্ ক্যানমোরের স্ত্রী মার্গারেট ছিল ইংলণ্ডের মেয়ে। সেখান থেকে সে নতুন এ্যাংলো-নর্ম্যান সভ্যতা এনে ফেলেছিল স্কটল্যাণ্ডে। সে যেমন গ্যালিক ভাষাটাকে একেবারে পছন্দ করত না তেমনি কেল্টিক চার্চও ছিল তার দুচক্ষের বালাই। এই ক্যানমোরদের চেষ্টাতেই চুড়োতোলা রোম্যান গথিক স্থাপত্য এদেশে এল। বড় বড় চার্চ, এ্যাবে, মোনাস্টারি তৈরী হতে লাগল—ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, আর ইংলণ্ডের অনুকরণে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক চার্চে রোমের কড়া অনুশাসন চালু হয়ে গেল।

একটু থেমে ডক্টর রোজ প্লেটের উপর থেকে একখানা স্যাণ্ডউইচ্ তুলে নিলেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে বললেন, রোমের অনুশাসন স্কটল্যাণ্ডের চার্চে সেই থেকে চালু হল বটে, কিন্তু কেল্টিক রক্ত যেমন স্কটল্যাণ্ড থেকে উবে যাবার নয়, তেমনি কেল্টিক ঐতিহ্যও কোনদিন এখান থেকে লোপ পাবে বলে মনে হয় না। হল কি জান? চার্চে তারা রোম্যান অনুশাসন গ্রহণ করলেও সামাজিক ব্যাপারে তারা যে কেল্ট সেই কেল্টই রয়ে গেল। এর ফলে স্কটল্যাণ্ড এক সঙ্গে দুটো মনোভাবের চর্চা করতে বাধ্য হল। তাদের একটা হল ন্যাশন্যাল আর একটি হল ইণ্টারন্যাশন্যাল। চার্চের অনুশাসন অনুযায়ী স্কটরা রোম্যান চার্চের রীতি নীতি মানতে লাগল। তাদের নিয়ম মতো চার্চ ফিস্ট্ এ যেতে লাগল। কিন্তু এহোবাহ্য। আসল স্কটদের ফিস্ট দেখতে চাও তো গাঁয়ে চলে যাও। দেখবে সেখানে কোন পাহাড়ের গুহাতে গাঁয়ের সব লোক জড়ো হয়েছে। আর ভোজ্য পানীয়ের ব্যাপারে আর যাই থাক কোন পবিত্রতার যে নাম গন্ধ সেখানে থাকবে না তা আমি হলপ করে বলতে পারি। এই সব গ্রাম্য সাধারণ ভোজে স্কটরা যে রোম থেকে কতোদূরে সেটা বেশ মালুম হয়। রোম যখন ঈশ্বর ঈশ্বর করে সবকিছু ছাড়তে শুরু করল—খাওয়া পরার ওপর কড়াকড়ি হল, যে কোন রকম পানীয় নরকের জল হিসেবে গণ্য হল, পার্থিব সুখের যা কিছু ব্যাপার সব ছাড়বার হুকুম হল, তখন স্কটল্যাণ্ড নীরবে চার্চ-কে দূরে সরিয়ে রেখে তার সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানকে

বড় জায়গা দিল। একজন সাধারণ স্কটের মতে ঈশ্বর আছেন কী নেই, সে সম্বন্ধে খোঁজা খুঁজি করে হায়রান হওয়ার চাইতে এই দুনিয়ার ভোজ্য পানীয়ে তুষ্ট হয়ে, দুনিয়ার লোককে ভালবেসে, লোকের ভালবাসা কুড়িয়ে আনন্দ করে জীবন কাটানটাই যথেষ্ট। একজন স্কটের কাছে তাই এই পৃথিবীর থেকে খাঁটি সত্যি আর কিছু নেই। স্কটল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জেমস মেয়েদের সঙ্গে ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা ছেড়েছিল কেন জান? ধর্মের ভয়ে ততটা নয় যতটা লোক নিন্দার ভয়ে।

ডক্টর রোজ এবার একটু থেমে স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন। এই ফাঁকে আমি বললাম, কিন্তু সাধারণ স্কটের মনে তো পরকাল কী ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাসের তো কিছু কমতি দেখি না।

ডক্টর রোজ একপেয়ালা কফি শেষ করে নিজেই এবার পট থেকে কফি ঢাললেন তাঁর নিজের ও আমার পেয়ালায়। তারপর দুধ চিনি মেশাতে মেশাতে বললেন, না, তার কমতি নেই। কিন্তু সেটা এসেছিল পরে, সংস্কারের যুগে। মধ্যযুগের স্কটরা ধর্মটাকে বাইরের থেকে আমদানী করা একটা বিদেশী জিনিস বলেই জানত। কাজেই তাদের সে সম্বন্ধে খুব একটা বড় মাথাব্যথাও ছিল না। সংস্কারের যুগে ছবিটা কিছু পাল্টাল।

একটু চুপ করে ডক্টর আবার কফির পেয়ালায় মন দিলেন। দু চার চুমুক কফি খেয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন।—ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরী স্রেফ তার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার জন্যে প্রোটেস্ট্যাণ্ট হল। সেই সঙ্গে সে চাপ দিল তার ভাইপো স্কটল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জেমস্-এর ওপর। জেমস্ শেষ পর্যন্ত নতুন ধর্ম নিল না। কিন্তু তাই নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ কেলেঙ্কারীর একশেষ। ব্যাপারটা তার মেয়ে রাণী মেরী পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল। সে সব আর একদিন তোমায় বলব পরে। কিন্তু নতুন প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম স্কটল্যাণ্ডে তখন থেকেই আস্তে আস্তে শিকড় গেড়ে বসতে লাগল। এদেশের কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি এই ধর্মের ধ্বজাধারক হলেন। পাশার চালটা সেই থেকেই পাল্টে গেল, বুঝলে। ধর্ম সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন এতদিন একান্ত বাইরের জিনিস ছিল সেগুলোকে এই বিদগ্ধ বক্তারা স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণের মনের মধ্যে নরম গরম বক্তৃতায় গেঁথে দিতে লাগলেন। তখন থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস তাদের মনে কায়েমী হয়ে বসতে লাগল। কিন্তু বিপদও বাধল অন্যদিকে। ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে স্কটদের সহজ সরল মন জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে বিষম হ্যাঙ্গামে পড়ে গেল। সব সময়েই তাদের মনে স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে লাগল। তারা সহজ আনন্দের জন্যে যা কিছু করতে যায়, তার মধ্যেই দেখে নরক লুকিয়ে রয়েছে। শেষে এই প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম থেকে তারা যখন আরও কড়াপাক প্রেসবাইটেরিয়ান ধর্মের পাল্লায় পড়ল তখন তাদের সসেমিরে অবস্থা। যে কোন রকম সহজ সরল

আনন্দের পথ যে নরকের পথ তা গোঁড়া প্রেসবাইটেরিয়ানেরা দেখিয়ে দিতে লাগল প্রতি পদে। জেনারেল এসেম্ব্লি ষোলশ ছাপান্ন খ্রীষ্টাব্দে ছেলেতে মেয়েতে মিশে নাচ বন্ধ করে দিলে। যারা রবিবার তাস খেলত বা বেড়াতে যার হত তাদের পৌত্তলিক ক্যাথলিকদের মতোই ঘেন্না করা হত।

ডক্টর রোজ এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, সমাজের তো সইবার একটা সীমা আছে। অত আঁটা আঁটি বাঁধন কী স্কটদের ধাতে সয়? এক সময়ে সেই বাঁধনটা ছিঁড়ে গেল আর স্কটরা ক্রীসমাস থেকে হগম্যানিকে আলাদা করে ফেললে। ক্রীসমাসে তারা নমো নমো করে আকাশের ঈশ্বরকে ডেকে নেয়। আর হগম্যানিতে তারা নানারকম খাবার আর সুরা নিয়ে এই পৃথিবীর দেবতাকে পুজো করে। সেই থেকে ধর্ম চলতে লাগল নিজের রাস্তায়, আর মেরি-মেকিং চলল তার সনাতন পথে।

ডক্টর রোজ এবার কফির কাপটা নিঃশেষ করে একটা চুরুট ধরালেন। তার পর তাঁর আগেকার কথার খেই ধরলেন। বললেন,—তা বলে মনে করো না ধর্মধ্বজীরা স্কটল্যাণ্ডে ছেড়ে কথা বলেছে। তারাও বেশ জোর প্রতিপত্তি করে ফেললে কালক্রমে। সমাজে পুরুতরা দেবতার পুজো পেতে লাগল। যে সব ছেলেরা স্কুল কলেজে বেশ উন্নতি করত, তারা ঠিক করত পরে পুরুত হবে। তাই একজন যুবক এক সময়ে লিখেছিল—

মেক্ মি, ও স্ফিয়ার-ডিসেণ্ডেড্ কুইন,
এ বিশপ, অর এ্যাট লিস্ট এ ডিন।

—প্রেস্বাইটেরিয়ানরা ছিল ভারী মজার লোক। তাদের সঙ্গে ঈশ্বর আর শয়তানের সমান জানাশোনা ছিল। শয়তানকে তারা যে কতোরকমে দেখতে পেত অষ্টপ্রহর—এখানে সেখানে নানান ছদ্মবেশে—তা বলা যায় না। তেমনি তারা ঈশ্বরকেও দেখতে পেত কথায় কথায়। এ ছাড়া প্রত্যেকটি লোকের মনে সদা জাগ্রত শংকা লেগেই থাকত, কখন সে কি করে বসে আর শেষ পর্যন্ত নরকে গিয়ে পেঁছায়।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। ডক্টর রোজ এবার হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়লেন। বললেন, যখন বাঁধনটা ছিঁড়ল তখন স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা 'ডেইল'-কে (ডেভিলের স্কট উচ্চারণ) ভয় না করে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এল। কবি রবি বার্নস্-এর কবিতায় ডেভিলকে তিনি ডেকেছেন নানান নামে। কখনো বলেছেন অল্ড্হর্নি, ক্লটি, কখনো বলেছেন, অল্ড্ হ্যাঙ্গি, নিকিবেন। আর জানতো i e দিয়ে স্কটরা যে ডাকটা শেষ করে সেটা তাদের আদরের ডাক।

বলতে বলতে কী মনে করে আবার তাঁর হাসির মাত্রাটা বেড়ে গেল। ওদিকে প্রেসবাইটেরিয়ানদেরও মজা দেখ। যতই ধর্ম ধর্ম করুক আসলে তাদের রক্ত তো স্কট রক্ত। পার্থিব জিনিসের ওপর থেকে মনটা কিছুতেই যেতে চায় না।

এক ধর্মসভায় বক্তৃতা করতে উঠে এক ধর্মধ্বজ গদগদ স্বরে চেঁচিয়ে বললেন, হে প্রভু, তুমি যে প্রচুর শস্য দিয়েছ তার জন্যে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই—পর মুহূর্তে তাঁর গলার আওয়াজটা হঠাৎ সহজ হয়ে নীচু পর্দায় নেমে এল। আগের কথার খেই ধরেই তিনি বললেন, অবশ্য স্টোনহ্যাভেনের কয়েকটা ক্ষেত একেবারে ন্যাড়া পড়ে আছে। তা থাকগে, তার কথা এমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়—

বলেই আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর। হাসতে হাসতে আবার মন্তব্য করলেন—এত গোঁড়ামী সত্ত্বেও প্রেসবাইটেরিয়ানরা তাদের ছোকরাদের আটকাতে পারত না। ষোলশ ছাপান্ন সালে এডিনবরায় একটা বেবুন দেখান হল। দর্শনী প্রত্যেকবার মাথা পিছু তিন পেনী। যে লোকটা বেবুন এনেছিল সে কদিনের মধ্যেই লাল হয়ে গেল। ওদিকে ক্যাননগেটে কুস্তি আর নানারকম খেলা দেখান চলতে লাগল রীতিমতো। ভীড়ও সেখানে হত প্রচুর। এডিনবরার এক উকিল একদিন এক শিলিং দিয়ে এক সিংহী দেখে এল। সেই দিনই সে রেসে তিন শিলিং খরচ করলে—হাঃ হাঃ হাঃ—

হঠাৎ হাসি বন্ধ করে তিনি চট করে ঘড়ির দিকে তাকালেন। গম্ভীর মুখে বললেন, এই জন্যেই তো তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে আমি পথ হাঁটি না। দেখো দেখি নি কী ভীষণ দেরী হয়ে গেল, দশটা বাজে। আমার বুড়ী আমার জন্যে সাপার নিয়ে বসে থাকতে থাকতে হয়তো এতোক্ষণ থানায় খবর দিয়েছে—

চটপট উঠতে উঠতে বললেন, কাল খবরদার আমার বাড়ি এসো না। এলে একটি দানাও খেতে পাবে না। তবে হ্যাঁ হগম্যানি নাইটের নেমন্তন্ন তোমায় এখন থেকেই করে রাখছি। রাত বারোটার পর এক টুকরো কয়লা হাতে নিয়ে আমার বাড়িতে যেও। আমার ঘরগিন্নী তোমাকে সমাদরে চুমু খেতে খেতে ঘরে তুলবেন—

হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন।

॥ ২১ ॥

ডক্টর রোজের কথাই সত্যি। ক্রীসমাস ইভে বাড়িতে কোন রকম অনুষ্ঠানই নেই। এমন কি খাওয়ার মেনুতেও যে খুব একটা কিছু পরিবর্তন দেখলাম, তাও নয়। সাধারণ ছুটির দিনের খাওয়া যেমন হয় তেমনি। ডিনার টেবিলের আড্ডাটাও খুব বেশী জমল না। শিলভিম্যান, আর জোসেফ গর্ডন, ক্রীসমাস থেকে নিউইয়ারসডে পর্যন্ত ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেছে লণ্ডনে। ডিনার টেবিলে বসে দেখলাম আলোচনার চাইতে খাওয়া শেষ করার দিকে ঝোঁকটা সবার কিঞ্চিৎ বেশী। কেবল মিঃ মরিসন আজ অসম্ভব গম্ভীর। মিসেস মরিসন যদিও

আমাদের সবার দিকে চেয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসছিল তবুও কথাবার্তা ও খুব বেশী একটা বলছিলেন না। ওদের ছেলে উইলিয়মও খুব নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিল।

মাঝখানে শকসেনা তার গোরা পল্টনী ইংরাজীতে কী একটা রসিকতা করার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউই তাতে সে রকম সাড়া দিল না। কাজেই শকসেনা আবার সেঁতিয়ে গেল। শ্যামল শুধু খেতে বসে মৃদু রহস্যের সুরে হাসতে হাসতে বললে, ক্রীসমাসের দিনে আমি মনে করেছিলাম খৃষ্টানের বাড়ির ভোজটা আর একটু আড়ম্বরের হবে—

আমার দিকে চেয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললে, আমরা খৃস্টান না হয়েও আজকের দিনে কলকাতায় যা খাবার ধুম লাগাই। উঃ মনে করতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফুলকপি দিয়ে বড় বড় গলদা চিংড়ির লাল টকটকে কালিয়া, ভেট্‌কী মাছের ফ্রাই—

মনে মনে ওগুলো স্মরণ করেই সামনের খানা খেয়ে নাও—

আমাদের বাংলা কথাতে শকসেনা ঘোর আপত্তি তুলল। মুখ বিকৃত করে বললে, ফলো টেবিল ম্যানার্স—

বিকেলে থেরেসাদের বাড়িতে হাই-টীর নেমন্তন্ন। একটু সকাল সকাল বার হব তাই প্রস্তুত হতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় পামেলা আমার ঘরে এলো।

বললাম, কি খবর মিস্ বেকার্শ্লি? আজকাল তোমাকে বড় কম দেখছি যে—

পামেলা বড় বড় চোখ করে আমার হাত ধরে বললে, কেন—রোজই তো খাবার টেবিলে আমায় দেখতে পাও—

বললাম, ও দেখা কী আর দেখা? বাবাঃ একটা কথা বলবার জো নেই তখন তোমার সঙ্গে।

পামেলা মুখটা খুব ভারিক্কে করে বললে, কাজে থাকি কিনা—তাছাড়া সার্ভিসের একটু এদিক ওদিক হলেই মাম আমাকে খেয়ে ফেলবে। আর আমাকে কেউ কিছু বললে আমার মার বেজায় মন খারাপ হয়। আমি সব কিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু মায়ের মন খারাপ আমি কিছুতেই সইতে পারি না।

পামেলা কথা বলছিল আর বারবার পাশের বড় আয়নাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল নিজেকে। দেখবার কারণ হল ওর গলায় একটা নতুন নকল মুক্তোর শেলী। কানে তার সেট মিলিয়ে দুটো মুক্তোর ষ্টাড্।

পামেলা চাইছিল আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলি। কিন্তু কিছু বলবার আগেই আমার মনে পড়েছিল—সে রাতে রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ডের কথাগুলো। তাই কথা পাল্টে বললাম, ওঃ আজ মিঃ মরিসন যা গম্ভীর হয়েছিল, আর মাম—

পামেলা মুখের ওপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে একটা শস্ করে আওয়াজ

করতে করতে আমার পাশে সোফার ওপরটায় এসে বসল। গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলতে লাগল, আজ খাবার আগে বিষম ঝগড়া হয়ে গেছে কর্তা-গিন্নীতে। কর্তার ব্যাংকে আর একটা পয়সাও নেই। সব পয়সা গত মাসে রেস আর জুয়া খেলে উড়িয়েছে। ক্রীসমাসের স্ফুর্তি করবার জন্যে তাই গিন্নীর কাছে পয়সা চাইতেই গিন্নী যা নয় তাই বলে অপমান করল কর্তাকে আমার সামনে। আমি মলেও কিন্তু আমার স্বামীকে ওরকম অপমান কিছুতেই করতে পারতাম না—

বলে পামেলা বিজ্ঞের মতো ভান করল। কিন্তু বারবার ফিরে ফিরে দেখতে লাগল আয়নাটির দিকে।

এবার আমি অবাক হবার ভান করলাম। বললাম, তোমাকে কী সুন্দরটি দেখাচ্ছে পামেলা। সত্যি আমি একটা বোকা। এতক্ষণ দেখেও তোমাকে কথাটা বলি নি। বাঃ, মুক্তোর শেলী আর স্টাড দুটো কি সুন্দর—ক্রীসমাসে তোমার মা তোমায় উপহার দিলেন বুঝি ?

পামেলার মুখটা এবার লজ্জায় রক্তরাঙা হয়ে উঠল। মুখ নীচু করে সে জবাব দিল—না, মা কোথা থেকে এতো টাকা পাবে বল—

তা হলে কি মিসেস মরিসন দিয়েছেন—

পামেলা আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বিস্ময়ের সুরে বলল, মিসেস মরিসন ?—আ মাই গুড্‌নেস হেভেনস্‌—

তাহলে তুমি কী নিজের জমান টাকায়—

পামেলার মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, মিটার দিল একটু আগে—

বললাম, মিটারের পছন্দটা খুব সুন্দর তো ! তা তোমারও পছন্দ হয়েছে নিশ্চয়ই।

পামেলা খুব খুশী হয়ে বললে, হ্যাঁ—খুব—জিনিসটা খুবই ভাল আর দামী তো ! কিন্তু আমি এইটা পরে কী করে সবার সামনে বার হই বল দেখি ?

বললাম, তুমি যে এতো বোকা তাতো জানতাম না। এটাতো পরবে পার্টিতে যাবার সময় কোন উৎসবের দিনটিনে। সব সময় তো আর তুমি ব্যবহার করছ না—

পামেলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, ঠিক বলেছ—

বললাম, কিন্তু তুমি যে সেদিন আমার কাছে নালিশ করছিলে, মিটার তোমায় মোটেই ভালবাসে না। খালি ঝগড়া করে—

পামেলা কোন কথা না বলে এক ঝটকায় দোর খুলে ভোঁ দৌড় দিলে।

আমি বাড়ির প্রত্যেকটি বাসিন্দাকে ক্রীসমাস ইভের শুভেচ্ছা জানালাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। নেমন্তন্ন আছে বৃটীশ কাউন্সিলে, সেকথা

মনে পড়ল। থেরেসার বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে।

থেরেসাদের বাড়িতে এসে দেখি এলাহি ব্যাপার। তাদের দোকানটাকে আর চেনা যাচ্ছে না। ফার গাছের ডাল, তুলো, কাগজের ফুল, সেণ্ট নিকো-লাসের মূর্তি, আর নানা রঙের বালব্ দিয়ে সাজান হয়েছে দোকান ঘরটা।

আমি যেতেই দুই মায়ে ঝিয়ে বিষম আনন্দে আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল।

এ কোথায় এসেছি ঠিক বুঝতে পারছি না, বললাম আমি।—একটা জায়গা যে দু একটি আলোর বাল্‌বে এমন পাল্টে যায় তা তো আগে জানতাম না—

—এই থেরেসাই সব সাজিয়েছে। বললে, থেরেসার মা।

ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু—

থেরেসা খুশীর চোটে লাল হয়ে উঠল। বললে, এ আর কি সাজান দেখছ, এক একটা দোকান সাজাতে কী রকম খরচ?—ডেকরেটররা তো এ মাসে পয়সা লুটবে দুহাতে। আমাদের ছোট দোকান তাই আর পয়সাগুলো ডেকরেটরকে না দিয়ে আমিই সব করলাম। তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুশী হলাম—

থেরেসাদের বাড়িতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বেশ জমকালো হাই-টী সেরে উঠে পড়া গেল। থেরেসাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলাম বৃটীশ কাউন্সিলে। রাত তখন আটটা। সভ্যদের সবাইকে নিমন্ত্রন পত্র দিয়েছে কাউন্সিল। সেই পত্রে অনুরোধ যা হয় দু শিলিং এর মধ্যে একটা উপহার নিয়ে যেতে।

বৃটিশ কাউন্সিলে এসে রীতিমতো অবাক। সারা ঘরটার রূপ একেবারে পাল্টে অন্য রকম হয়ে গেছে। চেয়ারগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘরটার সারা মেঝে ফাঁকা। এক কোণে প্রকাণ্ড একটা ফারের ডাল জরির সুতো আর রঙীন কাগজ দিয়ে সাজান। তার শাখা-প্রশাখায় ঝুলছে রঙীন বাল্‌বের মালা। ঝিকমিকে একটা আলোর গাছ। সেই রঙীন বাল্‌বগুলোর পাশেই ঝুলছে নিমন্ত্রিতদের দেওয়া উপহারগুলো। ঘরের ছাদ থেকে দেয়াল ধরে লম্বালম্বি টাঙান আলোর মালা। কড়িকাঠে ঝুলছে মিশ্‌ল্‌টো লতার গোছা যেখানে সেখানে।

সারা ঘরটা ফিকে সবুজ আলোয় একটা স্বপ্নরাজ্যের মতো দেখাচ্ছে। কেবল একদিকে ফায়ার প্লেসের গণগণে আগুনে লেগে আছে খানিকটা বাস্তবের পরিচয়।

ঘরে অনেকেই জমা হয়েছে। পরিচিতের মধ্যে পেলাম লোলা গার্সিয়াকে। মিষ্টি হেসে স্প্যানিশ ভঙ্গীতে ইংরাজী উচ্চারণে নরম সুরে গল্প করতে লাগল। সেদিনের সেই ডেভিড ছোকরাকেও দেখলাম। ঘরের একটা পাশেই ছেলে মেয়েতে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল।

এমন সময় ঘরে ঢুকল সেই অপূর্ব সুন্দরী রাজরাণীর মতো চেহারার

মহিলাটি। সে ঘরে ঢুকে কাউকেই প্রায় দেখল না। অথচ তার বড় বড় টানা চোখের তারা দুটো ঘন কালো পাতার ছাউনীর নীচে চঞ্চল হয়ে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনে হল ভদ্রমহিলা খুব ব্যস্ত হয়ে কাকে যেন খুঁজছে। তার চোখের সঙ্গে আমার চোখ মিলতেই হেসে নড্ করল। কিন্তু সে হাসিতে তার মুখের উদ্বেগের ভাবটা চাপা পড়ল না। সারা ঘরটা দেখে নিয়ে সে আমার কাছে সরে এল। আস্তে আস্তে বললে, আপনি কি ডক্টর রেকে এখানে দেখেছেন—

—কে, শুদ্ধসত্ত্ব ? সে তো এখানে আসে নি—

ভদ্রমহিলা আর দ্বিতীয় কথাটি বললে না। নীরবে একপাশে সরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে সভ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। একবার বাঁ পাশের ছোট ঘরটায় গিয়ে দেখি কাউন্সিলের আশ্রম মাতা মিস্ স্কট্ প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁকে সাহায্য করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা জনাদশেক মেয়ে। কেউ খেলার বন্দোবস্ত করছে। কেউ দেয়ালে কী কী ছবি টাঙান হবে সেগুলি সাজিয়ে ঠিক করছে। কেউ বা ফল কুচিয়ে ফেলছে সাইডারের জলের টবের মধ্যে।

একটু পরেই উৎসব শুরু হয়ে গেল। এদের উৎসবের ব্যাপারটা আমাদের ভারতীয়দের চোখে একটু আলাদা ঠেকে। বৃদ্ধ ভারতবর্ষ এসব ব্যাপারকে বালচাপল্য বলেই মনে করবে হয়তো। কিন্তু অনাবিল বাঁধ ভাঙা আনন্দ উপভোগ করতে গেলে অনেক সময় ছেলেমানুষ হয়ে যেতে হয় বৈকি।

খেলা শুরু হল দল তৈরী করে। সবার হাতে একটা করে পিসবোর্ড। তাইতে হাওয়া দিয়ে একটা কাগজের মাছকে ঘরের এপার থেকে ওপারে নিয়ে যাও। কিম্বা ঠোঁটে স্ট্র পাইপ দিয়ে একটা পাত্র থেকে শুক্‌নো মটর কড়াই তুলে আর একটা পাত্রে রাখ। যে দল সবচেয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারবে তারা একটা প্রাইজ পাবে।

হৈ হৈ করে খেলা জমে উঠতে লাগল। শুধু আনন্দ আর আনন্দ। ছেলে-মানুষের মতো আনন্দ। ভগবান যিশু আনন্দের প্রতীক। তাঁর পুণ্য আবির্ভাব পৃথিবীতে পরমানন্দময়ের আবির্ভাব। আজ ক্রীসমাস ইভ। আজ সবাই শিশু হয়ে যাও। সব কিছু ছোট বড়র কমপ্লেক্স্ ভুলে, আনন্দের সাগরে ডুবে একেবারে তলিয়ে যাও, মিলিয়ে যাও।

আমার দল তৈরী করতে গিয়ে খোঁজ করলাম সেই অপূর্ব সুন্দরী মহিলাটির। কিন্তু তাকে আর দেখলাম না হলঘরের মধ্যে। এঘর ওঘর খুঁজেও তার পাত্তা পেলাম না। সে নিঃসাড়ে কখন এখান থেকে সরে পড়েছে। একটু চিন্তা এল মনের মধ্যে। তার এমন কিসের উদ্বেগ যাতে করে সে নিজেকে এমন আনন্দের

জগত থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ভাবনাটা খুব বেশীক্ষণ আমার মনে দাঁড়াতে পারল না। হৈ হৈ করে আনন্দের ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল সারা শরীরে, মনে। মাতন লেগে গেল সারা হলঘরটার মধ্যে। অমৃতের আস্বাদ এসে লাগল আনারস আপেল ভেজান সাইডারের জলে। গ্লাসের পর গ্লাস তাই পান করে সবাই গলা আর মন দুই ভিজিয়ে ফেললে।

একটু পরেই ঘরের সব আলো নিভে গেল। কেবল ফায়ার প্লেসের আগুন-টাই ঘরটাকে একটু ফিকে আলো দিতে লাগল। সেই ফিকে আলোর মধ্যে হঠাৎ ফাদার ক্রীসমাসের আবির্ভাব। লম্বা সাদা দাড়ি গোঁফে মুখ ভর্তি। মাথায় সাদা লম্বা লম্বা চুলের রাশ। পরনে গেরুয়া ঢোলা আলখাল্লা। বগলে একটা মস্ত ঝুলি। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—আমি ফাদার ক্রীসমাস। আমি তোমাদের জন্য ঝুলি ভর্তি করে এনেছি উপহার, এনেছি আনন্দ। এসো, তোমরা এসো, নিয়ে যাও এই আনন্দ দুহাত ভরে—

স্যান্টাক্লস ঝুলি থেকে উপহার বার করে সবাইকে একটাএকটা দিতে লাগলেন। চারদিকে ছেলেমানুষের মতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—ফাদার, এ প্রেজেন্ট ফর মি—ফাদার, এ প্রেজেন্ট—

সবাই কিছু কিছু পেল। কে কি পেল আধা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ ঘরের মধ্যে চড়া আলো জ্বলে উঠল। সেন্ট নিকোলস তাঁর নকল দাড়ি গোঁফ আর আলখাল্লা খুলে আবার একজন কাউন্সিলের সভ্য হয়ে গেল।

সবাই উৎসুক। কে কি উপহার পেয়েছ—আমার হাতে এসেছে একটা গরু। ছোট্ট সুন্দর জীবটি। একটা ঢালু জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে আপনি গা দুলিয়ে সুট গুট করে হেঁটে আসে। দেখে তো সবাই হেসে বাঁচে না। থেরেসা তাকে টপ করে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে নাম দিল—ক্রিস্টাবেল।

একটু পরেই নাচ শুরু হল। কজন ছেলে মেয়ে গিয়ে পিয়ানো আর একর্ডিয়ন নিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল ওয়াল্‌জ্‌-এর চমৎকার ঢেউ খেলান সুর।

নাচে আমি নিরেশ। তবু আনন্দের কিছু কমতি সেই। ওয়ালজ্‌-এর সুর ঘরের সবাইকেই সাগর ঢেউয়ের দোলায় দোলাচ্ছে, নাচাচ্ছে। আমিও নাচছি মনে মনে। ঘর ভরে ছেলে মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় নেচে চলেছে ঘুরে ঘুরে। নাচের মধ্যে একে অপরকে প্রীতি জানাচ্ছে। যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মে অনেকেই তাদের বান্ধবীদের প্রীতির ওপরে হয়তো আরও একটু বেশী কিছু দিয়ে ফেলছে। কোন কোন মেয়ে তাকে গ্রহণ করছে নিছক প্রীতি হিসাবে। কেউ কেউ আবার সুযোগ পাচ্ছে। তবে সব কিছুই ভেসে চলেছে একটা প্রবল স্রোতে। সেটা হল আনন্দের।

এই আনন্দ স্রোতের পিছনে আর একটা স্রোত বইছিল। তার সন্ধান পেতাম না যদি পাশের ক্লোক রুমটায় একটুখানির জন্যে না যেতাম।

নাচ দেখতে দেখতে মনে হল গত কাল দুপুরে জ্যাক ক্রীস্‌মাস ইভের নেমন্তন্ন করেছে। তার কাছে যেতেই হবে। তাই আর দেরী না করে পাশের ক্লোক রুমে গেলাম কোটের খোঁজে। সেখানে তিনটি আফ্রিকান মেয়ে ম্লান মুখে বসে আছে। বৃটীশ কাউন্সিলে এরা প্রায়ই আসে। এদের প্রত্যেকেই আমার পরিচিত। এদের একজনের সঙ্গে আমার একদিন আলাপও হয়েছিল। মেয়েটির নাম এলিজাবেথ উসোরো। বাড়ি উগাণ্ডায়। এখানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্রী। তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, আপনারা তো আমার মতো নাচে নিরেশ নন, এখানে বসে আছেন কেন? যান হলে গিয়ে নাচ শুরু করুন। অনেক ছেলে পার্টনার পাচ্ছে না বলে মুখ শুক্‌নো করে দাঁড়িয়ে আছে—

এলিজাবেথ ম্লান মুখে বললে, নাচের জন্যে আমরা হলে যেতে পারছি না, সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য—

—কেন—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

এলিজাবেথ বললে, আপনি কালো লোক। আপনাকে বলতে বাধা নেই। সাদা চামড়ার লোকেরা আমাদের সঙ্গে নাচে খুব কম। বৃটীশ তো নয়ই। আমরা অবশ্য এখানে এসেছিলাম সাদাদের সঙ্গে নাচবার জন্যে নয়। আমাদের নিজের দেশের কালো আফ্রিকান ছেলে এখানে অনেক রয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই। তাদের সঙ্গেই আনন্দ করতে এসেছিলাম। কিন্তু তারাও আমাদের সঙ্গে নাচতে চায় না। তারা চায় সাদা মেয়েদের সঙ্গ। নাচ শুরু হবার সময় আমরা হলেই ছিলাম কিন্তু কোন ছেলেই আমাদের নাচের সঙ্গী হিসেবে নিতে রাজী নয়—কি সাদা, কি কালো। তাই এই ঘরে এসে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বসে আছি। আপনি আমাকে একটু দয়া করবেন—

বললাম—নিশ্চয়ই, কি বলুন—

উসোরো বললে, আমার বয় ফ্রেণ্ড ঐ আফ্রিকান জনকে আপনি চেনেন নিশ্চয়ই, যে আজ ফাদার ক্রীস্‌মাস সেজে ছিল—তাকে দয়া করে একটু ডেকে দেবেন এখানে? আমি তার সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাব।

—এক্ষুনি দিচ্ছি—

হল ঘরে এলাম জনকে ডাকতে। সেখানে নাচ আরও জমাট বেঁধেছে। আফ্রিকান ছেলেদের প্রত্যেকের মুখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেতে যেতে দেখলাম তাদেরই সবারই সঙ্গিনী হচ্ছে একটি করে সাদা মেয়ে। নাচের তালে তারা ঘুরছে, ফিরছে। মাঝে মাঝে তাদের পুরু ঠোঁট নেমে আসছে সঙ্গিনীদের মসৃণ সাদা কাঁধের ওপর। জনকে সেখানে পেলাম না। অনেক খোঁজা খুঁজি করে তাকে আবিষ্কার করলাম হলের পিছন দিকের ঝুল বারান্দায়। সেখানে

অন্ধকারের মধ্যে ঘরের স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে দেখলাম জন একজন শ্বেতাঙ্গিনীর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে সুদীর্ঘ চুম্বনের মধ্যে ডুবে আছে। নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলাম।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এলএলিজাবেথদের কথা ভেবে। এলিজাবেথকে জানালাম জনকে হলের মধ্যে পাওয়া গেল না।

কাউন্সিল ছাড়বার আগে একবার অফিস ঘরে গিয়ে টেলিফোন করলাম শুদ্ধসত্ত্বকে। ওপারের থেকে নারী কণ্ঠে জবাব পেলাম, শুদ্ধসত্ত্ব বাড়ি নেই। কখন সে আসবে তাও জানা নেই—

টেলিফোনে আমার গলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল—মিসেস রে, ক্রীসমাস ইভে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

ওপারের থেকে বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন—আপনি ভুল করেছেন, আমি মিসেস নই—

বলেই তিনি টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। আমি মনে মনে একটু অবাক হলাম।

থেরেসার কাছে বিদায় নিয়ে বৃটীশ কাউন্সিল ছাড়লাম। যেতে হবে জ্যাকের কাছে।

জ্যাকের বাড়িতে যখন এলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। জ্যাকের ঘরের দরজা খোলা, কিন্তু ঘর খালি। তার সঙ্গে কথা ছিল আমি একটু রাত করেই আসব। এত রাতে ঘর ফাঁকা রেখে সে গেল কোথায় ?

পায়ের আওয়াজ শুনে জ্যাকের বাড়িওয়ালী বেরিয়ে এল। পাশের ঘরেই থাকে বুড়ি। ক্রীসমাসের শুভেচ্ছা জানাতেই বুড়ি বললে, জ্যাক একটু বাইরে গেছে বিশেষ দরকারে। তোমাকে বসতে বলে গেছে। তুমি বসবে কি ?

—নিশ্চয়ই।

বুড়ী জ্যাকের ঘরে আমায় বসিয়ে কয়লার আগুনটা একটু খুঁচিয়ে দিয়ে চলে গেল। জ্যাক যখন ফিরল তখন বারোটা বেজে গেছে। বসে থাকতে থকেতে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঘরের দরজা খোলার আওয়াজে চট্‌কা ভেঙে দেখলাম জ্যাক ঘরে ঢুকছে। আমি উঠেই তাকে জড়িয়ে ধরলাম। ক্রীসমাসের শুভেচ্ছা জানালাম। কিন্তু একি ! আজ এই আনন্দের দিনে জ্যাকের আলিঙ্গন মোটেই গরম লাগল না। মনে হল ভারী ঠাণ্ডা, ভারী সেঁতানো।

জ্যাক আমায় হাত ধরে বসাল। বাড়িওয়ালী বুড়িকে ডেকে আমায় ক্রীসমাসের কেক আর চা দিতে বললে। তারপর আর কোন কথা না বলে পিয়ানোতে বসে টুং টাং করে একটা গৎ বাজাতে লাগল।

তার এই আচরণ আমার কাছে এত নতুন যে আমি প্রথমেই হতভম্ব হয়ে

গেলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই জিমির পাল্লায় পড়ে বেশ কিছু হুইস্কি কি ব্রাণ্ডি টেনে এসেছে, বোধ হয় এটা তারই প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু পরে আমার খেয়াল হল। জিজ্ঞাসা করলাম—অদ্রে কোথায়? তাকে তো দেখছি না—

বাড়িওয়ালী চা আর কেক এনে সামনে বসিয়েছে ইতিমধ্যে। জ্যাক সেদিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বললে, চা খাও, সব বলছি—

বলবার কি আছে? অদ্রে আজ ক্রীসমাস ইভে ঘর ছেড়ে কোথায় রইল? সে কি জানে না, ক্রীসমাস ইভে ঘরের মেয়েদের ঘরে থেকে অতিথিদের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। তাই আবার জ্যাককে জিজ্ঞাসা করলাম—অদ্রে গেল কোথায়, এত রাত অবধি? ফিরবে কখন—

জ্যাকের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। শুকনো গলায় সে বললে, অদ্রে আর আসবে না—

আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ে গেল মিসেস খানের রেস্টুরেণ্টে প্রীতম্ সিং আর অদ্রের সেই ছবিটা।

জ্যাক একটা চিঠি আমার হাতে ধরিয়ে দিলে। পড়লাম। অদ্রে লিখেছে—আমি ভয়ানক ভুল করেছিলাম। এ জীবন আমার নয়। আমি আমেরিকাতে যাচ্ছি। তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম তা ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।

তাহলে কর্তার সিং ঠিকই বলেছিল। প্রীতম্ সিং অদ্রেকে আমেরিকাতে নিয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। কোন কথা আর বলা গেল না। ঝিম মেরে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। মনটা বিষিয়ে তেতো হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলার আনন্দের এতটুকু রেশও মনের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

জ্যাক খানিকটা ম্লান হাসি হাসল। বললে, আমি বার্নাড শ'র অধ্যাপক হিগিনের মতো পিগম্যালিয়ন তৈরী করতে চেয়েছিলাম। রাতের পর রাত আমি ঘুমোই নি, অদ্রেকে এখানে নিয়ে আসার পর। তার ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত করবার জন্যে যে পরিশ্রম আর যে অর্থ ব্যয় করেছি তাতে একটি ছেলে তার ভবিষ্যত তৈরী করে ফেলতে পারে। এখানে তাকে নিয়ে আসার পর দেখলাম সে মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। আমি সে কথা কাউকে জানতে দিই নি। ভেবেছিলাম জীবনে ঘা খাওয়া মানুষ হয়তো আমাকে জানতে পারবে ভাল করে। তাই তাকে ভাল করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। তাই তাকে দিয়েওছিলাম অনেকটা—

একটু থেমে জ্যাক বললে, চল বাইরে যাই।

দুজনে একেবারে নির্বাক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে পথ ভাঙতে লাগলাম। বাইরের তীব্র শীত, রাস্তার এক হাঁটু বরফ, এসব কোন কিছুই আর গায়ে লাগছে

না। রাতও গভীর। রাস্তায় লোকের সংখ্যা অনেক কম।

ইউনিয়ন স্ট্রীটের ওপরকার ইস্ট্ এণ্ড্ ওয়েস্ট্ চার্চের সামনে এসে জ্যাক দাঁড়াল। চার্চের বাইরের চত্বরটায় অন্ধকার। লোকজনও খুব বেশী নেই। জ্যাক আমার হাত ধরে ঢুকে পড়ল চার্চের গেটের মধ্যে। আজ ক্রীসমাস ইভ। তবুও বাইরের বাগানটা আলোর অভাবে ভুতুড়ে বলে মনে হচ্ছে। বাগান ঘুরে এলাম চার্চের দরজার সামনে। ম্যাড়মেড়ে মোমের বাতি জ্বলছে বড় বড় দেউড়ি-গুলোতে। তাতে যেন আরও ভুতুড়ে একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো পার হয়ে এলাম হল ঘরে। সেখানে বেশ আলো। গুটিকয়েক প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের মতো যুবকদের ভিতরে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

একটু পরে একজন সৌম্যমূর্তি পুরোহিত বেদীর কাছে রাখা পিয়ানোর ওপর বসে ভরাট গম্ভীর গলায় হিম্‌ন্ গাইতে শুরু করলেন।

হে আমাদের পরম পিতা, তোমার শিশুদের তুমি ব্যথা দাও শুধু তোমার কাছে টেনে নেবার জন্যে। তোমার দেওয়া দুঃখ, ব্যথা, শোক সবই তোমার অপার করুণার-ই নামান্তর। পরম দুঃখের মধ্যে তোমার পবিত্র আবির্ভাব হোক —আমেন—

জ্যাক হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল প্রার্থনার ভঙ্গীতে। তার দুটো চোখ বোজান ছিল। হঠাৎ তার গলা থেকে চাপা কান্না ভেজা একটা আকুতি ফেটে পড়ল—ঈশ্বর তুমি কোথায়—তুমি আমায় দয়া কর, আমায় আর একটু সহ্য করবার শক্তি দাও—

প্রায় ভোর রাতে বাড়ি ফিরে আবার একবার টেলিফোন করলাম শুদ্ধসত্ত্বকে। সেই আগের নারীকণ্ঠে ঘুম জড়ানো সুরে জবাব এল—তিনি এখনো ফেরেন নি। তবে খবর পেয়েছি, আবার্ডিনের কোন একটা শ্লাম এরিয়াতে একটি সংকট অবস্থার রুগী নিয়ে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন সন্ধ্যা থেকে।

॥ ২২ ॥

ক্রীসমাসের পরের দিনই সাউথ কন্‌স্টিটিউসন স্ট্রীটের মিসেস মরিসনের বাড়ি ছাড়লাম। এলাম এক নতুন পাড়ার নতুন বাড়িতে।

বাড়িটির নামটি বড় সুন্দর—লি-রীগ। কবি বার্ণস্-এর একটি কবিতার নাম।

দেখা মাত্রই আমার পছন্দ হয়ে গেল। শহরের প্রায় বাইরের দিকে ডি নদীর পুল পার হয়েই ওপারে জমিটা একা বেশ উঁচু পাহাড়ের মতো উঠে গেছে।

মাথায় তার পাইন আর ফারের জঙ্গল। সেই পাহাড়াটার গায়ে গায়ে ঝুলছে কতকগুলো নতুন বাংলো ধরনের বাড়ি। আর উঠে গেছে প্যাঁচালো অজগরের মতো প্রকাণ্ড রাস্তাটা এ্যাবট্‌স্‌ওয়েল ক্রেসেণ্ট্‌। এখানে প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গেই কিছু না কিছু বাগান, ফল ফুলের। তার মধ্যে এই লি-রীগ বাড়িটা হল মিসেস ব্রাউনের। আলেক্‌স নিয়ে গিয়েছিল বাড়িটা দেখাতে। সে এ পাড়ার বাসিন্দা। এখানেই একটা বাড়িতে বোর্ডার হয়ে থাকে।

ভদ্র পরিবার। ছোট সংসার। থাকেন বিধবা মিসেস ব্রাউন আর তাঁর বুড়ি বোন জেন। যখন বাড়িটা দেখতে গেলাম তখন মিসেস ব্রাউন বাড়ি ছিলেন না। আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন তাঁর বুড়ি বোন। বুড়ির বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। বিয়ে থা হয় নি। রোগা চেহারা। মাথার চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। সমস্ত চেহারা জুড়ে জড়িয়ে আছে একটা অত্যন্ত শান্ত কোমল ভাব। দেখলেই যেটি মনকে সবচেয়ে আগে ছুঁয়ে যায়। বৃদ্ধা আমাদের সযত্নে ঘরে বসালেন। বললেন, একা থাকতে পারি না। আর কাজের মানুষ আমি। তাই আলেক্‌সকে বলেছিলাম একটি ভদ্রলোক বোর্ডার জোগাড় করে দিতে। তবু তো কিছুটা কাজে থাকব।

একটু পরে বললেন, আমাকে পাড়ার সবাই আণ্টি জেন বলে ডাকে, তুমিও ডেকো—

এদেশের প্রথামতো দরদস্তুর করতে গিয়ে ঠেক খেয়ে গেলাম প্রথমেই। অভিজ্ঞতা ছিল মিসেস্‌ মরিসনের বাড়ির। কিন্তু এখানে সেটা প্রথম ধাক্কাতেই অচল হয়ে গেল। আণ্টি জেন ভাড়ার কথায় বললেন, আমরা তো ব্যবসা করিনে। খরচ তোমার এখানে খুব বেশী পড়বে না। আর সে সব ঠিক হবে আমার বোন এলে। তুমি তোমার ঘরটা পছন্দ কর আগে।

মরিসনের বাড়ির তুলনায় এ বাড়ি মনে হল স্বর্গ। বৃদ্ধা দুখানা ঘর খুলে দেখিয়ে দিলেন। ফার্নিচারগুলো মনে হয় নতুন। তবু শুনলাম সবই বৃদ্ধার বাপের আমলের। বাইরের ঘরে রাখা আছে একটা বিরাট পিয়ানো আর তাকের ওপর একটা বেহালা। বুঝলাম এ বাড়িতে গানের চর্চা আছে।

বৃদ্ধা বললেন, যে কোন ঘর তুমি পছন্দ করতে পার। অবশ্য এদিকের দুখানা ঘরের একটাতে থাকে আমার বোন। আর আমি নীচের মাঝখানকার ঘরটায় থাকি। এই দুটো ঘর ছাড়া আর সব ঘরই তোমার—তুমি আমাদের বাড়িতে বাড়িরই একজন হয়ে থাকবে। কি বল—

কথাগুলিতে আত্মীয়তার সুর বারবার বেজে উঠতে লাগল। ভারী ভালো লাগল শুনতে।

বৃদ্ধা তারপর তাঁর পোষ্যবর্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কোলি আর সেণ্টবার্নাডের সংকর একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুকের মতো কুকুর, নাম র‍্যামসে। একটা

ছোট্ট কচ্ছপ নাম টোবি। খাঁচার মধ্যে ছোট্ট সবুজ রং-এর বাজরেগার পাখি, এদেশে যাকে চলতি ভাষায় বলে বাজী। নাম বিলিবয়। চুমকুড়ি দিয়ে শিস দিলেই ও মিহি গলায় ডাকে, বিলিবো-য় —মাঝে মাঝে কলকল করে ঝগড়া করে। কথাগুলোর কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু মা ব্রুন আর আণ্টি জেন—এই কথা দুটো স্পষ্টই শোনা যায়। বাড়িটার চারদিক ঘিরে আছে একটা সুন্দর শান্তভাব। বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়াতে নজরে পড়ল নীচের সমস্ত শহরটা। ডী পার হয়েই সামনে পড়ে ওপারে আবার্ডিনের বিখ্যাত ডাথি পার্ক ডানদিকে। আর বাঁদিকে প্রকাণ্ড কবরখানাটা।

আণ্টি জেন আমাদের দুজনকে বসিয়ে চা আনতে গেলেন। আলেক্স্ মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল—কেমন লাগছে--

সুন্দর—

আলেক্স বললে, জানিতো তোমার রুচির খানিকটা। তাই এই বাড়িটাতেই তোমাকে নিয়ে এলাম। আশা করছি তুমি এখানে আরামেই থাকবে।

আগুনের কুণ্ডের কাছে বসে গল্প করছিলাম। পায়ের ডগায় একটা কী যেন ঠেকতেই চেয়ে দেখি ছোট্ট কচ্ছপটা পায়ের কাছে চলে এসেছে। এতক্ষণ নজর করি নি। এটা নিশ্চল হয়ে একজায়গায় পড়ে থাকে মনে হয়েছিল। দেখলাম, না তা নয়। খুব আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় ঘরের ভিতরে। ছোট্ট একটা এতটুকু মুখ বাড়িয়েছে কচ্ছপটা। টপ করে হাতে তুলে নিলাম। ভেবে-ছিলাম হয়তো এটা হবে নেহাতই একটা জড়পিণ্ড। কিন্তু জন্তুটার চোখের দিকে চেয়ে সে ভুল ভাঙল। অতটুকু প্রাণীর চোখ যে অত উজ্জ্বল আর অত ভাবব্যঞ্জক হয় তা আমার আগে কোনদিন নজরে পড়ে নি। কচ্ছপটা তুলে নিতেই আলেক্স-এরও মজা লেগেছিল। সেও দেখছিল।

বললে, গস্—কী দারুণ চাউনী দেখ। যেন কিসব বলতে চায়, নয় ?

—সেইরকমই তো মনে হচ্ছে—

সেটার গলার কাছে সুড়সুড়ি দিতেই তার মুণ্ডুটা আরও খানিকটা বার করে দিয়ে চোখবুজে আদরটাকে উপভোগ করতে লাগল। র‍্যামসেও টোবী কচ্ছপের দেখাদেখি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আলেক্স্ তাকে টেনে নিল কোলের কাছে। খাঁচার মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল বিলিবয়।

একটু পরেই ঘরের ভিতর ঢুকলেন একজন ভারী দোহারা চেহারার প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। একটু গম্ভীর ভাব মুখের ওপর লেগে আছে। গুড্ উইস্ করেই আমার সামনে বসলেন।

আলেক্স্ পরিচয় করিয়ে দিল, ইনিই মিসেস ব্রাউন—মিসেস ব্রাউন কথা বলেন খুব আস্তে। আমাকে দেখেই বললেন, বুঝেছি। তোমার পরিচয় আগেই পেয়েছিলাম। এখানে এসেছ ভালই হল। আমাদের একজন সঙ্গী

তো বাড়ল। বাড়িটা পড়ে থাকে ফাঁকা। আমার উইলিয়ম গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে কাজ পাবার পর থেকে আসতেও পারে না চটপট—তা তুমি থাকলেও তবু জানব বাড়িটায় একটা ছেলে রইল। তার জন্যে করবারও কিছু রইল। নইলে বাড়ি ঘরে বাস করার কোন ইণ্টারেস্টই থাকে না। আমার বোন জেনেরও নয়, আমারও নয়। আমি তবু বাইরে কাজ করি তাই নিয়েই আছি। জেনের দিন কী করে কাটে বলত? তা তোমার বাড়ি পছন্দ হয়েছে?

বললাম, খুব। তবুও—

ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন। তাহলে আর কোন কথা নয়। এসো কাল কী পরশু তোমার জিনিসপত্র নিয়ে।

আণ্টি জেন ঘরে ঢুকলেন—এসো, ডিনার তৈরি—

আমি একটু অবাক।—সে কি—

আণ্টি বললেন, এটা ডিনারের সময় যে। অবশ্য স্কটল্যাণ্ডে এখন হাই-টীরই বন্দোবস্ত। তবে আমাদের বাড়িতে এর ব্যতিক্রম। আমরা ইংরেজদের মতো দিনে লাঞ্চ রাতে ডিনার খাই—

কোন আপত্তিই টেঁকল না।

ডিনার টেবিলে বসে দেখি এখানকার খাবারের মেনু মিসেস মরিসনের বাড়ির থেকে অনেক তফাৎ। আণ্টি বললেন, তোমার শারীরিক যত্ন যা কিছু নেবার তার কোন রকম এদিক ওদিক হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে তোমার ভার আমার ওপর দিয়ে দাও।

যে কথা আণ্টি জেন আমাকে দিয়েছিলেন সে কথা একটি দিনের জন্যেও ভুলে যান নি, যতদিন আমি ছিলাম তাঁদের কাছে। মনে পড়ল সে কথা।

এ পাড়ায় এসে আলেক্স ফ্রেজারকে অনেক কাছে পেয়ে গেলাম। সে প্রায় রোজই আসত সন্ধ্যের পরে। বেশীক্ষণ বসতে পারত না। নানা কাজ থাকত তার। একদিকে জিমি রবার্টসন আর একদিকে পড়াশোনা। তবুও একবার করে খোঁজ সে রোজ আমার নিতই। আর শনিবার হলেই ধরে নিয়ে যেত স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নে।

ইউনিয়ন স্ট্রীট থেকে একটু ভিতরে ঢুকেই কিং স্ট্রীট। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে গথিকের চূড়ো তোলা প্রকাণ্ড মারিশ্যাল কলেজ ডানদিকে। বাঁদিকের তিনতলা বাড়িটা স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের বাড়ি। হরেক রকম ছাত্র-ছাত্রীর মেলা বসে এখানে। সাদা-কালো, হলদে, বাদামী। কোন রঙের চেহারাই বাদ যায় না। সবাই ছাত্র। সবাই এসেছে পড়াশুনো করতে। সারা সপ্তা এরা দম ফেলবার অবকাশ পায় না। কিন্তু শনিবার এদের ফুর্তির দিন। সন্ধ্যা সাতটা থেকে স্টুডেণ্ট্স্ ইউনিয়নের বারগুলো খুলে দেওয়া হয়। কেবল সাইডার আর বীয়ার পরিবেশন করা হয় এই বারগুলোতে। হুইস্কি, ব্রান্ডি, কি শেরী

শ্যাম্পেনদের প্রবেশ এখানে নেই। সন্ধ্যে থেকে জড়ো হয় ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের দল। অবশ্য শিক্ষকরাও এসময়ে ছাত্রই হয়ে যান। তাঁদের আচার ব্যবহারে থাকে না কোন রকম গুরুগিরির গন্ধ। ঘরে ঘরে অজস্র বাতি জ্বলে ওঠে। কোন ঘর থেকে ভেসে আসে ফক্সট্রট, ট্যাঙ্গো কি ওয়াল্‌জের সুর। কোন ঘরে ডিবেটের উত্তেজনাভরা আওয়াজ, কোন ঘর থেকে একটানা বক্তৃতার ভাষা। হল ঘরে প্রায় পাঁচশো ছেলেমেয়ের সমস্বরে কোরাস ওঠে—

ও মাই ডার্লিং ক্লেমেণ্টাইন্‌

দাউ আর্ট লস্ট্‌ এণ্ড্‌ গন্‌ ফর্‌ এভার্‌

ফলিং টু ফোমিং ব্রাইন।

দীর্ঘশ্বাস ওঠে—কোন এক অজ্ঞাত মৎস্যগন্ধা মলিমেলোনের উদ্দেশে—

এলাইভো লাইভো হো, এলাইভো লাইভো হো—

ক্রাইং কক্‌ল্‌স্‌ এণ্ড মস্‌ল্‌স্‌ এলাইভো লাইভো।—

ও—ও—ও।

শব্দের টানটা থেমে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে হলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

এখানে এই ইউনিয়নের বাড়িতে শনিবার সন্ধ্যেয় জমাট আড্ডা বসে হল ঘের। এক একটা টেবিল ঘিরে বসে পাঁচ ছজন করে ছেলেমেয়ে। হাসি, গান—আর রকমারি মজার গল্প। তার সঙ্গেই নরনারীর চিরাচরিত কাহিনী। কোরাস গানের স্রোতের নীচে চলে বিয়ার কী সাইডারসিক্ত ঈষৎ জড়িত অস্ফুটকণ্ঠের মদ-কাকলী। সুন্দরীদের কটাক্ষ আরও মোহময় হয়ে ওঠে রাত্রি যত গভীর হতে থাকে। একসময়ে দেখা যায় এখানে ওখানে ছড়ান ভীড়টা বেশ জমে জমাট হয়ে গেছে সুন্দরীদের ঘিরে। যেমন শুক্তির মধ্যে বিন্দুকে ঘিরে জমে ওঠে মুক্তোর দানা।

রাত এগারোটায় সারা বাড়িটার ঝিম ধরে যাওয়া স্নায়ুতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি লাগে। ঢং-ঢং-ঢং করে পালা শেষ করবার ঘণ্টা বাজে। ওয়েটাররা ঘরে ঘরে এসে ইঙ্গিত দেয় তৈরী হবার। তারপরই গা-তোলবার পালা। নীচে নেমে এলেই রাত এগারোটার কটা বাসকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। হুল্লোড় করতে করতে ছেলেমেয়ের দল বাস ভর্তি হয়। মাইল দুই দূরে কিংস কলেজের সামনে বাস থামে।

তারই উল্টো দিকে জিমি জলির বিখ্যাত কফিখানা। ছেলেমেয়েদের শুকিয়ে-ওঠা গলাতে গরম কফি ঢালতে আর একটু নড়ে চড়ে যাওয়া মাথাটাকে ঠিকঠাক করে দিতে জিমি জলি ওখানে দোকান খুলে বসে আছে। অন্ততঃ জিমি জলি নিজেই সেই রকম বিশ্বাস করে আর বলেও সেই কথা।

ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে অধ্যাপক-অধ্যাপিকার কাছে সে সুপরিচিত। লম্বা হুঁকোর খোলের মতো মুখে চার্লি চাপলিনী গোঁফ।

মাথার ওপরটায় প্রকাণ্ড টাক। মরুভূমিকে ঘিরে থাকা গুল্মের মতো আশে পাশে কয়েক গোছা চুল। জিমি জলি সব সময়েই হাসছে আর মস্করা করছে।

জিমিকে না হলে ছেলেমেয়েদের চলেই না। কারণ গলা ভেজান ছাড়াও জিমির আর একটা বিশেষ কাজ আছে। সেটা হল প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েদের নাড়ীনক্ষত্র জেনে রাখা। কে কার সঙ্গে কখন বেড়াতে গেল। কে কাকে কবে হৃদয় দিল। কোন সুন্দরী এখনও সঙ্গী পায় নি, পাবার আশায় আছে—ওপরে ভান করে তার সঙ্গীর দরকার নেই। এসব অতি আবশ্যকীয় গুহ্য তত্ত্বকথা জলি ছাড়া আর কার কাছে পাবে?

তোমার বান্ধবীকে খুঁজে পাচ্ছ না আজ সন্ধ্যেয়, সোজা চলে যাও জিমির কাছে। খড়িপাতার মতো জিমি বলে দেবে সে আজ ডিনার ডান্সে গেছে অমুক ছেলের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে এও জানাবে সে ভারী ধনী লোকের ছেলে। কাজেই সাবধান।

কাঁদো কাঁদো মুখে কোন মেয়ে এসেছে জিমির কাছে, আজ কেউ তার সঙ্গী নেই। ভয় কী, জিমি এক্ষুণি ঠিক করে দেবে। ঐ যে কোণে বসে ছোকরা কফি খাচ্ছে, একটু রোগা দেখতে বটে কিন্তু ভারী ভালো মানুষ। সবে এসেছে ডেনমার্ক থেকে—

খোশগল্পের রাজা জিমি। শুধু কফি খাওয়াবে তা নয়। প্রত্যেকটি খদ্দেরের কাছে গিয়ে হেসে দু-দণ্ড গল্প তার করা চাই-ই। কাজেই এহেন জিমির কফিখানা যে রাত বারোটা অবধি খোলা থাকবে তাতে আশ্চর্য কি?

রাত বারোটার পর আর কাউকে থাকতে দিতে তার ঘোরতর আপত্তি। হাজার হোক পুলিশের ভয় আছে তো? রাত বারোটার শেষ বাসে যে যার সবাই ঘরে কেটে পড়ে। জিমির কফিখানাতেই ঠিক হয়ে যায় কোন সুন্দরীকে কে বাড়ি পেঁাছে দেবে। কনুই গোঁতাগুঁতি একটু যে না হয় তা নয়। তবে জিমি শেষ পর্যন্ত সব ঠিক করে দেয়। আস্তে আস্তে জোড়ায় জোড়ায় সব কেটে পড়ে।

আবার একসপ্তা সব চুপচাপ। এইভাবে চলে বছরের সব কটি সপ্তা। বরফ, ঝড়, বৃষ্টি কিছুতেই এর কামাই নেই, শুধু মাত্র ছুটির কটা সপ্তা ছাড়া।

॥ ২৩ ॥

নতুন পাড়াতে পরিচিত হতে খুব বেশী দেরী হল না। বাড়িতেও সে পরিচয়ের শুরু হল বেশ নতুন ভাবে।

এতদিন ঘিঞ্জি ডক এলাকায় থেকেছি। মিশেছি হরেক জাতের লোকের সঙ্গে। এই মেশামেশির মাধ্যমটা ছিল সব সময়ে খাঁটি ইংরেজী ভাষা। এবার চলে এসেছি স্কটল্যাণ্ডের ঢেউ খেলান পাহাড়ে প্রকৃতির মধ্যে। বাস করছি তার

কোনিফারের জঙ্গলের সান্নিধ্যে। মুক্ত বাতাস সব সময়ে ছুটে আসছে ডী নদীর ওপর দিয়ে। এ হল খাঁটি স্কটল্যাণ্ডের প্রকৃতি। মিসেস ব্রাউন আর আণ্টি জেনও খাঁটি স্কট্। দেহে মনে, কথাবার্তায় এবং আচার আচরণে।

সন্ধ্যেবেলাতে মিসেস ব্রাউন কাজ থেকে ফিরলেই একসঙ্গে আমরা তিনজনে ডিনারে বসি। আণ্টিজেন, মিসেস ব্রাউন আর আমি। র‍্যামসে কুকুরটাও মিসেস ব্রাউনের কোলে দুটো থাবা তুলে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে। তার জন্যেও টেবিলে পড়ে একটা প্লেট। বিলিবয় র‍্যামসের আদর দেখে খাঁচার মধ্যে ঝটপট করে। কিচমিচ করে নানান কথা বলে যায়। কখনও কখনও বেশ রেগে গিয়ে উচ্চারণ করে মা—ব্রুন, আণ্টিজে—ন। টোবি কচ্ছপের খাওয়া দাওয়া নেই। কোনদিন যদি রোদ ওঠে আবহাওয়া ভাল হয় তবেই সে কিছু ঘাসপাতা খায়। নৈলে চুপচাপ। না খেয়ে তার এক সঙ্গে অনেকদিন যায়। টোবি র‍্যামসের বিশেষ বন্ধুলোক। তার বড় বড় লোমের মধ্যে টোবি আরাম করে শুয়ে ঘুমোয়।

রান্না করেন আণ্টি। বুড়ির এই একটা শখ। বাংলা দেশের যে-কোন ঠাকুমা দিদিমার মতই তাঁর রান্নার শখটা প্রবল। শুধু তাই নয়। রোজই এক একটা নতুন মেনু। বই খুলে কি খবরের কাগজের পুরোনো কাটিং থেকে ফাইল করে নানান রান্নার লিস্টি তৈরী করেছেন আণ্টি। রোজই নতুন পদ একটা না একটা তৈরী হওয়া চাই।

—এটা কী আণ্টি—

এটা টোড্ ইন্ দি হোল্—বলেই আণ্টি হেসে ফুটিফাটা—

পরের দিনই হয়তো টেবিলে দেখতে পাওয়া যাবে একটা নতুন পদার্থ। —এটা ফ্রিকেসী।

তারপরের দিন আরও একটা—জার্মান হামবুর্গার—

মাংস খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি? আণ্টি বাঁধা কপি স্যালাড দিয়ে সুন্দর ডিস তৈরী করে দেবে। রুবার্বের চাটনী করে দেবে। আর বেশীর ভাগ দিনই দেবে স্কচ ব্রথ।

স্কচ ব্রথ, রুবার্ব আর হেগিশ স্কটদের একেবারে অতি প্রিয় ডিনারের মেনু, বলেন আণ্টি।

একদিন ধরলাম, হেগিশ খেতে হবে। আণ্টি কিছুতেই রাজী নয়। বললেন, ও খেতে পারবে না—

শেষে একদিন জিদে পড়ে আণ্টি তৈরী করে ফেললেন। খেয়ে ঢেকুর উঠল চব্বিশ ঘণ্টা। আর এই চব্বিশ ঘণ্টায় পেটের ভিতর যেন একটা বদ গন্ধ গুলিয়ে উঠতে লাগল। শুনলাম ভেড়ার পাকস্থলীর ভিতরে কোচান মাংস আর কী কী সব গাছগাছড়া দিয়ে আধপচা করে তাকে সিদ্ধ করে হেগিশ তৈরী করে।

আণ্টি হো হো করে হেসে বললেন, কেমন আর হেগিশ খাবার ধুয়ো তুলবে ?

মিসেস ব্রাউন বললেন, এ তো তবু ভাল ! আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের আমলে সাধারণ স্কটরা দিনে তিনবার কেবল পরিজ খেয়েই থাকত। নুন দেওয়া পরিজ। ব্রেকফাস্টেও পরিজ, লাঞ্চেও পরিজ আর ডিনারেও সেই পরিজ। তবে এখন স্কটল্যান্ডে খাবারের অভাব নেই। টাটকা মাংস, আলু, ডিম আর দুধ এদেশে যা হয় ইংলণ্ডে চালান না গেলে তা এখানকার পক্ষে যথেষ্ট।

খাবারের টেবিলে বসলেই গল্প শুরু হয়। মিসেস ব্রাউন নানান খবর নিয়ে আসেন শহর থেকে।

—এ্যাবটস্‌ওয়েল ক্রেসেণ্টে শিগ্‌গির বিয়ে লাগছে বোধি—শুনেছো—

বললাম, কই না তো। কার বিয়ে—

ঐ যে গো নীচের রোতে দু-নম্বর বাড়ির মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়ে যেটি।

মেয়েটিকে রোজ বাসে যেতে-আসতে দেখি। তাই চিনতে আমার কষ্ট হয় না। বলি, তাই নাকি ? কার সঙ্গে ? এ পাড়ার কেউ নাকি ?

—না না, স্টোনহাভেনের একটা চাষার সঙ্গে। চাষাটার পঞ্চাশটা গরু আর তিনশোটা হাঁস-মুরগী আছে। পড়াশুনোতে নাকি আমারই মতো। শুনলাম, অনেকদিন থেকেই ওরা এনগেজ্‌ড ছিল। বাপ-মার ঘোর আপত্তি। কিন্তু মেয়েটার কী পছন্দ দেখো একবার। এম-এ পড়া মেয়ে, সে কিনা বিয়ে করবে একটা আকাট মুখ্যুকে। হরিবল্‌—

বলি, বিয়ে করবে কী ডিগ্রীকে না লোকটাকে—

আণ্টি জেন হেসে গড়িয়ে পড়লেন। ও, মাই মাই—ডিনা কেন (জানি না) ওরা একে অপরে কেমন করে ম্যাচ্‌ করবে ? হাউ এভার নে বদার এটা (ভাবনার কিছু নেই)—বোডি—নতুন রেসিপিটা কেমন লাগল—

—চমৎকার—কিন্তু বুঝলাম না আণ্টি পদার্থটা কী—

আণ্টি আর খানিকটা পাতে দিতে দিতে বলেন, এটা ফরাসী মিট পাই—

আমি হাঁ হাঁ করে উঠি। একি—এতো খেতে পারব কেন ?

—আহা এটুকু না খেলে শরীর থাকবে কেন ? আমার উইলিয়মের কাছে এই প্যানের সবটাই একেবারে নস্যি গো—

আণ্টির এই এক অভ্যাস। কিছু একটা খাবার ভাল লেগেছে বললেই সেটা আবার খানিকটা পাতে চাপিয়ে দেন।

খাবার পরেই মিসেস ব্রাউন আর আণ্টি জেন এসে বসেন বাইরের ঘরে। একজন বসেন পিয়ানোতে আর একজন গান করেন। ও'রা দুজনেই সঙ্গীতে পারদর্শিনী। তবে মিসেস ব্রাউন এই পঞ্চাশ বছরেও যে রকম মিষ্টি হিম্‌ন্‌ গান, অনেক যুবতীর কণ্ঠেও সে রকমটি শোনা যাবে কিনা সন্দেহ। আর

পিয়ানোর ওস্তাদ আণ্টি জেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নিবিষ্ট মনে বসে অপূর্ব সুর সৃষ্টি করে যান। বাজান মেণ্ডেলসনের মিড সামার নাইটস ড্রিম, কিম্বা বিথোফেনের সেভেন্থ্ সিম্ফনি নয়তো ভাগনার কী বাখের কোন সোনাটা।

আন্টি রীতিমতো ক্লাসিক সঙ্গীতের ভক্ত। বাজাতে বাজাতে তন্ময় হয়ে যান আন্টি জেন। তখন তাঁকে দেখলে আর একজন বলে মনে হয়। যে আন্টিকে এখন-তখন দেখি, হেসে গড়িয়ে পড়ছেন, রসিকতা করছেন কথায় কথায়, সেই আন্টির মুখে চোখে নেমে আসে কেমন একটা অপরিচিত অপার্থিব ভাব। চোখ-মুখের আদলটা থমথমে হয়ে যায়। কিন্তু ঠোঁটের কোণে দাঁড়িয়ে থাকে একটুকরো অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। ঝড়ের মতো বাজিয়ে যান আন্টি। বাজনা থামার পরও বহুক্ষণ তাঁর সেই ভাবটা থাকে। তারপর আস্তে আস্তে তিনি সহজ হন।

মিসেস ব্রাউনের কাছে শুনেছি জীবনে গভীর আঘাত পেয়েছেন আণ্টি যখন তাঁর বয়স বাইশ। সেই থেকে গান বাজাতে বসলেই উনি অমনি হয়ে যান। অবশ্য গান নিয়ে আছেন বলেই তাঁর এই বয়সেও তিনি হেসে কাজ করে বেড়াচ্ছেন।

মিসেস ব্রাউন একদিন বলেছিলেন, নিউজিল্যাণ্ডে আমাদের বাবা যখন ফার্মিং এর কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন জেনের বয়স কুড়ি আর আমার দশ। সঙ্গে গিয়েছিল মা আর জেনের এক গানের মাস্টার। মাস্টার ছিল অতি সুপুরুষ আর ক্লাসিক মিউজিক বাজাত অদ্ভুত সুন্দর। বাবা ছিলেন গান-পাগলা। কাজেই তাকে নিউজিল্যাণ্ড যাবার সময় ছেড়ে গেলেন না। স্কটল্যাণ্ড থেকে নিয়েই গেলেন সঙ্গে করে। তার সঙ্গে জেনের হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দীর্ঘ দিন ধরে। তারপর একদিন রাতারাতি সে উধাও হল আমাদের বাড়ির মাউরী ঝিটাকে নিয়ে। এই নিয়ে বহু কেলেঙ্কারী হয়েছিল সেখানে। কিন্তু সে ভদ্রলোকের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেই থেকে জেন কুমারীই রয়ে গেল। কিছুতেই আর বিয়ে করল না। নৈলে ওখানকার কয়েকজন অবস্থাপন্ন লোক চেয়েছিল ওকে বিয়ে করতে। তারপর ওর এই অবস্থা।

কোন কোন দিন ডিনারের পরেই বেরিয়ে পড়ি। ফিরতে যত রাতই হোক ফিরে দেখি দুইবোনে অপেক্ষা করে আছেন সাপার সাজিয়ে।

দেশের বাড়িতে মায়ের কথা মনে পড়ে।

সাপার খাইয়ে আমার ফায়ার প্লেসে সারা রাতের মতো কাঠ দিয়ে, বিছানার মধ্যে গরম জলের বোতল রেখে নিশ্চিন্তে দুজনে শুতে যায়। কোন আপত্তি করলে দুজনেই বলে, তোমাকে গরমে না রাখলে আমাদের পাপ হবে।

রবিবারে এ বাড়িতে কতকগুলি গেস্টের আবির্ভাব হয়। পুরানো আবাডিন থেকে আসে এ্যাগী, ডীর অপর পার থেকে আসে ইংরেজ ক্লারা। এরা দুজনেই

মিসেস ব্রাউনের বান্ধবী। কারুরই বিয়ে-থা হয় নি। এরা দোকানে কাজ করে সারা সপ্তা। প্রত্যেক রবিবারে এখানে আসে দুপুরবেলা। ডিনার শেষ করে একেবারে রাতে বাড়ি যায়।

মাঝে মাঝে আসেন মিসেস ব্রাউনের আপন মাসী অ্যান্টি এ্যানী। সত্তর বছরের বুড়ি। কিন্তু কী সাজের ঘটা! আন্টি এ্যানী আপ্রাণ চেষ্টা করেন নিজেকে যুবতী বলে প্রমাণ করতে। অবশ্য এত বয়সেও আণ্টি এ্যানীর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আগুনের আঁচ কমে এলেও একেবারে নেভে নি। তাঁর হাসি, তাঁর কথাবার্তা, ঠাট-ঠমক চমক লাগাবার মতো এখনও।

মিসেস ব্রাউন বলে, এখনও ঐ হাসি দিয়ে অনেক ছোকরাকে আন্টি মাথা ঘুলিয়ে ধরে আনতে পারে।

প্রথম যেদিন আন্টি এ্যানীকে দেখি সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। এক রবিবারে দুপুরের লাঞ্চের পর ড্রইংরুমে বসে আগুন পোহাচ্ছি আর কী একটা পড়ছি একমনে। হঠাৎ মনে হল পিছন থেকে কে যেন ঢুকল। ফিরে দেখি একটি সুন্দরী বৃদ্ধা।

উঠে দাঁড়ালাম। পরিচয় দিলাম। হাতে হাত মিলিয়ে ভারী মিষ্টি গলায় তিনি বললেন, হা-ডু-ডু? তুমিই বোধি? তোমার নাম অনেক শুনেছি জেনের কাছে। আমি ওদের আন্টি অ্যানি। বৃদ্ধার চুলগুলি সব সাদা কিন্তু পরিপাটী করে কার্ল করা। চর্ম লোল কিন্তু তাতে পাউডারের আর রুজের মোটেই অপ্রতুলতা নেই। কানে মুক্তোর দুল। গলায় শেলী। ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক। ভুরুগুলি সযত্নে আঁকা। আন্টি এ্যানির এক হাতে সিগারেট অপর হাতে 'নিউজ-অব-দি ওয়ার্লড্' যাতে দুনিয়ার যতো নারীঘটিত কেচ্ছার খবর ছাপা হয়, তারই এক কপি।

আণ্টি খুব আগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। খোঁজ নিলেন ভারতবর্ষের রীতি-নীতির খুঁটিনাটির। ভারতবর্ষের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল অসীম। তারপর এলেন ব্যক্তিগত কথাবার্তায়।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন তাঁর দুই বোন-ঝি।—কী গো আণ্টি কখন এলে? বোধির সঙ্গে একা বসেই যে আলাপ শুরু করেছ ব্যাপারটা কী—হাসতে হাসতে বললেন মিসেস ব্রাউন।

আণ্টি অ্যানি হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন—ভারতীয় আম একটু চেখে দেখেছিলাম, টক্ না মিষ্টি। তা যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে এ বর্ণচোরা। —বলে আণ্টি এ্যানী মুখচোখে একটা গম্ভীর ভাব করে ভুরু কোঁচকালেন।

সবাই হেসে উঠলাম আমরা। আমি বিস্ময়ের ভান করে বললাম, আপনি কী এখনও চাখাচাখি করেন নাকি?

দ্বিধাহীন কণ্ঠে আণ্টি জবাব দিলেন—নিশ্চয়ই—

তারপর সুন্দর সুরে আবৃত্তি করলেন—

—ও, মাই লাভ ইজ্ লাইক্ এ রেড রেড রোজ
দ্যাট্স্ নিউলী স্প্রীং ইন্ জুন।
ও, মাই লাভ ইজ্ লাইক্ দি মেলোডী
দ্যাট্স্ নিউলী প্লেড্ ইন্‌টিউন॥

বলেই আণ্টি হো হো হাসতে লাগলেন।

আণ্টি জেন বললেন, এই আরম্ভ হল। ওঃ—আণ্টি তুমি এক চীজ্ বটে। তা এই বয়সে ঐসব ছোকরাগুলোকে কেন নাচাচ্ছ বলতে পার?

আণ্টি এ্যানী আরও হাসতে হাসতে বললেন, বুড়ি যে একটু হই নি এমন বললে মিথ্যে বলা হবে। এই দ্যাখনা দাঁত দুপাটি পড়ে গেছে তাই বাঁধাতে হয়েছে। তা এখন তো শক্ত কিছু চিবুতে পারব না। কচি নরমের ওপর তাই অত ঝোঁক।

অ্যাণ্টি এ্যানীর কথাবার্তায় তখনও আমার ধারণা হয় নি যে এসব ঠাট্টা না আসলে সত্যি।

আণ্টি এ্যানী একটুখানির জন্যে বাইরে উঠে যেতেই মিসেস ব্রাউন বললেন, এদিকে আণ্টি আমাদের খুব খোলা মনের লোক। যা করে তাই বলে।

আমি বললাম, সে কি! এই বয়সেও—

মিসেস ব্রাউন চোখটা একটু মটকে জবাব দিলেন—ওকে গোর দেবার সময় যদি কবরের কাছে কোন সুন্দর ছোকরা থাকে তবে ও মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে নির্ঘাৎ। এ অভ্যাস ওর এ জন্মে যাবে না—

আণ্টি এ্যানী ঘরে ঢুকে বললেন, কী বোধি আমার সম্বন্ধে পরের কাছ থেকে খবর নিচ্ছ? তার দরকার কী? এসো না একদিন আমার বাড়িতে সেখানে ভাল করে পরিচয় দেবো আর নেবো। আর তা না হলে—বলেই বার্নস্-এর কবিতা আওড়ালেন আণ্টি।

গি মি দি আওয়ার ও' গ্লোমিন গ্রে।
ইট্ মেক্স্ হার্ট স্যায় চিয়ারী ও,
টু মীট্ দী অন্ দি লী-রিগ,
মাই য়েনকাইণ্ড্ ডিয়ারী ও।

কথায় কথায় বার্নস্ আবৃত্তি করেন আণ্টি। শুনলাম বার্নস্-এর কবিতা নাকি অনর্গল বলে যেতে পারেন। রবি বার্নস্এর নাম শুনলেই আণ্টি প্রায় অজ্ঞান!

আমাকে বললেন, দেখ বোধি, আমি বোধ হয় গত জন্মে ছিলাম হিলান·মেরী (হাইল্যাণ্ড মেরী—বার্নস্-এর প্রেয়সী)।

আণ্টি জেন রসান দিয়ে বললেন, বার্নস্ একটি লোক ছিল বটে—

বলতে না বলতেই আণ্টি এ্যানি তাঁর কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে ওই তো হল পুরুষের হিম্মত। আর মেয়ের মতো মেয়ের হিম্মত হল ঐ রকম পুরুষকে জোর করে আটকে রাখা। এতো ছেলের সঙ্গে তো মিশলুম কিন্তু বার্ণস্-এর মতো একটিও আমি পেলাম না—

মিসেস ব্রাউন বললেন, কেন আমার আংক্ল্ জো—

আণ্টি হেসে কুটিকুটি হলেন—ও মাই, মাই—

বললেন, শোন সেই গল্প। আংক্ল্ জোর বয়স বোধ হয় তখন এই পঁচিশ। আর আমি হলাম আঠারো উনিশ। এই বয়সেই বেশ পোক্ত হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী বার্ণস্-ই আমাকে পাকিয়েছে। ওদের আংক্ল্ জো এলেন নিউজিল্যাণ্ড থেকে। ওর বাপের আদুরে ভাইটি। শুনলাম বেশ দুপয়সা করেছে আংক্ল্ শুয়োর পুষে। ওর বাপ তার আদুরে ভাইটিকে বোধ হয় এই অধমা শালীর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই দিলেন একদিন এই বাড়িতেই আলাপ করিয়ে। আমি মনে মনে হেসে বললাম, আচ্ছা একটু আগে দেখে নি, পরের কথা পরে।

একদিন রাতে ঐ পিছনের বাগানে দুজনে বেঞ্চের ওপর বসে আছি। আমি একটু করে কথা বলছি আর দূরে চাইছি। দেখি জো আমাকে আড়ে আড়ে দেখছে। তার দিকে চাইলেই ঝট করে সে চোখ নীচু করছে। ভারী মজা লাগল আমার। বললাম, ডিয়ার জো, মুখটা তোলই না। আমি কী এতই কুৎসিত যে আমাকে দেখাই চলে না। জো আস্তে আস্তে চোখ তুলল। আমি বেশ জানি ওর সার্টের ভিতরে তখন ঘামের দরানি বইতে আরম্ভ করেছে। পাল্স বীট বেশ বেড়ে গেছে। হঠাৎ আমি—ডিয়ার জো তুমি কী সুন্দর, বলে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতেই এক ঝটকায় জো আমাকে ফেলে দিয়ে সেই যে চম্পট দিল আর আমার সামনে আসে নি—

বলেই আণ্টি হো হো করে হেসে ফেললেন।

ডিনারের পর আণ্টি চলে গেলেন।

আণ্টির সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে দেখলাম সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর রসাল মনটাই আমাকে নাড়া দিয়ে গেল সবচেয়ে বেশী। এদিকে ডিনার টেবিলে মিসেস ব্রাউনকে মা-ব্রুন বলে ডাকতেই ইংরেজ ক্লারার এটিকেটে বোধহয় আঘাত লাগল। ভুরু কুঁচকে মিসেস ব্রাউনকে জিজ্ঞাসা করল—এ তোমাকে মা-ব্রুন বলে কোন হিসাবে—

মিসেস জবাব দিল—কেন—হিসেব তো খুব সোজা। এ বাড়িতে যে কটি পোষ্য আছে সব কটিই আমার ফ্যামিলী। সেই হিসেবে বোধিও এখন ব্রাউন ফ্যামিলী। সুতরাং মা-ব্রুন বলতে বাধাটা কোথায় ?

ক্লারা চুপ করে গেল।

মিসেস ব্রাউনের ভয়ানক শখ নানারকমের খবর জোগাড় করা। তাই রবিবার দুপুরে তাঁর কাছে আসে পাড়াপড়শী গিন্নীবান্নীর দল। সবাইকে নিয়ে বেশ জমাট আড্ডা বসান মিসেস ব্রাউন আর আণ্টি জেন। মাঝে মাঝে এই সময়ে আমারও ডাক পড়ে। কখনও কখনও মিসেস জনস্টন তাঁর মোটা শরীরটা টেনে টেনে নীচের রাস্তা থেকে ওপরে উঠে আসেন। হাতে একটা ঝুড়ি। এই কিছু আপেল পেকেছে গাছে, নিয়ে এলাম মিসেস ব্রাউন।

আস্তে আস্তে এ্যাবাটস্‌ওয়েল ক্রেসেণ্টে পরিচিত হয়ে পড়ি। অপরিচয়ের বাধা কেমন করে ঘুচে যায় সব সময়ে বুঝতেও পারি নি, চেষ্টাও করি না। ঘরের স্নেহ যত্নে একবারও মনে হয় না আমি বিদেশে আছি। বাইরেও আস্তে আস্তে মিশে যেতে থাকি ঠিক সেইভাবে।

॥ ২৪ ॥

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম—আজ তো বছরের শেষ দিন। নববর্ষ আপনারা স্কটল্যাণ্ডে কী ভাবে পালন করেন?

প্রশ্ন শুনে প্রোফেসর তাঁর বিরাট চুলে ভরা ঝাঁকড়া মাথাটা দুলিয়ে হো হো করে খুব একচোট হেসে নিলেন। তারপর বললেন, এদেশে মদ খেতে মানা নেই। কিন্তু তবুও লোকে একটা না একটা ছুতো খোঁজে। আমাদের এখানে নববর্ষের প্রথম রাতটা হল মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হবার সবচেয়ে বড় ছুতো। দেখো ইউনিয়ন স্ট্রীটের বড় রাস্তার ওপর দিয়ে হুইস্কি, ব্রাণ্ডীর স্রোত বয়ে যাবে। অন্য ছোটখাট রাস্তার তো কথাই নেই।

বললাম, তা না হয় একটু হল। কিন্তু অন্য কিছুও তো হয় তার সঙ্গে নববর্ষের প্রথম দিনটাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে।

প্রোফেসর বললেন, মদ খেয়ে মাথা ভারী হয়ে উঠলে কি আর কারবার কিছু থাকে? সুতরাং ও কথা ছাড়।

কথাটা তখনকার মতো ছেড়ে দিলেও সেদিন সন্ধ্যাবেলায় টের পেলাম হগম্যানি নাইট (**Hogmanie night**) এরা কাকে বলে।

স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় উৎসব নববর্ষের উৎসব। ক্রীসমাসের উৎসবও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। শহর সেই ক্রীসমাস থেকেই যে সাজে সেজেছিল তার ওপর আরও কয়েক দফা সাজ চড়েছে। দোকানে দোকানে রাস্তা-ঘাটে নিয়নের আলোর সংখ্যা বেড়ে গেছে প্রচুর। শহরের যেখানে সেখানে পাতাঝরা গাছগুলোতে লাল নীল, সবুজে হলুদে হরেক রকম বাল্‌ব লাগিয়ে দেওয়া

হয়েছে। দোকানগুলোর সাজ দেখে মনে হচ্ছে না তাদের কোন রকমে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। রাস্তায় ভীড় বেড়েছে চতুর্গুণ। শহরের প্রত্যেক বাড়িতে সাধ্য অনুযায়ী সাজাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ইউনিয়ন স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে থাকলে মনে হয় যেন কোন অজানা আলোর রাজ্য দিয়ে চলেছি। চিনতে কষ্ট হয়। মাথার ওপর বরাবর তার টাঙিয়ে তা থেকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ওপর। বড় বড় বাড়ির থামগুলোতে নানারঙের কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উড়ছে বিচিত্র বর্ণের পতাকা।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আসতেই আন্টি জেন বললেন, তুমি হবে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ—

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, ঠিক রাত বারোটা বাজার পরই নতুন বছর শুরু হবে। তখন যদি কোন লোক বাড়িতে সর্বপ্রথম পা দেয়—সে হল সে রাতের ফার্স্ট স্টেপ—

সেই লোকের গায়ের রং আর মাথার চুল যদি কালো হয় আর হাতে থাকে এক টুকরো কয়লা, তবে তার মতো কল্যাণকর অতিথি আর কেউ হতেই পারে না। সে নাকি সব সৌভাগ্য নিয়ে আসবে গৃহস্থের জন্যে। কাজেই আমি একজন কালো লোক যখন হাতের মধ্যেই রয়েছি তখন ফার্স্ট স্টেপ হয়ে গেরস্তের এ উপকারটুকু কেনইবা না করব ?

আন্টি আরও খবর জানালেন। মিসেস ম্যাকফারসন, মিসেস ম্যান আরও কয়েকজন পড়শী আমাকে নববর্ষের নেমন্তন্ন জানিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য অবশ্য ফার্স্ট স্টেপ হবার। এদিকে থেরেসার মা দুদিন আগেই নেমন্তন্ন দিয়ে রেখেছেন, তাঁর বাড়িতে যেন যাই রাত বারোটার পর। মিসেস মরিসনও টেলিফোনে নেমন্তন্ন জানাতে ভোলেন নি।

সন্ধ্যের ডিনার শেষ করে বৃটিশ কাউন্সিলে গিয়ে দেখলাম মাত্র গুটি কয়েক মেম্বার বসে আছেন সেখানে। হলঘরের মাঝখানে একটি বোর্ড খাড়া করা আছে। তাতে বড় বড় হরফে খড়ি দিয়ে লেখা—দিস্ ইজ্ হগম্যান নাইট। লাউঞ্জ ইজ্ ওপেন আপটু ইনফিনিটী ফর্ ডীপ মেডিটেশন। কোন রহস্যপ্রিয় সভ্য আজ রাতের উপযুক্ত এই কথাটা বোর্ডে লিখে রেখেছে। যে কটি সভ্য সেখানে ধ্যানে বসেছিলেন সবার সঙ্গে এক এক করে আলাপ করতে লাগলাম। এই সবে সন্ধ্যে। এরই মধ্যে সবাই বেশ অল্পবিস্তর রঙীন হয়েছে দেখলাম। কাজেই সেখানে বেশীক্ষণ কাল না কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে রাস্তায় ইতিমধ্যেই মদ্যপের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। হুড়হুড় করে চলেছে জনস্রোত ব্রীজ স্ট্রীটের চৌমাথার ওপর দিয়ে। তাদের পায়ের চাপে আলগা বরফের স্তূপ ধুলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে বেশ জোরেই এক এক পশলা

হয়ে যাচ্ছে। শহর আজ উৎসবের বেশে সেজে থাকলে কী হবে—রাস্তার অবস্থা, আবহাওয়ার অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই যৎপরোনাস্তি খারাপ।

আমি ব্রীজ স্ট্রীটের এক ধার থেকে গাঁয়ে যাবার বাস ধরলাম সেই রাতে। আজ সারা রাত বাস ট্রাম চলবে। কাজেই যাতায়াতের কোন অসুবিধে নেই।

ব্যাংখরি এখান থেকে বেশী দূরে নয়। বাসে মাত্র ঘন্টাখানেকের রাস্তা। ব্যাংখরিতে থাকে শুদ্ধসত্ত্ব। আজ রাতে যেমন করেই হোক তার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। নতুন বছরটা শুরু করতে চাই নতুন আলোর রশ্মিরেখায় চোখ খুলে নিয়ে। সে আলোর উৎস শুদ্ধসত্ত্ব।

ব্যাংখরির গাঁয়ে ঢোকবার মুখেই যে রাস্তাটা বাঁ দিক দিয়ে ডী নদী পার হয়ে চলে গেছে—সেই রাস্তাতে যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই ডক্টর রের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।—বলেছিলেন আমাকে মিস স্কট।

ঠিক সেই রাস্তার ওপর বাস থেকে নেমে পড়লাম। বাঁ দিকের সরু গ্রাভেল ছড়ান রাস্তাটা ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোরে জল এসে গেল। অথচ দাঁড়ালেও আমার চলবে না। তাড়াতাড়ি পেঁছান চাই শুদ্ধসত্ত্বের বাসায়। কী জানি যদি সে এর মধ্যে বেরিয়ে গিয়ে থাকে। মুখের ওপর বনেটটা টেনে দিয়ে ওভারকোটের কলার তুলে জোর পায়ে চলতে লাগলাম।

রাস্তাটার দুধারেই কিছুদূর অন্তর আলো আছে বটে। তবে বৃষ্টি আর মেঘেতে সে আলো নিতান্ত ম্যাড়মেড়ে। আবছা অন্ধকারে কেবল দেখলাম একটা কাঠের পুলের নীচে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে চঞ্চলা ডী। পুলটা পার হয়ে গিয়ে ওপারে পেলাম স্যামন ফিসারীর ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড লেখা কুটীর। তার মধ্যে বসে আছে এক ব্যক্তি আগুন জেবলে। তার আশেপাশে তিন চারটে ছোট বড় বোতল। তাকে ডেকে শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ির ঠিকানাটা একবার ভাল করে জেনে নিলাম। লোকটা সোজা আঙুল দেখিয়ে দিল সামনে। ঝাপসা পথটা সামনে কিছুদূর দেখা যাচ্ছে। দেখলাম সেটা ক্রমশঃ চড়াইয়ের দিকে উঠে গেছে। আর মনে হল সেই পথটার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড় সার বেঁধে।

ডীর পুল পার হয়ে একটু পরেই একটা ছোট্ট গ্রামে এলাম। বোধ হল কুড়ি পঁচিশ ঘর লোক সেখানে বাস করে। জায়গা যেমন নির্জন, তেমনি নিস্তব্ধ। গাঁয়ের লোক সবাই গাঁ খালি করে চলে গেছে শহরে উৎসবে যোগ দিতে।

গাঁটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে উঠতে লাগালাম চড়াইয়ে। দুপাশে পাইন, ফার, বার্চ, ওক, এলমের জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। এদিকে বৃষ্টিও ক্রমশঃ বাড়বার মুখে। হঠাৎ একটা মোড় ফিরতেই কানে এল একটা গমগম শব্দ। যত এগিয়ে চলতে লাগলাম ততই শব্দটা আরও স্পষ্ট আরও গভীর হয়ে উঠতে লাগল। বুঝলাম শব্দটা পাথরের বুকে জল আছড়ানির। কাছে নিশ্চয়ই

কোথাও ঝরণা আছে। একটু পরে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমার পায়ের নীচে একটা সিমেন্ট কংক্রীটের পুল আর তার নীচে চলছে এক পাহাড়ী নদী। চলছে বললে ভুল হয়। সামনের উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে দারুণ বেগে এসে আছড়ে পড়ছে নীচে গভীর খাদে পাথরের বুকে। আর তাতেই ঐরকম একটা প্রচণ্ড আওয়াজ উঠছে।

এই ভীষণ নির্জন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত অরণ্য পর্বতে ঘেরা প্রকৃতিটাকে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন মৃতের রাজত্ব। এইবার একটা প্রবল জীবনের লক্ষণ পেলাম শুধু ঐ দুরন্ত আওয়াজটুকুর মধ্যে। মাথার ওপর যে বেশ বৃষ্টি ঝরছে সে খেয়াল কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হঠাৎ চমক ভাঙার মত এক সময়ে মনে পড়ল মিস্ স্কট বলেছিলেন, এই নদীর নাম ফিউথ। এরই পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলে এক জায়গায় পাওয়া যাবে শুদ্ধসত্ত্বর বাড়িটা।

নদীটার পাশ দিয়ে সরু পায়ে চলা একটা পথ আবিষ্কার করলাম। দেখলাম সেটা সটান উঠে গেছে ওপরের দিকে পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে। সেই পথের ধার বরাবর একটা করে ল্যাম্পপোস্ট চলে গেছে সেই কোন পাহাড়ের চূড়োটার আড়ালে।

চলতে চলতে ফিউথের জল আছড়ানীর শব্দটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে গেল। এবার স্পষ্ট কাণে এসে বাজল সেই অন্ধকার অরণ্যের ভিতর থেকে পিয়ানোর সুন্দর সুর। আর তারপরেই ভরাট গম্ভীর গলায় গান

'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।'

শুদ্ধসত্ত্ব গান গাইছে। তার গলার আওয়াজ ঠিক ফিউথের জলপ্রপাতের মতোই সে অঞ্চলটিকে মুখরিত করেছে। প্রাণের বন্যা বইয়ে দিয়েছে মরার মতো নিস্তব্ধ জনহীন রাজত্বটায়।

দূরে থেকে দেখলাম হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা মাঝারি গোছের পাহাড়ের টিলার উপর একটা কাঠের বাড়ি। তার কাঁচের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে খানিকটা আলোর রেখা। সেটা আবার অন্ধকারের মধ্যে কিছু দূর এসেই আর এগোতে পারে নি। সেই বাড়িটার ভিতর থেকে ভেসে আসছে শুদ্ধসত্ত্বের গলার সঙ্গীতের সুর। মনে হল সেই জানালাটার বাইরে কে একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভিজছে।

আস্তে আস্তে উঠে এসে গেলাম বাড়িটার কাছে। দেখি বাইরেই দাঁড়িয়ে ভিজছে একটা স্ত্রীমূর্তি। মূর্তিটি রাস্তার দিকে পিছন ফিরে ঘরের ভিতর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু ফাঁক করা কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুদ্ধসত্ত্বের মূর্তিটা। পিয়ানোর উপর সোজা বসা। দুচোখ প্রায় বোজা। তন্ময় হয়ে সে গান গাইছে।

স্ত্রীলোকটির কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করলাম—কে আপনি—

দেখলাম সে যেন চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকাল। তার বিস্মিত কণ্ঠ থেকে আপনা আপনি আলগা ভাবে বার হয়ে এলো—আপনি মিস্টার মৈত্রেয়—

এতক্ষণে রেন কোটের ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে তার মুখটা ভাল করে নজরে পড়ল। ব্রিটিশ কাউন্সিলে দেখা অনবদ্য অস্মিতা আর রূপের অধিকারিণী সেই ভদ্রমহিলা। মহিলাটির মুখটা যে ফ্যাকাসে হয়ে একেবারে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে, তা বৃষ্টি আর আবছা অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও আমার চোখ এড়াল না।

গুড উইস্ করে বললাম, চলুন ভিতরে যাই—

একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে মহিলাটি বললে, কিন্তু এখন —ওঁকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে—

বললাম, বলেন কী? এত দূরে থেকে পাহাড় জঙ্গল ফুঁড়ে এই বৃষ্টিতে ভিজে এখানে এসেছেন—

বলতে বলতে গিয়ে খুব জোরে দরজার কলিং বেল টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেল। একটু পরেই শুদ্ধসত্ত্ব দরজা খুলে এসে দাঁড়াল। প্রথমে আমাকে দেখেই সে প্রসন্ন হয়ে উঠল—এসো, এসো ভাই বোধি—

বলতে গিয়েই আমার পিছনে তার নজর পড়ল। স্পষ্ট দেখলাম সেই প্রসন্ন মুখে অপ্রসন্নতার কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠল, একটুখানির জন্য। শুকনো গলায় শুদ্ধসত্ত্ব মহিলাটিকে আবেগহীন অভ্যর্থনা জানাল—আসুন মিস নেলসন—

আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—মিস নেলসনকে কোথায় পেলে—

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দিলাম—তোমার ঘরের সামনে। উনি যে কতোক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনছিলেন তা বলতে পারব না—

মিস নেলসনের দিকে ফিরে শুদ্ধসত্ত্ব সেই রকম শুকনো গলায় বলতে লাগল, এই দারুন বৃষ্টিতে আপনি সেই আবার্ডিন থেকে এত দূরে এলেন এই রাতে? না এলেই ভাল করতেন—

মিস নেলসন জবাব দিলেন—না না, ব্যাংথরিতে আমার এক বান্ধবী আছে—আমি সন্ধ্যাবেলা তার কাছেই—

শুদ্ধসত্ত্ব আমার দিকে ফিরে বললে, তোমাদের বোধ হয় পরস্পরের আলাপ নেই—

বললাম, ব্রিটিশ কাউন্সিলে ওঁকে দেখেছি। কিন্তু নামটা শুনলাম এইমাত্র তোমার মুখে।

শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরস্পরের পরিচয় দিয়ে বললে, ইনি বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। বাংলার ছেলে কিন্তু দেশে থাকতে এঁকে আমি দেখতে পাই নি। এঁর দেখা পেলাম এই সেদিন। আর ইনি মিস নেলি নেলসন। ভারতবর্ষ থেকে এডিনবরায়

এসেছেন পড়া শুনো করতে। একটা পরীক্ষা দিয়ে আবার্ডিনে এসেছেন ছুটি কাটাতে—

আমরা পরস্পর নতুন বছরের অভিনন্দন আদান প্রদান করলাম। শুদ্ধসত্ত্ব বললে, তোমরা একটু বোসো ভাই। আমি আসছি। আজ আমার বয় ছুটি নিয়েছে। তাই ঘরের কাজ সব আমাকেই করতে হচ্ছে। তোমাদের জন্যে একটু কফির জল চাপিয়ে আসি—

মিস নেলসন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি কী আপনাকে সাহায্য করতে পারি—

শুদ্ধসত্ত্ব নরম গলায় বললে, না, তার দরকার হবে না। আপনি বোধিকে একটু সঙ্গ দিন—

শুদ্ধসত্ত্ব রান্নাঘরে ঢুকতেই আমি মিস নেলসনের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম।

একটা ব্যাপার আমার মনকে পীড়া দিতে লাগল। ওর যে চেহারা সেদিন বৃটীশ কাউন্সিলে দেখেছি, সেই দৃপ্তোন্নত উজ্জ্বল সৌন্দর্যটা আজ যেন ওর সারা অঙ্গ থেকে বিদায় নিয়েছে। আজ ওকে মনে হচ্ছে বড্ড বেশী রকমে অসহায় নিতান্ত ঘরোয়া সাধারণ একটা মেয়ে। আমার বারবার মনে হতে লাগল, ওর পক্ষে এই ভাবটা একান্ত খাপছাড়া, বেমানান।

মিস নেলসনকে প্রশ্ন করলাম—কতদিন আবার্ডিনে এসেছেন—

মিস নেলসন বললে, প্রায় একমাস-এর কাছাকাছি—

বললাম, ভারতবর্ষে আপনার বাবা আছেন শুনলাম। ভারতবর্ষ আপনার পছন্দ হয়—

নেলী নেলসন বললে, আমার জন্ম ভারতবর্ষে। আপনি আমাকে ভারতীয়ই ভাবতে পারেন—

কিছুক্ষণের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব কুচো নিমকী আর কফি এনে হাজির করল। নেলী নেলসন এর মধ্যে আগুনের জায়গাটায় বড় বড় কয়েক কুঁদো কাঠ ফেলে দিয়েছে। ঘরের আচ্ছাদনটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। সেই গরমে নেলী নেলসনের চেহারার স্বাভাবিক সৌন্দর্যটা আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।

আমি বললাম, আজ এখানে এসে আমার অনেক লাভ হল—

শুদ্ধসত্ত্ব পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে বললে, কী রকম—

বললাম, প্রথমতঃ, একজন ভারতীয় মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। দ্বিতীয়তঃ আজ এই প্রথম জানলাম যে তুমি সুন্দর গান গাইতে পার। তোমার গান আজ শুনলাম। শুধু শুনলাম কেন দেখলামও—

শুদ্ধসত্ত্ব হেসে বললে, গান দেখলে কেমন করে—

বললাম, সে কথাটা তুমি মিস নেলসনকে জিজ্ঞাসা কর। উনি আমার চেয়ে আরও ভাল জবাব দেবেন।

মিস নেলসন লাল হয়ে উঠল আমার কথায়। তাড়াতাড়ি বললেন, না না, আমি খুব বেশী কিছু লক্ষ্য করি নি—

এবার আমি বললাম, শুদ্ধসত্ত্ব, দুনিয়ায় এতো জায়গা থাকতে এই এমন একটা পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় শেষ পর্যন্ত বাসা বাঁধতে গেলে কেন? ওঃ, শহর থেকে আসতে গেলে মনে হয় যেন এ আর এক রাজত্ব।

নেলী বললে, এখানে যে মানুষ বাস করে তা বাইরের থেকে ধারণা করা কঠিন। এখানে তো কেবল পাহাড়ের টিলা আর জঙ্গল।

শুদ্ধসত্ত্ব একটু হেসে জবাব দিল—না হয় ভেবে নিন না—আমি ঘোরতর অসভ্য, অরণ্যবাসী ইণ্ডিয়ান—

নেলী কোন কথা না বলে চুপ চাপ কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল। একটু পরে উঠে গিয়ে তার লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা মাঝারি বোতল বার করে নিয়ে এসে সেটা বাড়িয়ে দিল শুদ্ধসত্ত্বের দিকে।

শুদ্ধসত্ত্ব সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। বললে, ধন্যবাদ আপনাকে মিস্ নেলসন। এটা কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনি দ্রব্যের অপব্যবহার করলেন। আপনার যে কোন বয় ফ্রেণ্ড এটাকে আমার চেয়ে বেশী উপভোগ করবে—

বলে সেটা আবার নেলীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

মিস্ নেলসন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। বারবার বলতে লাগল, আমার ভয়ানক ভুল হয়েছে, আমায় মাফ করুন—

আমি আগের প্রশ্নটা আবার তুললাম। বললাম, শুদ্ধসত্ত্ব তুমি ভাই শহরের দিকে একটা বাড়ি নাও না, এখানে এইভাবে নির্জনে না থেকে। তাতে আমার মনে হয় ডাক্তার হিসেবে ব্যবসার দিক থেকেও তোমার সুবিধা হবে।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, এ জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অদ্ভুত সুন্দর। এক দিন সকালে এসে দেখো। তা ছাড়া এই টিলার ওপরের সব বাড়িটাই আমি ভাড়ান নিয়েছি বলে শহরের চেয়ে অনেক সস্তায় পেয়েছি—

নেলী এর মধ্যে নরম গলায় অথচ দৃঢ় ভঙ্গীতে মন্তব্য করল—সস্তার তিন অবস্থা। এখানে যদি কেউ রোগে ভুগে মারাও যায় তো জগতের লোক তা টের পাবে না। তাছাড়া এখানে আছে টা কী? না হাটবাজার, না ডাক্তার-বদ্যি—আপনি যদি বলেন, তাহলে আমার বান্ধবীকে বলে—

শুদ্ধসত্ত্ব বাধা দিয়ে বললে, না, তার দরকার হবে না—

আলোচনার মধ্যে একটা জিনিসের অভাব বড় বেশী অনুভব করছিলাম। শুদ্ধসত্ত্বকে আজ যেন সেই আগের শুদ্ধসত্ত্ব হিসাবে পাচ্ছিলাম না। কোথায় যেন কিসের একটা বাধা এসে শুদ্ধসত্ত্বের সমস্ত সত্ত্বাকে আড়াল করে রেখেছিল। তার সেই উজ্জ্বল প্রীতিপ্রদ স্বভাবের এতটুকু পরিচয় আজ আসা থেকে পাই নি।

তাই বললাম, সব কথা রেখে তুমি ভাই আজ রাতে আমাকে যদি গান শোনাও তবে খুশী হই—

শুদ্ধসত্ত্ব এবার হাল্কা হাসি হাসতে হাসতে বললে, তুমি কী রকম লোক হে ? একজন মহিলা বসে থাকতে তাঁকে অনুরোধ না করে আমায় অনুরোধ করছ গান গাইতে—মাফ চাওয়ার ভঙ্গীতে নেলীকে বললাম, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। সত্যি, যদি আপনি গান শোনান তো বড় আনন্দ লাভ করব।

নেলী নেলসনের ঝিমিয়ে পড়া চোখ দুটো প্রথমে চকচকে হয়ে উঠল। তারপরেই দেখলাম সে দুটো আস্তে আস্তে জলে ভরে গেল। সে আমার সোফাতেই বসেছিল। কাজেই আমার চোখের দৃষ্টি সেটা এড়াল না। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব তা দেখতে পেল না। মিস নেলসন দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই শুদ্ধসত্ত্বের দিকে পিছন ফিরে পিয়ানোতে বসল। তারপর বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে কণ্ঠস্বরে অপূর্ব মাধুর্য আর দরদ ঢেলে গাইতে লাগল—

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥

দু তিন বার ঘুরিয়ে নেলী পুরো গানটা গাইল। সুরের মাধুর্যে ঘরের বাতাসটা ভারী হয়ে উঠল। গান থেমে যাবার পরও অনেকক্ষণ আমরা কেউ কথা বলতে পারলাম না। শুদ্ধসত্ত্ব ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে হাতের ওপর চিবুক রেখে গান শুনছিল। তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে তার নিশ্চুপ অবস্থা থেকে মনে হল সে তন্ময় হয়েই গান শুনছে।

আমি এবার স্তব্ধতা ভাঙলাম। —অপূর্ব গান গাইতে পারেন আপনি। সত্যি সত্যি অবাক হয়েছি আপনার গলায় রবীন্দ্রনাথের গান শুনে। কোথায় কার কাছে শিখলেন এ গান—

নেলী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শুদ্ধসত্ত্বের ভাবলেশহীন মুখের দিকে। এবার আমার দিকে ফিরে বললে, আমার সুরের গুরু কে তা আপনি জানতে চান ? কিন্তু সেকথা আজ থাক, আর একদিন বলব—

কিছুক্ষণ পরে পিয়ানোর ওপর রাখা ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধসত্ত্বের ধ্যান ভাঙল। সে বললে, আজ রাতে কী ব্যাংথরিতে আপনার বান্ধবীর কাছে থাকবেন মিস নেলসন ?

নেলী নেলসন কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। আমি বললাম, আমি কিন্তু এবার উঠব। বারোটার মধ্যেই আমার আবার্ডিনে ফিরতে হবে।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, তা হলে আপনি এক কাজ করুন না কেন মিস নেলসন, আপনি তো বোধির সঙ্গেই শহরে ফিরতে পারেন—

নেলী নেলসন শুকনো মুখে বললে, আমার জন্যে ভাববেন না। আমি এখন শহরে ফিরব না। আমি যাব অন্য দিকে।

আমার সঙ্গেই বাড়ি থেকে বার হয়ে এল সে।

কিন্তু কিউখের ওপর এসে সে বাঁ হাতি রাস্তাটা ধরল। আমি বিদায় নিলাম।

নেলীর ওপর শুদ্ধসত্ত্বের আচরণটা আমাকে সারা রাস্তা পীড়া দিতে লাগল। মনে হল অনেক কিছু যেন বলার ছিল নেলীর শুদ্ধসত্ত্বকে। কিন্তু সে সুযোগ না দিয়েই সে জোর করে নেলীকে বাড়ির বার করে দিল।

ব্রীজ স্ট্রীটের চৌমাথায় এসে বাস থেকে নামলাম। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। রাতও বারোটা বাজে। তবে দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি সন্ধ্যা হল। বৃষ্টির তাড়ায় একটা বাড়ির আলসের তলায় আশ্রয় নিলাম। সেখানেও এতো ভীড় যে কষ্ট করে জায়গা করে নিতে হল।

একটু পরে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, যারা অপেক্ষা করছে তাদের মধ্যে বাল-বৃদ্ধ-বনিতা কিছুই বাদ যায় নি। প্রত্যেকটা লোকের হাতে বা পকেটে একটা দুটো মদের বোতল। তারা বোতল মুখে দিয়ে মদ গলায় ঢালছে আর অপক্ষপাতে পাশের লোক বা স্ত্রীলোকের মুখে তুলে ধরছে সেই বোতলটা। পাশের সেই লোক, জানা অজানা যে কেউ হোক না কেন।

আমার পাশের এক বৃদ্ধ এক সময়ে আমার দিকে একটা বোতল এগিয়ে ধরে বললে, রং দেখে মনে হচ্ছে তুমি এদেশের লোক নও। তা যাক্‌গে পানের আসরে তো আর রং-এর কোন প্রশ্ন ওঠে না—তুমি স্বচ্ছন্দে আমার বোতলটা গলায় ঢালতে পার—

লোকটার কথাগুলো বেশ জড়ানো। আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে সে আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করল—তোমার বোতল কই—

এবার আমি সুযোগ পেলাম। বললাম, বাড়িতে ফেলে এসেছি। যাই নিয়ে আসি—

বলতে বলতেই সামনে একটা এ্যাবট্‌স্‌ ওয়েল ক্রেসেন্টের বাস এসে দাঁড়াল। আমি চেপে বসলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে সাইরেন বেজে উঠল। পাশে চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। বাসটা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পোর্ট থেকে অসংখ্য জাহাজের সম্মিলিত আনন্দধ্বনি শোনা গেল গম্ভীর আওয়াজে। বাসের মেয়ে কণ্ডাক্‌টাররা অপক্ষপাতে যাত্রীদের গুড্‌ উইস করে গাল বাড়িয়ে চুমু নিতে লাগল। বাইরেও দেখলাম যে যাকে পাশে পাচ্ছে সবাই সবাইকে চুমু খাচ্ছে।

বাড়িতে এলাম। প্রথমে বাইরে দাঁড়িয়ে ঘণ্টি বাজাতেই আণ্টি জেন ছুটে এলেন। তারপর মিসেস ব্রাউন। বৃদ্ধারা আমার দুগালে কপালে চুমু খেয়ে ঘরে তুলতে যাবেন, মিসেস ব্রাউনের নজরে পড়ল আমার হাতে কয়লা নেই।

তাড়াতাড়ি এক টুকরো কয়লা এনে হাতে গুঁজে দিয়ে ঘরে তুললেন। বাড়িতে কয়েকজন অতিথি ইতিমধ্যে এসেছেন, ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করছেন। আমি আসতেই গৃহকর্ত্রী আমাদের টোস্ট দিলেন। কিছু মিষ্টি, কিছু কফি, কিছু সুরা। এ বাড়িতে সুরা এসেছে শুধু নিয়ম রক্ষার খাতিরে।

আণ্টি জেন এবার পিয়ানোতে বসলেন। মিসেস ব্রাউন গাইতে লাগলেন "হ্যালেলুয়া আমেন।"

গান শেষ হতে আণ্টি জেন-এর সঙ্গে পাড়ায় বার হলাম। পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেক বাড়িতে আজ অবারিতদ্বার। যে কোন লোক বিনা নিমন্ত্রণেই যে কোন বাড়িতে ঢুকতে পারে, নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে। বাড়িতে ঢুকলেই প্রত্যেক গৃহস্থকে অতিথি সৎকার করতেই হবে কিছু না কিছু মিস্টি আর সুরা দিয়ে।

পাড়ার নিমন্ত্রণ সারতে সারতে রাত প্রায় আড়াইটে। আজ সারারাতই বাস চলবে। কাজেই ভাবনা নেই। বাস ধরে এলাম ডক এলাকায়। থেরেসাদের বাড়িতে থেরেসার মা আর থেরেসাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে, এলাম সাউথ কনস্টিটিউশন স্ট্রীটের পাড়ায়। রাস্তায় স্খলিত পদ মাতালের দল চলেছে। এদিক ওদিক আকছার লোক পড়ে আছে বরফের ওপর—বেহেড মাতাল অবস্থায়। আলিঙ্গনবদ্ধ, চুম্বনরত নরনারী, আজ রাস্তায় দেখা যাচ্ছে অনেক বেশী সংখ্যায়। আজ পুলিশও ঢিলে, সামাজিক চক্ষুলজ্জাটাও অনেক ঢিলে। তাদের পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলাম। একটা জায়গায় রাস্তার মোড় ফিরতে গিয়ে দেখলাম লাইট পোস্টটা প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে দুচোখ বুজে প্রাণপণে চুমু খেয়ে চলেছে একটা ছেলে। পাশে যেতেই দেখতে পেলাম ছেলেটি রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ড। তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম—রবার্ট—

রবার্টের তখন একেবারে উন্মত্ত অবস্থা। সে আমার দিকে একবার রক্ত চক্ষু মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করল। বিড় বিড় করে বলতে লাগল—পামি ডার্লিং, তোমাকে একবার যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না—

এবারও রবার্ট আমার দিকে সেই আগের মতোই রক্ত চক্ষু মেলে তাকাল। তারপর চক্ষু বন্ধ করে বিড় বিড় করে বলতে লাগল—ডার্টি নিগার, দূর হয়ে যা এখান থেকে। আমার পামিকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিস? দূর হ বলছি না হলে—

বলেই সে একটা লাথি ছুঁড়তে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে গেল।

রবার্টকে কাঁধে তুলে নিলাম আর দেরী না করে। সে তার বিরাট ওভার কোটের পকেট দুটোতে অন্ততঃ গোটা চারেক বোতল জমা করে রেখেছে। রবার্টকে এনে তার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সেও একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোতে লাগল।

ড্রইংরুম থেকে খুব হল্লার আওয়াজ আসছিল। সেখানে গিয়ে হাজির হতেই, মিঃ মরিসন—এই যে বোধি.—বলে আমাকে জাপটে ধরে মাথার উপর দুপাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিল।

তারপর আমাকে টোস্ট দিতে দিতে বললে, ঐ দেখ মামের অবস্থা—

ঘরের এককোণে মিসেস মরিসন পা দুটো ওপর দিকে তুলে হাত দিয়ে হাঁটবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

মিঃ মরিসনকে জিজ্ঞাসা করলাম—কী ব্যাপার—

মরিসন হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, ওর খুব ফুর্তি হয়েছে—

মরিসনের ছেলে উইলিয়ম পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, মাম ইজ ড্রাংক—

মিসেস মরিসনের কাছে এক সুবেশ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে দুবাহু দিয়ে মিসেসকে জড়িয়ে ধরে টেনে তুলল। বলতে লাগল, ছিঃ ছিঃ, হাত দিয়ে কী হাঁটে? হাতে ধুলো লেগে যাবে যে। আর যদি নিতান্তই হাঁটতে হয় তবে গ্লাভ্‌স্‌ পরে হাঁটো—

মরিসন সেদিকে দেখিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল। আর একের পর এক পেগ ওড়াতে লাগল।

এদিকে মিঃ মরিসনের অসীম নৈপুণ্য। বোতলের পর বোতল উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু গা বা মাথা কিছুই তার টলে না।

মরিসনকে জিজ্ঞাসা করলাম—শ্যামল কোথায়—

মরিসন বললে, পাছে কেউ তাকে মদ খাওয়ায় এই ভয়ে সে ঘর থেকে বার হয় নি। আর শকসেনা একটু আগে বেজায় বমি করছিল বলে তাকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে এলাম এই মাত্র।

ভোর পাঁচটায় যখন বাসে করে বাড়ি ফিরছি তখন রাস্তায় উৎসব শেষের যাত্রীদের নজরে পড়ল। যেন সারারাত একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে শহরের রাস্তায় রাস্তায়। মৃত সৈনিকদের দেহগুলো ছিটিয়ে পড়ে আছে এখানে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে। কণ্ডাক্টার সেদিকে দেখিয়ে হেসে বললে, সকাল বেলায় রাস্তা পরিস্কার করতে এসে যখন হোস পাইপে জল ঢালবে এদের গায় তখন এদের হুঁশ হবে, তার আগে নয়—

॥ ২৫ ॥

হগম্যানির পরের দিন সকালে রাস্তায় লোক চলাচল একেবারেই নেই। শুধু মাঝে মাঝে দৈবাৎ এক একখানা গাড়ি ভোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে রুটিওয়ালা বা দুধওয়ালাদের গাড়িগুলো। তাও সংখ্যায় অনেক কম।

আস্তে আস্তে মন বিছিয়ে পড়তে লাগল সেই অরণ্য-পর্বত ঘেরা, রোদের

তাপে ঈষৎ আতপ্ত প্রকৃতির মধ্যে। মনে একটা অদ্ভুত ভাব আসে এ সময়ে। পিছনের কোন টান নেই। নেই কাজের কোন তাড়া। দুনিয়ার লেন-দেনএর কোন কথাই মনের কোণে এতটুকু ছায়াপাত করে না। কী সুখ, কী দুঃখ, কী আনন্দ, কী বেদনা, এ সবই যেন একাকার হয়ে যায়। একাকার হয়ে যায় মনের অন্দর বাহির। বাইরে ঘুরে বেড়ান মনটা হঠাৎ যেন বড় কাছাকাছি এসে যায়। ভিতরে শুধু মাত্র একটা অনুভূতি থাকে, সেটা হল পথ চলা আর মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে নিজে বন্দ্ব হয়ে গল্প করা।

ঘুমের ঘোরে পথ চলার মত এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি পাকা রাস্তাটার পাশে দাঁড়িয়ে একটা বিরাট ওক গাছ। তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা পায়ে চলা মেঠো অথবা জঙ্গুলে রাস্তা। মোড় বেঁকে সে যে কোন জঙ্গুলে ঢুকেছে গোটাকতক চষা ক্ষেতের পাশ দিয়ে তার কোন হদিশ পাওয়া দুষ্কর। শুধু ওক গাছটার গায়ে একটা টিনের ফলকে তীর এঁটে দিয়ে তাতে লিখে দেওয়া হয়েছে—'ক্র্যাথেস কাস্‌ল' এই দিকে।

নির্জন প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের একটা অদ্ভুত ক্রিয়া থাকে মনের ওপর। নিত্য শহরবাসী জীবনে দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে, সব সময়ে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলি। ক্ষুদ্র কামনা-বাসনার বন্ধনে, উঁচু নীচু প্রভৃতি নানা কমপ্লেক্সের খোঁচায় মন ক্ষত বিক্ষত হয়। পিঁজরায় বাঁধা পাখির মতো সে ডানা ঝাপটায়। আমরা বেশীর ভাগ সময়ে তা বুঝতেও পারি না। মন খারাপ হয়। মনে করি ওটা অভাবের জন্যে। অভাব আছে বলেই তো সৃষ্টি সভ্যতা আছে।

কিন্তু ভূমার মধ্যে, পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে, মনকে একবার বিছিয়ে দিতে পারলে বোধ করতে পারি যে, সে অভাব বোধটা হল মনের ক্ষয় রোগ। তাতে সৃষ্টি হয় না। মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা হল আনন্দ। এ আনন্দের মধ্যে তীব্র সুখও আছে, আছে তীব্র বেদনাবোধও। তবু ওর এতটুকু কণা যে মানুষের মনে আসে, সে মহৎ স্রষ্টা, সে সার্থক সভ্যতার জনক। সর্বদেশের মানুষের জন্যে সে পথ তৈরী করে দিতে পারে আলোর রাজত্বের।

নানা কথা মনের ভিতর তোলাপাড়া করতে করতে এক সময়ে ওক গাছটার নীচু দিয়ে বার-হয়ে-যাওয়া পায়ে-হাঁটা সুঁড়ি পথটায় ঢুকে পড়েছি। দুদিকেই চষা ক্ষেত বরফে ভরে আছে। এই বরফ গললে ঐ পাথুরে মাটি নরম হবে। তখন তাতে চাষ হবে।

চারদিকে বারবার তাকিয়ে দেখলাম—নাঃ, জনপ্রাণীও নজরে পড়ছে না। সামনের পাহাড়ে পথটা ধরে সটান ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগলাম। চষা ক্ষেতগুলো পার হয়ে পথটা একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। ভারতবর্ষে হলে এ জঙ্গলে ঢুকতে দিন-দুপুরেই ভয় হতো। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই। হিংস্র জন্তুর সন্ধান এদেশের জঙ্গলে পাওয়া যায় না। অথচ এখানকার

লোকদের শীকারের ঝোঁকও প্রচুর। তাই গণ্ডা চার-পাঁচ কুকুর সঙ্গে করে, ঘোড়ায় চড়ে, রাইফেল বাগিয়ে এরা যায় খেঁকশিয়াল আর খরগোস মারতে। এ্যাডার সাপের ভয় আছে বটে। তবে তারা এই দারুণ শীতে কোন গর্তের ভিতর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের সন্ধান মিলবে সেই গ্রীষ্ম এলে। অতএব এখন ভয়ের কোন কারণ নেই।

আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। বাইরে যে এতক্ষণ এত রোদ্দুর পেয়ে এলাম—জঙ্গলের মধ্যে এসে দেখি সব অন্ধকার। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে কত কালের প্রাচীন ফার, ওক, এলমের দল। গায়ে তাদের শ্যাওলা জমে গেছে পুরু হয়ে। এখান-ওখান দিয়ে নেমেছে জলের ধারার দাগ।

স্থবির উইলো গাছগুলোর একই দশা। এদের কারুরই পাতা নেই। তবুও অজস্র সরু ডালের ঘন সন্নিবেশে মনে হয় পাতা ঢাকাই রয়েছে ডালগুলো। জঙ্গলের অন্ধকারটা আরও জমাট বেঁধেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইউ, ফার আর মংকি পাজ্‌লের তলায়। কালচে সবুজ রংয়ের পাতাওয়ালা বিশাল ডাল চারদিকে ছড়িয়ে ইউ গাছগুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নিতান্ত ভীতু উইপিং বার্চগুলো লতানে ডালপালা চতুর্দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেদের কোন রকমে বাঁচাবার চেষ্টা করছে তাদের দৃষ্টি থেকে।

তলায় ঝরা পাতা জমেছে বোধ হয় সেই নভেম্বর থেকে। তারপর সেখানে জল ঝরছে অনবরত। পচে উঠেছে এখানে ওখানে। পা দিতেই এক-হাঁটু করে বসে যাচ্ছে কোথাও কোথাও। কেমন একটা পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধ চারদিকে বাতাসের মধ্যে ভাপিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, যেন দম বন্ধ করে দিতে পারে।

জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর এসে রাস্তাটাকে আর খুঁজে পেলাম না। ঝরে পড়া পাতার রাশির মধ্যে কোথায় কখন যে সে হারিয়ে গেল, ভাল করে বুঝতেও পারলাম না। দেখলাম কেবল পাহাড়ে চড়াইয়ের মতো জঙ্গলটা গড়িয়ে উঠে গেছে সামনে।

এতক্ষণ যে নিস্তব্ধতাকে মনে মনে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে করতে আসছিলাম রোদে ভরা আকাশের তলায়—সেই নিস্তব্ধ ভাবটাই এই জঙ্গলের মধ্যে এসে অন্যভাবে রূপ নিল মনের ভিতরে। এখানে এই আবছা অন্ধকারের রহস্যময় জায়গাটা মনে হতে লাগল যেন অশরীরী আত্মাদের রাজত্ব। ইউ আর মংকি পাজ্‌ল্‌দের ঝাঁকড়া মাথাগুলো রূপকথার রাক্ষুসী বুড়ি্দের কথা বার বার মনে জাগিয়ে দিলে। এখান ওখান থেকে যেন অদৃশ্য কারা ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করেছে, স্পষ্ট শুনতে পেলাম। বুড়ো ওকগুলো হঠাৎ দুলে উঠল একে অপরকে ছুঁয়ে। মনে হল তারা ভীষণ ভ্রুকুটী নিয়ে আমাকে দেখছে। আমি এ রাজত্বে নিতান্ত অবাঞ্ছিত। এক সময়ে দাঁড়িয়ে

পড়লাম। হাঁটলেই পায়ের নীচে পাতারা আবার যে আর্তনাদ করে উঠবে, এই ভেবে নিজের থেকে পা আর চলতে চাইল না। অন্ধকারে আর ভ্যাপসা গন্ধের ভিতরে দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

যেখানে দাঁড়ালাম সে জায়গাটা টিলাটার সবচেয়ে উঁচু জায়গা। একটুখানি পিছনে তাকিয়ে দেখি জমিটা হঠাৎ নেমে গেছে অপরদিকে। আর তার গা দিয়েই চলে গেছে একটা লম্বা বেড়া। বেড়ার ওপারে একটা ছোট্ট ভুট্টার ক্ষেত। সেখানে জঙ্গলটা অনেক ফাঁকা। সেটা চোখে পড়তেই মনে হল এক মুঠো টাটকা বাতাস এসে আমার বুক ভরিয়ে দিল। সূর্যটা বোধ হয় মেঘের আড়ালে একটু ঢাকা পড়েছিল, তাই ভাল রোদ নজরে পড়ল না। ফাঁকা জায়গাটা দেখেই বেড়া টপকে আমি গিয়ে পড়লাম সেই ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে।

ছোট্ট ক্ষেত। পার হয়ে দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা প্রাচীন কাস্‌ল্‌। বুঝলাম ইনিই হলেন ক্লাথেস কাস্‌ল্‌। সেই কাস্‌লের বাইরে লোকজন নেই। নেই কোন প্রাণের চিহ্ন। ভিতরে কোথাও তার কোন জীবন্ত প্রাণী বাস করে, এমন কোন রকম আভাস বাইরে থেকে পাওয়া গেল না। ভুতুড়ে জঙ্গলের মধ্যে ভুতুড়ে দুর্গটা প্রাণময় জগৎ থেকে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে, নির্বাসিত হয়ে আছে বলে মনে হল।

দুর্গের চারদিক ভাল করে ঘুরলাম। একদিকে একটা রক্তচক্ষু বুলডগ চুপ করে বসে পাহারা দিচ্ছে একটা দরজার সামনে। সেই দরজার পাশে দুর্গের গায়ে একটা মোটা ওকের ডাল পোঁতা আছে। তা থেকে ঝুলছে একটা প্রকাণ্ড বড় লোহার ঘণ্টা।

কুকুরটাকে দেখে মনে ভয়ও হল ভরসাও হল। তাহলে লোকজন নিশ্চয় আছে এর মধ্যে। ঘণ্টায় ঘা দিলাম ঢং করে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ তলার ওপর ছোট্ট জানলা একটুখানি খুলে গেল। একটি নারীর মুখের খানিকটা দেখা গেল। হাতের ইঙ্গিতে তিনি জানালেন—আসছি, দাঁড়াও—

বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। অপেক্ষা করছি কখন দরজা খুলবে। বুলডগটা সাড়া শব্দ দিচ্ছে না। শুধু কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি অনুভব করছি। এমন সময়ে ভিতরের দিকে আগল খোলার আওয়াজ হল। এক প্রৌঢ়া এসে বাইরে দাঁড়ালেন। বললেন, এস, ভিতরে এস—

ছোট দরজাটা দিয়ে কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে ভিতরে এলাম। ভিতরে এসে একটা মাঝারি রকমের ঘর। তার একদিকের কোণ বেয়ে উঠে গেছে ঘোরান সিঁড়ি। প্রৌঢ়া বললেন, তুমি এখানে একটু বস। আমি আমার বোনঝিকে ডেকে আনি। সে-ই সব দেখাবে তোমাকে। সে আবার ইতিহাসের ছাত্রী। কাজেই এ সব ব্যাপার সে বেশ ভালই পারবে।

তিনি গজেন্দ্র গমনে পাশের একটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ভদ্রমহিলার এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মুস্কিলও আছে। তাঁর পায়ে বেশ বড় রকমের একটা গোদ।

যে ঘরটায় আমি বসলাম—তার চারদিকে এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আগাগোড়া গ্রানাইট পাথর দিয়ে গাঁথা শক্ত দুর্গ। ঘরের মেঝে, ঘরের দেওয়াল, ছাদ সবই গ্রানাইটের। ঘরটার মধ্যে ছড়িয়ে আছে আবছা অন্ধকার। একটু ঘুলঘুলির মতো একটা লম্বা কাটা ফোকরের ভিতর দিয়ে শুধু মাত্র এক টুকরো আলো এসে পড়েছে। তাইতেই যতটুকু নজর করা যায়। বহু প্রাচীনকালের ঘর। আর বেশ বোঝা গেল—এখানে মানুষের আনাগোনা হয় খুবই কম। ঘরের ভেতরে একটা পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধ যেন চার কোণ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে।

একটু পরেই ভিতর দিকের দরজাটা খুলে গেল। প্রৌঢ়া এলেন, সঙ্গে আর একজন। আবছা আলোয় চেহারাটা খুব স্পষ্ট চোখে পড়ল না। তবে বুঝলাম বয়সে যুবতী। প্রৌঢ়া বললেন, এ আমার বোনঝি। আবার্ডিনের কিংস্ কলেজের ইতিহাসের ছাত্রী। আর ইনি এসেছেন দুর্গ দেখতে।

মেয়েটী অকুণ্ঠিতভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করল। বললে, আসুন আপনাকে সব দেখাচ্ছি। আণ্টি, তুমি যাও লাঞ্চটা দেখ—

ঘোরান সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, কিন্তু অসময়ে এই শীতকালে তো কোন টুরিস্ট এখানে আসে না। আপনি এই কাস্‌লের সন্ধান পেলেন কার কাছে—

আমি তার পিছনে সিঁড়ি ভাঙছিলাম। বললাম, সন্ধান দিয়েছে দুচোখ। আজ এই সুন্দর রোদে ভরা দিনটা কী শুধু শুধু বাড়িতে বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়? আপনিই বলুন না—

মেয়েটী বোধ হয় একটু মিষ্টি হাসল। বললে, না তা দেওয়া যায় না। তবে এখানকার লোক শীতকালে কক্ষনো বাড়ির বার হয় না তা জানেন? অবশ্য এটাও সত্যি কথা, শীতকালে এখানে চারদিকে বরফ আর ন্যাড়া গাছের জঙ্গল ছাড়া আর দেখারও কিছু থাকে না—সব কথা ছেড়ে দিয়েও গত রাতে যে হগম্যানী নাইট গিয়েছে সে কথাটা তো সত্যি—

বললাম, আমার গায়ের চামড়াটা এখনো ভাল করে আপনার নজরে পড়ে নি। পড়লে দেখতেন সেটা বেশ কালো। কাজেই হগম্যানীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ খুব বেশী নেই বলেই আপনি ধরে নিতে পারেন। আর তা ছাড়া আমি এসেছি দেশ দেখতে। এখানকার সব রূপের সঙ্গে পরিচিত না হলে সে দেখায় যে ফাঁক থেকে যাবে।

ইতিমধ্যে আমরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এসেছি। সিঁড়ির

পাশে একটা ঘরের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়লাম। ঘরটা হলঘরের মতো। বেশ আলো আছে ঘরের মধ্যে। এবার দুজনে দুজনকে দেখে নিলাম। একটি বছর কুড়ি বাইশের সুন্দরী মেয়ে। ঢলঢলে দুটি উজ্জ্বল চোখ। শান্ত আর খুশীভরা।

মেয়েটি আমাকেও এক নজরে দেখে নিল। বললে, আপনাকে আমি চিনি। আপনি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছেন তো? জ্যাক আপনার বিশেষ বন্ধু লোক—

বললাম, আমাকে আপনি নিশ্চয় স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের বাড়িতে দেখেছেন—

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ—

মুখটা একটু নীচু করেই বললে, একদিন আপনার সঙ্গে পরিচয়ও বোধ হয় করে দিয়েছিল জ্যাক। আপনার অবশ্য মনে না থাকারই কথা। সেদিন আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম কমসে কম চব্বিশ জন ছেলে মেয়ে এক দলে।

আপনার নামটা—

মেয়েটি একটু লাল হয়ে উঠল, জবাব দিল—শীলা—

—এতক্ষণে মনে পড়েছে আমার। সে রাতে জিমি জলির কফিখানায় আপনাকে নিয়েই তো এলিস আর জ্যাকের মধ্যে পরিহাসটা জমে উঠেছিল না? তা আপনি এখানে এলেন কেমন করে? আপনি তো থাকতেন নতুন আবার্ডিনের কাছে কোন একটা রাস্তায়?

শীলা বললে, হ্যাঁ। সেখানেই এখনো থাকি। তবে এখানে আসি ছুটিতে আর শনিবার রাত্রে কী রবিবার সকালে। আমার মাসী বুড়ি হয়েছেন। তাঁকে একটু দেখাশোনা করাও তো দরকার হয়ে পড়ে।

হলটার চারদিক দেখিয়ে শীলা বলতে লাগল, এই যে দুর্গটা দেখছেন, এই দুর্গের মধ্যে আমরা মাসী, বোনঝি, আর ঐ কুকুরটা ছাড়া আর কোন চতুর্থ প্রাণীটি নেই। ঐ বংশের অবশ্য একটা ছাঁট এখনো ঐ পিছন দিকটাতে বাড়ি করে বাস করছে বটে তবে এ দুর্গের মধ্যে নয়। এ দুর্গ এখন কেবল কতকগুলো মূক অস্ত্র-শস্ত্র পুঁথিপত্তর আর সাজ-পোশাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন ছিল যখন এর মধ্যে রোজকার যে ইতিহাস তৈরী হত তা ছিল যেমন চমকপ্রদ তেমনি রোমাঞ্চকর। এই দুর্গের ইতিহাস একদিন সারা স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। শুধু জড়িয়ে পড়েছিল বললে প্রায় কিছুই বলা হল না। তার ভাঙন গড়নের কাজে সাহায্য করেছিল অনেকখানি।

১৫৫৪ সালে এক প্রাচীন জমিদার বংশ ব্রুনেট ফ্যামিলী জঙ্গলের মধ্যে এই দুর্গের পত্তন করেন। তখন রবি-দি-ব্রুস্ (রবার্ট ব্রুস্) প্রাণপণে লড়াই করছেন ইংলণ্ডের সঙ্গে, স্কটল্যাণ্ডকে স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপ দেওয়ার জন্যে। ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্রুসের যুদ্ধে ব্রুনেটরা যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। তারই

নিদর্শনস্বরূপ ঐ দেখুন বন্ধুত্বের চিহ্ন। বলে শীলা আঙুল দিয়ে দেখাল। আগুনের জায়গাটার ওপর ক্রস্ করে টাঙান আছে প্রকাণ্ড দুটি তরোয়াল। তারই ঠিক নীচেই ঝুলছে এক গোছা সাদা লেস্ আর দুটো বড় বড় শিঙা। —এ ছাড়াও বহু পানপাত্র আর অলংকারও উপহার দিয়েছিলেন রবার্ট ব্রুস্ ব্রুনেটদের—

শীলা পরম যত্ন আর আগ্রহ নিয়ে দেখাতে লাগল সেই সব পুরোনো জিনিস-পত্রের প্রত্যেকটি। কোন পানপাত্রটা ব্রুনেট বংশের কোন জমিদার গ্র্যাণ্ড-রয়্যাল্ ভোজে ব্যবহার করেছিলেন, এ সব সবিস্তারে বর্ণনা করে যেতে লাগল শীলা।

এ সবের মধ্যে ব্যক্তিগত কথাগুলোও বাদ যাচ্ছিল না। শীলাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার মাসীর এ ফ্যামিলীর সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক—

—কোন সম্পর্কই নেই। কাস্‌ল তো এখন চলে গেছে স্কটল্যাণ্ড বোর্ড অব্ ট্রাস্ট-এর হাতে। তারাই আমার মাসীকে এনে রেখেছে গাইড আর রক্ষক হিসেবে। অবশ্য মাসী ছাড়াও একজন গার্ড দিন রাত থাকে। আজ বছরের পয়লা বলে তাদের কারুর পাত্তা পাওয়া যাবে না। আর আছে একজন কেরাণী। সেও আজ আসে নি।

কথা বলতে বলতে এলাম পাশের আর একখানা ঘরে। সেখানে একটা অতি প্রাচীন খাটের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। অবশ্য বিছানাও পুরোনো। কিন্তু দেখলে মনে হয় এখুনি কারুর জন্যে এ বিছানা প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই খাটের পাশে ঝুলছে একখানা অয়েল পেণ্টিং। একজন অতি সুশ্রী, তীব্র ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকের চেহারা। ছুঁচোলো দাড়ি, ছুঁচোলো গোঁফ। বড় বড় চোখ দুটো এত অভিব্যক্তিব্যঞ্জক যে দেখলেই মনে হয় যেন এখনই কিছু একটা কথা বলবে। দম্ভ, সৌন্দর্য, শৌয, অস্মিতা এসব মিলিয়ে সে চেহারাতে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করেছে যে হঠাৎ সে ছবি থেকে চোখ তুলে নেওয়া যায় না।

শীলা বললে, ইনি মার্কুইস অব মণ্ট্রোজ—

মণ্ট্রোজ-এর নাম আগে শোনা ছিল। কাজেই আরও ভাল করে দেখলাম সে ছবিটা। শীলা আস্তে আস্তে বলতে লাগল—১৬৪০ খৃষ্টাব্দের কোন এক শীতের রাতে আবার্ডিন থেকে পালিয়ে আসছিলেন মণ্ট্রোজ রাজা প্রথম চার্লসএর তাড়া খেয়ে। মণ্ট্রোজ-এর মনের বাসনা ছিল রবার্ট ব্রুসের মতো স্কটল্যাণ্ডকে স্বাধীন করবেন। কাজেই ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে তিনি হয়েছিলেন রাজদ্রোহী। মণ্ট্রোজ এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই দুর্গে। তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এই ঘরে। ব্রুনেটেরা যদিও প্রকাশ্যে রাজভক্ত সাজত কিন্তু মনে মনে তারা স্কটল্যাণ্ডকে স্বাধীন করবার জন্যে উৎসুক ছিল বড় কম নয়। মণ্ট্রোজ এসে এই ঘরে লুকোলেন। কারুর সাধ্য হল না আর মণ্ট্রোজের পাত্তা করা। শেষে মণ্ট্রোজ-এর রূপই তাঁর কাল হল। এ বাড়ির অতি রূপসী এক ব্রুনেট-পত্নী মণ্ট্রোজ-এর

প্রেমে পড়ে গেল। মণ্ট্রোজ ছিলেন আবার কবি প্রকৃতির মানুষ। কাজেই গোপনে প্রেম বেশ ভালভাবেই জমে উঠতে লাগল। সেই গোপন কথাটা জানাজানি হতেও খুব দেরী হল না। ব্রুনেট ঠিক করলেন তিনি গোপনে নিজে হাতে মণ্ট্রোজকে খুন করবেন। তাঁর স্ত্রী কেমন করে সে কথা টের পেয়ে মণ্ট্রোজকে একটা ঘোড়া দিয়ে সেই রাতেই জঙ্গল পার করে দিলেন। হাতের চিড়িয়া ফস্কে যাওয়াতে ব্রুনেট সে রাগ কেমন করে সামলেছিলেন অবশ্য সে কথা আমরা জানি না। তবে শোনা যায় তাঁর স্ত্রী খুব সম্ভবতঃ আত্মহত্যাই করেছিলেন—

সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আরও কয়েকটা ঘর ঘুরলাম। দেখলাম সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সঞ্চিত কৃষ্টি-সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে রাখা বহু রকমের জিনিষ। শীলা বললে, এসব বহু পুরনো জিনিস। তবে আপনাদের দেশে যতো পুরনো ব্যাপার আছে এসব তেমন কিছু পুরোনো নয়।

সারাটা দুর্গ শীলা দেখিয়ে দিল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। ইতিহাসের ছুটকো ছাটকা গল্পের সঙ্গে দুর্গের ভিতরকার সব কিছু দেখা শেষ হয়ে গেল। ছবি ঘরে এসে শেষ পর্যন্ত দেখলাম ব্রুনেট ফ্যামিলীর সকলের ছবি। মণ্ট্রোজের সঙ্গে ভালবাসায় পড়া সেই মহিলাটির ছবিও সেখানে রয়েছে। ছবি তো নয়, যেন এক রাশ মল্লিকা ফুল চাঁদের আলোয় হাসছে। মণ্ট্রোজের দোষ ছিল না। এমন নারী যদি কাউকে আত্মনিবেদন করে তার পক্ষে তাকে এড়ান অসম্ভব।

শীলা বললে, এখন লাঞ্চের সময় হয়েছে। চলুন আমাদের বাড়িতেই আজ লাঞ্চ খেয়ে যান—

বাড়ি মানে দুর্গের একতলার ঘর। ঘরে এসে বসলাম।

লাঞ্চ ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছে। শীলা ভিতরে গিয়ে মাসীকে কি বলে এল। একটু পরেই টেবিলের ওপর আমরা তিনজনে লাঞ্চ সাজিয়ে বসলাম। আমার আপত্তির কোন কারণ দেখাতে পারলাম না। বিশেষতঃ মেয়েটির সহজ আত্মীয়তার সুরটা ভারী মন ছুঁয়ে গেল।

লাঞ্চ তো নয়, ডিনার। এরা স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা দিনে বড় খাওয়া ডিনারটা সেরে রাখে। খেতে খেতে গল্প চলতে লাগল। মাসী অবশ্য খুব কিছু একটা কথা বলেছিলেন না। শীলার কৌতূহল অসাধারণ। একথা সেকথায় শীলা ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে পড়ল। বললে, পুরনো কিছু পড়তে হয় তো ভারতবর্ষের ইতিহাস—

বললাম, পুরণো কিছু যে পড়তেই হবে তার কি মানে আছে? শুধু পুরনো আঁকড়ে থাকলেই তো মানুষের চলবে না। তাকে তো নতুনকে জানতে হবে।

শীলা বললে, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন লোকের মতামত এ সম্বন্ধে

আপনাকে শোনাচ্ছি। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতা হল পুরনো জ্ঞানের সঞ্চয়। যে দেশে যে জাত যতো পুরনো সে দেশের সে জাতের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তত বেশী। ইতিহাস তো ওই সঞ্চয়েরই কথা। আর আমি নিজে ইতিহাসের ছাত্রী। প্রাচীন দেশের ওপর, প্রাচীন যা কিছু নিদর্শন সব কিছুর ওপর আমার কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক নয় কী ?

নিশ্চয়।—বললাম আমি।—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার শ্রদ্ধেয় লোকটি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ কী মিশরের লোক—

শীলা বললে, ভারতবর্ষের লোক তিনি বটে। তবে তাঁর সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি সারা পৃথিবীর বাসিন্দা। সমস্ত মানুষ তাঁর আত্মীয়। তাঁর কাছে দেশ-পাত্র ভেদ একেবারেই নেই।

মনটা উৎসুক হয়ে উঠল। আমি এই রকম লোক মাত্র একজনকে জানি। উৎসুক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—তাঁর নামটি দয়া করে জানাবেন কী—

শীলা বললে, তাঁকে কী আপনি চিনবেন ? তাঁর নাম রে ! এখন তিনি থাকেন ব্যাংখরীর কাছে একটা গাঁয়ে। অমন অদ্ভুত মানব-প্রেমিক লোকের কথা পুঁথি-পত্তরে পড়েছি অনেক কম। আর নিজের চোখে তো আদবেই দেখি নি। দুটো মহাদেশের মধ্যেও না। তিনি এ অঞ্চলের সমস্ত গরীব পাড়ায় বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। পথ্য দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে তিনি তাঁর উপার্জনের বেশীর ভাগ অর্থ ব্যয় করেন।

বললাম, রয়কে আমি চিনি। উনি আমার বিশেষ বন্ধু লোক। শীলা আনন্দে লাফিয়ে উঠল—এ্যাঁ, তাই নাকি। একদিন ওঁকে এখানে আসতে বলবেন—

বললাম, নিশ্চয় বলব। আজই আমি ওর কাছে যাচ্ছি। আজই বলব—

শীলা একটু চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে বললে, নাঃ থাক। আমিই একদিন যাব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। জানেন, আমাকে যমের দরজা থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন ঐ ডক্টর রে। ব্যাংখরি স্যানাটোরিয়ামের বেশীর ভাগ রোগীই তো বাঁচে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে। ওঁর টি বির ওপরে গবেষণা আর চিকিৎসা পদ্ধতি যদি জগতে যোগ্য প্রচার পায় তবে তা যুগান্তর আনবে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

শীলার কথায় মনটা যেন ভরে গেল। শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে এত কথা আমারও জানা ছিল না।

শীলা কাস্‌ল্‌ থেকে বার হয়ে আমার সঙ্গে একটু পথ এল জঙ্গলের মধ্যে। সামনে একটা পথ দেখিয়ে বললে, এইটা ধরে সটান চলে যান—

পথটা জঙ্গলের মধ্যে। ওপরে গাছগুলো বেশ সারি বেঁধে একটা বীথির মতো সাজান চট্‌ করে চোখে পড়ে না। একটু নজর দিলেই বেশ বোঝা

যায় সেটা। সেই বীথির তলায় জঙ্গলে পথ। সেই পথ ধরে ঠিক পাঁচমিনিটের মধ্যে আমি জঙ্গল থেকে বার হয়ে এলাম। পথের ধারে সেই বুড়ো ওক গাছটা নিশানা। দুপুরের রোদ এবার ঢলেছে পশ্চিমে। পূর্বদিকে ছায়া নেমে আসছে। কনকনানি হাওয়ার দমকা আক্রমণ বাড়ছে। ওক গাছটার তলায় গিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

জায়গাটা আর নতুন মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মালঞ্চ পেরিয়ে কুলপী রোডের সেই অতি পরিচিত জায়গাটা। যেখানে জীবনের অনেক কটা বছর ভর দুপুরে বহুদিন একলা শুয়ে বসে কাটিয়েছি বুড়ো কদ্‌বেল গাছটার তলায়। আবার্ডিন রোডের সঙ্গে কুলপী রোডের কোন তফাতই খুঁজে পাচ্ছি না।

রোদ লেগে চারদিকে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। ব্ল্যাকবার্ডদের কিচির মিচির কলরব কানে আসছে এদিক ওদিক থেকে। সোয়ালোদের লম্বা শিসও দুএকটা ভেসে আসছে অলস মুহূর্তে। একটু কান পেতে তার মধ্যেই শুনলাম মিষ্টি গান। ভাল করে নজর করলাম। দেখি একটা থ্রাস চষা ক্ষেতের ওপর নেচে নেচে গান গাইছে।

শীতকালে থ্রাসের গান শোনা যায় না এদেশে। যদি শোনা যায় তবে সেটাকে দুর্লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয় এখানে। কী জানি কী দুর্ঘটনা আছে পরে। কিন্তু সে পরের কথা। এ মুহূর্তটিকে বিশেষ ভাবে উপভোগ করবার জন্যে থ্রাসের গান এতটুকু অবান্তর তো নয়ই বরঞ্চ বিশেষ উপযোগী বলে মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ যে এভাবে সব ভুলে বসেছিলাম ঠিক খেয়াল নেই। আবার্ডিনের দিক থেকে একটা বাস আসতেই ধ্যান ভাঙল। উঠে তার ভিতরে বসে ব্যাংখরির একখানা টিকিট কাটলাম।

এসে পড়লাম ঠিক জায়গাটিতে। চিনে নিয়ে আবার সেই গ্রাভেল ছড়ান পথে চলতে লাগলাম গত রাতের মতো। ডীর পুলও পার হলাম। এখানে এত রোদে এখনও বেশ নিঝঝুম নির্জন ভাব। তারপর সেই পাহাড়ে পথ। এ্যাডলার, ওক্, ফার, এল্‌ম্, বার্চ, বীচের জঙ্গল। বাঁয়ে পড়ল ফিউখ। দিনের আলোয় দেখলাম, প্রায় দুশো হাত উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে ছোট্ট শীর্ণা নদীটি লাফিয়ে নেমে গর্জন করে ছুটে যাচ্ছে ডীর দিকে।

এ রাজত্বটাও জঙ্গুলে। রোদ এখানে এসেছে অতি অল্প। ফিউখের ব্রীজের সিমেণ্টের গায়ে লেগেছে শ্যাওলার পোঁচ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্যাঁতসেতে শেওলা ধরা পুরু আস্তরণ। তারই ডাইনে শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ি। বাড়ির কাছে গেলাম। দরজা আড়-ভেজান। একটু দাঁড়িয়ে মনে করলাম কলিং বেলটা টিপি।

কানে এল তার আগেই এক করুণ আর্তনাদ—তুমি কী পাথর ? বল, আজ

আমাকে শেষ কথা তুমি বল, তোমার কাছে আসব, কী না ?—নেলীর গলা।

ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত স্বরে শুদ্ধসত্ত্বকে বলতে শুনলাম—নিশ্চয় এসো। কিন্তু কোন বাসনা নিয়ে এসো না—

নেলী আবার আর্তকণ্ঠে বললে, বাসনা কী করে ছাড়ব—তোমার জন্যেই আমি এদেশে এসেছি। কত জায়গা ঘুরে এখানে তোমাকে পেলাম। কতদিন পরে। তোমার দেখা পাওয়া থেকে আমার যে প্রতিটি মুহূর্ত দুর্বহ হয়ে উঠেছে। তোমাকে পাওয়ার বাসনা ছাড়লে আমার জীবনে চাওয়ার আর কী রইল বল—

আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছি। নেলী বলছে—আজও কী তোমার কাছে এসে থাকবার সময় আমার হয় নি ? একবার তোমার প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি। এবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও দয়া করে। আমাকে সরিয়ে দিও না, তা হলে আমি বাঁচব না—

হাহাকার বাজল নেলীর গলায়। গলাটা বলতে বলতেই বুজে এল।

শুদ্ধসত্ত্ব আগের মতোই জবাব দিল—না, তা হয় না। আমার কাছে আসার অধিকার তোমার সব সময়েই আছে, কিন্তু বাসনা নিয়ে তুমি এসো না। আমার কাছে যদি আসতে চাও তবে আমাকে পাওয়ার সব রকম ইচ্ছে বিসর্জন দিয়ে এসো। আর যদি সে ইচ্ছে বিসর্জন দিতে না পার, তো একেবারেই এসো না—

উঃ কী পাষাণ এ মানুষটা ! এতক্ষণ যত গৌরব তার জন্যে বোধ করেছি, যত তাকে সম্মান করেছি, ভালবেসেছি, সবকিছু মন থেকে উবে গেল। ভাবতে লাগলাম—অসাধারণ হবার লোভ, সস্তায় নাম কেনবার মোহ নির্ঘাৎ পেয়ে বসেছে শুদ্ধসত্ত্বকে। নইলে নেলীর মতো এমন নারীকে এই অবস্থায় কি কেউ ঠেলে দিতে পারে ? এক মুহূর্তে মনে হল শুদ্ধসত্ত্ব মনে আর মুখে একেবারেই এক নয়। ওর মুখের কথা সব ভণ্ডামী।

যেই এ কথা মনে হল, অমনি ঘরের মধ্যে আর না ঢুকে এক দৌড়ে পালিয়ে এলাম বাইরে। চলতে লাগলাম বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

॥ ২৬ ॥

একটা রবিবার সন্ধ্যার ডিনারে আমার বন্ধু-বান্ধবরা প্রায় সবাই নিমন্ত্রিত। ভার নিয়েছেন আন্টি জেন আর মিসেস ব্রাউন। নিজেরাই সবাইকে টেলিফোনে নেমতন্ন জানিয়েছেন। আন্টি জেনের স্বভাবই হল হৈ-চৈ আর আনন্দের মধ্যে থাকা। মিসেস ব্রাউন ভারিক্কে গম্ভীর হয়ে থাকলেও, আসলে তাই-ই চান। বুঝতে কষ্ট হয় না আমি এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। আসল ব্যাপার একটা কিছু নিয়ে হৈ-হৈ করা।

দ্বপ্বরের পর অনেকেই এসেছে এ বাসায়। এসেছে পামেলা, শ্যামল, থেরেসা। এসেছেন লোলা গার্সিয়া। জ্যাককে নিমন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলাম। টেলিফোনে তাকে পাওয়া যায় নি। জিমি আর আলেক্স্ ফ্রেজারের আসার কথা আছে। এবাড়ির অভ্যাগতরাও সবাই হাজির। আণ্টি এ্যানী তাঁর সাদা চুলে ঢেউ খেলিয়ে, কানে ম্বক্তোর ইয়াররিং দ্বলিয়ে, আঁকা ভুর্ব নাচাতে নাচাতে এসে হাজির। হাতে তাঁর নিউজ-অব-দি-ওয়ার্ল্ড্-এর একটা কপি। এসেছে এ্যাগী আর ক্লারা।

দিনটাও আজ নেহাৎ খারাপ নয়। রোদ্দ্বর অবশ্য ওঠে নি কিন্তু বিষ্টি বাদলা যে সারাদিন হয় নি সেটাই ভাগ্য। আর জান্বয়ারী মাসে যে কড়া শীত থাকবেই এতো জানা কথা। সে সম্বন্ধে কেউ অভিযোগও করে না, করলে সাজেও না। শ্বধ্ব আণ্টি এ্যানী গল্পের মাঝখানে একবার মন্তব্য করলেন—কই গো ঘরগিন্নীরা, অতিথিরা কি শ্বধ্ব হৈ হৈ করবে? এই ঠাণ্ডায় আঁতে একটু গরম কিছ্ব ফেলার বন্দোবস্ত কর।

মিসেস ব্রাউন বেশ জোর করেই বললেন, জান তো মাসী আমাদের এখানে সবই ঠাণ্ডা। আমি খ্বব দ্বঃখিত। শ্বধ্ব গরম চা ছাড়া আর কিছ্বর বন্দোবস্ত করা এ বাড়িতে সম্ভব নয়।

তারপর আমার কানের কাছে ম্বখ এনে ফিসফিস করে বললেন, মাসীর আমার অনেক গ্বণ। তিন বোতলেও ওঁর পা টলে না—

মাসী কিছ্ব মনেই করলেন না সে কথায়। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি ম্বখে বললেন, চা? বেশ তাইই দাও—

আণ্টি এ্যানী একাই মাতিয়ে রেখেছেন আজকের এই আড্ডাটা। শ্যামলকে আণ্টির ভারী পছন্দ। বারবার তারিফ করছেন পামেলার পছন্দকে। বলছেন, ওর ভাগ্যটা নাকি খ্ববই ভাল। তবে যেন খ্বব বেশী দিন বিয়ে না করে ফেলে না রাখে। তাহলে শ্যামলকে পাওয়া ম্বস্কিল হবে। অন্ততঃ আণ্টি এ্যানীর তো খ্বব লোভ পড়েছে ওর ওপরে।

বেচারা শ্যামলের কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে লজ্জায়। আণ্টির কিন্তু কামাই নেই। শ্যামলকে বললেন, তোমার জন্যে যে-কোন মেয়েই বলতে পারে—

অর্ ওয়্যার আই ইন্-দি-ওয়াইল্ড্-ওয়েস্ট
স্যায় ব্ল্যাক এ্যাণ্ড চেয়ার, স্যায় ব্ল্যাক এ্যাণ্ড চেয়ার,
দি ডেজার্ট ওয়্যার এ প্যারাডাইস,
ইফ্-দাউ-আর্ট দেয়ার, ইফ্-দাউ-আর্ট-দেয়ার।

শ্যামল সব কথাগ্বলো বোধ হয় ব্বঝতে পারল না। একটু অবাক হয়ে আণ্টির ম্বখের দিকে তাকিয়ে রইল। পামির ম্বখ হাসিতে ভরে উঠল। সে কানে কানে শ্যামলকে সব কথা ফিস্-ফিস্ করে বোঝাতে লাগল।

লোলা গার্সিয়া কাব্য শুনে উৎসুক হয়ে উঠলেন। আণ্টি এ্যানীকে অনুরোধ করলেন—আপনার সুন্দর গলায় আর একটা কবিতা শোনান না আমাদের—

আণ্টির আপত্তি নেই এতটুকু। তখনই আবৃত্তি করতে শুরু করলেন বার্ণস্-এর—টু-এ মাউণ্টেন ডেইজি।

সুন্দর উচ্চারণ আর আবৃত্তির ভঙ্গী আণ্টির। এ ধরনের গেঁয়ো কবিতা যে এতো সুন্দর একটা রেশ এনে দিতে পারে মনে তা আণ্টির মুখে না শুনলে মনেই হয় না। কবিতাটা চোখ বুজিয়ে আন্টি আবৃত্তি করে গেলেন। তারপর সেটা শেষ করেই দুচোখে একটু দুষ্টুভাব এনে পামেলার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সুর ধরলেন—

উইল ই গো টু দি ইণ্ডিজ্ মাই মেরী
এ্যাণ্ড লিভ অল্ড্ স্কোশিয়াস্ সোর ?
উইল ই গো টু দি ইণ্ডিজ্ মাই মেরী
এ্যাক্রস্ দ্য' আটলাণ্টিক রোর ?

গান শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পামেলা আর শ্যামল দুজনেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আণ্টি থামতেই আমি লোলাকে অনুরোধ করলাম স্প্যানিশ গান শোনাবার জন্য।

শ্রীমতী লোলা পিয়ানোতে বসলেন। তারপর সুন্দর গলায় স্প্যানিশ সুর গাইতে লাগলেন। সুর শুনে মনে হল ইউরোপীয়ান গানের মধ্যে প্রাচ্যের ঢং বেশ কিছুটা মেশান। অন্ততঃ বিস্তারের দিকটা। গানের কথার মানে একটাও বুঝলাম না কেউ, কিন্তু সুর উপভোগ করতে কারুরই কোন অসুবিধা হল না। ঘরটা যেন ভরে উঠল সুরে সুরে। এমন অদ্ভুত সুন্দরভাবে সুর ছড়িয়ে দিতে লাগলেন গার্সিয়া।

আণ্টি এ্যানী চোখ বুজে গান শুনছিলেন। গান শেষ হবার পর বললেন, ইউ আর এ নাইটিঙ্গেল আরেখ্‌ট—

ক্লারা বলে উঠল—এটা ইংরেজী গান হলে সবাই বুঝতে পারত—

লোলা মিষ্টি হেসে বললেন, সেতো ইংরেজী গান, স্প্যানিশ গান তো না—

আণ্টি এ্যানী ক্লারাকে বললেন, ওগো মেয়ে, হুইস্কি খেতে চাও তো স্কটল্যাণ্ডে এসো। কিন্তু ভাল শেরী খেতে হলে তোমাকে স্পেনে যেতেই হবে। বলে চোখ মটকে একটা ইংগিত করলেন।

ক্লারাকে ছেড়ে আণ্টি ধরে বসলেন শ্যামলকে। তোমার ইণ্ডিয়ান গান শোনাও তো একটা। তবে—'গোরি গোরি বাংকিচুরী' ওটা গেয়ো না। ওটা আমি জানি। একটা ইণ্ডিয়ান সোলজারের কাছে একখানা রেকর্ড ছিল। সেটা সে এতবার বাজাত যে বিরক্ত হয়ে আমি একদিন সেটাকে ভেঙে দিয়েছি। আর

ইণ্ডিয়ান মিউজিক গাইবার সময়ে একটু সাবধানে গেও। আমি ইণ্ডিয়ান মিউজিক জানি—

বললাম, তাই নাকি আণ্টি ? তা ওর গান হবে এখন পরে। আপনিই না হয় আগে আপনার ইণ্ডিয়ান মিউজিকটা শোনান না—

সবাই খুব অবাক আর উৎসুক হয়ে উঠেছে। আণ্টি দ্বিধা না করেই আরম্ভ করলেন—

ইনি মিনি পিনি জিনি
চ্যারান ডিনি রিনি।
টিন্‌স্পাইকা হাস্‌কা বাব্‌ল।
আলে মাসা বাবরি। ই-ই-ই।

বলে একটা টান দিয়ে গান শেষ করে আন্টি হো-হো করে হেসে উঠলেন। এক 'চরণ ধ্বনি রণি' কথাটা শুনে মনে হল বাংলা গান। বাকী কথার অর্থগুলো 'কম্পারেটিভ ফিললজির' সাহায্য নিয়েও উদ্ধার করা গেল না।

আন্টি বললেন, আমার ঠাকুরদা কাজ করত ইণ্ডিয়ান আর্মিতে। আমি তার কাছ থেকে শিখেছিলাম গানটা ছেলেবেলায়। ঠাকুরদার সঙ্গে একটা ইণ্ডিয়ান মেয়ের ভাব ছিল। তার ছবি আমি দেখেছি, ওঃ কী যে সুন্দর দেখতে কী বলব ? তার কাছ থেকে ঠাকুরদা ঐ গানগুলো শিখেছিল। যাই হোক শ্যামল তুমি গান শোনাও তো ডিয়ার—

শ্যামল স্বভাবতঃই লাজুক। অনেক কষ্টে লজ্জা ভেঙে সে গাইতে লাগল—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাব।

শ্যামলের গলাটা ভাল। আমি আগে জানতাম না যে সে এত ভাল গান করে। গান শেষ হতেই সবাই জিজ্ঞাসা করল—মানেটা কী ?

তাদের ইংরেজী করে মানেটা বুঝিয়ে দিলাম।

আন্টি এ্যানী চুপ করে শুনছিলেন। চোখ বুজেই বললেন, আশ্চর্য—এতো সুন্দর গান লেখে তোমাদের দেশের লোক—

তারপর যেন নিজেকে নিজেই বলতে লাগলেন—কী অপূর্ব কথা ! আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাব। কিন্তু এখানে একথা বুঝবে কে বোধি—

আন্টির মুখের চেহারাটাই পাল্‌টে গেছে এই মুহূর্তে।

আন্টি বলতে লাগলেন—এখানে মানে এই ইংলণ্ডে স্কটল্যাণ্ডে একথা বোঝবার লোক কটা আছে বল ? একথা বুঝি আমি। আর আমার মতো মানুষেরা।

কানের কাছে মুখ এনে ফিস্-ফিস্ করে বললেন, সারা জীবনই তো হাত দিয়ে দোর খুলতে চেষ্টা করলাম। সে দোর ত বন্ধই রয়ে গেল। এখন এই বয়সেও তো চেষ্টায় ত্রুটি নেই। কিন্তু দোর ত খুলল না। কেবল ঠেলাঠেলিই সার হল।

দেখি অ্যান্টির চোখের কোলটা যেন চক্-চক্ করছে। অপর সবাই নিজেদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তায় ব্যস্ত। কেবল আন্টি ডুবে গেছেন নিজের মধ্যে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে একটু আধটু কথা বলছেন মাত্র। একটা গান যে একটা লোককে এতটুকু সময়ের মধ্যে এমন বদলে দিতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

আণ্টি এ্যানীর সব পরিচয়টা বোধ হয় সবাই পায় না। আমার কেমন মনে হল আণ্টি তাঁর আসল রূপটা লুকিয়ে রাখেন অনেক ভিতরে। তাঁর বাইরের ওই ইন্দ্রিয়াসক্ত, উচ্ছল রূপটা—ওটা ওঁর একটা মুখোশ। ভিতরের মানুষটি ভালবাসে কাব্য। ভালবাসে ভালবাসতে, গভীর-এর অনুভূতি পেতে। রবীন্দ্র-নাথের গানটা বোধহয় আজ সেই জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়েছে। আন্টির পূর্ণ রূপটা আজ আমার চোখের সামনে একবার ঝিলিক দিয়ে গেল। একটু চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময়ে দরজার কলিং বেলের আওয়াজ। আন্টি বাইরে গিয়ে ফিরে এলেন, সঙ্গে জ্যাক।

সত্যি কথা বলতে কী আজকের এই আনন্দের মাঝে থেকে থেকে মনটা আমার ভিতরে ভিতরে মোচড় দিচ্ছিল। জ্যাকের কথা আর শুদ্ধসত্ত্ব নেলীর কথা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। ক'দিন জ্যাকের দেখা পাই নি, কোথায় যে সে ঘুরে বেড়ায় তাও জানি নে। হয়তো প্রাণের জ্বালায় ছিটকে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। তার জন্যে একটু ভাবনা আমার মনে লেগেই ছিল। তাই তাকে পেয়ে আমার মনের আনন্দের বাঁধ ভেঙে গেল। দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। এতদিন কোথায় ছিলে জ্যাক—

জ্যাক বেশ হাসিখুশী ভরা মুখেই জবাব দিল—কেন এই আবার্ডিনে। কিন্তু তোমার কাছে আসতে পারি নি, আমায় ক্ষমা কর। তা আজ সব এরা কারা—

সবার সঙ্গে জ্যাকের পরিচয় করিয়ে দিলাম। অ্যান্টি জেন আর মিসেস ব্রাউন বললেন, আজ যখন এখানে এসেছ তখন ডিনার না খাইয়ে ছাড়ছি না।

বেশ বেশ, পড়ে যাওয়া চোদ্দ আনা—বললে জ্যাক—আমিও না খেয়ে নড়ছি না, ডিয়ার লেডী।

এই কিছুদিন আগে জ্যাকের ওপর দিয়ে যে একটা ঝড় বয়ে গেছে তার একটু চিহ্নও নেই তার মুখে চোখে, আচারে ব্যবহারে।

মনে মনে অনেকটা শান্তি অনুভব করলাম। ঠিক সেই সঙ্গে মনে পড়ল নেলীর সেদিনকার রাতের মুখটা। মনটা কঠোর হয়ে উঠতে লাগল শুদ্ধসত্ত্বের

ওপর। মনে হল ভণ্ড, দাম্ভিক শুদ্ধসত্ত্ব। ওর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখাই ঠিক হবে না। যাক এখানে আজ ওকে নেমন্তন্ন না করে ভালই করেছি।

ভাবলাম বটে সে কথা। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব আর নেলীর চিন্তাটা কেমন যেন সব গল্প গানের মধ্যেও বারবার মনে খোঁচা মারতে লাগল।

আণ্টি জেন আর মিসেস ব্রাউন বললেন, জিমি রবার্টসন আর আলেক্স্ ফ্রেজার তো কই এল না? সাড়ে সাতটা বাজে। আর দেরী করাও যায় না। এসো আমরা ডিনারে বসি—

টেবিল সাজাতে খাবার পরিবেশন করতে থেরেসা আর পামেলা আণ্টি জেনকে সাহায্য করতে লাগল। আমরা সবাই খেতে বসলাম। শেষে সব খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে আণ্টি, থেরেসা আর পামেলাও এসে বসল।

আণ্টি জেনের আজ উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। প্রায় পাঁচ ছটা নতুন পদ তৈরী করেছেন বই দেখে। অদ্ভুত অদ্ভুত রান্না। তার সঙ্গে ঘি ভাত আর মুর্গীর কারীও আছে, লুচিও আছে। অবশ্য এসব তিনি আমার কাছ থেকেই শিখে নিয়েছেন তাগিদ দিয়ে।

ইণ্ডিয়ান রান্না শুনেছি খুব ভাল। কই কয়েকটা শিখিয়ে দাও তো বোধি। এরপর যাতে তোমায় খাওয়াতে পারি।

আণ্টি জেনের দরদী মন লোককে খাইয়ে খুশী—রান্না করেই খুশী। হৈ-হৈ করে ডিনারে বসলাম। পাশে আণ্টি এ্যানী। হঠাৎ খেতে খেতে শুনলাম—অস্ফুটভাবে তিনি বলছেন—আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব—

জ্যাক এদিকে হাসির গান জুড়ে দিয়েছে। আবার্ডিনের কথার টান নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়েছে। মিসেস ব্রাউন জ্যাককে বললেন, তোমার বাড়ি তো হিলানে (হাইল্যাণ্ডে)। তুমি তো হিলানম্যান—

আবার্ডিনে হিলানদের একটু খাটো নজরে দেখা হয়। তারা গেঁয়ো, গোঁয়ার আর বুদ্ধি-মোটা।

জ্যাক হো হো করে হাসছিল আর মুর্গীর ঠ্যাং চিবুচ্ছিল। বললে, শুনুন তা হলে আমাদের আবার্ডিনের কথা। কিনা ল্যাসি, ডগি, গার্লি, ল্যাডি, সব কথায় আই-ই দিয়ে না বললে যেন আপনাদের কোন আরাম নেই কথা বলার। এই না—

একটু থেমে মুর্গীর ঠ্যাংটা নামিয়ে রেখে বললে, একদিন্ একটা ছোট্ট মেয়ের মা মারা গেছে। বেচারা কদিন স্কুল যেতে পারে নি, তাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্ বাড়ি গেছেন সন্ধ্যের সময়ে মেয়েটির খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখেন মেয়েটি বসে আছে রান্নাঘরে আর তার মাসী সুপের বোলে কাঠি দিচ্ছে। মিস্ট্রেস জিজ্ঞাসা করলেন—স্কুলে যাও না কেন খুকী—

খুকী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মাসী তাড়াতাড়ি বলে উঠল—বল না, বল না, ইওর মাদার ইজ্ ইন্ দি গ্রেভী—

এখন গ্রেভী শুনেই তো মিস্ট্রেস্ অবাক। তাহলে মাসী যে গ্রেভীতে কাঠি দিচ্ছেন তাইতেই ডুবে আছেন নাকি মা? ভদ্রমহিলা আবার আবার্ডিনের নন। কাজেই বুঝতে কষ্ট হল। সুপের বোলের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতেই খুকুটি চোখ মুছে উঠে এসে বললে, ম্যাডাম গ্রেভী নয় গ্রেভ। তবে জানতো আমরা আবার্ডিনের লোকরা সব কথার শেষে আই-ই লাগাই—

গল্প শুনে আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম। দেখলাম জ্যাকের মুখের উপরের সেই বিষাদ আজ উধাও। এদিকে মিসেস ব্রাউনও তাঁর গম্ভীর ভাবটা অনেক ছেড়েছেন। সবাই হৈ-হৈ করে গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ করতে লাগলাম। একটু খাইয়ে ছেলে শ্যামল পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে মাংস চিবুতে লাগল দুচোখ বুজে। আণ্টি জেন তার দশা দেখে আরও খানিকটা তার পাতে দিয়ে দিলেন। সবাই রান্নার খুব সুখ্যাতি করতে লাগল।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। আণ্টি জেন গিয়ে ধরলেন। তারপর এসে আমাকে ডেকে দিলেন। টেলিফোনে কান দিতেই ওপার থেকে বেশ একটা ভারী ধরা গলায় আওয়াজ এল—বোধি, আমি আলেক্স্ বলছি। আমার বড় বিপদ। এখনি আমার বাড়িতে একবার এসো।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলে উঠলাম। সংক্ষেপে সব কথা বললাম জ্যাককে আর আণ্টি জেনকে। জ্যাক বললে, দাঁড়াও, আমিও আসছি—

খবর পেয়ে থেরেসাও উঠে দাঁড়াল। বললে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে বোধি—

আমি, জ্যাক আর থেরেসা মিনিট কয়েকের মধ্যেই আলেক্স্-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। জ্যাক গিয়ে দরজার বেল টিপল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল আলেক্স্। ভরাট মুখখানা তার আরও ভরাট গম্ভীর। সারা মুখটায় আতঙ্ক আর দুঃখের ছায়া পড়েছে প্রগাঢ় হয়ে। বড় বড় প্রায় কান পর্যন্ত টানা চোখ দুটো আরক্ত তো বটেই, ফুলেও উঠেছে বেশ। দেখলেই মনে হয় বহুক্ষণ ধরে কেঁদেছে।

জ্যাককে সামনে পেয়ে আলেক্স্ তাকে জড়িয়ে ধরে আবার হু হু করে কেঁদে ফেলল। আমরা সবাই তার ঘরে এসে ঢুকলাম। সামলে নিয়ে আলেক্স্ বললে, অনেকদিন থেকেই সহ্য করছিলাম জিমির এই সব উৎপাতগুলো। এখন আর আমি পারছি না। আজকে আমার চরম শাস্তি, চরম অপমান করেছে ও—

—জিমি কোথায়? তার তো আজ আমার ওখানে পার্টিতে যাবার কথা ছিল তোমাকে নিয়ে—

আলেক্‌স্‌ কোন কথা না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুমটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে রুমাল গুঁজে দিলে জোর করে। দুচোখ দিয়ে তার ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

—কী ব্যাপার— জিমি বাথরুমে গেছে তো কী হয়েছে? এখনই বার হবে। তা তুমি এত উতলা হয়ে আমাদের ডাকলে কেন বলত—বললে জ্যাক।

আলেক্‌স্‌ মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে জিমি বাথরুমটা। আজ সেই দুপুর থেকে ঘরে বসে মদ খাচ্ছিল। আমি তোমার ওখানে যাব বলে ওকে ধরতে গেলাম। ওর বাড়িওয়ালী বললে, বারে গেছে। বেবাক সারা শহর খুঁজে দেখি একটা জঘন্য বারের ভিতর বসে জিমি মদ খেয়ে একেবারে বেহেড মাতাল হয়ে পড়েছে। ওঠবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। আমি ওকে তুলে নিয়ে এলাম পাঁজাকোলা করে। এনে ফেললাম আমার বাসায়—লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে। জানত আমার বাড়িওয়ালী কী কড়া! তবুও নিয়ে এলাম এই ভেবে—যে ওর কিছুটা সেবা করা তখন ভয়ানক দরকার হয়ে পড়েছিল। হেঁচ্‌কির চোটে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সেই অবস্থায় বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটু পরে উঠে বাথরুমে ঢুকে সেই যে দরজা বন্ধ করেছে, আমি এক ঘণ্টা ধাক্কাধাক্কি করেও সে দরজা খোলাতে পারলাম না।

একটু থেমে আকুলভাবে বললে, কী হবে বোধি—ওকি ভিতরে মরে গেল নাকি? কোন সাড়াও তো পাচ্ছি না—

বলেই সে আবার হু হু করে কেঁদে ফেললে। থেরেসা তাকে ধরে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মতো সান্ত্বনা দিতে লাগল।

জ্যাক আর আমি খাটটা টেনে এনে তার ওপর ড্রেসিং টেবিলটা তুলে স্কাই-লাইট পর্যন্ত পেঁছাবার ব্যবস্থা করলাম। জ্যাক স্কাইলাইট গলে ভিতরে নেমে গেল। বাথরুমের ভিতরকার দরজা খুলে দিলে। দেখা গেল একগাদা বমির ওপর জিমি রবার্টসনের দেহটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। জ্যাক তার দিকে একবার চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, বিস্ট্‌! তারপর তার দেহটাকে একটুকরো কাঠের মতো দুহাতে তুলে নিয়ে বাথটাবের মধ্যে ফেলে দিলে। আলেক্‌স এগিয়ে এসে বললে, এখন তোমরা বাইরে যাও। আমি ওকে ঠিক করছি। ওর বুকটা আর নাড়ীটা একটু দেখো ভাল করে—ও বেঁচে আছে তো? জ্যাক এক টুকরো বিকৃত হাসি হেসে বলল, ভয় নেই, ও সহজে মরবে না।

আমরা বাথরুম থেকে বার হয়ে এসে ঘরের মধ্যে বসলাম। আলেক্‌স্‌ জিমিকে ময়লা মাথা ছোট্ট ছেলের মতো পরিষ্কার করতে লেগে গেল। থেরেসা তাকে সাহায্য করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে জিমিকে পরিষ্কার করে এনে বিছানায় শুইয়ে তাকে নেবু

দেওয়া চা খাওয়ান হল এক কাপ। সে যেমন অচৈতন্য ছিল তেমনিই পড়ে রইল বিছানায়। আর আলেকস্ তার বুকে আর মাথায় হাত রেখে দেখতে লাগল মাঝে মাঝে, তার হার্টফেল হয়ে যায় কী না। ভারী ভয় পেয়েছে বেচারা। হাজার সাহস দেওয়া সত্ত্বেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে জিমি বাঁচবে।

রাত একটু বেশী হতে আমরা উঠলাম। আলেক্স্‌কে বলে এলাম পরের দিন এসে খবর নেবো। আর যদি রাতেই দরকার পড়ে তবে যেন টেলিফোনে তক্ষুনি আমায় জানায়। যত দূর বোঝা যাচ্ছে ভোরের আগে জিমির জ্ঞান হবে না। তবে তার জন্যে ভয়ের কোন কারণ নেই।

রাস্তায় বার হয়ে অপূর্ব এক দৃশ্য চোখে পড়ল। সেই দৃশ্য দেখে সন্ধ্যে-বেলাকার এই ঘটনায় যত গ্লানি মনে জমা হয়েছিল তা এক মুহূর্তে ধুয়ে গেল। কখন আমাদের অজানতে আকাশের মেঘ কেটে গেছে। সারা আকাশ ডুবিয়ে দিয়ে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে। শীতের ম্যাড়মেড়ে মেঘ-ঢাকা আলো নয়। একেবারে পরিষ্কার আকাশের নিখাদ চাঁদের নির্মল জ্যোৎস্না। ডীর এপারে ওপারে রাজ্যটাকে আর চিনতে পারছি না।

জীবন্ত নরকে গিয়েছিলাম কয়েক ঘন্টার জন্যে। তার মেয়াদ ফুরতেই চলে এলাম এ কোথায়? এতো সেই পরিচিত পৃথিবীতে নয়। স্বর্গের সুষমায় ভরা নন্দন। সঙ্গে সঙ্গে এক অমর্ত্য লোকের আহ্বান পৌঁছে গেল অন্তরে। এখানে সেখানে জমা বরফের স্তূপগুলোতে চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছে হীরের খনি উজাড় করে কারা ফেলে রেখে গেল সব এদিকে ওদিকে হেলায় ছড়িয়ে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুনিয়াটা যে এমন পাল্টে যেতে পারে—তা যেন বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে উঠল। বিশ্বকর্তার অপূর্ব কারিগরিতে বিস্মিত, মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। জ্যাককে বললাম, শীতের রাতে এখানে এমন চাঁদ ওঠে তাতো জানতাম না।

জ্যাক বললে, জুনের সঙ্গে অবশ্য মুনের শব্দগত আর ঋতুগত মিল থাকলেও জানুয়ারীতে যে চাঁদ একেবারেই উঠবে না এমন কথাও তো জোর করে বলা যায় না। তবে আমি শীতের রাতে যে এমন চাঁদ কদাচ দেখেছি তা হলপ করে বলতে পারি—

থেরেসা আনন্দে হাততালি দিয়ে রাস্তার ওপরেই একটা বিশেষ নাচের পোজ দেখাতে লাগল। দেখলাম ওর মনেও বেশ স্ফূর্তি হয়েছে।

জ্যাক আর বাক্যব্যয় না করে এক হাতে আমাকে আর এক হাতে থেরেসাকে নিয়ে প্রায় জোরে দৌড়তে লাগল ডীর তীরের দিকে। ডীর পুল পার হয়ে এলাম ডাথি পার্কের কাছে। পার্কের আসল গেট বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কী? ডীর পাড় ধরে একটু রাস্তার আড়ালে গিয়ে একটা জায়গায় পার্কের

লোহার রেলিং টপকে এসে তিন জনে ঢুকে পড়লাম পার্কের মধ্যে। জ্যাক থেরেসাকে পাঁজাকোলা করে পার করে নিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, যত বেরসিকের দল। এই চাঁদের আলোতে পার্কটা রেখেছে বন্ধ করে। আর খোলা থাকবে সেই সময়ে, ঝুপঝুপনি বিষ্টির চোটে লোক যখন অস্থির।

এদিকে আমি দেখছি তো দেখছি। চোখ ফেরাতে পারছি না সে দৃশ্য থেকে। কী কলমে যে সে দৃশ্যের ছবি আঁকব তা জানি না। বোধহয় মর্ত-লোকের কোন তুলি-কলমেই তাকে ষোল আনা ধরে দিতে পারব না। গাছের ন্যাড়া ডালগুলিতে বরফের মোড়কগুলো চাঁদের আলোর জমাট বাঁধা সুষমা। ডীর জলে কে দুধ গুলে দিয়েছে। ওপারের ঢেউখেলিয়ে উঠে-যাওয়া সমস্ত জমিটা হয়ে গেছে মর্মর পাহাড়। তার ওপরের বাড়িঘরগুলো হল রূপকথার রাজত্ব। যেখানে আমি এতদিন আছি, যে পথ দিয়ে হাজারবার ডীর এপার ওপার যাতায়াত করি, সেই সব অতিপরিচিত জায়গাগুলো তো এরা নয়। এরা যেন অন্য কোন রাজত্বের। হঠাৎ কখন দুধের সাগরটার মাঝখান বরাবর ফাঁক হয়ে গেল আর বেরিয়ে এল এই দুর্লভ শুভ্রতায় ঢাকা বিস্ময়কর রাজত্বটা।

থেরেসা একবার বললে, গান গাইতে পারলে এখন বেশ হয়। কিন্তু আমার গলায় তো গান হয় না। এস নাচা যাক—

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক রাজী। থেরেসাকে নিয়ে জ্যাক হাইল্যাণ্ডের এক নাচ নাচতে লাগল। আমি চুপচাপ বসে দেখছি। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ওরা মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে নাচতে নাচতে। আবার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে জোছনায় এক জোড়া পরী নেমে এসেছে এই বাগানটায়। একটুও ওরা বেমানান নয় এই সৌন্দর্যের সঙ্গে। চারদিক খুব নিস্তব্ধ, নির্জন। বোধহয় শীতের জন্যেই। শুধু শীত নেই আমাদেরই। আমাদের মনে জানুয়ারীর শীতকে হটিয়ে দিয়ে বসন্তের আবির্ভাব হয়ে গেছে।

কিন্তু খুব বেশীক্ষণ চাঁদের আলো উপভোগ করা গেল না। জানুয়ারীর শীত কাউকে রেয়াত করে কথা কয় না। সুতরাং সবকিছু ফেলে এক সময়ে টুপ করে ঘরে ঢুকে পড়তে হল।

জ্যাক বললে, আজ বাইরে থাকতে পারলাম না বটে তবে ঘুমকে আমি কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছি না। আজ সারারাত বসন্ত আহবান করব ঠিক করেছি।

বললাম, এতটা রাতে তো বাস ট্রাম কিছু পাবে বলে মনে হচ্ছে না। চল আণ্টি জেনের স্মরণ নিই।

বাড়ি এসে দেখলাম মিসেস ব্রাউন আর আণ্টি জেন দু বোনেই আমার সাপার কোলে করে বসে আছেন ড্রয়িং রুমে। আণ্টি আগুনে পা সেঁকছেন। আর মিসেস ব্রাউন খেলা জুড়েছেন র‍্যামসে কুকুরটার সঙ্গে।

আমরা ভিতরে আসতেই দুজনেই হৈ হৈ করে উঠলেন। কী ব্যাপার তোমাদের বলত ? আলেক্স্-এর খবর কী ? কী হয়েছিল বেচারার ?

এক সঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন এসে আমাদের ওপর ঝড় তুলে ফেলল।

জ্যাক শুধু দু-চার কথায় উত্তর দিল—ও কিছু না। জিমি মদ খেয়ে বাথরুমের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল—

তা এতক্ষণ তোমরা ছিলে কোথায়, জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস ব্রাউন।

—চন্দ্রগ্রস্থ হয়ে ডার্থি পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। ফটক বন্ধ ছিল বলে ঢুকতে হল পাঁচিল টপকে। কী করব বলুন, বললাম আমি।

মিসেস ব্রাউন গালে হাত দিয়ে আঁ করে একটা বিস্ময়ের শব্দ তুললেন। বললেন, কী ডাকাত ছেলে-মেয়ে সব রে বাবা ! যদি পুলিশের হাতে পড়তে—

জ্যাক হাস্তে হাস্তে বললে, তারাও কি চন্দ্রগ্রস্থ হয় নি ভাবছেন—

আণ্টি জেন বললেন, তা সত্যি, কী চাঁদটাই উঠেছে আজ ! কিন্তু আজ রাতে আর নয়। তোমরা বোধ হয় এত রাতে শহরে ফিরতে পারবে না। চল তোমাদের শোবার ব্যবস্থা করি।

জ্যাক বললে, আমি আজ রাতে বোধির সঙ্গে বসন্ত আবাহন করব ওর ঘরে।

মিসেস ব্রাউন মিটিমিটি হেসে বললেন, কটা বোতল ঘরে জমা আছে বোধি—

বললাম, একটাও না—

—তাহলে বসন্ত আবাহনটা হবে কি দিয়ে—

—মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। দেখুন না বাইরে চেয়ে, আকাশ থেকে কি রকম মাতাল করা সুরাস্রোত বইছে। ওর কাছে হাজার ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, কোনিয়াক হার মেনে যাবে। সুতরাং—

আণ্টি জেন বললেন, থেরেসা চলুক এ্যাটিকের ঘরে। অসুবিধা কিছু হবে না।

থেরেসা আমাদের সঙ্গী হিসেবেই ছিল এতক্ষণ। তাই তার দিকে বিশেষ কিছু নজর এতক্ষণ দেওয়াই হয় নি। এবারে তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধ্যেবেলাকার থেরেসাতে আর এখনকার থেরেসাতে যেন বেশ কিছুটা তফাৎ। চোখেমুখে ওর এমন একটা ভাব এসে লেগেছে যেটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ওকে যেদিন থেকে জানি সেদিন থেকেই দেখছি ও সদাহাস্যমুখী, ঈষৎ চঞ্চলা, আনন্দময়ী। মাঝে মাঝে ও ভারিক্কে হবার ভান করে বটে তবে ওর সে রূপটাও আমি চিনি। ওর আর এক রূপ দেখেছিলাম ট্রেনের কামরায়। সে যেন জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড। সে শুধু একটুখানিরই জন্যে। এ যেন সম্পূর্ণ একটা নতুন রূপ দেখছি ওর। ডার্থি পার্কের নৃত্যরতা থেরেসাকে এই একটু আগেই দেখেছি আনন্দোজ্জ্বলা হাস্য-মুখরা। কিন্তু এর মধ্যে ওর হল কী ? চোখের পাতা

ওর যেন আর ওপর দিকেই উঠছে না। চুপ করে সে বসে রইল সোফার এককোণে। যেন বেশ একটু ক্লান্ত, একটু গম্ভীর, একটু অন্যমনস্ক। আমি ইচ্ছে করেই ওকে একবার জিজ্ঞেসা করলাম, কী থেরেসা তোমার তো অসুবিধে কিছু হবে না এখানে ?

ও চোখ তুলল আমার দিকে। একটু ফিকে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললে, না না, অসুবিধে কি—

বলেই চট করে উঠে পড়ল—যাই একটা টেলিফোন করে দিই মাকে—

থেরেসার এই যে অতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনটা, এটা সবার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। ওরা থেরেসাকে দেখেছে আমার থেকেও কম। জ্যাকের তো এ সব গ্রাহ্যই নেই। সে অনর্গল বকছে আর হাসছে মিসেস ব্রাউনের সঙ্গে। মনে মনে আমিই একটু অস্বস্তি অনুভব করছি। কে জানে কোন অজানতেই ওই মেয়েটার ওপর হয়ত কোন অবিচার হয়ে গেছে।

রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ ড্রয়িং রুম ফাঁকা করে সবাই শুতে চলে গেল। বসে রইলাম কেবল আমি আর জ্যাক।

জ্যাক বললে, আজকের সন্ধ্যেটা কী রকম একটা বিপরীত আবহাওয়ায় কাটল দেখেছ ?

—হ্যাঁ, নরক আর স্বর্গ পাশাপাশি দেখলাম—

সেই জন্যেই স্বর্গের সুষমাটা অত ভাল করে প্রাণমন দিয়ে উপভোগ করা গেল।—বললে জ্যাক। এই নরক নিয়েই আমাদের কারবার করতে হয় সব চেয়ে বেশী। কিন্তু সান্ত্বনার কথা হল—এই জানুয়ারি মাসের আকাশে যেমন একটু-খানির জন্যে চাঁদের আলো দেখা যায়, তেমনি জীবনেও। ওই ক্ষণটুকুর জন্যেই মানুষের বাঁচা। আসল আনন্দ জীবনে আসে কদাচিৎ। তবু সে তুচ্ছ নয়। সমস্ত মানুষ জাতটা যে অনবরত দু হাত দিয়ে এই পাঁক ঠেলে যাচ্ছে শুধু ওই এক টুকরো আনন্দের সন্ধান পেতে। ওইটুকুই মানুষ জাতটাকে আজও অমর করে রেখেছে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিতে। আজ বহুকাল পরে ঐ একটুকরো আনন্দের ছোঁয়া লেগে গেল আমার মনে। আর ঐ ছোঁওয়া লেগে দেখছি আমার বেদনার স্মৃতিগুলোও হঠাৎ আনন্দের রঙে রাঙা হয়ে উঠছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করল।—জিমিকে দেখে আজ সন্ধ্যেতে আমার মন একটুখানির জন্যে রাগ আর ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। কেন জান ? ওকে মাতাল দেখে নয়। মাতাল অবস্থায় ওকে আমি বহুবার উদ্ধার করেছি—কাজেই ওটা আমার গা সওয়া। আমি আজ রেগেছি ওর জঘন্য ছলনা আর কপটতার জন্যে।

—সে কি? কপটতা ওর দেখলে কোথায়? দিব্যি সোজা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।

জ্যাক বললে—না না তা নয়। তুমি জানো না—আলেক্স্ও জানে না—জিমি আজ প্রায় বছরখানেক হল একটা ফরাসী মেয়েকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনগেজড্ হয়েছে—

আমি রীতিমতো অবাক হয়ে বললাম, তাই নাকি? তা তুমি এ খবর পেলে কোথা থেকে?

জ্যাক বললে, বলছি শোন সে সব কথা। অদ্রের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে যে ব্যাপারটা ঘটল তা তো তুমি জান। অনেকবার অনেকের কাছ থেকে ঐরকম আঘাত আমি পেয়েছি বটে—কিন্তু বোধি এখনও ঐ আঘাতের প্রথম ঝোঁকটা হজম করবার মতো মনের জোর আমার আর তৈরী হল না। তবে এটুকু হয়েছে যে তীব্র বেদনার বেগটা কেটে যেতে খুব বেশী দেরী হয় না। অদ্রের কাছ থেকে ঐ আঘাতটা পাবার পরদিনই আমি ছিট্‌কে বার হয়ে পড়েছিলাম। চলে গিয়েছিলাম হাইল্যাণ্ডের একটা গ্রামে। অদ্ভুত সুন্দর সে জায়গাটা! কী বরফ তুমি এখানে দেখছ, হাইল্যাণ্ড এখন কেবল বরফের মধ্যে ডুবে আছে। সব সাদা। নেই লোকের ভীড়। নেই কোন হট্টগোল। সামনেই অসীম বিস্তার সমুদ্র। আর সমুদ্রের ঠিক বুক থেকেই উঠে গেছে বিরাট উঁচু পাহাড়ের জমি। তার ওপর গড়ে উঠেছে ছোট ছোট লোকালয়। সেখানে গিয়ে পেলাম যেমন শীত, তেমনই আরাম। মনে যে বিশ্রী একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই শুকিয়ে গেল। সেখানে হঠাৎ দেখা হল আমার এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে। মেয়েটির নাম রোজ-মেরী। অক্স্ফোর্ডে আমাদের সঙ্গে ডিগ্রী কোর্সে পড়াশুনো করত। আসলে ওর নামটা ছিল মেরী। আর ফুটন্ত তাজা রক্ত-গোলাপের মত ওর চেহারা ছিল বলে ওকে আমরা ডাকতাম রোজ-মেরী বলে। ও এখন সেই গ্রামের একটা স্কুলের মিস্ট্রেস্। আমাকে পেয়েই ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। সেখানেই কয়েকদিন কাটিয়ে মেজাজটা তাজা করে এলাম। এই রোজ-মেরীর কাছ থেকেই শুনে এলাম জিমির সম্বন্ধে অনেক কথা। অক্স্ফোর্ডে জিমির সঙ্গে রোজ-মেরীর দিনকতক খুব জমেছিল। তারপর কী জানি কি কারণে সে সম্বন্ধে আবার একসময়ে ভাটাও পড়ে গিয়েছিল। বোধ হয় বুদ্ধিমতী মেরী আগেই চিনতে পেরেছিল জিমির আসল চেহারাটা।

—এই মেরীর কাছ থেকেই খবর পেলাম জিমির এন্‌গেজমেন্টের। সেটা ঘটেছে গত বছর ইস্টারের ছুটিতে ব্রাইটনে। ঘটনার সময় মেরীও ব্রাইটনে ছিল দিনকতক। কাজেই ব্যাপারটার সব কিছুই ও জানে। কিন্তু জান বোধি, এই জিমি যার সঙ্গে আমি ক'বছর এক সঙ্গে এক ঘরে শুয়েছি, এক ক্লাসে পড়া-

শুনো করেছি—যাকে আমি বন্ধু বলে স্বীকার করেছি—যার নামে বডি ওয়ারেন্ট বার হলে আমি তাকে বেল দিয়ে নিজের টাকায় মামলা লড়ে তাকে নিশ্চিত জেল হওয়া থেকে বাঁচিয়েছি—সে আমার যা ক্ষতি করেছে তার পূরণ বোধ হয় সারা জীবনে হওয়া সম্ভব নয়—

বলে জ্যাক একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বললে, সে খবর পাবার পর আজ রাতে মাতাল অবস্থায় ওকে গলা টিপে খুন করাও আমার পক্ষে হয়তো পাপ বলে মনে হত না। কিন্তু না—ওকে আমার ক্ষমা করতে হবে। ওকে মেরে ফেললে ও জীবনকে ফাঁকি দেবে। ওরই জীবন ওকে তিলে তিলে পুড়িয়ে মারছে দেখতেই তো পাচ্ছ। আমি নিজে ওকে আর শাস্তি দেব না বোধি। শুধু ওর এই জ্বলুনির সঙ্গে জ্বলছে অপর কতকগুলি নির্দোষ প্রাণী। তাদের কী করে বাঁচাই বলত—

বলে জ্যাক নিজের মধ্যে ডুবে রইল কিছুক্ষণ।

একটু পরে পূর্বের আলোচনার রেশটুকু পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জ্যাক হো-হো করে হেসে উঠল। বললে, যত বাজে কথা আর বাজে চিন্তায় তোমার মন ভারী করছি বোধি। আজ রাতে তো আমার বসন্ত আবাহন করার কথা—

বললাম, স্প্রিং সম্বন্ধে গোটাকতক কবিতা শোনাবে তো ? তা নয় আরম্ভই কর—

জ্যাক মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, দূর, ঐ বহুবার আওড়ান পরের লেখা কবিতা তোমায় শোনাব কেন ? আজ শোন আমার জীবনের বসন্ত কাহিনী—ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললে, আজকে তোমাকে আমার কাহিনী শোনাবার উপযুক্ত সময়। তবে ভেবো না এ সব কথা তোমাকেই শোনাচ্ছি। আমি নিজেই আমার অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে যাচ্ছি—করতে ভাল লাগছে বলে। তুমি যেন আড়ি পেতে শুনে যাচ্ছ। মনে করতে চাচ্ছি আমার অতীত ভালবাসার ঘটনাগুলো। একটু আগেই বললাম না—যে আসল আনন্দ জীবনে আসে কদাচিৎ। তাই আজকে একটা গভীর আনন্দের ধাক্কা খেয়ে আমার মন পুরোনো আনন্দের সব টুকরোগুলো সঞ্চয় করতে চাচ্ছে গভীরে ডুবে। তার সঙ্গে অবশ্য আঘাতের আর বেদনার স্মৃতিগুলোও মনে পড়ছে। কিন্তু কী জান, আজ আনন্দের বানে সে সবগুলোও মনে হচ্ছে যেন আনন্দেরই ঢেউ। কাজেই আজ আমার কাছে আনন্দ-বেদনার মূলগত তফাৎ আমি খুঁজে পাচ্ছি না বোধি।

জ্যাকের ভেতর কোথায় যেন আজ একটা বাঁধ ভেঙে গেছে মনে হল। নিজের কথা বলবার জন্যে এত আকুল ওকে কোনদিন আমি দেখেছি বলে মনে হল না। আমি কেবল চুপ করে বসে শুনতে লাগলাম ওর কাহিনী।

॥ ২৭ ॥

জ্যাক বলতে লাগল।

আজ পর্যন্ত আমার জীবন যত দূরে এগিয়েছে তার সমস্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি বোধি, সেই ছোট্টবেলা থেকে একটা গভীর তৃষ্ণা আমার বুকে রয়ে গেছে ভালবাসবার জন্যে—ভালবাসা পাবার জন্যে। এর কারণ আমি ছোটবেলায় মার মুখ দেখি নি—

জ্যাকের জন্মাবার পরই তার মা মারা যায়। বাবা ছিল গাঁয়ের ডাক্তার। তাকে সারা দিন ব্যস্ত হয়ে রুগী দেখে বেড়াতে হত। কাজেই ছেলের দিকে কোন দিন সে মন দিতে পারেনি। পরে অবশ্য তার নজর তার উপর পড়েছিল। তাতে ফল হয়েছিল সাংঘাতিক।

গাঁয়ের এক বুড়ি দাই জ্যাককে মানুষ করেছিল। সে বুড়ির তিন কাল গিয়ে এক কালে উপস্থিত। জীবনের তিনটে কাল তার কেটে গিয়েছিল একদম শুকনো। একে তো সে আইবুড়ি তার ওপর তার তিনকুলে কেউ ছিলও না। সস্তায় শুধু খোরপোষের বন্দোবস্তে সে রাজী হয়েছিল তাকে দেখাশুনো করতে। জ্যাকের বাবা আবার প্রতিটি পেনীকে নেড়েচেড়ে গুনত বলে—সস্তার দিকে তার প্রীতি ছিল অসীম।

যে কোন দিন ভালোবাসা পায় নি—তার পক্ষে কাউকে কিছু দেওয়া একেবারে অসম্ভব। বুড়ি দাই তার দিনের কাজ শেষ করত কোন রকমে। আর জ্যাককে মাঝে মাঝে বেদম প্রহার করত। ক্ষিদেয় মরে গেলেও তার কাছ থেকে খাবার পাওয়া ছিল এক বিষম ব্যাপার। একটু বড় হতেই জ্যাক খুব হুঁসিয়ার হয়ে গিয়েছিল এসব ব্যাপারে। ভুলেও খেতে চাইত না—যতক্ষণ খাবার টেবিল সাজিয়ে ডাকা না হত। আর খেতে বসে সাপ খাচ্ছে—কি ব্যাঙ খাচ্ছে—এসবও দেখত না। তার বাবাও ছিল এসব সম্বন্ধে একদম উদাসীন। সে কেবল বুঝত কাজ আর পয়সা। আর অবসর সময়ে স্বপ্ন দেখত অস্ট্রেলিয়াতে প্রচুর জমি-ক্ষেত-খামারের। এর ফলে বাবার পাশের ঘরটিতে বাস করেও তার বাবাকে সে চিনতে পারে নি বহুদিন।

এদিকে গাঁয়ের ডাক্তারের মান-সম্মান জ্ঞান টনটনে। হাইল্যাণ্ডের পাড়াগাঁ। তার অধিবাসীরা বেশীর ভাগই নিতান্ত সাধারণ গেরস্ত। একটু আধটু চাষ আবাদ, হাঁস মুরগী আর গরু রেখে তাদের দিন চলত। কেউ কেউ আবার স্রেফ কিছু করত না। গ্রীষ্ম এলে বড়লোকদের যখন শীকারে ঝোঁক চাপত তখন তাদের সাহায্য করতে যেত। তাদের বলত 'ঘিলি'। কেউ বা যেত স্যামন শীকারে। জ্যাকের বাবা তাদের দুচোখে দেখতে পারতো না। বলতো,

অকেজো ভবঘুরে। তাই জ্যাকের বাড়ি থেকে বার হওয়া, সাধারণ লোকেদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেশা বারণ ছিল। সে একলা বন্দী থাকত বাড়িতে আর তেতো ওষুধের মত সহ্য করত বুড়ি দাইয়ের সঙ্গটা। ওষুধে তবু একটা উপকার হয়। ভিতরের ব্যায়রামটা সারে। তার ভিতরে কিন্তু ব্যায়রাম দিন দিন বেড়েই চলছিল। অনেক দিন সে ভেবেছে ও রকম একটা বন্দী জীবনের মধ্যে তার কাঁচ বয়সের কটা বছর শুধু বরবাদই হয়ে গেল। তার মন এক এক সময়ে এ চিন্তায় জ্বালা করত।

জ্যাক বললে, আজ মনে হয় ওরকম করে আটকে না থাকলে আমার চোখও কী কোন দিন ভিতরে দেখবার দৃষ্টিটুকু পেত? সত্যি হয়েছিলও তাই। চার দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আমার দৃষ্টি চলে যেত মনের গভীরে। অতটুকু বয়স থেকেই আমি মন চিনতে মন দেখতে শিখেছিলাম সম্পূর্ণ নিজে নিজেই। বাইরে যখন যেতাম—তখন শুধু আপন মনেই ঘুরে বেড়াতাম জঙ্গলে অথবা নদী ঝরণার পাশে পাশে। একটু বেশী বয়সে দিনের পর দিন কাটিয়েছি আমি পাহাড়ে চড়ে আর লাল হরিণের দলের পিছনে ঘুরে। অবশ্য বাবা এসব টের পেলে আমাকে রক্ষা রাখতো না। কিন্তু একটা তীব্র অভাব বোধ যখন ভিতরে ভিতরে ধুঁইয়ে উঠে আমাকে খুব বেশী কাহিল করে তুলত তখন বাইরের ডাকটা শুনতাম আরও জোরে। আর তখন বার হয়ে পড়তাম দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। অসংখ্য গাছপালায় ভরা নিস্তব্ধ নির্জন জঙ্গলগুলোকে আমার মনে হত যেন রূপকথার রাজত্ব। ওদের মধ্যে আমি খুঁজতাম আমার মনের সান্ত্বনা। একটা অদ্ভুত ভাব জাগত আমার মনে। জঙ্গলে ঢুকলেই আমার মনে হত সেখানে যেন আমি একটা কিছু পেয়ে যাব—যে পাওয়াটা আমার কাছে হবে অপার আনন্দের—

একদিন সে পেয়েও গেল। তখন তার বয়স হবে বছর আষ্টেক। বাড়িতে কী একটা অপরাধ করার জন্যে মার খেয়েছিল প্রচণ্ড। তাই শীতের রাতে বিছানা ছেড়ে সে বার হয়ে পড়েছিল জঙ্গলের পথে। পা দুটো অসাড় হয়ে পড়েছিল। তবুও সে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলছিল তার ভিতরকার জ্বালায়। কিছুদূর যেতেই অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেয়ে যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একটা খাদের মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা বিকট দৈত্য এসে তার মাথায় মারল এক লাঠি। যন্ত্রণায় সে চেঁচিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সারা দুনিয়াটা তার চোখে লোপাট হয়ে গেল। তার সমস্ত শরীর যেন হিমে জমে আসতে লাগল। একটু পরে তার বোধ হল জঙ্গলে একটা পরী নেমে এল। তাকে চোখে সে দেখতে পাচ্ছিল না বটে। তবে সমস্ত দেহ মন দিয়ে যে অনুভব করছিল তার উপস্থিতিটা। পরী অদ্ভুত সুন্দরী। মনে হচ্ছিল তার রূপে অন্ধকার জঙ্গলটা আলো হয়ে উঠেছে। সে ঘুরতে ঘুরতে

এসে তার কাছেই পেঁছে গেল। তাকে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে পরম যত্নে তার দু হাত দিয়ে তাকে বুকে উঠিয়ে নিল। তারপর উড়ে চলল মেঘের ভিতর দিয়ে। নিশ্চিন্ত আরামে সে শুয়ে রইল তার নরম বুকে।

চোখ চেয়ে সে ভারী অবাক। স্বপ্নে দেখা সে পরীকেই দেখল চোখের সামনে। একমাথা সোনালী ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। ডাগর ডাগর চোখে তার উৎকণ্ঠার দৃষ্টি। তার মুখের ওপর চোখ দুটি রেখে ঝুঁকে পড়ে সে তাকে দেখছে। তার চোখের যে দৃষ্টি তা তার আগে কখনও জ্যাক দেখে নি। সে ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভূতি। জ্যাক তার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে শুধু সেই চোখের দৃষ্টিটা তখন দেখছিল অপলক দৃষ্টিতে।

জ্যাক বললে, সে মুহূর্তে যে কথাটা আমার মনে হয়েছিল—আজ এতদিন পরও তা আমার মনে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমার মনে হয়েছিল—জেগে ঘুমিয়ে, জ্ঞানে অজ্ঞানে অহরহ আমি যা চেয়েছি এ হল তাই। একে পাবার জন্যেই আমার যত অভাববোধ।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক অনুভব করল তার গায়ে মাথায় অসহ্য ব্যথা। আস্তে আস্তে মনে পড়তে লাগল সব কথা। সে অনেকক্ষণ পরে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে ?

তাকে কথা বলতে দেখে মেয়েটির মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, আমি লিজা।

বলেই তাড়াতাড়ি বার হয়ে গেল। একটু পরেই একটা লোককে সঙ্গে এনে হাজির। জ্যাক তাকে দেখেই চিনল সেই কাঠুরেটা। জঙ্গলের ভিতরে প্রায়ই ওকে কাঠ চিরতে সে দেখেছে এখানে সেখানে। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সে শুয়ে আছে একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ির মধ্যে এদেশে যাকে বলে লগ কেবিন। সে বুঝল মেয়েটি কাঠুরের মেয়ে।

কাঠুরে বুড়ো মেয়েকে জ্যাকের কাছে বসিয়ে ব্যস্ত হয়ে সরে পড়ল। মেয়েটি তার পাশে বসে তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। জ্যাক তার একখানা হাত ধরে রইল প্রাণপণে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—তোমার বাড়ি কোথায় ? অত রাতে এই জঙ্গলেই বা কেন এসেছিলে, বলত ?

জ্যাক বললে, আমি কিছু বলব না—

মুখ ফিরিয়ে সে শুয়ে রইল। খানিক পরেই সে দেখে তার বাবা গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে ঘরে ঢুকছে। দেখেই তো তার নাড়ী ছাড়বার উপক্রম। ডাক্তার কট্‌মট্‌ করে ছেলের দিকে একবার তাকাল। চারদিকে ভাল করে পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে বললে, হুঁ।

কাঠুরেকে ডেকে একটা কাঠের স্ট্রেচার তৈরী করতে বললে। তাতে জ্যাককে শুইয়ে বাড়ি নিয়ে আসা হল। আসবার আগে কেবল দেখতে পেল লিজা

ব্যাকুল হয়ে তার বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করল—খোকা বাঁচবে তো? বিশেষ কোথাও লাগে নি তো কিছু—

বাবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল—নাঃ বিশেষ কিছু নয়। আর ছেলে যখন আমার সে ভাবনাও আমার। তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না—

কিন্তু লিজার উদ্বেগ মোটেই কমে নি। জ্যাক যতদিন বিছানায় পড়ে ছিল, সে রোজ একবার দুবার আসত তাকে দেখতে। মাঝে বাবা তাকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে আসত লুকিয়ে লুকিয়ে। কখনও দুপুরে, কখনও রাতে, কখনও বা খুব ভোরে আলো ফোটবার আগেও।

জ্যাক বিছানায় শুয়ে তার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করত। দিনরাত তাকে দেখতে চাইত। আর ধমক খেত তার বুড়ি দাইয়ের কাছে। সে এলে তার মনে হত যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। লিজা ছিল জ্যাকের থেকে বয়সে অনেক বড়। কিন্তু জ্যাকের কেমন যেন সময়ে সময়ে মনে হত সে তারও সমবয়সী। তার চোখ, তার হাসি, তার কথা বলার ধরনগুলো পর্যন্ত সে প্রাণপণে গিলত। তার কাছে আবদার করত রাতে তার কাছে শুয়ে থাকবার জন্যে। বেশীর ভাগ সময়েই অবশ্য সে এড়িয়ে যেত তবে মাঝে মাঝে রাতেও সে লুকিয়ে এসে জ্যাকের কাছে থাকত। একদিন সে ধরা পড়ে প্রচণ্ড ধমকানি আর মারও খেলো বুড়ী দাইয়ের হাতে। তবুও সে জ্যাকের কাছে আসা ছাড়ে নি। এইভাবে লিজা আর জ্যাকের মধ্যে একটা গভীর সম্বন্ধ তৈরী হয়ে গেল।

জ্যাকের সেরে উঠতে সেবার বেশ কিছুদিন সময় কেটে গেল। সেরে ওঠার পর লিজা আর তাদের বাড়ি আসত না। সে যেত তাদের বাড়ি লুকিয়ে চুরিয়ে। বাড়িতে ভাল খাবার হলেই সে পকেটে লুকিয়ে নিত লিজার জন্য। পয়সা সে যা পেত—তাতে কিনত লিজার জন্যে টফি, চকোলেট। লিজা ছিল চকোলেটের প্রিয়-ভক্ত।

এমনভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। জ্যাকও কৈশোরে এসে পড়ল। বলতে গেলে কৈশোর তার এসেছিল তাড়াতাড়ি। কৈশোরে ছেলেরা স্বপ্ন দেখে—প্রথম প্রেমের স্বপ্ন। স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি—ঐগুলো ঐ কৈশোর থেকেই মনের জারক রসে প্রথম পাক হতে শুরু করে। তার থেকে তৈরী হয় প্রেমের উপাদান—যৌবনের প্রাণশক্তি। লিজার ওপর তার অন্ধ আকর্ষণ ক্রমশঃ রূপ নিতে লাগল সনাতন প্রেমের আকারে। তখন অবশ্য জ্যাক অত কিছু বুঝত না।

জ্যাকের যখন বার বছর বয়স, তখন লিজাকে একদিন সে বলেছিল—তোমাকে আমার চাই-ই। তোমায় না হলে আমার সব মিথ্যে।—

লিজা তার উত্তরে শুধু একটু হেসে—তার গালে একটু টোকা দিয়ে বলেছিল,—দুষ্টু ছেলে কোথাকার। আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে—

সে কথার উত্তর জ্যাক সেদিন দিতে পারে নি।

কিছুদিনের মধ্যেই লিজার বাড়িতে এল ওর দূর সম্পর্কের ভাই। কোথায় যেন কলে কাজ করে। লক্কা পায়রার মতো চেহারা। মুখে বড় বড় কথা। সে একদিন লিজাকে ইনভার্ণেসে নিয়ে গেল সিনেমা দেখাতে। কিছুদিন ছুটি নিয়ে সে ওদের বাড়িতেই রয়ে গেল। কাজের মধ্যে তার ছিল বন্দুক নিয়ে খরগোস শীকার করা। আর দিবারাত্র সে লেগে থাকত লিজার পেছনে। লিজাও তার নানান বাহাদুরীর গল্প শুনে বেশ খানিকটা মুগ্ধ হয়েছিল তার শহুরে ভায়ের উপর। তাই জ্যাকের উপর ইদানীং তার মনোযোগেরও অভাব হচ্ছিল বেশ কিছুটা।

একদিন সেই লোকটা জ্যাককে ধরে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে—এই ছোকরা, লিজার সঙ্গে তোর এত ভাব কিসের রে?

জ্যাক স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতির। সে কথা বললে না। লোকটা তাকে শাসানির সুরে বললে, ফের যদি লিজার কাছে আসবি তো তোর একদিন কী আমার একদিন।

জ্যাক রাগের চোটে তার হাতে একটা জোর কামড় বসিয়ে দিল।

পরের দিন সে দেখল লিজার মুখ ভার। তার দেওয়া চকোলেট সে নেয় না। অনেক খোসামুদির পর সে বললে, আমার ভাইয়ের হাতে অসভ্যের মতো যে কামড় দেয় তার সঙ্গে আমি কথা কই না।

অনেক কষ্টে সে যাত্রা মাফ চেয়ে জ্যাক রেহাই পেল বটে। কিন্তু লিজার ভাইটা আবদার ধরল—মাফ সে তাকে করতে পারে যদি সে তাকে তার নতুন কেনা গোল্ডেন ল্যাবরেডরের বাচ্চাটা দিয়ে দেয়। কুকুরটা জ্যাক নতুন কিনেছিল অনেক শখ করে। তার বাবার এক জানাশোনা লোক খুদ ল্যাবরেডর থেকে সেটা তার জন্যে জোগাড় করে পাঠিয়েছিল। সেটা দেবার কথা উঠতেই জ্যাকের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। লিজাকে একবার আড়ালে ডেকে সে জিজ্ঞেসা করল—কুকুরটা তোমার ভাইকে দিলে তুমি খুশিও হও—

লিজা অম্লানবদনে বললে, নিশ্চয়ই—

জ্যাক আর কোন কথা না বলে সেইদিন কুকুরটা দিয়ে দিল লিজার ভাইকে। তার জন্যে বাবার কাছে যা প্রহার খেল তাতে তিনদিন বিছানা ছেড়ে সে উঠতে পারল না। গায়ের ব্যথা একটু নরম হতেই সে আবার গেল লিজাদের বাড়ি। জঙ্গলের পথে তাকে আসতে দেখেই লিজা আর তার ভাই দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে কাঠের ঘরের ভিতর ঢুকে জ্যাকের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে খিল এঁটে দিল।

জ্যাক বললে, বোধি তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না আমি তখন কী আঘাতটা পেয়েছিলাম। সে মারের কাছে বাবার দেওয়া কঠোরতম শাস্তিও কিছু না। প্রায় সাতদিন আমার কেটে গেল শুধু বিছানায় শুয়ে। খাওয়া-

দাওয়া খেলা-ধুলো বেড়ানো সব আমার চুকে গেল। খালি মনে পড়তে লাগল বিশেষ মুহূর্তে দেখা লিজার সেই চোখদুটো। কই তার মধ্যে কোন ছলনা তো ছিল না। এক একবার মনে হয়েছে আমি ঠকে গেলাম। আমার এই বুকভরা ভালবাসার কথা জেনেও লিজা কেমন করে আমাকে অমন ঠকাতে পারল। অভিমানের চেয়েও মনে তখন ভরে উঠেছিল তীব্র গ্লানি এই ছলনার বিরুদ্ধে। আবার ভাবতাম—হয়তো ছলনা ওটা নয়। কিন্তু সেটা কী তা বোঝবার বয়স তখন আমার হয় নি। লিজার সেই দুটো চোখ আমার মনে পড়লেই তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতাম জঙ্গলের দিকে যাবার জন্যে। লিজার সঙ্গে যদি একটু দেখা হয়ে যায় সেই আশায়। তবে সেই বয়সেই জিদও আমার কম ছিল না। আমি জোর করে নিজেকে বন্দী করে রাখতাম আমার ঘরের ভিতর।

কিছুদিন পরে জ্যাক শুনল—সেই ছেলেটার সঙ্গে লিজা নাকি আবার-গেল্ডিতে চলে গেছে কাজকর্ম করবার জন্যে। তার বাপ তাতে মত দিয়েছে। এতে জ্যাকের শাপে বর হল। আবার সে জঙ্গলে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু লিজার সেই অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তার মন থেকে মুছল না। সে দুটোর কথা ভাবলেই তার বিরুদ্ধে আর কোন যুক্তিই সে খুঁজে পেত না। তারও কিছুদিন পরে তার বাবা তাকে পাঠিয়ে দিল এই আবার্ডিনে পড়াশুনো করবার জন্যে।

জ্যাক একটু চুপ করে দম নিল। আমি উঠে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের আগুনটা খুঁচিয়ে তাতে চাপিয়ে দিলাম আরও কয়েক টুকরো কয়লার চাঁই।

হঠাৎ জ্যাক হো-হো করে হেসে উঠে বললে, কী হল তোমার বোধি? মুখখানা অমন করুণ করলে কেন? আরে ছেলেবেলাকার প্রথম প্রেম ক পার্সেন্ট টেঁকে বল? আর তা ছাড়া এই প্রথম প্রেম সম্বন্ধে আমার একটা অদ্ভুত ধারণা আছে।—

—কী রকম—

জ্যাক হাসতে হাসতে জবাব দিল—প্রথম প্রেম যাদের ব্যর্থতায় পরিণত না হয়েছে তাদের কখনও চোখ ফোটে না। জীবনকে তারা দেখতেই শেখে না। ঐ বেদনাটুকুই হল ডিম ফেটে যাবার বেদনা। মানুষের মানসলোকে ভূমিষ্ঠ হবার প্রথম বেদনা।

এমন সময়ে দরজায় একটু টোকা দিয়ে আণ্টি জেন ঘরে এলেন।—ও ডিয়ার, ডিয়ার, এখনও তোমরা ঘুমোও নি। তা দাঁড়াও তোমাদের একটু কফি করে দিই।

বৃদ্ধা চটপট চলে গেলেন। একটু পরেই শুনলাম প্যান্ট্রি থেকে সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠছে জল গরম করার।

জ্যাক বলতে লাগল, আবার্ডিনে এসে আমার পরম লাভ হল বোধি। বাবা

ভর্তি করে দিয়েছিল একটা কনভেন্ট স্কুলে। খুব বেশী পবিত্র জীবন আমার পক্ষে দরকার ছিল। বাবা বোধ হয় ভেবেছিল ছেলেকে চার্চ মিনিস্টার করবে।

এই কনভেন্টে এসে ফাদারের সঙ্গে জ্যাকের পরিচয় হল। ফাদারের নাম ডেভিস। জাতে আইরিশ। তিনি স্নেহ দিয়ে জ্যাককে কাছে টেনে নিয়েছিলেন পরম বন্ধুর মতো।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন জ্যাকের পূর্ব ইতিহাসটা। ফাদার তাকে একদিন কোলের কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, জ্যাক, তুমি কষ্ট পাচ্ছ বটে তবে আমি দেখছি তুমি মহৎ হবে। ভগবান যিশু বলেছেন, ভালবাসতে গেলে ত্যাগ করতে হয়—দিতে হয়। তা সে পরীক্ষায় তো তুমি উৎরে গেছ জ্যাক। এই দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষই পাবার জন্যে লালায়িত। একটুকরো জিনিসে মানুষের কত মোহ—আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে সে আর কিছু চায় না। সেই দুনিয়ার মানুষ হয়ে তুমি দিতে শিখেছ একি কম কথা?

ঠিক ঐ রকমই একটা কথা বলেছিলেন প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর—অক্সফোর্ডে। উনি পরীক্ষার ছলে জ্যাককে বলেছিলেন, ভালবাসাটা বড় কথা নয়—কতটা ছাড়তে পারবে বলত জ্যাক? প্রেমের মাপকাঠি হল ঐ দিতে পারার ক্ষমতা।

আবার ঘরে টোকা পড়ল। আন্টি ঘরে ঢুকলেন কিছু স্যাণ্ডউইচ আর কফির পট ট্রের ওপরে সাজিয়ে নিয়ে। সেটা সামনে রেখে একটু হেসে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

জ্যাক তাঁর যাবার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। বললে, এই দ্যাখ। দিতে পারার কত আনন্দ এই দেখলে তো? সারা জীবনে বোধ হয় এই বুড়ির পাওনা কিছু হয় নি। কিন্তু আমাদের এটুকু সেবা করেই উনি কত খুশী। অবাক লাগে আমার ভাবতে। দুনিয়ায় এরকম ছোটখাট অথচ কত মহৎ ভালবাসা এদিক ওদিক লুকিয়ে রয়েছে। আমরা এমন অধম, এমন চোখ বোজা জীব—যে সেগুলোকে একবার চোখ খুলেও দেখি না।

বললাম, একথা তোমার একটুও মিথ্যে নয় জ্যাক। কটা পয়সাই বা দিই বল না—সেটা কেবল নামমাত্র। এঁরা দু বোনে আমাকে যেটুকু দেন সে পরিমাণে ধরতে গেলে আমি তো এঁদের কিছুই দিই না। অথচ এটুকু করেই এঁদের আনন্দ।

জ্যাক সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে একবার কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নিল। বললে, তবে একথাও আমি হলপ করে বলব—এদের মতো জীব কিন্তু এদেশে খুব বেশী তুমি পাবে না বোধ। তুমি নিতান্তই ভাগ্যবান তাই এমন বাড়িতে থাকতে পেয়েছ—

জ্যাকের কথার পিঠোপিঠি আমার মনে পড়ল—সাউথ কন্স্টিটিউশন স্ট্রীটের

মিসেস মরিসনের কথা। কিন্তু সে কথা আর তুললাম না। শুধু বললাম, হ্যাঁ সে কথা আমি জানি।

জ্যাক আর আমি নিস্তব্ধ রাতে ঘরের মধ্যে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলাম স্যাণ্ডউইচে কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে। জ্যাক যেন আজ সব কিছু উজাড় করে দিতে চায়—তার সব কিছু অতীত ইতিহাস। আমি শুনছি—কিছু ভাবছিও। আমাকে এমনভাবে শ্রোতা করে নেবার কারণটাও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

হঠাৎ জ্যাক আমার সেই চিন্তাটাতেই ঘা দিল। বললে, আজ এই রাতে আমি অনেকদিন পরে অকুণ্ঠ হয়ে উঠেছি। সান্নিধ্য একটা বড় কথা বোধি। তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি আমাকে তোমার কাছে অকুণ্ঠ হবার সুযোগ দিয়েছ। আর—বলেই একটু রহস্যভরা চোখ মুখের ভঙ্গী করে সেই রকম গলায় বললে, এমন ধৈর্যশীল সুন্দর ডাম্পিং গ্রাউণ্ডই বা কে হবে বল—? বলেই আবার হো হো করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম।

জ্যাক বললে, ফাদারের অপূর্ব স্নেহ আর বন্ধুত্ব পেয়েও কিন্তু আমার স্বভাবের সেই যে অভাববোধটা সেটা একেবারে মরে নি।

সেটা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত আমার বুকের মধ্যে। তারই তাড়ায় একদিন আমি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলাম।

আমি এবার হাসতে হাসতে বললাম, কনভেণ্ট থেকে পালিয়ে লণ্ডনে চলে গেলে তো—

জ্যাক অবাক বিস্ময়ে বললে, তুমি একথা কোথা থেকে জানলে—

—জিমির কাছে তোমাদের ছেলেবেলার গল্প শুনেছিলাম একদিন—

—জিমি তোমাকে আমার জীবনের আর কোন কথা বলেছে—

—তোমার আর ভীনার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আমি কিছু শুনেছি জিমির কাছে।

জ্যাক খুব চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, ভীনার গল্প শুনেছো ? জিমি নিশ্চয়ই আমাকে সেখানে যৎপরোনাস্তি দুশ্চরিত্র প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে—

তারপর একটু গম্ভীর থেকে বলে উঠল, ভীনার সম্বন্ধে তুমি যাই শোন না কেন, একটা কথা তোমাকে আমার জানান দরকার। ভীনাকে আমি ভালবেসেছিলাম—

ভীনা কোর্টে সাক্ষ্য দেবার পর জ্যাক তার বাবার সঙ্গে সুবোধ বালকের মতো বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি থেকে সে বার হয়েছিল লেখাপড়া শেখবার জন্যে। এ কবছরে তার একেবারেই কিছু হয় নি তা নয়। বিশেষ করে পড়াশুনোতে জ্যাকের বরাবর একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য থেকে গিয়েছিল। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে জ্যাক যে শিক্ষা পেল তার তুলনায় সে সব কিছুই নয়।

বাড়ি ফিরল সে তার সমস্ত দুষ্কৃতির বোঝা মাথায় নিয়ে আর বুকে নিয়ে দুনিয়ার সমগ্র নারী জাতটার ওপর তীব্র ঘৃণা, জঘন্য বিদ্বেষ।

বাড়িতে এসে কিন্তু তার মোটামুটি বেশ ভালই লাগল। সে দেখল বাড়িটা একেবারে বদলে গেছে। তার বাবার অস্ট্রেলিয়াতে সম্পত্তি হয় নি বটে কিন্তু সম্পত্তি হয়েছে দেশেতেই। একটা প্রকাণ্ড ফার্ম-হাউস করেছে বাবা। সেখানে অনেকগুলো ঘোড়া, গরু, ভেড়া আর হাঁস মুরগী থাকে। তাদের আস্তানাগুলো ঘিরে কাঠের ছোট ছোট ঘর। মাঝখানটাতে একটা বড় ফাঁকা জায়গাতে যব, গম আর ওট কেটে এনে গাদা দেওয়া হয়েছে। সেখানেই সেগুলো ঝাড়া বাছা হয়। কাঠের কুঠরীগুলোতে থাকে ফার্ম-হাউসের কর্মচারী জনকয়েক লোক। তারই একটা কুঠরী খালি করে তার বাবা তাকে সেখানে ঢুকিয়ে দিল। এই ফার্ম-হাউসের পিছনে তাদের আসল বাড়ি। তার সেখানে ঢোকবার আর কোন পথই রইল না। কিছুদিনের মধ্যেই তার বাবা তাকে নিয়ে গিয়ে ইনভার্ণেসের স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এল।

গোটা চারেক বছর তার লেগেছিল স্কুল থেকে বেরিয়ে আসতে। ইনভারনেসে স্কুলের পড়া শেষ করে সে আবার এসে তার কুঠরী আশ্রয় করল। এবার আর ততটা মুহ্যমান নয়। সময় কাটাবার উৎকৃষ্ট পথ সে এবার আবিষ্কার করেছে —পড়াশুনো করা। কিন্তু মনে মনে তখনও সে মেয়েদের ঘৃণা করে। তাদের এড়িয়ে যায় প্রাণপণে।

তার বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। তবে কথাবার্তা আদবেই হয় না। দীর্ঘ চার বছর পরে বাড়িতে এসে বাড়িটাও কেমন যেন একটু নতুন বলে মনে হয় তার। তাদের হাঁস মুরগীর খাটালটা যেন আরও একটু বড় হয়েছে। তার থাকার ঘরটাও বদলে গেছে। এবার তার ঘরটা হয়েছে তাদের পুরানো বাড়ির সামনেই। ঘরটা আগের ঘরের থেকে একটু বড় আর তাতে কিছু ফার্ণিচারও এসেছে।

একটা গোঁফওলা মেয়ে রোজ জ্যাককে খাবার দিতে আসত। সে বললে, কত্তা এবার খুব জাঁকিয়ে কারবার ফেঁদেছে। এ কবছর লাভ হচ্ছে খুব বেশী। বরাত ফেঁপে উঠেছে কত্তার—ঘরে বাইরে সব জায়গায়—

মেয়েটার মুখটা ছিল বিশ্রী। সে সেই কুৎসিত মুখে বিশ্রী রকম একটা হাসি হেসে একটা ইঙ্গিত করে বললে, কত্তার ঘরে এখন অনেক সুখ—

অবশ্য সে কথাটা তার বাবাকে দেখেই জ্যাকের মনে হয়েছিল। তার বাবার শরীরটায় যেন কেমন একটা অজানা নতুনত্বের ছাপ পড়েছে, যা কি না জ্যাক জীবনে কখনও দেখে নি। তবুও মেয়েটার কথাতে সে শুধু একটু গম্ভীর হয়ে বললে, তার মানে—

মেয়েটা তার কানের কাছে মুখ এনে কি একটা বলতে যাবে এমন সময় বাইরে

থেকে হৈহৈ করে শব্দ উঠল। চীৎকারের চোটে ফার্ম-হাউসটা তোলপাড় হয়ে গেল। কিছু বোঝবার আগেই জ্যাক মেয়েটাকে ঠেলে দৌড়ে বাইরে বার হয়ে এল। এসে দেখে খড়ের গাদায় কী করে আগুন ধরে গেছে। ফার্মের লোক-গুলো শুধু দৌড়োদৌড়ি করছে। কী করবে তার হদিশই পাচ্ছে না। এদিকে গাদার পিছনেই রয়েছে কয়েক শ ভেড়া আর হাঁস মুরগী। আগুন তাদের শেডের ভিতর ঢুকলে আর রক্ষে নেই। সেগুলো আগুন দেখে পরিত্রাহি চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। সে এক নারকীয় পরিস্থিতি। কাছে জল বালতির কোন রকম বন্দোবস্তই নেই। জ্যাক দেখল সে সব জোগাড় করে আগুন নেভাতে গেলে—আগস্ট-এর রোদ খাওয়া খড়গুলো ততক্ষণে হাঁস মুরগী ভেড়াগুলোকে শেষ করে ছাড়বে। একটা কথা তার তক্ষুনি মনে এল। গাদাটা ধরেছে সামনের দিকে। পিছনে রয়েছে তার হাঁস মুরগী ভেড়ার শেড। এখন যদি কোন রকমে পিছন থেকে গাদাটা সামনের উঠোনে ধসিয়ে দেওয়া যায় তবেই রক্ষে।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে গোটাকতক লোককে ধরে কথাটা বলে দলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিসে কি? কর্তা বাড়ি নেই। তারাও সমানে বালতি আর জলের খোঁজে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। আর জ্যাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল আগুনটা হুহু করে জ্বলে ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। একটু পরেই ওপারে গিয়ে পড়লে আর কিছু বাঁচান যাবে না।

সে আর দেরী করল না। এক দৌড়ে ফার্ম-হাউসের পিছন ঘুরে হাঁস মুরগীর ডেরাটাকে পিছনে রেখে গাদার পিছনদিককার গা বেয়ে উঠে যেতে লাগল ওপরের দিকে। ধোঁয়ায় মুখ চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। দম আটকে যাবার উপক্রম হল বারবার। আগুনের ফুলকিগুলো উড়ে এসে গায়ে পড়তে লাগলো। এমনিভাবে গাদার ওপরের দিকে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখে—তার সামনে সেটা জ্বলে যাচ্ছে হুহু করে। আর সেই আগুনের আলোয় তার চোখে পড়ল তাদের বাড়ির জানালায় একটি সুন্দরী মেয়ের কাঁচ ঢলঢলে মুখ। সে ছেলেবেলায় যে ঘরখানায় থাকত তার জানালার পর্দা সরিয়ে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে মেয়েটি এদিকে তাকিয়ে আছে। সে পায়ের ঘা দিয়ে গাদাটা ভেঙে দিতে দিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে আগুনের কুণ্ডের ভিতর গাদাটা তাকে নিয়ে ধ্বসে পড়ল। জ্ঞান হারাবার আগে কেবল ওদিকের জানালা থেকে নারীকণ্ঠের এক ভয়ার্ত চীৎকার তার কানের পর্দাটায় এসে বাজল।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন সে শুনতে পেল ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, পা দুটো একটু পুড়েছে বটে তবে অজ্ঞান হয়েছে শক্ পেয়ে। ভয়ের কোন কারণ নেই। এবার সে বুঝল তার পা দুটো এত ভারী কেন।

কতক্ষণ যে নিঃঝুম হয়ে সে পড়েছিল তা সে জানে না। মনের ভিতরে মাঝে

মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল—সেই কচি ঢলঢলে ছোট্ট মুখখানা। কে সে? ও বাড়িতে এরকম স্ত্রীলোক কে এলো?

শুয়ে শুয়ে কেবল ঐ এক কথাই বারবার তার মনে হচ্ছিল।

এক সময়ে গোঁফওলা মেয়েটি এসে তার কানে কানে জিজ্ঞেস করল—জেগে আছ কী?

সে জবাব দিল—হ্যাঁ।

মেয়েটি বললে, গিন্নী এসেছেন তোমায় দেখতে—

বলতে বলতেই সেই কচি ঢলঢলে মুখ, যাকে দেখে তার নিমেষে পদস্খলন হয়েছিল—ত্রস্ত হরিণীর পায়ে তার ঘরে এসে ঢুকল। বিছানার পাশে এসে নীচু হয়ে জ্যাকের মুখখানা দেখতে লাগল। হঠাৎ সে জ্যাকের হাতটা ধরে পরম খুশী হয়ে বলে উঠল, ঈশ্বর তোমায় বাঁচিয়েছেন। তুমি ভাল আছ তো?

মেয়েটির বয়স খুব যদি বেশী হয়তো বছর কুড়ি। নিষ্পাপ শিশুর সারল্য তার মুখে, চোখে, তার কথার ভঙ্গীতে। দুই গণ্ডে তার রক্তাভা। দেখে মনে হয় পাকা গিন্নীর লজ্জা ভাঙা অবস্থা তার এখনও আসে নি।

জ্যাক অবশ্য কথা তার সঙ্গে একেবারেই বললে না। জ্যাকের হয়ে জবাব দিয়ে যেতে লাগল গোঁফওলা মেয়েটি।

বললে, ভগবান বাঁচিয়েছেন বলে! নৈলে পুড়ে তো ছাই হয়ে যেত—তা ছাড়া ম্যাডাম, তুমিও চীৎকার করতে করতে এসে পড়েছিলে তাই। আমাদের ফার্মের চাষাগুলো তো আর মানুষ নয়। হয়তো জ্যান্ত ছেলেটা পুড়ে মরত—আর তারা হৈহৈ করতে করতে দৌড়ে বেড়াত।

গিন্নী কথাটা শোনার পর থেকে জ্যাকের সমস্ত কৌতূহল সমস্ত হৃদয়ের আবেগ গুটিয়ে এক জায়গায় জমা হয়ে গিয়েছিল। তাহলে কী তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। ঐ ষাট বছরের বুড়ো লোক বিয়ে করেছে এইটুকু একটা কচি মেয়েকে? আশ্চর্য! সে ভেবেই পেল না যে তার বাবার ওপর রাগ করবে না অভিমান করবে।

মেয়েটি আস্তে আস্তে হাত রাখল জ্যাকের কপালে। জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কী—

জ্যাকও গম্ভীর গলায় বললে, জ্যাক—

নামটা শুনে মেয়েটির সুন্দর ভুরু দুটো ঈষৎ কুঁচকে উঠল। সে তার কপালের কাছটাতে কী যেন দেখতে লাগল। সেই যে ছেলেবেলায় জঙ্গলে পড়ে গিয়ে তার কপালটা কেটে গিয়েছিল সেই দাগটার ওপর বারবার তার নরম আঙুলগুলো খেলা করে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তার সব রকম তদারক সেরে সে উঠে পড়ল।

তার আধঘণ্টা পরেই কোথা থেকে লোকেরা একটা স্ট্রেচার এনে হাজির ক

গিন্নীর আদেশ জ্যাককে ফার্ম-হাউসে না রেখে বাড়ির ভিতর রাখতে হবে। সবাই মিলে তাকে ধরাধরি করে, সে যে ঘরটায় ছেলেবেলায় থাকত সেইটাতে এনে শুইয়ে দিলে।

ঘর থেকে লোকগুলো বার হয়ে গেলে গিন্নী ঘরে এল। খুশী ভরা মুখ। জ্যাক কিন্তু ওসব দেখেও দেখছে না। চুপচাপ শুয়ে আছে। গিন্নী বললে, কী জ্যাক, এ ঘরটা চিনতে পার—

বুকের ভিতরটা জ্যাকের ছ্যাঁৎ করে উঠল। তবুও মুখে সে বললে, না।

গিন্নী একটু অবাক হল এবার। কিন্তু ঘাবড়ে না গিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে উঠল, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। দেখত এই ফটোটা কার—

বলে জ্যাকের ছোটবেলাকার একটা ফটো বার করে তার সামনে ধরল। বললে, কপালের কাটা ঘা আর তার চোখের চাউনী তো আর বদলাবার নয়। বয়সে আর দেহে তুমি বেড়েছ বটে—ভিতরে একটুও পাল্টাও নি।

জ্যাক চমকে উঠে বললে, সে কি—

গিন্নী মিষ্টি হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ। এই দেখ না কী রকম ছেলেমানুষ তুমি। নৈলে চট্ করে অমন মিথ্যে কথা আমার সঙ্গে বলতে না। এই ঘরটা তুমি চেন না—

গিন্নীর আর কোন কথা শোনবার আগেই সে বালিশে মুখ গুঁজেছে। গিন্নীও এসে তার মাথাটা দুহাতে টেনে তুলল। বললে, দেখি। এই তো লক্ষ্মী ছেলে। বলত আমি তোমার কে হই ?

জ্যাককে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই খিলখিল করে হেসে বলে উঠল, আমি তোমার মা। বিশ্বাস হয় না ? তবে দেখ তোমার ছোট্ট বোনটিকে দেখাই—

একটুখানির জন্যে বাইরে গিয়ে এই বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ের হাত ধরে সে ঘরে এসে ঢুকল।

মেয়েটির মুখের ওপর দিকটা ঠিক তার বাবার মতো।

জ্যাক বললে, বোধি, জীবনে সেদিনকার মতো অমন আনন্দ কম পেয়েছি। আমি সে মুহূর্তে আমার বয়েস ভুলেছি—আমার বিগত কটা বছর জীবন থেকে উপড়ে ফেলে দিয়েছি। আমি তখন ভেবেছি গত দীর্ঘ আট দশ বছর যেন আমি ঘুমিয়েছিলাম। সেই ঘুমের মধ্যে আমি যেন একটা সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ঘুম থেকে উঠে মনে হচ্ছিল এই বাড়িতেই সেই মধুর শৈশব থেকে আবার আমার জীবনের শুরু। আমার বাবা, আমার মা, আমার ছোট্ট বোনটি, ঘরদোর, গাঁয়ের পথ, গাঁয়ের জঙ্গল, নদী—সব আমার কাছে পরম আদরের, পরম আনন্দের বস্তু—

সব পাওয়ার মত্ততায় জ্যাক কদিন মসগুল হয়ে রইল। যদিও এখানে তার বাবা তার কোন পরিচয় দেয় নি—যদিও এরা কজনে আগে তাকে একজন খুনী বলেই জেনেছিল তবুও সেদিন সে বাধাটা যেন হঠাৎ টুটে গিয়ে তাকে এই বাড়ির একজন হবার পরিপূর্ণ গৌরবের অধিকারী করে দিল এই কচি ঢলঢলে মুখের মেয়েটি। কী ছোট্ট ওকে দেখতে—কিন্তু কি বিরাট ওর মনটা। ও সত্যি সত্যিই তো তার মা হবারই উপযুক্ত। ভাবতে লাগল জ্যাক।

মনটা মাঝে মাঝে জ্যাকের বিগড়ে যেত। তার বাবার ওপর ভীষণ রাগ হত। ঐ অতটুকু মেয়ের প্রতি এই অবিচার করার জন্যে তার বাবাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারত না। গোঁফওলা মেয়েটি প্রায়ই দেখতে আসত জ্যাককে। গিন্নী জ্যাকের ঘরে থাকলে সে একটা অপাঙ্গ-কুটীল দৃষ্টি তাদের উপর হেনে নিঃশব্দে বার হয়ে যেত।

অদ্ভুত এই ক্ষুদে মা। আচারে আচরণে জ্যাকের সঙ্গে সে যেরকম ভাবে চলতে শুরু করল, কে বলবে জ্যাক একজন উঠতি বয়সের যুবা। তার চার বছরের মেয়ে মেরী আর জ্যাক—তার চোখে যেন কোন তফাৎ নেই।

সব সময়েই কলকল করে ঝরে তার হাসির বন্যা। অনন্ত প্রাণের উৎস যেন লুকিয়ে আছে তাঁর বুকের মধ্যে। তা থেকে ঝরছে হাসি, আনন্দ, করুণা, যখন তখন অজস্র ধারায়। তবে সে উৎসও মাঝে মাঝে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত।

একদিন কী একটা কথায় জ্যাকের ঘরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি অজস্র হাসির কুল কুলুনীতে ভেসে যাচ্ছে, এমন সময় তার বাবা ঘরে ঢুকল। ব্যস্, কোথায় গেল সে হাসি, কোথায় গেল স্ফূর্তি, মেয়েটির চেহারাই গেল পালটে। একদম ফ্যাকাশে—শুকনো কাঠ।

গোঁফওলা মেয়েটি জ্যাককে বললে, ওমা, তুমি কর্তার আগের পক্ষের—তা এতদিন বল নি তো? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি। তা আর তোমার দোষ কী? তোমার বাপটা যা। নিজের ছেলেকে বাড়িতে এনে রেখে তাই নিয়ে গিন্নীর সঙ্গে নিত্যি ঠোকাঠুকি বাধাচ্ছে।

নতুন মা জ্যাককে বাঁচিয়ে দিলে। মেয়েদের ওপর যে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ তার মনে জমেছিল তা আস্তে আস্তে ঝেড়ে মুছে মনকে পবিত্র করতে লেগে গেল তার নতুন মা। অদ্ভুত ছিল তার মনের কথা বোঝবার শক্তি, এত তীক্ষ্ন অনুভূতি আর প্রখর বুদ্ধি ছিল মেয়েটির, যে বারবার জ্যাক অবাক হত তার কাজে-কথায়, আদর-যত্নে। অথচ পড়াশুনো সে করেছিল যৎকিঞ্চিৎ। চিরকাল পাড়াগাঁয়েই মানুষ। শহুরে সভ্য সমাজে মেশবার সুযোগই তার কোনদিন হয় নি। সে কিন্তু ধ্রুব বুঝেছিল জ্যাকের মধ্যে মেয়েদের ওপর ঘৃণা আর বিদ্বেষ কাজ করছে বিষক্রিয়ার মতো। এই সময়ে সে এসে হাজির হল তার

স্নেহ মমতা নিয়ে জ্যাকের জীবনে। বেঁচে গেল জ্যাক। মেয়েটি বলত, ঘা মানুষকে খেতেই হবে। তা পুরুষের কাছ থেকেই হোক আর নারীর কাছ থেকেই হোক। ঘরে ঝড় বিষ্টি লাগবে না, বরফ জমে চাল ধ্বসে পড়বে না—এ কটা লোকের ভাগ্যে হয় বল না। তাই বলে কি ঘরের চাল তুলবো না ? মেঘ বিষ্টির ওপর রাগ করে কী জুলাই আগস্টের রোদে-ভরা আকাশের প্রসন্ন দাক্ষিণ্যটুকুও হারাব ?

জ্যাক তাকে তার জীবনের সব ঘটনা একটু একটু করে খুলে বলেছিল। সব শুনতে শুনতে তার চোখ জলে ভরে উঠেছিল। শেষে চোখ মুছে জ্যাকের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল, তুমি আমার চেয়ে সত্যিই বড়—অনেক বড়। পরক্ষণেই জলভরা চোখ নিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলেছিল, তবুও আমি হলাম তোমার মা। তোমার গুরুজন। তোমার বাপের স্ত্রী। আমাকে সমীহ কোরে কথা বোলো। বুঝেছো ?

দিনে দিনে জ্যাকের নতুন মার সঙ্গে একটা বন্ধন গড়ে উঠল। সে বন্ধনটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বের। সেই মেয়েটি জ্যাককে যেমন বুঝতে পারত তেমনি জ্যাকও তাকে বুঝত জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু এক রাতে, জ্যাকের পায়ের ঘা তখনও পুরোপুরি শুকোয় নি—সেই অবস্থাতেই তাকে বাড়ি ছাড়তে হল।

মেয়েটির মেজাজ খারাপ হত কদাচিৎ। খারাপ হলেই জ্যাক টের পেত। তখন ওর মধ্যে একটা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ এসে আশ্রয় করত। তখন সে সমস্ত যুক্তির বাইরে চলে যেত। হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত ওর লোপ পেত। তখন ও নানা ছুতোয় আজে-বাজে তর্ক করত, ঝগড়া করতে পর্যন্ত ছাড়ত না।

একদিন ঐ রকম একটা বাজে তর্কের মধ্যে জ্যাকের নতুন মা তাকে হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ন ভাষায় আক্রমণ করে বসল। জ্যাক ওর স্বভাব খুব ভাল ভাবেই জানত তাই সে কিছুই মনে করে নি। হঠাৎ সে দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল। জ্যাক তাড়াতাড়ি উঠে বসে তার মাথাটা দুহাতে ধরে ফেলল। আর সেও ছোট্ট মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকানি দিয়ে জ্যাকের কাঁধের কাছে মুখ ঘসতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে দরজার পর্দাটা একটু ফাঁক হতেই সে দেখতে পেল গোঁফওলা মেয়েটা একটু কটু হাসি ছড়িয়ে চট করে সরে গেল। জ্যাক সেদিকে দেখেও দেখল না। নতুন মাকে সান্ত্বনা দিতেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ তার বাবা ঘরে এসে উপস্থিত। দৃশ্যটা দেখে তার চোখে কি বীভৎস যে একটা ভাব এল তা বলা যায় না। একটা বিকট চিৎকার করে তার বাবা বলে উঠল, দাঁড়া, আজ তোকে কুত্তার মতো গুলি করে মারব।

বলেই দৌড়ে অন্য ঘরে গেল রিভলবার আনতে।

মায়ের তখন কান্না শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে সে

জ্যাককে ঠেলে নিয়ে জানলা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল অন্ধকারে। বললে, পালাও—

জ্যাক এক দৌড়ে ফার্ম-হাউসের কুঠুরীতে এল। সেখান থেকে মোটা জামা কটা গায়ে এ'টে নিয়ে পায়ে গামবুট পরে কলার তুলে টুপীতে মুখ ঢেকে সেই রাতেই সরে পড়ল।

মা তার কপালে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করল আর সেই সঙ্গে তার মুখ চোখ ভিজে গেল চোখের জলে।

জ্যাক একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ছাড়ল। তার গলা ভিজে উঠেছে। চোখে সত্যি সত্যি জল এসে গেছে। বললে, এমন মেয়ে খুব কম দেখেছি বোধি। যারা না দেখছে তাদের বোঝানো যাবে না যে এই জাতের মেয়েরা কী পদার্থে তৈরী। ওকে না দেখলে নির্ঘাৎ আমার জীবনটা এক-চোখো হরিণের মত হয়ে যেত। স্ত্রী চরিত্রে কেবল অন্ধকারটাই চোখে পড়ত।

জ্যাক পালিয়ে এসে সে-রাতেই আবার্ডিনের ট্রেনে চেপে বসল। পায়ের ঘা তখনও ভাল শুকোয় নি। অতটা পথ দৌড়ে এসেছে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। গাড়িতে বসে সে দেখে ঘা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে জুতো ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় মাথার শির পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠছ। এদিকে ভোরের দিকে তেড়ে জ্বরও এসে গেল।

কোথা থেকে কী হল কিছু ভাববার আগেই সে ট্রেনের মধ্যে প্রায় বেহুঁস হয়ে পড়ল। আবার্ডিনের টিকিট দেখে একজন রেলের কর্মচারী তাকে স্টেশনে নামিয়ে ভর্তি করে দিলেন একটা হাসপাতালে।

জ্যাক আবার্ডিনের হাসপাতালে আছে। পায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে জ্বর ত্যাগ হয়েছে কয়েকদিন আগেই। শুয়ে শুয়ে কেবল চিন্তা করে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। আবার মনে হয় নতুম মায়ের কথাগুলোও। আকাশে মেঘ আছে, বিষ্টি আছে, তাবলে কি কেউ আগস্টের রোদ্দের কথা ভুলবে? তাদের আসতেই হবে। বিষ্টি বরফ যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি এই সূর্যের আলো।

আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে দোলায়মান মন নিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে সে। ভাবে সেরে উঠে করবেই বা কী?

এমন সময় একদিন সে দেখল তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ফাদার টিসল ডেভিস। ফাদার আরও বৃদ্ধ হয়েছেন। চুল দাড়িগুলো আরও পেকেছে। একটু ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি হয়েছে আরও অনেক বেশী নরম। সে দৃষ্টি যেন লোকের অন্তরে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারে। ফাদারের মুখেও এসেছে এক প্রগাঢ় প্রশান্তি। ফাদার জ্যাককে দেখেই এগিয়ে এলেন। ঠিক চিনতে পেরেছেন।

—আরে জ্যাক, তুমি এত বড় হয়েছ ? কোথায় ছিলে এতদিন ? এখানে এলে কী করে ?—ফাদার একরাশ প্রশ্ন করলেন।

জ্যাক সংক্ষেপে সব জানাল ফাদারকে। সে এতক্ষণ নজর করে নি। ফাদারের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন একজন তাল-ঢ্যাঙা ভদ্রলোক। কাকের বাসার মতো প্রকাণ্ড মাথায় শুকনো বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, পিছন দিকে উল্টে দেওয়া। বোধ হল তাতে চিরুণী পড়ে নি কোনদিন। পরণে একটা আধ-ময়লা ওভার কোট। তার বুকের কাছটা নস্যি পড়ে পড়ে ধুলিধুসর হয়ে গেছে। লোকটার চোখ দুটি কিন্তু অপূর্ব। এমন এখন-তখন জ্বলে-ওঠা আবার ডুবে-যাওয়া চোখ জ্যাক আগে আর কারুর দেখে নি।

ফাদার বললেন, আবার্ডিন ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক—সুবিখ্যাত ডক্টর পিয়ের ম্যাকিন্টর—

জ্যাক অবাক হয়ে ভদ্রলোককে দেখছিল। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ বিখ্যাত তো বটেই। নৈলে সেদিন পাথর ভাঙা একটা মজুর মুগুরের এক ঘায়ে একটা পাথর ভেঙে বলে, প্রোফেসর ম্যাকিন্টরের মাথাটা এই রকম করে ভেঙে একদিন দেখতে হবে তাতে কী আছে—আমি দাঁড়িয়ে তার সামনে। ভাগ্যিস চিনত না। সেই থেকে ভীষণ সাবধানে আছি।

ফাদার আর জ্যাক দুজনেই হেসে উঠল। হাসি থামতেই ফস করে জ্যাকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—আপনার ও-মাথায় মুগুর কিছু করতে পারবে না—

প্রোফেসর ভীষণ মজা পেয়ে হাসতে লাগলেন হো হো করে। বারবার মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলেন, তা ঠিক, তা ঠিক।

ফাদার রোজ হাসপাতালে আসেন রুগীদের জন্যে প্রার্থনা করতে। মাঝে মাঝে প্রোফেসরও আসেন। কিছুদিন পরে পায়ের ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে এমন সময় ফাদারকে জ্যাক তার সমস্যাটা বলেই ফেলল।—ঘা তো শুকিয়ে এল। এবার ছাড়া পেয়ে যাব কোথায় ? খাব কী—

প্রোফেসর বললে, খাবার ভাবনা কী ? চল না আমার সঙ্গে—কতো খেতে পারো দেখব। তোমার পেট কটা হে—

জ্যাক বললে, একটা—

প্রোফেসর হাসলেন। বললেন, একটা তো গুণতিতে। আর গুণতির বাইরে—

—অর্থাৎ—

অর্থাৎ বাইরে কতগুলো প্রমিশ করে রেখেছ ? বয়সটা উঠতির কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।

জ্যাক খোলাখুলি জবাব দিল—কিছু নেই—

ফাদার বললেন, আমি ওকে জানি প্রোফেসর। ওকে আপনার পছন্দই হবে। আপনার হাতে কি কোন কাজ আছে ?

প্রোফেসর বললেন, আমার কাছে নাবালক হয়ে থাকতে হবে আপাততঃ।

ফাদার এবার বললেন, অর্থাৎ—

অর্থাৎ আমার একজন বয়ের দরকার। কলেজে আমার সঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ সেই-ই হবে আমার লোক্যাল-গার্জেন। আজকাল কোথায় যে কী থাকে সব সময়ে খুঁজে পাইনে। আর মিঃ আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জড়পদার্থেরও যেন দু জোড়া করে পাখনা আর পা গজাচ্ছে। তারাও যে হরবখৎ কোথায় যায়, কোথায় লুকোয়—বুঝে উঠতে পারি না। ওদের মস্করা ঐ লুকোচুরি খেলে—আমার এদিকে প্রাণ ওষ্ঠাগত। পরীক্ষার খাতা, ফাউণ্টেন পেন, ছেলেদের রেজিস্ট্রার বই এই থাকে আবার এই পাওয়া যায় না। তা তোমাকে তাদের পুলিস করে দেবো অখন। চল আমার সঙ্গে—

॥ ২৮ ॥

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের কাছে সটান গিয়ে হাজির জ্যাক। প্রোফেসর তখন কিংস কলেজে তাঁর ঘরে বসে পড়া-শোনা করছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হতে তিনি বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে। জ্যাক অভিবাদন করল। তা প্রোফেসর সে সম্বন্ধে কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে তার দিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কী চাই—

জ্যাক তো একেবারে অবাক। বুকের ভিতরটা তার ধড়াস করে উঠল। প্রোফেসর হয়তো এখানে তাকে চিনতেই চাইবেন না।

তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে প্রোফেসর ভুরু কোঁচকালেন। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে তড় বড় করে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মুখে বেশ চিন্তিত ভাব। যেন মনে করার চেষ্টা করছেন তাকে আগে কোথায় দেখেছেন।

জ্যাক বললে, প্রোফেসর, আমি আসছি আপাততঃ হাসপাতাল থেকে আমার নাম—

প্রোফেসর বলে বসলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি—তা আপনাদের সার্জন গ্রিফিথকে বলবেন, তাঁদের ও ব্যাপারের মধ্যে আমি কিছুই করতে পারব না। আমি ভয়ানক দুঃখিত। কী করব বলুন। শীঘ্রই আমাকে একটা জরুরী কনফারেন্সে যেতে হবে রোমে।

জ্যাক তখন আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। গম্ভীর মুখ করে সে বললে, ফাদার ডেভিস আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আমার নাম জ্যাক।

এতদিন হাসপাতালে পোড়া পা নিয়ে ভুগছিলাম। এখন সেরে গেছি। আপনি একদিন বলেছিলেন এখানে একটা কাজ খালি আছে। যদি দয়া করে—

প্রোফেসর প্রসন্ন মুখে হা-হা করে হেসে উঠলেন। দেখেছো, দেখেছো। এরা সহজ মানুষের মাথা খারাপ করে দিতে পারে এমন এই হাসপাতালের ডাক্তারগুলো। ডাক্তার গ্রিফিথকে বললাম, আমি ওসব পারব না, তা আমাকেই ধরেছে মধ্যস্থ। তোদের নিজেদের ঝগড়া—যতসব—

প্রোফেসর কথাটা শেষ না করেই জ্যাককে বললেন, হেড ক্লার্ককে ডাকতো দেখি। বল, আমি ডাকছি, বিশেষ দরকার—

জ্যাক খুঁজে পেতে হেড ক্লার্কের পাত্তা করল। হেড ক্লার্ক বললে, এত করার দরকার কী ছিল। প্রোফেসরের হাতের কাছে রয়েছে টেলিফোন—তুলে একবার আমায় ডাকলেই পারতেন।

পরে বললে, প্রোফেসরের ব্যাপারই এই—

ম্যাকিন্টরের কাছে এসে দুজনেই হাজির। প্রোফেসর বই থেকে মুখ তুলে হেড ক্লার্কের অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এই ছেলেটির নাম লিখে নিন আমার লাইব্রেরী বয়ের পদে। আর সেই সঙ্গে এর কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতিও নিয়ে নিন—

হেড ক্লার্ক অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জ্যাকও রীতিমতো অবাক, একাজে আবার প্রতিশ্রুতি কিসের?

প্রোফেসর একটু চুপ করে থেকে গম্ভীরমুখে বললেন, একে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, এখানকার কোন কথা ঘরে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করবে না।

হেড ক্লার্ক গম্ভীর মুখে তক্ষুণি বললে, ইয়েস প্রোফেসর—

জ্যাক বললে, আই প্রমিশ বাই দি নেম অফ গড—

প্রোফেসর হাঁ হাঁ করে উঠলেন—ওসব জোচ্চুরী চলবে না। গডকে ঠেকিয়ে সরে পড়া চলবে না। নিজের নাম শপথ কর।

যাই হোক সে পালা তো শেষ হল। জ্যাকও কাজে ভর্তি হল। প্রোফেসরকে বুঝতে তার লাগল মাত্র কয়েক ঘন্টা। তারপর সেই ভাবে তাল রেখে কাজ চালাতে লাগল সে। বাড়িতে প্রোফেসর সর্বভাবে নির্ভর করতেন মিসেস ম্যাকিন্টরের ওপর। আর কলেজে জ্যাকের ওপর।

কলেজে সে প্রোফেসরের কাজ সেরেও সময় পেত বেশ কিছুক্ষণ। সে সময়টা সে লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করতে লাগল। শেষে তার পড়াশুনোর আগ্রহটা এত বেশী বেড়ে গেল যে কোন কোন রাত পুরোটা কেটে যেতে লাগল বইয়ের স্তূপের মধ্যে।

একদিন প্রোফেসরকে কিন্তু জ্যাক সম্বন্ধে বেশ একটু বিশেষভাবে সচেতন হতে হল।

স্কটল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় একদিন একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বার হয়। তাতে সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন যে স্কটল্যাণ্ডের যুবক যুবতীরা আজকাল খুব বেশী সংখ্যায় নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের উপর ফেথ আগে ছিল স্কটল্যাণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য থেকে তারা বিচ্যুত হতে চলেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই প্রসঙ্গে পরে সেই পত্রিকা থেকে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রবন্ধের বিষয় হল আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা। কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের যে কোন স্কট যুবক যুবতী এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। তাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, তিনটি পুরস্কারেরও বন্দোবস্ত করা হল। প্রবন্ধের যোগ্যতা অনুসারে তাদের লেখকদের এই পুরস্কারগুলি দেওয়া হবে। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পত্রিকার লোকেরা চারজন বিচারক ঠিক করলেন। তাঁদের একজন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, দ্বিতীয় জন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজনীতির অধ্যাপক। তৃতীয় জন আবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে অধ্যাপক ম্যাকিন্টর। চতুর্থ জন আবার্ডিনের আর্চবিশপ।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে অনেক যুবক যুবতী বই, খাতা, কলম নিয়ে বসে গেল প্রবন্ধ লিখতে। কারণ পুরস্কারের অংকগুলো নেহাৎ ছোট ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তো হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। লাইব্রেরীতে ছাত্র ছাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহে। এডিনবরাতে পত্রিকার অফিসে প্রবন্ধের গাদা জমা হল।

বিচারকরা সবাই পত্রিকার খরচে এডিনবরাতে গেলেন প্রবন্ধগুলির ভাল মন্দ বিচার করবার জন্য। পত্রিকার লোকেরা আগে থেকে প্রাথমিক বিচারে দশখানা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রবন্ধ নির্বাচন করে রেখেছিলেন। এই দশখানার মধ্যে নখানা প্রবন্ধ-ই আস্তিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। নাস্তিকতাকে নস্যাৎ করেছে ভুরি ভুরি যুক্তি দিয়ে। বাকী একখানা মাত্র প্রবন্ধ লেখা হয়েছে পৃথিবীতে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করে। প্রবন্ধের লেখক ঈশ্বরের অস্তিত্বটাকে একটি নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছে। ঈশ্বরবাদকে সে বিশ্লেষণ করেছে চুলচেরা যুক্তি ও তথ্যের সমন্বয়ে। আরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত বিচার করে সে দেখিয়েছে কিভাবে অবাস্তব কল্পনার উপর বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে। প্রবন্ধ লেখকের মতে বৈজ্ঞানিক সত্য দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবই মানুষের মনে অবাস্তব কল্পনা এনে দেয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সৃষ্টির অধিকাংশ বড় বড় রহস্যগুলোর আবরণ সরিয়ে ফেলে তাদের আসল রূপ দেখে নিয়েছে। এইটাই হল বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি। সেই রহস্যের আবরণ

ধীরে ধীরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানুষের মন থেকে ঈশ্বরবাদও ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। প্রবন্ধ লেখক বলেছে যে পৃথিবীটা আজও পরিপূর্ণরূপে সভ্য হয়ে ওঠে নি তাই ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার আগ্রহ আজও মানব সমাজের রয়ে গেছে। প্রাণরহস্যের সঙ্গে ঈশ্বরবাদ আজও জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গী হয়ে। সে অনেক কিছু সৃষ্টি নিজে করতে সক্ষম হলেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি আজও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। একমাত্র এই জায়গাতেই পৃথিবীর সভ্যতা অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। যেদিন সে লেবরেটারীতে প্রাণ তৈরী করতে পারবে, জীব সৃষ্টি করতে পারবে, সেদিন সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস গায়ের উপর থেকে ধুলোর মত ঝেড়ে ফেলবে। আশার কথা এই যে সে দিনের আর খুব বেশী দেরী নেই।

পত্রিকার লোকেরা এই প্রবন্ধটাকে প্রথমে বাদ দেবার কথাই চিন্তা করেছিল। কিন্তু প্রবন্ধ লেখকের লেখার ভঙ্গীটি এতো মনোরম ছিল যে তারা সেটা আর পেরে উঠল না। তারা বিচারকদের উপরেই বিচারের ভার ফেলে দেওয়া ভাল মনে করল। তবে তারা ধরেই নিয়েছিল যে এ প্রবন্ধের মতামত কোন বিচারকই গ্রহণ করবেন না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এটি বাজে কাগজের ঝুড়িতেই যাবে।

প্রবন্ধটা চারজন বিচারকের সামনে পড়া হতে লাগল। চারজন বিচারকই পয়েণ্ট নোট করতে লাগলেন। মাঝখানে হঠাৎ আর্চবিশপের গলা দিয়ে একটি অদ্ভুত শব্দ বার হয়ে এল। তিনি বললেন, এ প্রবন্ধ আর বেশী পড়ার দরকার নেই। এ কোন কম্যুনিস্ট-এর লেখা। বুঝতে পারা যাচ্ছে স্কটল্যাণ্ডে কম্যুনিজম্ বাড়ছে ভয়াবহ ভাবে।

অধ্যাপকরা কিন্তু বিশপের সঙ্গে একমত হলেন না। তারা প্রবন্ধটা পুরো-পুরিই শুনতে চাইলেন। কিন্তু সব শোনার পর তর্ক বাধল অধ্যাপকদের মধ্যেই। এডিনবরা ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক বললেন, লেখাটা খুব সুন্দর হয়েছে বটে, আর লেখক যতগুলো বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছে তাতে তার বৈদগ্ধও প্রমাণ করেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তবু এ প্রবন্ধকে তো আর পুরস্কা-রের জন্য রেকমেণ্ড করা যায় না। এ যে ঘোর নাস্তিকতার প্রচার। আর যাই হোক কাগজের লোকেরা তো আর টাকাগুলো নাস্তিকতা প্রচারের জন্য দিচ্ছেন না।

গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তাঁর কথাতে সায় দিলেন।

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর তাদের কথার প্রতিবাদ করলেন। বললেন, এমন একটি উৎকৃষ্ট ধরনের প্রবন্ধ যে একজন কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের ছেলের কলম দিয়ে বার হয়েছে এটা একটা বিস্ময়ের কথা বৈকি। তা ছাড়া রেফারেন্স হিসাবে লেখক যে সব বইয়ের তালিকা দিয়েছে—সেগুলো হচ্ছে এই চিন্তাধারার সব চেয়ে আধুনিক অবদান। লেখক আরিস্টট্ল থেকে বর্তমান সর্বাধুনিক দার্শনিক ও

বৈজ্ঞানিকদের চিন্তায়—কেবল ঈশ্বরকেই খ‍ুঁজেছে—তাতে সন্দেহ নেই। অথচ সত্য কথা বলতে কী বেচারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের জোরাল প্রমাণ কিছুর মধ্যেই পায় নি। এ-লেখাটাকে শুধুমাত্র প্রবন্ধ বললে ভুল হবে। এ হল সত্যিকারের গবেষণা। তা ছাড়া কাগজের লোকেরা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন উৎকৃষ্ট রচনার উপরে—ঈশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তো নয়। কাজেই আমার মনে হয় প্রথম পুরস্কার এই রচনার লেখককে দেওয়া যেতে পারে নিঃসন্দেহে।

একটু এদিক ওদিক আলোচনার পর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের কথায় সায় দিলেন।

আর্চবিশপ বললেন, এখন দেখতে পাচ্ছি কী করে এই সব নিরীশ্বরবাদের বীজ স্কটল্যাণ্ডে ছড়াচ্ছে। যেখানে অধ্যাপকরা এই রকম সেখানে ছাত্ররা তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেই না।

এডিনবরার অধ্যাপক আর্চবিশপের কথায় চটে গেলেন। বললেন, ঈশ্বরের জায়গা হল চার্চ। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে হল জ্ঞানের জায়গা। প্রবন্ধটা যে সবচেয়ে সেরা হয়েছে—সে বিষয় আমি প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের সঙ্গে একমত।

তিনজন অধ্যাপক প্রবন্ধের লেখক প্রথম পুরস্কারের যোগ্য বলে ঘোষণা করলেন। তারপর অন্য অন্য পুরস্কারগুলিরও ব্যবস্থা করে প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর দুদিনের মধ্যেই ফিরে এলেন আবার্ডিনে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর কাছে পোস্ট অফিস থেকে লোক এল, জন ম্যাকফারসন বলে কি কোন ছাত্র তাঁর কাছে কাজ করে? তার নামে টাকা এসেছে কাগজের অফিস থেকে—প্রথম পুরস্কার। প্রোফেসর শুনে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। জন ম্যাকফারসন কে? হঠাৎ মনে পড়ল, আরে তাইতো এযে জ্যাকের ভাল নাম। তিনি মনে মনে খুশী হয়ে উঠলেন ভয়ানক। তখুনি জ্যাককে ডেকে পাঠান হল। প্রোফেসরের সামনে জ্যাক তার পুরস্কারের টাকা হাত পেতে নিল।

পোস্ট অফিসের লোক চলে যেতেই প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর গম্ভীরমুখে জ্যাককে বললেন, তুমি একটি সাংঘাতিক ছেলে। তোমার ওপর এই কবছর নির্ভর করে আছি ভাবতেই আমার হৃদকম্প হচ্ছে। ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে এর মধ্যে অনেকদিন আগেই সাবাড় করে দিতে পারতে। প্রথমতঃ তুমি হলে নাস্তিক। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে এইসব ভয়াবহ গবেষণা চালাচ্ছ আমাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে দাও নি। যাকগে তোমায় আর আমার বয়ের কাজ করতে হবে না।

প্রোফেসরের কথা শুনে জ্যাকের এদিকে সত্যি সত্যি মুখ শুকিয়ে গেছে। সে প্রায় কাঁদকাঁদ গলায় কী একটা বলতে গেল। প্রোফেসর তাকে থামিয়ে দিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, আমার বয়ের কাজ ছেড়ে কাল থেকে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাও।

বাড়িতে তখনও টেঁকে আছে। বাকী সব উধাও। অতগুলো কাঠের কুঠুরী সব ফাঁকা।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করল—ফার্ম হাউসের লেই গভর্নেস মেয়েটা কোথায়—

আংকল্ ডেভি বললে, আরে সেই ডাইনীটাই তো সর্বনাশের গোড়া—

তারপর ডেভি যে কথাগুলো বলে গেল তার মূল কথা হল এই, যে জ্যাক পালিয়ে যাবার পর থেকেই তার বাবার মাথায় খুন চেপে যায়। তখন থেকেই অসহ্য রকমের অত্যাচার চালিয়েছে সে নতুন মায়ের ওপর দিনের পর দিন। বাইরে কাউকে সে জানতেও দিত না একথা। বাড়ির ভিতরে একটা ঘরে সে নানা রকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে মাকে তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা দিত। রোজ হেভী ডোজ ইঞ্জেকসন দিত আর্সেনিকের তার বয়সের অনুপাতে তাকে বুড়ো করে দেবার জন্যে। এ কাজে তার বাবাকে সক্রিয় সাহায্য করত ফার্ম-হাউসে সেই মেয়ে মানুষটা। সে-ই শেষ পর্যন্ত মাকে খতম করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। আশ্চর্য মেয়েমানুষের বিদ্বেষ!

এইভাবে দিনের পর দিন তীব্র ওষুধের ক্রিয়ায় আর অসহ্য শারীরিক অত্যাচারের ফলে মা পাগল হয়ে গেল। অবশ্য তার বাবাও এমন কিছু সুস্থ ছিল না। তার ওপরেও দুদুবার সেরিব্রাল থ্রম্বসিসের আক্রমণ হয়ে গেল। শেষ বারের বার সে মরে শান্তি পেল। কিন্তু মায়ের দশা যা হল তা বলা যায় না।

মা দিনরাত ঘরের মধ্যে ঘুরত প্রায় অন্ধের মতো। মাঝে মাঝে তীব্র যন্ত্রণায় চুল মুঠো করে ধরে চীৎকার করে উঠত—না না ইলেকট্রিক শক্ দিও না। ঈশ্বরের দোহাই—আমার কিছু হয় নি। সে সময়ে বাড়িতে ইলেকট্রিক হীটার জ্বালান যেত না কিছুতেই। হীটার দেখলেই নিদারুণ ভয়ে মা কাঠ হয়ে যেত, বুকফাটা চীৎকার করত। কখনও উপুড় হয়ে শুয়ে ছেলেমানুষের মতো চীৎকার করে কাঁদত—উঃ জ্বলে গেল আমার পাকস্থলীটা, পুড়ে গেল—

আবার কখনও বা তীব্র ঘৃণায় মুখ কুঁচকে থু-থু করে বাতাসে থুথু ফেলত। বলত, তোরা সবাই পশু। ওঃ পশুর থেকেও তোরা নীচ। পশু হলে আমায় একেবারে খেয়ে ফেলত। তোরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিস—তোরা রক্ত-চোষা নেকড়ে। বেরো বেরো, সবাই বেরো—

জ্যাক এইসব দেখত আর মনে মনে ভাবত—কতোদিনের কতো অসহ্য অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হল এই সব।

ডেভির কাছে সে শুনতে পেল, তার বাবার যখন মৃত্যু আসন্ন তখন নাকি ফার্ম-হাউসের সেই মেয়েটি ডেভিকে বলেছিল, ওরে বাবা, এবার ঐ পাগলীই আমায় নখে ছিঁড়ে মারবে। বলে একরাত্রে সে বাড়ি ছেড়ে সটান উধাও হয়েছে।

জ্যাকের প্রথমে মনে হয়েছিল সে নিজেই যেন পাগল হয়ে যাবে। সময়ের ফেরে সে ভাবটা কমল। কিছুদিন বাড়িতে থেকে অবস্থাটা বেশ ভাল করেই সহ্য করে নিল সে। তারপর মাকে আর মেরীকে নিয়ে এল আবার্ডিনে। বাড়ির সব দায়িত্ব ডেভিকে দিয়ে এল।

আবার্ডিনে এসে প্রথমেই সে মাকে ভর্তি করে দিল মেণ্ট্যাল হস্পিট্যালে আর মেরীকে একটা ভাল স্কুলে।

এত করেও বাঁচাতে পারে নি জ্যাক নতুন মাকে। চিকিৎসা শুরু করতেই নাকি এমনিতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। মনের দিক ছেড়ে দিলেও শরীরে মায়ের একটুও পদার্থ ছিল না। একদিন হঠাৎ মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত-বমি করতে করতে মারা গেল।

তার আর একটা অধ্যায়ের যবনিকা পাত হল।

॥ ২৯ ॥

ঘড়ি দেখলাম। রাত প্রায় তিনটে। অথচ জ্যাক বা আমার কারুর চোখেই ঘুমের কণামাত্র নেই। জ্যাক তার পূর্বকথা শোনাতে বসে স্থান কাল বিস্মৃত হয়েছে। আর তার ছাপও তার মুখে চোখে সুস্পষ্ট। আমিও এতক্ষণ ভাসছিলাম তার জীবনের জোয়ার ভাঁটার টানে।

এবার একটু চুপ করতে আমি নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। ফায়ার প্লেসের আগুনটা ম্যাড় মেড়ে হয়ে এসেছিল। তাতে আরও গোটাকতক কাঠের কুঁদো গুঁজে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলাম।

জ্যাক তার চিবুক হাতের ওপর রেখে ফায়ার প্লেসের জলন্ত আগুনটার দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিল। সে ভাবছিল অনেক কিছুই। আমি তার চিন্তায় বাধা দিলাম।

বললাম, জ্যাক, শুনেছি তোমার জীবনে একটি অদ্ভুত নারী এসেছিল তার নাম অনীতা বোস—বাঙালীর মেয়ে। এতদিন মনে মনে যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ সুবিধা হয় নি। আজ তার কথা কিছু শোনাও-না।

জ্যাক তার পুরু লেন্সে ঢাকা চোখ দুটো সটান আমার মুখের ওপর তুলে ধরল। দেখলাম তার ছোট ছোট চোখ দুটো তাদের চঞ্চলতা ছেড়ে প্রায় স্থির হয়ে আছে। গভীরে চলে গেছে তাদের দৃষ্টি। সে একটু ফিকে হেসে বললে, কার কাছে শুনেছো—

—প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের কাছে। তা ছাড়া সেদিন প্রোফেসর অনীতার

প্রসঙ্গ তুলতেই তুমি যে রকম ঘন ঘন রাঙা হয়ে উঠতে লাগলে—

জ্যাক একটু লাজুক হাসি হেসে মুখ নীচু করে বললে, তা ঠিক, তা ঠিক—

সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি মিলিয়ে গেল। মুখটা ম্লান হয়ে উঠল। অস্ফুট স্বরে এবার সে বললে, কিন্তু সেও তো হারিয়ে গেল—

—কি করে? সে কি তোমায় প্রত্যাখ্যান করল? না শেষ পর্যন্ত তুমিই তাকে ছেড়ে দিলে—

জ্যাক বললে, ও-দুটোর কোনটাই নয়। এতে তৃতীয় ব্যক্তির হাত ছিল—

হেসে বললাম, কার? ঈশ্বরের?

জ্যাক আমার হাসি দেখে একটু হাসল। বললে, বরঞ্চ শয়তানের বলতে পার।

—কি রকম—

জ্যাক বললে, তা হলে তোমাকে অক্স্ফোর্ডের ব্যাপারটা সব শোনাতে হয়। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললে, আচ্ছা তবে শোন—

নাস্তিকতার ওপর প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার জিতে জ্যাকের পায়া ভারী হয়ে উঠল। প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের কাছে সে যদিও কৃতজ্ঞ রইল ইউনিভারসিটিতে পড়বার সুযোগ পাবার জন্যে—কিন্তু সারা দুনিয়াকে সে নস্যাৎ করতে লাগল তীক্ষ্ন যুক্তির আঘাতে। আত্মা বা ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উঠলেই সে সেটাকে মনে করত ছেলেমানুষী আলোচনা। বড় বড় অধ্যাপক আর ছাত্রদের এই ছেলেমানুষী আলোচনা করতে শুনলেই তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে একটী তীব্র বিদ্রূপের হাসি। এই হাসিটা প্রতিপক্ষ যদি হজম করতে না পেরে তাকে একবার তর্ক যুদ্ধের মধ্যে টেনে নামাত তাহলে আর রক্ষে থাকত না। তখন জ্যাকের জিভ থেকে অনর্গল গোলাবর্ষণ সুরু হয়ে যেত। শুধু যে তীক্ষ্ন যুক্তি তা নয় তার সঙ্গে থাকত পর্যাপ্ত কটু বিদ্রূপবানও। আবার্ডিনের ছাত্র আর শিক্ষক মহলে জ্যাকের নাম হয়ে গিয়েছিল পিগ্ম্যালিয়ন। এই পিগ্-ম্যালিয়নই যখন আবার ডিগ্রী পরীক্ষায় দর্শনে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হল তখন অন্যান্য অধ্যাপকদের মুখগুলো চুন হয়ে গেলেও—প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরকে তাঁর ঘরে বসে উঁচু হাসি হাসতে শোনা গেল ঘন ঘন।

প্রোফেসরদের একজন ঘরে ঢুকে বললেন, মিস্টার ম্যাকিণ্টর, আপনি যাই বলুন, এই রকম একটা ঘোরতর নাস্তিককে ওপরে ওঠবার পথ করে দিয়ে আপনি কিন্তু মোটেই সমাজের মঙ্গল করছেন না। ওকে আর এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েটে ভর্তি হতে দেবেন না।

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর বললেন, অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? জ্যাক একদিন মস্ত বড় আস্তিক হবে সেকথা আমি আপনাকে এখন লিখে দিতে পারি।

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরকে বাধা দিয়ে অন্য প্রোফেসরটি বললেন, কবে হবে সে কথা পরের। এখন ওর আত্মম্ভরিতার দাপটে যে আমরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর সে সব শুনে আবার আগের মতো হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

আবার্ডিনের অধ্যাপক আর ছাত্রদের বরাত ছিল প্রসন্ন। অধ্যাপক ম্যাকিণ্টর অক্সফোর্ড থেকে আহ্বান পেলেন সেখানে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্টে অধ্যাপনা করতে হবে দর্শন আর মনোবিজ্ঞানের। তিনি পরের মাসেই গিয়ে যোগ দিলেন অক্সফোর্ডে। জ্যাক তাঁর সঙ্গে গিয়ে ভর্তি হল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে। এখানে এসে জ্যাক তার পড়াশোনা বাড়িয়ে দিল আরও অনেক বেশী। সে পড়তে লাগল মনোদর্শন আর জ্ঞানতত্ত্ব। শুধু পড়া নয়—ঐ সব বিষয়ের ওপর সে প্রবন্ধও রচনা করতে লাগল।

সে সব রচনা ইউনিভার্সিটির অন্যান্য অধ্যাপকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেতে লাগল। অক্সফোর্ডে ছাত্রদের ব্যক্তিগত মতামতের দাম খুব বেশী বলে অধ্যাপক আর ছাত্র মহলে জ্যাক অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে উঠল তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে। দেখে শুনে প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর খুশী হয়ে উঠলেন।

এখানে এসে জ্যাক তার পুরোন বন্ধু জিমিকে তার সহপাঠী হিসাবে পেয়ে গেল। জিমি অক্সফোর্ডে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে ক বছর ধরে পড়ছে। জিমিই জ্যাককে ধরে নিয়ে গিয়ে, সে যে বাড়িতে পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকত সেখানে একটা থাকবার জায়গা করে দিল। সেই সঙ্গে তার বান্ধবী সুন্দরী রোজমেরীর সঙ্গেও জিমি জ্যাকের পরিচয় করিয়ে দিল।

ছোট্ট খাট্ট ছিপ্‌ছিপে রোজ মেরী। গাল দুটো ফেটে বার হচ্ছে গোলাপী আভা। মাথা ভরা এক রাশ অদ্ভুত সুন্দর সোনালী চুল। তাকে দেখলে কে বলবে মেরী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। ঠিক যেন একটা স্কুলের মেয়ে—এমন ছেলেমানুষের মতো চেহারা মেরীর। তাকে দেখে জ্যাকের তার নতুন মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। বিশেষ করে মেরীর তড় বড় করে কথা বলা আর চঞ্চল পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা—দুটোই জ্যাকের ভাল লাগল খুব। মেরীও ওদিকে জ্যাকের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে তার ওপর ঝুঁকল দারুণ ভাবে।

অথচ জ্যাকের স্বভাবের সেই পুরোণ নারীবিদ্বেষ সে তো মরেও মরে নি। তারপর ইদানীং সে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে। তার নাম অধ্যাপক ছাত্রদের প্রায় মুখে মুখে ঘোরে। সে কি এতই সস্তা হবে? আর পাঁচ জন ছেলের মতো সামান্য একটা মেয়ের কাছে—তোমায় ভালবাসি বলে প্রেম নিবেদন করবে? হোক না সে মেয়ে সুন্দরী, তাতে কী? মনে মনে রোজ মেরীকে ভাল লাগলেও—জ্যাক তার হাব ভাবে বা ঘুণাক্ষরেও সে কথা প্রকাশ করল না। সে চুপ করেই রইল। আর তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রোজ মেরী ক্রমশঃ

অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল ভীষণ ভাবে।

জিমিও রোজ মেরীর এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেছিল। সে কিছু না বলে চুপচাপ সব দেখে যাচ্ছিল। যদিও তার বুকের ভিতরটা বেশ জ্বালা করছিল এই ব্যাপারে। কিন্তু জ্যাককে কিছু বলার পথ সে বন্ধ করেছিল নিজেই।

জ্যাক কয়েক মাস জিমির সঙ্গে থেকে বুঝতে পেরেছিল জিমির টাকার খুবই টানাটানি। আর তার প্রধান কারণ তার অতিরিক্ত মদ খাওয়া। জিমির বুকে যেন সব সময়ে সাহারা মরুভূমির তৃষ্ণা লেগে আছে। যত মদই সেখানে ঢালা যাক না কেন সে তৃষ্ণার যেন নিবৃত্তি নেই। তার ঘরের মধ্যে খাবার সামগ্রী কিছু পাওয়া যাক বা না যাক হরেক রকমের ছোট-বড়-মাঝারি বোতল সাজান থাকে তার আলমারীর সব কটা তাক জুড়ে। সে ছুটীতে এদিক ওদিক কাজ কর্ম করে কিছু রোজগার করে নিয়ে আসে বটে কিন্তু মদেই তার সব খরচ হয়ে যায়। কাজে কাজেই তার বাড়ি ভাড়া দেওয়া প্রায়ই হয়ে ওঠে না।

একদিন বাড়িওয়ালী বুড়ি জিমিকে নোটীশ দিল। বললে, তোমাকে আর আমি রাখতে পারব না। প্রায় ছ সপ্তার ভাড়া বাকী পড়েছে। হয় সেটা দিয়ে দাও নয় তো বাড়ি ছাড়। অনেক দিন ধরে আমার বাড়িতে আছ বলে চক্ষু লজ্জার খাতিরে তোমাকে আমি অনেক সময় দিয়েছি।

বাড়িওয়ালীর কথাগুলো জ্যাক তার ঘর থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। সে উঠে গিয়ে জিমির সামনে ছ সপ্তার ভাড়ার টাকাটা বাড়িওয়ালীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, ওর ঘর ভাড়ার টাকা যখন বাকী পড়বে আপনি আমার কাছে আসবেন—

বাড়িওয়ালী তো রীতিমতো অবাক। আরও অবাক হয়েছিল সে তার কদিন পরে, যেদিন সে শুনতে পেল জিমিকে হাজত থেকে ছাড়িয়ে এনেছে জ্যাক বেশ কতকগুলো টাকা খরচ করে। জিমি বদ্ধমাতাল হয়ে রাস্তায় মাতলামী করবার সময় ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে।

কাজেই রোজ মেরী জ্যাকের ওপর ঝুঁকেছে জানতে পেরেও জিমি কিছু না বলে চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল। জ্যাককে চটাবার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না। পয়সার দিক দিয়ে জ্যাক বেশ শাঁসালো। একদিকে তার স্কলারশিপের টাকা, অন্যদিকে তার পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ও ইদানীং বেশ কিছুটা বেড়েছিল ডেভির দৌলতে। আর জিমির প্রয়োজনে তার নিজের টাকা বিনা দ্বিধায় খরচ করতে জ্যাক একটুও নারাজ ছিল না। বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য এতে জ্যাকের আত্মপ্রসাদ ছিল খুব বেশী।

মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পড়াশুনোর মধ্যে জ্যাক যখন হাঁপিয়ে উঠত তখন জিমিই তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত কোন পাব-এ কিংবা কোন বলরুমে। রোজ মেরীকে কায়দা করে জ্যাকের পার্টনার করে দিত নাচের সময়। এসবের মধ্যে জ্যাকের আত্মঅহঙ্কারটা বেশ পুরোপুরি বজায় থাকত। নাচতে কিন্তু

সপ্তায় দু-চারদিন পাব এ বসে মদ খেতে যে জ্যাকের ভাল লাগত না তা নয়। সে বেশ পছন্দ করত সেগুলো। বাইরে দেখাত যেন অনুরোধে পড়েই সে বন্ধুদের সঙ্গ দিচ্ছে।

যত দিন যেতে লাগল জিমির সঙ্গে পড়ে পাবে গিয়ে মদ খাওয়াটা তার ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সে যখন একবার মদ খেতে সুরু করত তখন বেশ কদিন ধরে মদেতে চুর হয়ে থাকত। হঠাৎ একদিন আবার সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে স্বাভাবিক হত। এদিকে ইউনিভারসিটির ছাত্রী মহলে জ্যাককে নিয়ে তুমুল আলোচনা হলেও এক রোজমেরী ছাড়া আর কেউ তার কাছে ঘেঁসতে ভরসা পেত না। দু-চার জন চেষ্টা যে করেনি এমন নয়। আড়ালে আড়ালে জ্যাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ তারা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু জ্যাকের কাটখোট্টা ব্যবহার আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথার চোটে তাদের দিবাস্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই ভেবে ছিল, পড়াশুনোয় ভালো হলে কি হবে, লোকটা নিতান্তই বেরসিক। তাই জ্যাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারা সময় নষ্ট করাকে বুদ্ধিমতীর কাজ বলে মনে করেনি। একে একে সরে পড়ে জ্যাককে রেহাই দিয়েছিল ঝামেলার হাত থেকে।

বাইরে ঝামেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও জ্যাক ভিতরে নিষ্কৃতি পেল না। বাড়িওয়ালী মিসেস পার্স এর এক মেয়ে ছিল। সে কাজ করত ম্যাঞ্চেস্টারের কোন একটা কারখানায়। সেই কারখানায় ছাঁটাই হয়ে যেতে সে পেন্সন নিয়ে বাড়ি এল। কলে কাজ করা মেয়ে, বয়স হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর। সে অনেক ছেলে এর মধ্যে চরিয়েছে। পুরুষ রক্তের স্বাদ তার অজানা নয়। জ্যাকের লম্বা চওড়া চেহারা দেখে সে মনে মনে মজল। জ্যাক মেয়েটাকে একেবারেই পছন্দ করত না। মেয়েটার চেহারার দিকে তাকিয়ে তার পুশি বেড়ালের কথা মনে পড়ত। আর তার চোখের নজর থেকে সে স্পষ্ট ইঙ্গিত পেত এ আগল রক্ত খেকো বাঘিনী। জ্যাক পারত পক্ষে তাকে এড়িয়ে চলত।

জিমি কদিনের মধ্যেই মেয়েটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল। মেয়েটাও জিমির ঘরে যাতায়াত করত সময়ে অসময়ে অগুনতি বার। জ্যাকের দিকে সে নজর ফেলত নিঃশব্দে। একদিন রাত প্রায় বারোটার সময় দরজায় টোকা শুনে জ্যাক দরজা খুলে দেখে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে তার ঘরের সমুখে।

জ্যাক অবাক হয়ে বললে, কী ব্যাপার, এতো রাতে কী চাই তোমার—

মেয়েটা নীচু গলায় চোখ না তুলেই জবাব দিলে, মা বললে তোমার ঘরে আগুনটা ঠিক জ্বলছে কিনা দেখতে—

বলতে বলতে সে ঘরে এসে ঢুকেছিল। আগুনটা একটু মিথ্যে মিথ্যে খোঁচাখুঁচি করে উঠে সে দেখল জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে আর তাকে একনজরে দেখছে। মেয়েটা হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জ্যাকের গলা জড়িয়ে ধরে তার

মুখের ওপর মুখ ঘসতে ঘসতে বললে, কী রকম লোক তুমি? তুমি কী আমার মনের কথা বুঝতে পার না—আমি তোমায় ভালবাসি। আজ রাতে আমি তোমার ঘরে শোব। ভয় নেই, ভোর হবার আগেই আমি উঠে যাব। কেউ জানতে পারবেনা এই কথা।

জ্যাক আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে ধরে শুধু একটা কথা বলেছিল, যাও—

মেয়েটা ঠিক এরকমটা আশা করেনি। তবুও জ্যাকের ভারিক্কী গম্ভীর মুখের হাবভাব দেখে সে সুড় সুড় করে বার হয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

জ্যাক তার পরের দিন থেকে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল তার বাসা পাল্টাবার জন্য। দু-একদিনের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটে গেল যার জন্যে জ্যাকের বাড়ি পাল্টানর ইচ্ছেটা আপাতত স্থগিত রাখতে হল।

সেদিন ডিনার টেবিলে বসে জ্যাক দেখল জিমি অনুপস্থিত। বাড়িওয়ালী মিসেস পার্সকে জিজ্ঞাসা করে জ্যাক জানতে পারল জিমির বাইরে কোথায় নেমন্তন্ন আছে। জ্যাকের কিছু জরুরী লেখাপড়ার কাজ থাকার জন্যে সে আর সেদিন সন্ধ্যোবেলাতে বাইরে না গিয়ে নিজের ঘরেতেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন শীতকাল। বাইরে ঠাণ্ডাও খুব প্রচণ্ড। রাত নটা নাগাদ মিসেস পার্স-এর বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থামল। জ্যাকের ঘরটা রাস্তার ওপরে বলে জ্যাক ট্যাক্সি থামার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে বার হয়ে এল। দেখল একজন ভদ্রমহিলা জিমির অচৈতন্য দেহটা ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে আনছেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারবার আগেই জ্যাক এগিয়ে গেল ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করতে। সে জিমিকে এনে তুলল তার ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলাটিও এলেন। জিমিকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই মহিলাটি বলে উঠলেন, আমি বিশ্বাস করি আপনি এর বন্ধু—

জ্যাক ফিরে দেখল মেয়েটি একটি কালো মেয়ে। সে গম্ভীর মুখে গুড্ উইস করে বললে, হ্যাঁ—

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় তার রক্ত চড়ে গেল। সে ভাবল এইসব যাচ্ছেতাই মেয়ে-গুলোর পাল্লায় পড়ে জিমি দিনের পর দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

তাই সে বেশ একটু রুক্ষ গলায় বললে, সঙ্গে ছিলেন যখন তখন একে একটু কম মদ গেলালেই পারতেন—

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটির মুখের কালো রংটা গাঢ় হয়ে উঠল। কিন্তু সে ধীরভাবেই জবাব দিল, আমি ওঁকে অচৈতন্য অবস্থায় এডিশন ওয়াকএর গাছ পালায় ঢাকা নির্জন রাস্তাটায় পড়ে থাকতে দেখি। সেখান থেকেই ওঁকে তুলে আনছি—

জ্যাক অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে, ওখানে সন্ধ্যের পর সাধারণতঃ একলা কোন মেয়ে যায় না। তবু আমায় বিশ্বাস করতে হবে আপনি ওর সঙ্গে

ছিলেন না।

মেয়েটি কথাগুলো বলছিল ধীর শান্তভাবে। জ্যাক মনে মনে তার ওপর যথেষ্ট চটে গেলেও তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে সে বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছিল। পরিষ্কার ইংরেজী ভাষা একের পর এক যেন নিটোল স্প্যানিশ আঙুরের মতো খসে পড়ছে তার কণ্ঠ থেকে। মেয়েটির কথার সুরে যেন একটি মিষ্টি সঙ্গীত আছে যাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না কিছুতেই। তাকে মন দিয়ে শুনতে হয়, উপভোগ করতে হয়।

জ্যাকের কথায় মেয়েটির সেই শান্ত সৌম্য ভাবটা এতটুকু ক্ষুন্ন হল না। সে তার ধীর শান্ত স্বরে বললে, বিশ্বাস অবিশ্বাস এর প্রশ্ন পরে তুললে ভাল হয় না কি? এখন ঐ ভদ্রলোকের দরকার একজন ডাক্তারের। দেখছেন না, ওঁর মুখ নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

জ্যাক এবার জিমির মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে শিউরে উঠল। বিকৃত বীভৎস সে মুখ। যেন কেউ জোর আঘাত করে থেঁতো করে দিয়েছে। সে একটু ভয় পেয়ে গেল। মেয়েটিকে বললে, আপনি কী দয়া করে একটু বসবেন? আমি একজন ডাক্তার ডেকে আনছি এখনই—

মেয়েটি বললে, নিশ্চয়ই—

জ্যাক চট করে বার হয়ে গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এল পাড়ার একজন ডাক্তারকে সঙ্গে করে। ডাক্তার সব দেখে শুনে বললে, জিমি মাথায় আর মুখে খুব বেশী আঘাত পেয়েছে যার জন্যে তার জ্ঞান ফিরতে অনেক দেরী হবে। ডাক্তার আরও বললে, মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়েছে জিমি যার থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে সে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগিয়েছে। কিন্তু ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে, এ পড়ে যাওয়া ক্ষত নয়। কোন লোক তাকে নৃসংসভাবে আঘাত করেছে মাথায় আর মুখে।

ডাক্তার জিমিকে গোটা দুই ইঞ্জেক্সন দিয়ে,ক্ষতের ওপর লোশানের বন্দোবস্ত করে বিদায় নিল। জ্যাক এবার মেয়েটিকে সন্দেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করল্ আচ্ছা আপনি কোথা থেকে ওকে তুলে নিয়ে এলেন—ওকে কে মেরেছে তা কি আপনি জানেন?—

মেয়েটি তার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বললে, বললাম তো এডিশান ওয়াক-এর গাছপালায় ঢাকা নির্জন রাস্তাটার একপাশে আমি ওঁকে পড়ে থাকতে দেখি। একটু চুপ করে থেকে বললে, ওখানে প্রতিদিন ডিনারের পর কয়েক চক্কর ঘুরে বেড়ান আমার নিত্যকার অভ্যাস। আজও ওখানে বেড়াচ্ছিলাম। ম্যাগডালেন কলেজ পর্যন্ত আমি চলে যাই ওই রাস্তাটা ধরে, আবার ফিরে আসি। নির্জন বলে রাস্তাটা আমার খুব ভাল লাগে। আজ যাবার সময় কিছু দেখিনি। আসার সময় দেখি এই ভদ্রলোক পড়ে রয়েছেন। ও রাস্তাটায় আলো কম।

ভালো করে তখন বুঝিনি কি হয়েছিল ভদ্রলোকের। ভেবেছিলাম মাতাল হয়ে পড়ে থাকবে হয়তো। তাই—

জ্যাকের তবু সন্দেহ গেল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, ওখানে তো রাতে চট্ করে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। হাইস্ট্রীটের কাছে এসে ট্যাক্সি ধরতে হয়। ঐ অতটা রাস্তা আপনি ওকে নিয়ে এলেন কি করে—

মেয়েটি মৃদু হেসে বললে, কাঁধে করে। কি করা যায় বলুন? একজন ভদ্রলোক ওখানে ঐভাবে রাস্তায় পড়ে শীতে জমে যাচ্ছে—এ দেখে কেমন করে আমি তাকে ফেলে আসি? তাই হাইস্ট্রীট পর্যন্ত এনে ওর পকেট হাতড়ে নোটবই থেকে ঠিকানা পেয়ে এখানে নিয়ে এসেছি—

ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে জ্যাকের মনোভাব অনেকটা বদলে গেছে। তবুও সে তার পুরু লেন্সের চশমার আড়াল থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেখছে মেয়েটিকে।

মেয়েটি কালো, পাঁচফিটের ওপর লম্বা একহারা চেহারা, অপূর্ব শ্রী তার মুখের গড়নে। তার টিকোল ছোট নাক। ঝকঝকে আয়ত দুটো চোখ। ছোট কপাল। পাতলা একজোড়া ঠোঁট। অপূর্ব সুন্দর চিবুক। সব মিলিয়ে এ যেন বিধাতার এক অনবদ্য সৃষ্টি। জ্যাকের মনে হল সে সাদা কালো কোন চেহারার মধ্যে এত রূপ কোনদিন দেখেনি। কিন্তু তবুও তার মনে একটু সন্দেহ রয়ে গেল।

ডাক্তার লোশন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটি তুলোতে ডুবিয়ে সেই লোশন দিয়ে পরম যত্নে জিমির ক্ষত পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। তার সেই মূর্তিটার দিকে চেয়ে জ্যাক মনে মনে জিমির ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে লাগল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করল—অক্স্ফোর্ডে কি পড়াশুনা করতে এসেছেন—

মেয়েটি জিমির সেবা করতে করতে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—হ্যাঁ—

জ্যাক সেই রকম গম্ভীর মুখে জেরা করার ভঙ্গীতে মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞাসা করল—আপনি কোন দেশের লোক, ভারতবর্ষ, সিংহল না মালয়—

মেয়েটী মৃদুস্বরে জবাব দিল—আমার বাড়ি ভারতবর্ষ, কলকাতায়—

জ্যাক আবার পুরনো প্রশ্নে ফিরে এল। বললে, আপনি তাহলে জিমিকে আগে থাকতে চিনতেন না—

মেয়েটি এবার কোন রকম জবাব না দিয়ে জিমির মাথাটা পরম যত্নে ঠিক করে বালিশে শুইয়ে জ্যাকের দিকে ফিরে দাঁড়াল। মুখে তার মৃদু হাসি। যেন জ্যাককে দেখে তার ভারী মজা লেগেছে এমনি একটা ভাব তার চোখে মুখে।

একটু পরে পরিষ্কার সুরেলা গলায় ধীর শান্ত ভঙ্গীতে জ্যাককে সে পাল্টা প্রশ্ন করল—বিশ্বাস করি আপনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র? আপনার বিষয় কি—

জ্যাক জবাব দিল—দর্শন আর মনোবিজ্ঞান—

মেয়েটি আগের মতো হাসি হাসতে লাগল। চমৎকার প্রাণমাতানো সেই হাসিটুকু। জ্যাক সেটাকে মনে মনে উপভোগ করল।

মেয়েটি বললে, মনোবিজ্ঞান পড়েন অথচ আপনার নিজের মনেরই স্থৈর্য নেই। এ ভারী আশ্চর্য কথা—

জ্যাকের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। গম্ভীর ভাবে বললে, একথা বলবার মানে—

মানে খুবই সোজা, বললে মেয়েটি।—আত্মবিশ্বাস থাকলে মনের স্থৈর্য থাকে। আর মনের স্থৈর্য থাকলে মানুষ মানুষকে সহজে বিশ্বাসও করে। আপনার মন থেকে আমার ওপর সন্দেহ এখনও যাচ্ছে না দেখে অনুমান করি আত্মবিশ্বাসের কিছু অভাব আছে আপনার মধ্যে।

ইউনিভার্সিটির ডাকসাইটে ছেলে, প্রোফেসর ম্যাকিণ্টরের একনম্বরের ছাত্র জ্যাককে যে এমন কথা মুখোমুখি কেউ বলতে পারে এ ছিল তার ধারণার বাইরে। বিশেষ করে একটা স্ত্রীলোক! রাগে তার গলা বন্ধ হয়ে গেল। কোন কথাই সে বলতে পারল না।

মেয়েটি খুব স্বাভাবিক ভাবে জিমিকে একবার ভাল করে দেখে এসে বললে, আমি এবার চলি। রাত অনেক হল, আপনার বন্ধু এখন ঘুমোচ্ছেন—

জ্যাক গম্ভীর মুখে দরজার কাছে এসে বললে, গুড বাই—

মেয়েটি পাহাড়ী ঝরণার মতো কুলকুল করে হেসে উঠল একবার। তারপর হাসি থামিয়ে তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় বললে, খুব রেগেছেন দেখছি আমার ওপর। আপনার বন্ধুকে পেঁছেদিলাম তার জন্যে একটা ধন্যবাদ তো দিলেনই না উপরন্তু চিরদিনের জন্যে গুড্‌বাই করছেন। মানে আমার মুখটাও আর দেখতে চান না। কিন্তু একই ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমরা, বলা যায় না আবার কখন কীভাবে দেখা হয়ে যায়—সুতরাং আপাততঃ গুড্‌নাইট—

মেয়েটি হেসে জ্যাকের হাতটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে পিছন ফিরল। তার লম্বা একহারা চেহারাটা যতক্ষণ দেখা গেল রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যাক দেখতে লাগল।

আজ তার আত্মাভিমানে প্রচণ্ড ঘা লেগেছে। ভিতরটা তার টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু আলো নিভিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়তেই তার দুচোখের সামনে ভেসে উঠল সেই অনবদ্য সুন্দর মুখখানা। কালো মেয়ে—তবু তার চেহারা থেকে রূপের আলো ঠিকরে বার হচ্ছে। মনে মনে সে খালি বলতে লাগল, অদ্ভুত মেয়ে তো। আমি আগে একে দেখি নি কেন—

আস্তে আস্তে তার মনের ভিতরকার সব উত্তাপ জল হয়ে গেল। কেবল সেখানে একটা তীব্র ইচ্ছা মাথা কুটতে লাগল—মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্টতা করার।

পরের দিন সকালে জিমির ঘরে গিয়ে জ্যাক দেখল জিমির ঘুম ভেঙেছে।

তখনও বিছানায় শুয়ে। জ্যাককে দেখে জিমি জড়িয়ে জড়িয়ে গুড্‌উইস্‌ করল। গত রাতের খোঁয়াড়ি তার তখনও ভাঙে নি। তার নাক মুখও বিচ্ছিরি হয়ে ফুলে উঠেছে।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করল—এখন কেমন আছ—

জিমি বললে, মাথাটা বড় ভারী হয়ে আছে। তা ছাড়া নাকে চোখে বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। জানোয়ারটা কাল সন্ধ্যেবেলায় আমাকে বড্ড ঠেঙিয়েছে।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করল—জানোয়ারটা কে ?

জিমি মুখ খিঁচিয়ে বিকৃত স্বরে জবাব দিল—ঐ কুত্তার বাচ্চা ফিলিপ—

ফিলিপ জিমির নিত্যকার মদ খাওয়ার সঙ্গী। বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সবচেয়ে কুখ্যাত গুণ্ডা। মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের এমনিতেই একটু বদনাম আছে। রাতের অন্ধকারে তারা অনেক কুকীর্তি করে থাকে। তাদের সভ্যদের মধ্যে ফিলিপের শরীরটা সবচেয়ে প্রকাণ্ড। লম্বা-চওড়ায় নিজেই সে একটা ক্ষুদে পাহাড়। যেমন তার শরীর স্বভাবটাও তার তেমনি দুর্ধর্ষ। ইউনিভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রী মহলে সে একটি জীবন্ত আতঙ্ক। বেশ কয়েকবার ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তাকে তাড়িয়ে দেবার কথা ভেবেছে। কিন্তু চাম্পিয়ান স্পোর্টসম্যান, মাউন্টেনিয়ার ফিলিপকে তাড়ান খুব সোজা কাজ নয়। শরীরের অনুপাতে তার মদ খাওয়ার শক্তিও অদ্ভুত। দশবারো বোতল বিয়ার তিনটে হুইস্কির বোতল সে এক জায়গাতে বসে বিনা আয়াসে শেষ করতে পারে। তার সঙ্গে মদে পাল্লা দিতে এক জিমি ছাড়া আর বড় একটা কেউ পারে না। তাই জিমির চেহারাটা ফিলিপের ঠিক বিপরীত হলেও দুজনে সন্ধ্যের সময় একটা পাবে পাশাপাশি বসে মদ খায়। এটা ফিলিপ আর জিমির নিত্যকারের কাজ। জ্যাক সে কথা সবই জানে।

সে বললে, তা ফিলিপ হঠাৎ তোমাকে কাল ঠেঙাতে গেল কেন ?

জিমি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলতে লাগল, সে কেচ্ছার কথা আর বোলো না। ফিলিপটা তো আর সভ্যভব্য কোন দিন হল না। চিরকাল গোঁয়ার থেকে গেল। যাকে বলে একেবারে জানোয়ার তাই। গত রাতে আমরা পাবে বসে মদ খাচ্ছিলাম, দেখলাম পাবের উল্টোদিকের একটা রেস্টুরেন্টে একটা কালো মেয়ে ডিনার খেতে ঢুকল। মেয়েটা নতুন এসেছে, ফ্রেশ ফ্রম ইণ্ডিয়া। একেবারে যাকে বলে একটা চার্মিং ব্ল্যাকবার্ড। আমি তাকে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি। সে কখন কোথায় যায়, কি করে, সব খবর আমার আঙুলের ডগায়। মেয়েটা রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় ফিলিপকে দেখালাম।

ফিলিপ বললে, আমি কয়েকদিন চেষ্টা করে দেখেছি। মেয়েটি কিছুতেই ভিড়তে চায় না। তাই হাল ছেড়ে দিয়েছি। বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কী ?

জিমি বললে, তোমার চেহারাটাই হোঁৎকা। মেয়েদের মন ভোলাতে গেলে

যে সব গুণ থাকার দরকার সে সবের কোনটাই নেই।

জিমির কথায় ফিলিপের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। সে বললে, তুমি যদি ঐ মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পার তবে একমাস তোমার মদের খরচ আমি চালাব। কি রাজী?

জিমি লাফিয়ে উঠে বললে, এক্ষুনি রাজী। চল তুমি আমার সঙ্গে।

মেয়েটি ডিনারের পর রেস্টুরেন্ট থেকে বার হয়ে সটান হাঁটতে লাগল। হাইস্ট্রীটের পাড়া ছেড়ে হেঁটে যেতে লাগল এডিশন ওয়াক ধরে ম্যাগডালেন কলেজের দিকে। এ রাস্তায় আলো বড় কম। দুদিকে জঙ্গল, অন্ধকারে ভরা, নির্জন রাস্তা। মেয়েটি আপন মনে নেই রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। পিছনে চলতে লাগল জিমি আর ফিলিপ। এক জায়গায় এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। জিমি ফিলিপকে বললে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে। জিমি জানে মেয়েটি ডিয়ার পার্ক পর্যন্ত গিয়ে এক্ষুণি ফিরে আসবে। নিত্য সে এই রকম যায় আর আসে।

জিমি তার ভারতপ্রবাসী কোন এক মিলিটারী বন্ধুর কাছে কবে নাকি শুনেছিল, ভারতবর্ষের মেয়েরা ভয়ানক লাজুক। তার মানে তারা যে পুরুষের সঙ্গ চায় না এমন নয়। বরঞ্চ তারা গরম দেশের মেয়ে বলে তাদের ভিতরকার গরমও যথেষ্ট বেশী। পুরুষদের সঙ্গ খুব বেশী করেই পেতে চায়। লজ্জার জন্যে তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। কাজেই যদি কোন পুরুষ কোন ভারতীয় নারীকে পছন্দ করে তবে কোন কিছু না দেখে তাকেই এগিয়ে যেতে হবে আগে। সব লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সেই মেয়ের কামনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। জিমিও মনে মনে সেই কথা ভেবে রেখেছে। এদিকে মাত্রাতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যে তার পা দুটো টলছে। ফিলিপেরও সেই একই অবস্থা। জিমি ফিলিপকে আবার গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করল।

ফিলিপ হঠাৎ গর্জন করে উঠল—আমি একপাও নড়ব না এখান থেকে—

জিমির প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল ফিলিপের ওপর। গোঁয়ারটা এক্ষুণি বুঝি সব মাটি করে। সে দাঁতে দাঁত পিষে বললে, ইউ সিলি ফুল—

বলার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি মার মারতে লাগল। জ্ঞান হারাবার আগে জিমি দুবার 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলে চেঁচাতে ফিলিপ পুলিশের ভয়ে জিমিকে একলা ফেলে চম্পট দিয়েছে।

জিমির মুখে সব গল্পটা শুনে জ্যাক মরমে মরে যেতে লাগল। ছিঃ ছিঃ, গতকাল ভদ্রমহিলাকে মিথ্যে মিথ্যে সন্দেহ করে কি বিশ্রী কাণ্ডই না করে ফেলেছে সে। মনে মনে সে নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগল। ঠিক করল, সেই মেয়েটির দেখা পেলে তার কাছে সে ক্ষমা চাইবে। আর তাকে বন্ধুর মতো পরামর্শ দেবে, এডিশন ওয়াকের রাস্তায় সে যেন সন্ধ্যার পর একলা না বেড়ায়।

এমন সময় বাইরের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। জ্যাক উঠে গেল দরজা খুলতে। দরজা খুলে দাঁড়াতেই গত রাতের সেই কালো মেয়েটি তাকে গুড উইস্ করল।

তার দিকে চেয়ে জ্যাকের তাকে গুড উইস ফিরিয়ে দেবার কথাটা বোধহয় ভুল হয়ে গেল। পরণে তার হাল্কা সবুজ রংএর একখানা সিল্কের শাড়ী। তার সঙ্গে মানানসই রং-এর একখণ্ড শাল গায়ে জড়ান।

জ্যাকের মনে হল এ যেন একটা আবির্ভাব। জ্যাককে দেখে মেয়েটি মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করল—আপনার বন্ধু কেমন আছেন—

মেয়েটির দাঁতগুলি ঠিক সমান আকারের সাজান মুক্তোর মালা। ওর কালো রংএর সঙ্গে সাদা নিখুঁত দাঁতের হাসিটা জ্যাকের মনে বসন্ত দিনে রোদের রং ফলিয়ে তুলল।

এতক্ষণে জ্যাকের হুঁশ হল। তাড়াতাড়ি বললে, জিমি আজ মোটামুটি ভালই আছে। তা আপনি দয়া করে একটু ভিতরে আসবেন কি?

মেয়েটি দুপা এগিয়ে ভিতরে ঢুকল।

জ্যাক কিন্তু তাকে নিয়ে জিমির ঘরে গেল না। নিজের ঘরের দরজা খুলে মেয়েটিকে অনুরোধ করল ভিতরে বসতে। বাড়িওয়ালীর মেয়েকে ডেকে কিছু চায়ের বন্দোবস্ত করতে বলে মেয়েটির কাছে এসে বসল।

একটু চুপ করে থেকে মাথা নীচু করে সে বললে, গত রাতে আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে—আমাকে আপনি ক্ষমা করুন—

মেয়েটির হাসি ভরা মুখের একটা রেখারও পরিবর্তন হল না। সে তেমনি মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করল—হঠাৎ ক্ষমা করতে হবে কেন—

জ্যাক বললে, হঠাৎ নয়, গতকাল জিমির ঐ অবস্থার জন্যে যে আপনি দায়ী নন এটা আজ সকালে জিমির কাছ থেকে জানতে পারলাম। জেনে পর্যন্ত মনে স্বস্তি পাচ্ছি না। মনে মনে ভেবেছিলাম আপনার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি। কিন্তু আপনার ঠিকানাটাতো আমি জানতাম না।

একটু চুপ করে থেকে বললে, দোহাই আপনার, রাত্রের অন্ধকারে ঐ জঙ্গুলে পথগুলোতে একা একা বেড়ান বন্ধ করুন।

মেয়েটি বিস্মিত চোখ তুলে বললে, কেন?

জ্যাক বললে, মেয়েদের পক্ষে ওটা নিরাপদ নয়।

মেয়েটি আবার মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বললে, এ কথাটা ভারতবর্ষ হলে মানতে বাধ্য হতে হত। কিন্তু দুনিয়ার লোক জানে বৃটিশ জাত নারীর সম্মান রাখে।

জ্যাক বললে, কথাটা খুবই সত্যি। বৃটিশের বেশীর ভাগ পুরুষের কাছে নারীর সম্মান একটা আবশ্যকীয় কর্তব্য। তবে একথাটাও সত্যি যে বৃটেনে দুষ্টু

লোকের অভাব নেই। তাই বেশীর ভাগ ভাল লোকের কথা ভেবে তো আর সমাজের দুষ্টু লোকেদের তুচ্ছ করা যায় না। তারা দলে ভারী না হলেও তারা যে একাই একশ।

মেয়েটি একটু হেসে বললে, দুষ্টু লোকের ভয়ে আমি আমার সান্ধ্যভ্রমণটুকু বাদ দেব, এ কেমন অনুরোধ আপনার? তা হবে না। আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না। আমাকে মাফ করুন।

জ্যাক মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। মেয়েটি জানে না ফিলিপ কী রকম দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। সেবার একটি স্প্যানিশ মেয়েকে সে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার বাসায়। মেয়েটি পুরো সাতদিন বিছানা থেকে উঠতে পারে নি তার পরে। জিমির মুখেই জ্যাক এ গল্প শুনেছে। তাই সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল, আমাকে আপনি যদি আপনার বন্ধু বলে মনে করেন তবে কৃতজ্ঞ হই। আমি আপনাকে যে পরামর্শ দিচ্ছি সেটা দয়া করে বন্ধুর পরামর্শ বলে মনে করবেন।

মেয়েটি হাসিভরা মুখে তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললে, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, আপনার পরামর্শের জন্যে। আপনি যে আমাকে আপনার বন্ধু হবার সুযোগ দিলেন তার জন্যেও আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করুন। কোন কিছুর ভয়ে আমি আমার নিত্যকার অভ্যাস ছেড়ে দেব বা পথ বদলাব, এ জীবনে আমি কোনদিন করি নি। আপনি দয়া করে আমাকে এ অনুরোধ করবেন না।

জ্যাক দেখল অনুরোধ বৃথা। সে চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে বাড়িওয়ালীর মেয়েটি চা নিয়ে এল ঘরে। কালো মেয়েটিকে দেখে সে যেন দুচোখ দিয়ে তাকে গিলতে লাগল। জ্যাক তার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিতেই বাড়িওয়ালীর মেয়ে বেশী কথা না বলে ঘর থেকে গোমড়া মুখ করে বার হয়ে গেল।

জ্যাক আর মেয়েটি ঘরে বসে আলাপ করতে লাগল।

এই হল অনীতা বোসের সঙ্গে জ্যাকের প্রথম আলাপের সূত্রপাত।

সেইদিন সন্ধ্যার পর অনীতা রীতিমত বিস্মিত হল জ্যাককে তার বাড়িতে আসতে দেখে। সন্ধ্যার ডিনারের পর সে প্রস্তুত হচ্ছিল তার সান্ধ্যভ্রমণের জন্যে। জ্যাক এসে বললে, আমি কী আপনার সঙ্গে আসতে পারি—

অনীতা হাসিমুখে বললে, চলুন চলুন—

এর পর থেকে জ্যাকের নিত্যকার কাজ হল ডিনারের পর অনীতার সান্ধ্য-ভ্রমণে সঙ্গ দেওয়া।

॥ ৩০ ॥

অনীতাকে সান্ধ্যভ্রমণে সঙ্গ দেবার ফলে জ্যাকের অন্যদিকের জীবনটায় ভাঁটা পড়ল। জিমির সঙ্গে বারে গিয়ে যখন তখন মদ খাওয়া তাকে ছাড়তে হল। এদিকে রোজ মেরীও রোজ সন্ধ্যাবেলা জ্যাকের খোঁজে এসে তাকে বাসায় না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

সপ্তাখানেকের মধ্যেই জিমি জ্যাকের নতুন সঙ্গী সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠল। কয়েক দিনের মধ্যেই সে আবিষ্কার করে ফেললে, জ্যাক সেই কালো মেয়েটার সঙ্গে খুব ভাল ভাবেই জড়িয়ে পড়েছে।

একদিন প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর স্বয়ং জ্যাককে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনীতার সঙ্গে নতুন করে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, এই হল আমার ছাত্র জ্যাক। আর এ প্রাচ্যের এক বিদুষী,অনীতা বোস—আমি ওর গুণমুগ্ধ। তারপর অনীতার দিকে রহস্য ভরা চোখ তুলে বললেন, তা বলে তুমি যত বড় আস্তিকই হও না কেন জ্যাকের নিরীশ্বরবাদের কাছে তোমার কোন যুক্তিই পাত্তা পাবে না। এ আমি জোর করে বলতে পারি।

বলেই হো-হো করে হাসতে লাগলেন প্রোফেসর। কিছুক্ষণ পরে অনীতা চলে যেতেই তিনি জ্যাককে বললেন, অদ্ভুত মেয়ে। স্ত্রীলোক যে এত উঁচু অস্মিতার অধিকারিনী হয় তা আমার আগে জানা ছিল না। আমি ওকে বেশ কতদিন নাড়াচাড়া করে দেখলাম। ওর জ্ঞানের যা পরিধি তাতে ও আমাদের নিঃসন্দেহে শেখাতে পারে।

জ্যাক মনে ভাবল প্রোফেসর অনীতাকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়িই করছেন। অনীতাকে প্রশংসা করা যায় সত্যি। তা বলে—এতটা! জ্যাকের মনে অনীতা সম্বন্ধে বেশ একটু ঈর্ষা এসে গেল।

সেদিন জ্যাক সান্ধ্যভ্রমণের সময় অনীতার সঙ্গে কথায় কথায় তর্ক তুলতে লাগল। কিন্তু অনীতা তার তর্কের মধ্যে একেবারেই মাথা গলাল না।

জ্যাক বললে, শুনেছি আপনি নাকি ভয়ানক ঈশ্বর বিশ্বাসী?

অনীতা হাসি ভরা চোখ তুলে বললে, তাই নাকি? তা কার কাছে শুনেছেন—

প্রোফেসরের কাছে। প্রোফেসর নিজে একজন আস্তিক। তাই তাঁর কাছে আস্তিক মাত্রেই উঁচু আসন পেয়ে থাকে।

অনীতা হেসে জবাব দিল—কিন্তু আপনি তো একজন পাকা নাস্তিক। তবু তাঁর সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে বসে আছেন—

জ্যাক বললে, উনি আমাকে স্নেহ করেন এই পর্যন্তই—

স্নেহের আসনটা কী সবচেয়ে বড় আসন নয় ? বললে অনীতা—

জ্যাক চুপ করে পথ হাঁটতে লাগল। সে আজ মনে মনে তৈরী হয়ে এসেছিল অনীতাকে যুক্তি তর্কের মধ্যে টেনে আনবে। প্রমাণ করবে যে যুক্তিবাদী জ্যাককে অত সহজে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না।

অনীতা ধীর শান্তভাবে তার সেই যুদ্ধোদ্যত মনোবৃত্তিকে এড়িয়ে গেল দেখে তার মনের ভিতরটা নিস্‌পিস্‌ করতে লাগল। শেষে ম্যাকডালেন কলেজের ডিয়ার পার্কের কাছে এসে সে আর থাকতে পারল না। বললে, আপনি আজ সন্ধ্যা থেকে আমার কথাগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন—আমাকে আজ শুনতেই হবে আপনার ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিতটা কোথায়—

ওরা দুজনে ডিয়ার পার্কের মধ্যে গিয়ে একটু আবছা আলোয় একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল। অনীতা আগের মতই হাসতে হাসতে বললে, আপনি আমায় খুব বিপদে ফেললেন কিন্তু—ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিতের খবর আমি আপনাকে কেমন করে দেব। খুঁড়ে দেখতে গেলে আমার বাপ পিতামহ থেকে হয় তো কয়েক শ পুরুষ পিছনে তার অস্তিত্ব মিলবে।

জ্যাক এবার একটু বাঁকা হাসি হাসল। বললে, সব অন্ধবিশ্বাসের মূলেই আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তের মধ্যে গেঁথে আছে। তাদের সেই অন্ধবিশ্বাসকে মেনে চলা মানে কি এই বোঝায় না যে আমরা সভ্যতার পথে এক চুলও এগোই নি।

অনীতা শান্ত ধীর স্বরে বললে, তা কেন ? সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের মনের বিশ্বাস ভালবাসার কী লোপ হবে আশা করেন ? তারা আগেও যেমন ছিল তেমনি এখনও থাকবে। কিন্তু আপনি অন্ধবিশ্বাস বলে কি বোঝাতে চাইছেন—

জ্যাক বললে, ধরুন না কেন এই ভূতের ভয়। আধুনিক জ্ঞান প্রমাণ করেছে, ভূতের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই যারা ভূতে বিশ্বাস করে তারা অন্ধবিশ্বাসী ছাড়া আর কী ? তাদের তো কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না—

অনীতা আগের মতোই ধীর ভাবে বললে, আপনি মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে কী করে বলেন যে ভুত নেই। আমি কিছুদিন আগেই পড়েছিলাম এক ধরনের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই ভুত দেখেন। সে ভুতের চেহারা কেমন তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্যে রোগীর যে ভয় তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। ভুত দেখাকে অন্ধবিশ্বাস বলে যদি আমরা অস্বীকার করি তা হলে আমরা ভুল করব না কি ? আমাদের সেই অন্ধবিশ্বাসকে মেনে নিয়েই তার প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে। সেই রোগীর চোখে যেদিন ভুতের সত্য রূপটা প্রকাশ পাবে সেদিন ভূতের ভয় থেকে তার মুক্তি হবে। তেমনি ঈশ্বরে বিশ্বাসকেও অন্ধবিশ্বাস বলে অস্বীকার করলে চলবে না। এ বিশ্বাসকে

মেনে নিতে হবে। হতে পারে সে বিশ্বাস অনেক সময়ে ভ্রান্ত পথে চলে মানুষের মনে ও সমাজে নানান সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যুগ যুগান্তরের এই যে বিশ্বাস একে দুকথায় উড়িয়ে দেওয়া তো চলে না। আমাদের আসল কর্তব্য ঈশ্বরের সত্য রূপটা জানা ও সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাকে জানান। মানুষ যেদিন সে কাজ পারবে সেদিন তার বিশ্বাস হবে নির্মল আর হিমালয়ের মতো অটল। সেদিন তার মন থেকে সমস্ত ভয়, সমস্ত দ্বন্দ্ব, সমস্যার অবসান হবে। সেই দিনই হবে মানুষের আসল মুক্তি। আর এ জানাতেই হবে মানব কালচারের আসল পরিণতি।

জ্যাক উদ্ধত ভাবে বলে উঠল, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন বলেই ও কথাগুলো বললেন। আসলে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুললেও বর্তমান সভ্য মানুষের বেশ চলে যায়।

অনীতা মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে বললে, চলে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক আজও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তাদের ভালবাসতে গেলে, তাদের অবস্থার ভাল-মন্দ, অতীত-ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাবতে গেলে, এক কথায় এই গোটা মানুষ জাতটার সঙ্গে যে আপনার নাড়ীর যোগ আছে তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে গেলে, ঈশ্বরবিশ্বাসের মতো এতো বড়ো মাধ্যম আর নেই। যে নিজেকে এই বিশ্বাসের থেকে দূরে রাখে—সে আত্মঅহংকারী কূপমণ্ডুক। সাধারণ মানুষ হয় তাকে ভয় করে, না হয় করে ঘৃণা। ভালবাসে না।

বলতে বলতে শেষের দিকে অনীতার গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল। মনে হতে লাগল তার অন্তরের গভীর কোন স্তর ভেদ করে এই কথার উৎস বার হয়ে আসছে। জ্যাকের হঠাৎ মনে হল এগুলো কথা নয়, আলোর তীর। অনীতার শেষের দিকের কথাগুলো—সটান তার মনের মধ্যে গিয়ে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। এ চিন্তা তার আত্মজিজ্ঞাসার চিন্তা। আজ এই প্রথম সে সব আবরণ ঘুচিয়ে নিজের মুখোমুখি হয়ে বসল। দেখল ভিতরে সে ভয়ানক নিঃস্ব, ভয়ানক একা—তাই বাইরে সে এতো দাম্ভিক।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পার্কের মধ্যে। শেষে দূরের ঘড়িতে বারোটা বাজার গম্ভীর শব্দটা দুজনের কানে এসে বাজতে ওদের হুঁশ হল।

জ্যাক বললে, চলুন যাই—

অনীতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলুন। শীতটা আজ বড্ড কড়া। একটু তাড়াতাড়ি রাস্তা হাঁটতে হবে।

জ্যাকের তাড়াতাড়ি হাঁটার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অনীতাকে অগত্যা জ্যাকের সঙ্গে তাল রেখেই হাঁটতে হল। হাঁটতে হাঁটতে একটি তীব্র আসঙ্গলিপ্সা জ্যাকের মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। এই নির্জন রাস্তা, এই অদ্ভুত নারী তার সঙ্গী। এর রূপে সে আকৃষ্ট হয়েছে, তৃষ্ণার্ত হয়েছে।

তাছাড়া আজ সে নিজের নিঃসঙ্গতা যেন সহ্য করতে পারছে না। জ্যাক তার বাঁ হাতটা অনীতার কোমরে জড়িয়ে ধরল।

চলতে চলতেই খুব আস্তে অনীতা নিজেকে জ্যাকের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিল। চলতে লাগল জ্যাকের পাশে। তার চালচলনে এতটুকু বৈলক্ষণ্য নেই, নেই কোন রকম চাঞ্চল্য।

রাতে জ্যাক অনীতার বাড়ি পর্যন্ত চলে এল। তার মোটেই ইচ্ছা করছিল না নিজের বাড়িতে ফিরতে। অনীতাও তাকে ভিতরে ডেকে এনে বসাল। একটু মিষ্টি হেসে বললে, কি, মাথায় আপনার ঈশ্বর চিন্তা ভর করল না কি ?

বলতে বলতে ঘরের উনুনে চায়ের কেটলী চাপাল অনীতা।

ইতিমধ্যে অনীতার ঘরে আওয়াজ পেয়ে তার বাড়িওয়ালী উঠে এসেছে। দরজায় টোকা মেরে সে ঘরে ঢুকে একটুকরো কাগজ অনীতার হাতে দিয়ে গেল। বললে, একটু আগে এই কেব্‌ল্‌টা এসেছে কলকাতা থেকে।

অনীতা সেটা হাতে নিয়ে এক নজরে দেখে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা ছাইয়ের মতো পাঁশুটে হয়ে গেল। সেটা এক মুহূর্তের জন্যে।

জ্যাক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি কি দেখতে পারি কেব্‌ল্‌টা—

অনীতা মৃদু হাসির রেখা টেনে বললে, নিশ্চয়—কেব্‌ল্‌টা সে দিল জ্যাকের হাতে। তারপর চা তৈরী করতে লেগে গেল।

কেব্‌ল্‌টা এক নজরে পড়েই জ্যাকের মনটা ছাঁৎ করে উঠল। তাতে লেখা আছে—তোমার বাবার শেষ অবস্থা। এক সপ্তার বেশী বাঁচবেন না। তোমাকে খুব দেখতে চাইছেন। তোমার মা।

জ্যাক কেব্‌ল্‌টা হাতে নিয়ে শুকনো মুখে চুপ করে বসে রইল। তার মন থেকে সব রকম আসঙ্গ লিপ্সা এর মধ্যে লোপ পেয়েছে। সে ভাবছে অনীতার কথা, দেখছে অনীতাকে। আশ্চর্য ! যে কোন মেয়ে এই সংবাদ পেলে এর মধ্যে কেঁদে কেটে হাট পাকাত। কিন্তু অনীতার মুখটা শুধু একটু গম্ভীর, চোখ দুটো একটু আনত। ব্যস্‌ এই পর্যন্ত। সে যেন এক মনে চা তৈরী ক:তেই ব্যস্ত। মেয়েটার মন বলে কি কোন পদার্থ নেই !

দু কাপ চা তৈরী করে অনীতা এসে জ্যাকের সামনে বসল। জ্যাক বললে, আপনার বাবা অসুস্থ ছিলেন কে সে কথা তো জানতাম না—

ছোট একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ভাবতে পারি নি বাবা এতো শীঘ্র যাবেন—

জ্যাক বললে, তিনি যাবার আগে আপনাকে খুব দেখতে চাইছেন—

অনীতা তেমনি একটা ম্লান হাসি হাসতে হাসতে বললে, খুবই স্বাভাবিক। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তবে তিনি জ্ঞানী। তিনি জানেন পৃথিবীতে চাওয়া মানেই দুঃখ পাওয়া। কিন্তু আমার তো এখান থেকে যাবার

এখন কোন উপায় নেই।

জ্যাক বললে, কেন—

অনীতা এবার বড় দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেললে। বললে, আপনি নিতান্তই ছেলেমানুষ। বাবাকে দেখতে গেলে আমার জাহাজে যাওয়া চলবে না। প্লেনে গেলে হয় তো তিন চার দিনের মধ্যে পেঁছিতে পারি। আমি এখানে এসেছি ইউনিভার্সিটির সামান্য স্কলারশিপ নিয়ে। আমার পড়ার খরচও চালাচ্ছি কোন রকমে। তার মধ্যে প্লেনে কলকাতা যাতায়াতের কথা তো আমার কাছে স্বপ্ন। আমার বাবারও এতো সামর্থ নেই যে তিনি এ খরচের টাকা রেখে যেতে পারেন। সুতরাং ওকথা না ভাবাই ভাল—

একটুকরো হাসি হেসে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে বলে উঠল, তাই বলে আপনি চায়ে চুমুক দেওয়া বন্ধ করবেন না। এটা ঠান্ডা করে কোন লাভই নেই।

অনীতা এবার চোখ তুলে দেখল, জ্যাকের চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। তার নীচের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছে। একটু সামলে নিয়ে জ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, গুড্ নাইট। আবার কাল দেখা হবে—

বলে সটান পিছন ফিরে অনীতার ঘর থেকে বার হয়ে গেল। অনীতা তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে দেখল জ্যাক সামনের পথে ঘাড় হেঁট করে হেঁটে চলেছে। অন্য দিনের মতো একবারও পিছন ফিরে সে আজ হাত নাড়ল না।

পরের দিন তখনও বোধ হয় দুধের গাড়ি পাড়ায় আসে নি, রাস্তায় লোক চলাচলও ভাল করে শুরু হয় নি, জ্যাক এসে হাজির অনীতার বাসায়। অনীতা তখন সবে তার সকালের প্রার্থনায় বসবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। জ্যাককে এতো সকালে আসতে দেখে খুবই অবাক অনীতা। বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার? এতো সকালে—

জ্যাক বললে, গত রাতে আমি ভেবে দেখলাম আপনাকে আমি প্লেনে কলকাতা যাতায়াতের টাকাটা দিতে পারি। আপনি ইচ্ছা করলে সেটা নিতে পারেন—

অনীতা তার স্বাভাবিক মৃদু হাসি হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু নিলেই তো হবে না। আমি আপনার সে টাকা শুধব কেমন করে—

জ্যাক বললে, সে সম্বন্ধে আমার সর্ত রইল, আপনি যতদিনে যেমন ভাবে পারেন তা শোধ করবেন।

—কিন্তু আপনি এতো টাকা পাবেন কোথায়—

—আমার গ্রামের বাড়িটা আজই আমার এ্যাটর্নীর কাছে বাঁধা দেব ঠিক করেছি। তাতে আপনার যাতায়াতের খরচ বেশ চলে যাবে। বলুন আপনি নিতে রাজী কি না—বললে জ্যাক।

অনীতা এবার একটু গম্ভীর হল। বললে, না, তা হয় না—

জ্যাক বিস্মিত হয়ে বললে, কেন—

—যে ঋণ আমার শোধ করবার সামর্থ কোনদিন হবে কি না তা আমি নিজেই জানি না, সে ঋণ আমি কেমন করে নেব—বললে অনীতা।

অনীতার কথায় জ্যাকের সারাটা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিদারুণ যন্ত্রণায় তার চোখ দুটো ছোট হয়ে এল। কপালের উপর বলীরেখা দেখা দিল। সে কোন কথা বলতে পারল না। শুধু সেই যন্ত্রণাকাতর মুখটা নিয়ে চুপ করে বসে রইল অনীতার সামনে।

অনীতা সেই গর্বোদ্ধত, বাক্‌চতুর, ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলে জ্যাকের আর একটা মূর্তি দেখতে পেল। মনে মনে সেও দুঃখ পেল কম নয়। তবু তার নিজের কাছে সে নিজে প্রশ্ন করল—আমি ওর টাকা নেব কোন অধিকারে—

জ্যাক্ ইতিমধ্যে একটা কান্ড করে বসল। সে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল অনীতার দিকে। তার হাত দুটো নিজের দু হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, মানুষের কাছ থেকে আমি অনেক আঘাত পেয়েছি। তবু মানুষের কষ্ট আমার সহ্য হয় না। বিশ্বাস করো, আজ আমার এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তোমাকে অদেয় থাকতে পারে। আমি নাস্তিক বলে তুমি আমায় ঘৃণা কোরো সে আমার সহ্য হবে, কিন্তু টাকাটা তুমি ফিরিয়ে দিও না। সে দুঃখ হয়তো আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

অনীতা হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না। জ্যাকের মুখের দিকে শুধু বিস্মিত চোখ তুলে দেখল। তার চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ছে। হঠাৎ তারও দুটো চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল। সে জ্যাকের হাত ধরে সোফার উপর বসাল। ধীর গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল, তোমাকে নাস্তিক বলে যে ঘৃণা করবে সে ভুল করবে। তুমি তো নাস্তিক নও। বাইরে তুমি যাই হও না কেন ভিতরে তুমি পরম আস্তিক—

জ্যাক ম্লান হাসি হেসে বললে, তবুও ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই—

অনীতা চোখের জল মুছে বললে, মানুষকে যে ভালবাসে ঈশ্বরকেও সে ভালবাসে। তা মুখে সে ঈশ্বরের নাম করুক বা না করুক। তোমার অন্তরে যে গভীর ব্যথা জমে রয়েছে তারই জন্যেই কি তুমি নাস্তিক হতে চেয়েছ? যদি কিছু মনে না কর, তোমার সেই ব্যথার ইতিহাস আমায় কিছু শোনাবে কি?

জ্যাক তার এতখানি জীবনের মধ্যে এমন সঙ্গী দুবার মাত্র পেয়েছিল—তাঁরা ছিলেন ফাদার টিসল্ ডেভিস্ আর তার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, নতুন মা। তার পর যারা তার সাহচর্যে এসেছে তাদের কেউই তার পুরনো জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী উৎসুক ছিল না। জিমি তার বন্ধু কিন্তু অন্তরের অন্তরঙ্গ সে কোন

দিনই না। একদিন সে নেশার ঝোঁকে জিমিকে ভীনার গল্প শুনিয়েছিল। পরে সে বুঝতে পেরেছিল, জিমি তাকে ঠিক মতো চিনতে পারে নি। রোজ মেরী কাছে আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু জ্যাককে বোঝবার মতো মন তারও নয়।

জ্যাক অনীতার সামনে বসে একটু একটু করে তার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো বলে গেল সেদিন। অনীতাও তার গল্প শুনতে লাগল তন্ময় হয়ে। শুনতে শুনতে কখনও তার মুখে ফুটে উঠল হাসি। কখনও চোখ ছাপিয়ে এল জলের ধারা। দুজনের কারুরই খেয়াল রইল না বাইরে লাঞ্চের সময় গড়িয়ে গেল। দুজনের কেউই সচেতন মন নিয়ে জানল না যে তারা পরস্পর কতো কাছে এসে পড়েছে।

গল্প শেষ হতেই অনীতা জ্যাকের হাত দুটো তার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, তোমার কথাই মানলাম। তুমি আমায় টাকাটা দাও, আমি কলকাতায় যাব—

জ্যাক আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললে, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি—

শেষ অবধি অনীতার কলকাতায় যাওয়া হল না। লণ্ডনে প্লেন ধরবার আগেই সে খবর পেল তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। নিরালায় খানিকটা চোখের জল ফেলে সে আবার অক্‌স্‌ফোর্ডে ফিরে এল। অক্‌স্‌ফোর্ডে ফেরবাব আগে সে লণ্ডন থেকে একখানা চিঠিতে জ্যাককে তার বাবার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে লিখেছিল— এই পৃথিবীতে আজ আমি সত্যিকারের সঙ্গীহারা হলাম। আমার বাবা ছিলেন আমার সব রকম জ্ঞানের দীক্ষাগুরু। আমার সব সময়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। তবে ঈশ্বর কাউকে সর্বহারা করেন না। বাবা গেলেন বটে, সেই সঙ্গে পেলাম তোমাকে। তোমার মতো বন্ধু পাওয়াও একটা ভাগ্যের কথা বৈকি।

জ্যাক অনীতার সেই চিঠিখানা পেয়ে দুঃখ যত না পেল আনন্দ পেল তার বহুগুণ বেশী। নির্দিষ্ট সময়ে সে স্টেশনে গিয়ে অনীতাকে নামিয়ে নিয়ে এল। দেখল অনীতার মুখে চোখে তার পিতৃবিয়োগের এতটুকু চিহ্নও নেই। বরঞ্চ স্টেশনে জ্যাককে দেখে খুশী হয়ে উঠল ছেলেমানুষের মতো। সে তার একটা হাত জড়িয়ে ধরে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল।

লণ্ডন যাবার আগে অনীতা তার বাসা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। তাই জ্যাক তাকে নিজের বাসাতেই এনে তুলল। সেখানে বাড়িওয়ালীকে রাজী করে একটা ঘরও তার জন্যে ঠিক করে দিল।

এর পর থেকে জ্যাকের দিনগুলো অদ্ভুত একটা মাদকতায় ভরে উঠতে লাগল। সে ভাবল অনীতাকে সে বিয়ে করে সংসার পাতবে। তার চাল-চলনে এল একটা নিদারুণ পরিবর্তন। সেই উদ্ধত, দাম্ভিক, কূটতার্কিক জ্যাক কোথায় যে মাথা লুকোল তার খবর জ্যাক নিজেই জানল না। ইউনিভার্সিটিতে

সে একদিন প্রোফেসরকে গিয়ে ধরে বসল।

বললে, স্যর, আমি গবেষণার বিষয় বদল করতে চাই—

প্রোফেসর কৌতুক করে বললেন, কেন, জ্ঞানতত্ত্বের আগডালে পেঁছে গেছ নাকি তুমি এর মধ্যে—

জ্যাক মাথা নীচু করে বললে, না স্যর, এপিস্টেমোলজি বড় শুকনো লাগছে। ভাবছি প্রাচ্যদর্শন কিছুদিন নাড়াচাড়া করে দেখব।

—বুঝেছি, ভারতবর্ষের সেই কালো মেয়েটির প্রেমে পড়েছ তো? প্রোফেসর হো হো করে হেসে বললেন।

তারপর আপন মনে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই তো বটে, তাই তো বটে। তোমার সঙ্গী জিমি আমাকে কদিন আগে খবর দিচ্ছিল, তুমি তোমার বাড়ি বিক্রী করে সেই মেয়েটিকে কলকাতায় যাতায়াতের খরচ দিয়েছ। তা ছাড়া তোমাদের আর একলা কোন জায়গায় দেখা যায় না। মানে সব জায়গাতেই তোমরা জোড়ে ঘুরে বেড়াও আজকাল। তা বেশ, তা বেশ—

জ্যাক বললে, স্যর, আমি তাকে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি—

প্রোফেসরের হাসি এবার আরও চড়া পর্দায় উঠে গেল। জ্যাকের হাতটা ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললেন, আই, কনগ্রাচুলেট ইউ মাই বয়। বিয়ে যদি করতেই হয় তবে অমন মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত। তুমি সত্যি ভাগ্যবান। তোমাকে আমি ঈর্ষা করছি। বলে আপন মনেই হাসতে হাসতে বলে চললেন, কোন একটা বোকা নাকি বলেছিল **East is east and West is west,** তারা নাকি কখনও এক জায়গায় মিলতে পারে না। সে মূর্খটা যদি কাছে থাকত তো তাকে ঘাড়ে ধরে এনে দেখাতাম মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডটা কোন ভূগোলেরই ধার ধারে না—

হো হো করে আনন্দের হাসি হাসতে লাগলেন প্রোফেসর।

সেদিন রাতে অনীতাকে জ্যাক তার মনের কথাটা খুলে বলতেই অনীতা হেসে বললে, কেন বিয়ে না করলে কি পরস্পর বন্ধুত্ব বজায় রাখা যায় না?

জ্যাক বললে, রাখা যায় বটে, তবে সে বন্ধুত্বের স্থায়ীত্ব জল রংএর মতো। যে কোন সময়ে সে রং ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। শুধু মনের বন্ধুত্ব দিয়ে তো সম্পর্কের গুরুত্ব বজায় করা যায় না। মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক না থাকলে কোন সম্পর্কও পাকা নয়। বিয়েটা হল এই দেহের সম্পর্কের স্বীকৃতি।

অনীতা তার স্বাভাবিক হাসি হাসতে বললে, ঐ দেহের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার মত কিন্তু কিছু বিপরীত।

বলে সে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। এদিকে জ্যাক কদিন থেকেই মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। অনীতাকে আলিঙ্গনের মধ্যে না বাঁধতে পারলে যেন

তার কোন স্বস্তি নেই। তার শিরের মধ্যে রক্ত কণিকাগুলো পর্যন্ত যেন দুহাত বাড়িয়ে অনীতার দেহকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। উন্মত্ত কামনার ঢেউ এসে ধাক্কা দিচ্ছে জ্যাকের বুকের ভিতর।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল জিমির সেদিনকার কথাগুলো। ভারতীয় মেয়েদের বাইরের লজ্জা বড় বেশী। তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। তাদের দেহে মনে কামনার লিপ্সা জাগাতে গেলে পুরুষকে সব কিছু ভুলে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই সেই মেয়ের মনে আসঙ্গ লিপ্সা জাগবে। আর তখনই সে দেহ দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠবে।

জ্যাক ভাবল, অনীতাও তো ভারতীয় মেয়ে। বোধ হয় সে লজ্জা পাচ্ছে বিয়ের কথায়। এদিকে জ্যাকের বুকের ভিতর তখন একটা তীব্র বাসনা তাকে ভীষণ জোরে ঠেলতে শুরু করেছে। তারই ধাক্কা সামলাতে না পেরে সে হঠাৎ উঠে গিয়ে অনীতাকে জাপটে ধরল তার বুকের মধ্যে। উন্মাদের মতো চুমু খেতে লাগল তার ঠোঁটে, মুখে, বুকের উপর।

একটু পরেই সেই হঠাৎ-পাগলামীর ঢেউটা চলে যেতে জ্যাক বুঝল অনীতা তার আলিঙ্গনের মধ্যে নেই। সে একখন্ড পাথরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। সে পাথরের টুকরোটা যেমন ঠাণ্ডা তেমনি শক্ত। এ কথাটা খেয়াল হতেই সে মুহূর্তের মধ্যে গুটিয়ে গেল। তার আলিঙ্গন শিথিল হয়ে গেল। অনীতা আস্তে নিজেকে তার থেকে মুক্ত করে নিল। সে সত্যিই পাথর হয়ে গেছে। চোখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। তার চোখের পাতাটা পর্যন্ত পড়ছে না। তার নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। অনীতা নড়েও না কথাও বলে না।

জ্যাকের পক্ষে অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তার নিজের উপর একটা তীব্র ঘৃণা তার সমস্ত মন ছেয়ে ফেলেছিল। সে কোন কথা না বলে মুখ নীচু করে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। সে সটান এসে হাজির হল তার নিজের ঘরে। নিজেকে নিয়ে সে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল একটা গুরুতর শাস্তি দেয় সে নিজেকে। ঘরে থাকতে না পেরে সে আবার ছিটকে বার হয়ে পড়ল। তারপর জিমি যে বারে বসে মদ খায় সেখানে গিয়ে হাজির।

জ্যাককে অনেক দিন পরে বারে আসতে দেখে জিমি হৈ হৈ করে উঠল—আরে এসো এসো। আজ যে বড় সেই ভারতীয় ডাইনীটার মন্তরের দাপট কাটিয়ে এলে ? কী ব্যাপার—

জ্যাক কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে দলের মধ্যে বসে পড়ে বললে, অনেক দিনের তেষ্টা জমা হয়েছে। জিমি, বাক্যব্যয় না করে কয়েকটা গ্লাসের অর্ডার দাও চটপট্।

বীভৎসভাবে মদ খেতে শুরু করল জ্যাক। জিমি পর্যন্ত তার মদ খাওয়ার

বহর দেখে অবাক। সে রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত বার খোলা রইল, জ্যাক কেবল হুইস্কির পরে হুইস্কি শেষ করতে লাগল নির্জলা।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সবার আগে মনে পড়ল তার আগের দিনের সন্ধ্যার কথা। অনীতার সেই অদ্ভুত পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া চেহারা, সেই প্রাণহীন নিষ্পন্দ ভাব। তার মনে হল সে অনীতাকে খুন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা তীব্র গ্লানি তার মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে খোঁচা মারতে লাগল। সে সটান বিছানা থেকে উঠে পোশাক পরে বারে গিয়ে হাজির হল। তারপর ক্রমাগত মদ খেতে লাগল।

পুরো তিন দিন তিন রাত্রি জ্যাক নিজের উপর যা অত্যাচার চালাল তা তার শরীরের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। সে হয়ত শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করত যদি অনীতা গিয়ে তাকে বার থেকে একদিন ধরে বাড়িতে নিয়ে না আসত।

জ্যাকের সেই হঠাৎ পাগলামীর ঘায়ে অনীতা প্রথমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সে নিজের মধ্যে ফিরে আসতে লাগল। দেহের কথা ভাবতে অনীতা চিরকাল ভারী নারাজ। আজ সেই দেহটাকে নিয়ে জ্যাকের লুব্ধ আচরণে সে সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিল। জ্যাককে সে ভালবেসেছে। জ্যাকের মধ্যে একটা মহৎ মন লুকিয়ে আছে, তাকে সে শ্রদ্ধা করেছে। নানান পরিস্থিতিতে আঘাত খাওয়া জ্যাকের ওপর তার মন সমবেদনায় ভরে গেছে। সে বুঝেছে, এই আঘাতগুলোই জ্যাককে অন্ধকার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে আলোর পথে ফেরাতে গেলে তাকে ভালবাসতে হবে। অনীতা তাই তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। কিন্তু জ্যাকের ভালবাসার এই কি রূপ! এই রাক্ষসের মতো মাংসলোলুপ প্রবৃত্তি।

সে সারা রাত চিন্তা করতে লাগল। শেষে তার মনের মধ্যে জ্যাকের সেই নিঃশব্দে পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল জ্যাক নিজেও তার এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। সে হয়তো সত্যিই কাজটা করে ফেলেছে ঝোঁকের বশে। অনীতা ভাবল যদি জ্যাকের মধ্যে আবার মানুষের মনটা মাথা চাড়া দেয় তবে তাকে নিখাদ ভালবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

সে অপেক্ষা করতে লাগল জ্যাক কি মূর্তিতে তার কাছে আসে তাই দেখার জন্যে। তিন দিন কেটে গিয়েও যখন জ্যাক তার ঘরে এলো না তখন সে রীতি-মতো চিন্তিত হয়ে উঠল। শেষে সে নিজেই গেল জ্যাকের ঘরে। দেখল তার সমস্ত জিনিসপত্র অগোছাল হয়ে পড়ে আছে, জ্যাক ঘরে নেই। জিমিকে গিয়ে ধরল অনীতা—জ্যাক কোথায় জানেন ?

জিমি ভুরু কুঁচকে জবাব দিল—সে কদিন একটু ফুর্তি করছে—

অনীতা জানতে চাইল—কোথায়—

জিমি বললে, তা কি জানি ? তবে কোন একটা পাবে তাকে পাওয়া যাবে আশা করি।

অনীতা ব্যস্ত হয়ে বার হয়ে পড়ল রাস্তায়। জীবনে সে যা করে নি এবার তাকে তাই করতে হল। প্রত্যেকটা পাবের মধ্যে গিয়ে সে উঁকি মেরে মেরে দেখতে লাগল জ্যাক আছে কি না।

শেষ পর্যন্ত সে জ্যাকের সন্ধান পেল একটা ছোট জঘন্য বারের মধ্যে। যতোরাজ্যের শ্রমিকজাতের লোকেরা মদ খেয়ে মাতাল হয় সেখানে। বারটা তাই একটা সরু অন্ধকারে ভরা গলির মধ্যে। অনীতা প্রায় চারঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরির ফলে জ্যাককে সেখানে আবিষ্কার করল। দেখল সেই বারের একপাশে একটা টেবিলের ওপর মাথা রেখে জ্যাক এলিয়ে পড়েছে। তখনও তার সামনে একটা গ্লাস তরল বিষে ভরা।

জ্যাককে সেই অবস্থায় দেখে অনীতার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। তবু কান্নার সময় এ নয়। বারের ভিতরকার সমস্ত লোকগুলো তার দিকে চেয়ে আছে। যেন গিলছে তাকে। সে ভিতরে গিয়ে জ্যাককে ধরে টেনে তুলল। জ্যাক তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, কিছু বললে না।

একটা ট্যাক্সিতে করে অনীতা জ্যাককে তাদের বাসায় এনে ফেলল। সারা রাত জেগে বসে রইল তার মাথার কাছে। সকাল বেলা জ্যাকের জ্ঞান হতে সে দেখল অনীতা পরম আদরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জ্যাকের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এলো। একটা প্রচণ্ড আনন্দে চোখ দুটো তার জলে ভরে গেল। সে আস্তে আস্তে অনীতার হাতটা টেনে নিয়ে বললে, তুমি আমায় ক্ষমা করেছো তো ?

অনীতা কোন কথাই বললে না। বলবার মতো অবস্থাও তার তখন নয়।

দুদিনের মধ্যে জ্যাক আবার সুস্থ হয়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলায় জ্যাক আর অনীতা অনীতার ঘরে বসে গত কদিনের সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল। জ্যাক বললে, তুমি এগিয়ে গিয়ে আমায় উদ্ধার না করলে আমি আত্মহত্যা করতাম নিঃসন্দেহে—

অনীতা জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু কেন—

জ্যাক বললে, সে দিন যা কাণ্ড করেছিলাম, তার তো কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

অনীতা বললে, সে দিন তুমি এ রকম করতে গেলে কেন—

জ্যাক বললে, মাঝে মাঝে আমার রক্তে নারীদেহ সম্ভোগের তৃষ্ণা জেগে ওঠে। তখন আমি কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারি না। আমি তখন পাগল হয়ে উঠি নারী মাংসের জন্যে।

—তুমি আমার দেহটাকে ভালবাস—প্রশ্ন করল অনীতা।

জ্যাক মাথা নীচু করে বললে, হ্যাঁ, বাসি—

অনীতা বললে, কিন্তু মন বাদ দিয়ে তো দেহের কোন অস্তিত্ব নেই।

স্বীকার করলাম,—বললে জ্যাক। কিন্তু দেহের টানটাও তো অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অনীতা উঠে দাঁড়াল। জ্যাকের সামনে সে একটুখানি দাঁড়িয়ে আপন মনে কী যেন ভেবে নিল। জ্যাক অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। সেদিকে অনীতার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আস্তে আস্তে তার জামা গা থেকে খুলে ফেলল। খুলে ফেলল তার বুকের কাঁচুলী। সমস্ত বস্ত্রাবরণ সে একটানে তার শরীর থেকে খসিয়ে ফেলল। মৃদু অথচ ঠাণ্ডা কঠিন স্বরে সে জ্যাককে বললে, এর সবটাই তোমার, তুমি এটাকে নিয়ে যা খুশী করতে পার—

জ্যাক অনীতাকে দেখার পর থেকে প্রতিনিয়ত যে বরাঙ্গের ধ্যান করেছে, কামনা করেছে তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে স্বর্গসুখ উপভোগ করার—সেই শরীর তার সমুখে খোলা। ভরাট নিটোল পিনোন্নত স্তন দুটি নির্লজ্জ ভাবে তাকিয়ে আছে জ্যাকের দিকে।

দু পাশের চারু অঙ্গরেখা এসে মিশেছে ক্ষীণ কটিতে। সেই ক্ষীণ কটি থেকে গুরু নিতম্ব দুটি উদ্ধত হয়ে উঠে ঢল নিয়ে গড়িয়ে গেছে দুই উরুতে। একটা অদ্ভুত লাবণ্যময় ছন্দের ঢেউ যেন জীবন্ত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে সারা নগ্ন শরীরটায়। জ্যাক দেখছে তো দেখছেই। তার চোখে যেন পলক নেই।

সবটা মিলিয়ে একটা আশ্চর্য ভাস্কর্যের নিদর্শন। কিন্তু একি, জ্যাকের মনের সেই কামোন্মাদনা গেল কোথায়? জ্যাক হাতড়েও মনের তলায় তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। তার মনে জেগে উঠছে একটা অদ্ভুত ভাব যার সঙ্গে আগে তার কোন পরিচয় ছিল না। অনীতা দাঁড়িয়ে আছে যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। পাথরের মূর্তি হলেও সে মূর্তিকে নিষ্প্রাণ বলা যায় না। ঠোঁটের ওপর খেলা করছে তার একটা অদ্ভুত হাসি। এ যেন প্রাণের অতীত একটা কিছু। জ্যাক সে দিকে তাকিয়ে রইল বিহ্বলের মতো। সে তার সারা দেহ-মন দিয়ে অনুভব করতে লাগল, যেন এই মুহূর্তে তার জন্ম হল এই মাটিতে। এই উলঙ্গ নারীমূর্তি থেকেই সে সদ্য বেরিয়ে এল।

অনীতা ধীরে ধীরে আবার তার সারা শরীর ঢেকে ফেলল। আবার সে সহজ হয়ে এসে বসল জ্যাকের পাশে সোফাতে। জ্যাককে জিজ্ঞাসা করল—সব তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি নিলে না—

জ্যাক একটু ফিকে হাসি হাসতে হাসতে বললে, ও নেবার সাধ্য আমার নেই অনীতা। তবু আজ আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। একটা নতুন জগতের সন্ধান তুমি আমাকে আজ দিয়েছ। আমি সে জগতে আজ নতুন করে জন্মালাম। আমার সারা জীবনের তৃষ্ণার নিবৃত্তি আজ বোধ হয় হয়ে গেল।

অনীতা এবার একটা সাধারণ মেয়ের মতো হাল্কা ভাবে বললে, কিন্তু তুমি তো আমাকে দেহে-মনে পেতে চাও। তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও—

জ্যাক তাকে বাধা দিয়ে বললে, আজ বুঝতে পারলাম, যা আমি চাই তাকে পেতে গেলে আমার প্রস্তুতির দরকার। আমি নিজেকে প্রস্তুত করব। তুমি কী অপেক্ষা করবে আমার জন্যে ?

অনীতা হাসিমুখে বললে, নিশ্চয়ই। তবে একটা সর্ত থাকবে আমাদের এই বন্ধুত্বে। আমাদের সম্বন্ধ হবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা পরস্পরের কাছে আমাদের কোন কিছু গোপন রাখব না। যদি কোন কারণে এই সত্য থেকে আমরা ভ্রষ্ট হই সেদিন কিন্তু আমাদের সব সম্পর্কের অবসান হবে।

জ্যাক গম্ভীর মুখে বললে, বেশ তাই—

॥ ৩১ ॥

জ্যাক গল্প বলতে বলতে এবার একটু চুপ করল। পরে বললে, অনীতার মতো এ রকম অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে আমি জীবনে দেখি নি। আর অনীতাকে না জানলে হয়তো কোন দিনই জানতাম না যে স্ত্রীলোক এতটা মনের বলের অধিকারিণী হতে পারে। তবুও সেও ভুল করল।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম—

জ্যাক বললে, আমাদের দুজনের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর অনীতা আর আমি স্থির করেছিলাম সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বেড়াতে যাব। সব ঠিক, যাবার দিনও প্রায় আসন্ন। এমন সময় বাড়ি থেকে ডেভির চিঠি পেলাম। সে আমাকে কয়েকটা জরুরী কাজের জন্যে বাড়িতে যেতে লিখেছে। কাজ খুব বেশী নয়। আমি ভেবেছিলাম এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ সেরে ফিরব। তারপর যাব সুইট্‌জারল্যাণ্ডে। অনীতাকে অক্‌স্‌ফোর্ডে রেখে আমি গ্রামে চলে গেলাম। সেখান থেকে ফিরতে আমার কিছু দেরী হল। সপ্তাহ দুই পরে অক্‌স্‌ফোর্ডে ফিরে এসে জিমির কাছে শুনলাম, আমি চলে যাবার পরেই অনীতা তার মায়ের কাছ থেকে কেব্‌ল্‌ পেয়ে লণ্ডনে গেছে প্রায় এক সপ্তা আগে। সেখান থেকে যে জাহাজ পাবে তাতেই বোম্বে পাড়ি দেবে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমাকে কিছু না জানিয়ে অনীতার এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে ভয়ানক রহস্যময় লাগল। মনে হল অনীতাকে আমি যা দেখেছি তার সঙ্গে এ আচরণটা যেন আগাগোড়া খাপছাড়া। তার ওপরে একটা নিদারুণ অভিমানে আমার মন ছেয়ে গেল। সেই অভিমানের মধ্যেই স্থির করলাম, যে আমাকে না বলে আমার অনুপস্থিতিতে বিদায় নিয়েছে আমি নিজে থেকে তার সম্বন্ধে আর কোন খোঁজ

নেব না। আমি দীর্ঘ দিন ধরে অনীতার ওপর সেই অভিমানের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি। এমন কি এই সেদিন পর্যন্ত।

একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগল জ্যাক, সেদিন হাইল্যাণ্ডের পাড়া গাঁতে রোজ মেরীর সঙ্গে দেখা হল। তার কাছে কয়েক দিন কাটিয়ে এলাম। সেই আমাকে বললে অনীতার অন্তর্ধান হবার আসল ব্যাপারটা। শোনার পর থেকে অনীতার ওপর আমার অভিমান ঘুচেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে অনীতা ভুল করেছে।

জ্যাক বলে চলল—

কালো মেয়েটার সঙ্গে অত বেশী মাখামাখি করতে দেখে জ্যাকের বন্ধুরা সবাই অসন্তুষ্ট হল। বিশেষ করে জিমি আর রোজমেরী। রোজমেরী প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর জ্যাকের ঘরে এসে দেখত ঘর খালি। তাতে সে দুঃখ যা পেত রাগ হত তার চতুর্গুণ। মনে ভাবত ভারতের কালো ডাইনীটা মন্ত্র দিয়ে জ্যাককে বশ করেছে। একদিন সে খুব সকাল সকাল এসে জ্যাকের ঘরে জ্যাককে পাকড়াও করল। রাগ সামলাতে না পেরে ঝাঁঝিয়ে সে বললে, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ? তোমাকে ঘরে পাই নি একদিনও—

জ্যাক রোজমেরীর এই জেরা করার ভঙ্গী দেখে মনে মনে চটে গেল। গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি কি আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাও—

রোজমেরীও হটবার মেয়ে নয়। সেও ঝাঁঝালো গলায় বলতে লাগল, যদি কৈফিয়ৎ চাই-ই তাতে তো অন্যায় কিছু করছি বলে আমার মনে হয় না।

জ্যাক আরও গম্ভীর হয়ে বললে, আমি জীবনে কোনদিন আমার কোন কাজের জন্যে কাউকে কৈফিয়ৎ দিই নি।

রোজমেরী তেড়ে জবাব দিল—তোমার দেবার মতো কৈফিয়ৎ নেই তাই তুমি ও কথা বলে আমায় এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি জেনেছি আজকাল সেই কালো নিগ্রো ডাইনীটা তোমায় মন্তর দিয়ে বশ করেছে।

জ্যাক আরও গম্ভীর গলায় বললে, সে ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বল মেরী—

মেরী ক্ষেপে গেল। বললে, ভদ্রভাবে কথা কইব একটা ডার্টি নিগারের সম্বন্ধে ? তুমি তার মধ্যে কি পেয়েছ ? সে কি আমার থেকেও সুন্দরী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী—

জ্যাক এবার শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, সে কথার জবাব আমি তোমায় দেব না। কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি আর আমার কাছে এসো না।

রোজমেরী চোখে রুমাল চাপা দিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলল। বললে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাষণ্ডও আমাকে এতটা অপমান করতে সাহস করত না। বলে সেই যে সে জ্যাকের ঘর ছাড়ল আর তার কাছে সে আসে নি। জিমির

কাছে তার যাতায়াত বেড়ে গেল।

এদিকে অনীতার সঙ্গে আলাপ হবার পর তার সঙ্গ পেয়ে জ্যাকের প্রত্যহ বারে বসে মদ খাবার ইচ্ছেটায় ভাঁটা পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জিমির মস্ত অসুবিধে হল। জ্যাককে দলে টানতে পারলে আর কিছু না হোক খরচের সম্বন্ধে জিমির চিন্তা থাকে না। খোঁজ খবর করে জিমি দেখল জ্যাক সেই কালো ভারতীয় মেয়েটার সঙ্গে এতো মজেছে যে অন্যান্য বন্ধু বান্ধবীর কথা তার মনেই নেই। আরও একটা ভয় জিমির মনে এসে গেল যখন সে শুনতে পেল, জ্যাক মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্যে ঠিক করে ফেলেছে। জ্যাক ঐ কালো মেয়েটাকে বিয়ে করলেই জিমির মুস্কিল। তখন আর অত সহজে জ্যাকের পয়সায় স্ফূর্তি করতে পারা যাবে না। বরঞ্চ জ্যাক যদি রোজমেরীকে বিয়ে করে তাহলে পুরোন বন্ধুত্বের খাতিরে মেরী জিমিকে কোন দিন ফেলতে পারবে না। জিমি উঠে পড়ে লাগল যাতে জ্যাক অনীতাকে বিয়ে না করে তারই জন্যে।

সে একদিন জ্যাকের ঘরে এসে তাকে বললে, শুনতে পেলাম তুমি নাকি ঐ কালো মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও—

জ্যাক বললে, হ্যাঁ, আমি তা-ই স্থির করেছি। তবে এখন নয়, কিছুদিন বাদে।

জিমি বললে, মেয়েটা লোভনীয় স্বীকার করি, তাকে নিয়ে দুচারদিন ফূর্তি কর ভাল কথা। কিন্তু তার জন্যে তাকে তুমি বিয়ে করবে এ কিরকম কথা জ্যাক?

জ্যাক বললে, কেন, আপত্তি কিসের—

জিমি বললে, মেয়েটা যাই হোক রংটা ওর কালো যে।

জ্যাক বললে, আমি বিয়ে করছি মানুষটাকে, তার রংটাকে নয়।

জিমি বললে, রোজমেরীর কী হবে?

জ্যাক অবাক হয়ে বললে, কেন? রোজমেরীকে কোনদিন আমি বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি এমন কথা তো আমার মনে পড়ে না।

জিমি একটু হেসে বললে, সব কথা কি আর মুখে বলা যায় জ্যাক? মেরী তোমাকেই মনে মনে তার সর্বস্ব দিয়েছে। আর তুমিও—মুখে না বললেও তাকে তো অপছন্দ কর নি। তার সঙ্গে রাতও কাটিয়েছ—

জ্যাক ধমকে উঠল জিমিকে—মিথ্যে কথা—

জিমি হিঃ হিঃ করে কুৎসিত হাসি হাসতে হাসতে বললে, সত্যি মিথ্যে আমি আর কোথা থেকে জানব বল? মেরীই একদিন আমাকে বলেছিল, তুমি যদি মেয়ে হতে আমি এতটুকু ঈর্ষা না করে তোমাকে একদিন জ্যাকের সঙ্গে রাত কাটাতে বলতাম। বুঝতে স্বর্গ সুখ কাকে বলে।

জ্যাকের মুখ ঘৃণাতে আর রাগে বেগুনী হয়ে উঠল। সে বললে, মেরী

আর আমার মধ্যে যে কথা সে আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা। তুমি এসব কথা নিয়ে আলোচনা কর এ আমি চাই না।

জিমি সেই রকম কুৎসিত ভাবে হাসতে হাসতে বললে, তাহলে মেরীর কথাটাও বিয়ের আগে ভেবে দেখো, কেমন? আমি তোমাদের দুজনের বন্ধু। সেই হিসেবেই সুপরামর্শ দিচ্ছি। বলে ঘর থেকে বার হয়ে গেল জিমি। রাগে, ক্ষোভে জ্যাকের মনের ভিতর জ্বলে যেতে লাগল। মেরী ঐ সব মিথ্যে কথা জিমিকে গিয়ে বলেছে, না ওগুলো জিমির নিজের রটনা করা কথা।

জিমি আর মেরী দুজনের উপরেই দারুণ চটে গেল জ্যাক। শেষ পর্যন্ত সে মিসেস পার্স-এর বাড়ি ছেড়ে অনীতাকে নিয়ে উঠে গেলআর একটা বাড়িতে।

জ্যাক জিমির খোঁজ খবর নেওয়া বন্ধ করলেও জিমি কিন্তু জ্যাকের খোঁজ রীতিমতো রাখতে লাগল। তাই জ্যাক দিনকতকের জন্যে তার গ্রামে চলে যেতেই সে একটা বড় সুযোগ পেয়ে গেল। সে রোজমেরীকে বললে, এই সুযোগে যদি ঐ কালো ডাইনীটাকে এখান থেকে তাড়াতে পার তো জ্যাক উদ্ধার পায়। হাজার হলেও সে যে তোমাকে ভালবাসত সে বিষয়ে তো সন্দেহ ছিল না। ঐ কালো ডাইনীটা না এলে সে হয়তো তোমাকেই বিয়ে করত।

রোজমেরী বললে, কিন্তু কী করে ওকে এদেশ থেকে তাড়ান যাবে?

জিমি হি-হি করে হেসে বললে, সে মন্তর আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।

তারপর জিমি ধীরে সুস্থে রোজমেরীকে তার মতলবের কথাটা খুলে বললে। তারই পরের দিন জিমি গিয়ে অনীতার বাসার হাজির। একথা সেকথায় সে জ্যাকের আগের দিনের কথাগুলো বলে ফেলল। বললে, আমি তোমাকে কনগ্রাচুলেট্ করছি। তোমার মতো অদ্ভুত মেয়ে আমার চোখে পড়ে নি। তুমি যে জ্যাককে রোজমেরীর মতো একটা বিচ্ছিরি মেয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছ তার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

অনীতা রোজমেরী সম্বন্ধে একটু কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল—জ্যাক কি রোজমেরীকে ভালবাসত—

জিমি সুযোগ বুঝে অনীতার কাছে জ্যাক আর রোজমেরীর সম্বন্ধে একটা গল্প বানিয়ে বলে গেল। সে গল্পের মধ্যে সত্য ছিল ছিটে ফোঁটা, মিথ্যেটা ছিল অনেক বেশী। সেই গল্পের মধ্যে জিমি অনীতাকে শুনিয়ে দিলে জ্যাক রোজমেরীর সঙ্গে অনেক রাত কাটিয়েছে। অনীতার সঙ্গে আলাপ হবার আগে সে রোজমেরীকেই বিয়ে করবে বলে ঝুঁকেছিল।

এরই দুদিন পরে স্বয়ং রোজমেরী জিমির পরামর্শ অনুযায়ী অনীতার বাসায় এসে হাজির হল। এ রোজমেরীকে দেখলে চেনা শক্ত। তার মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, গালের চোয়াল দুটো দেখাচ্ছে উঁচু উঁচু। তার চলনও সহজ নয়। তার সেই ফুটফুটে সুন্দর চেহারার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল

না মেরীর মধ্যে।

মেরী অনীতার কাছে যেতেই অনীতা তাকে অভ্যর্থনা করল—এসো, এসো মেরী। অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। তা তোমার কী অসুখ করেছিল? তোমাকে এতো অসুস্থ দেখছি কেন?

মেরী অনীতার সামনে বসে অল্প অল্প হাঁপাতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে ক্লান্ত স্বরে বলতে লাগল, শুনলাম জ্যাক নাকি তোমাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে?

অনীতা মাথা নীচু করে চুপ করে রইল।

মেরী বললে, তোমাকে আমি বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি জ্যাকের কথায় বিশ্বাস করো না। জ্যাক হল নারীমাংসলোভী নেকড়ে। যে মেয়ে ওর চেহারায় আর মুখের কথায় ভুলবে সে আমার মতো সর্বনাশ ডেকে আনবে।

অনীতা মেরীর শরীরের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কী মা হয়েছ—

মেরী বললে, আগে কি জানতুম? সে খবরটা তো পেলুম মাত্র কালকে। গত পনেরো দিন ধরে কিছু খেতে পারছিলুম না। যা খাই তাই বমি হয়ে যায়। ডাক্তারের কাছে যেতে গতকাল ডাক্তার বললে—

বলে মেরী চোখ নীচু করে বসে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জ্যাক এই সন্তানের বাপ। সে আমাকে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। তোমার সঙ্গে তার মেলামেশা ঘনিষ্ঠ হবার পর সে আমাকে ছেড়েছে। কিন্তু তুমি নিজে তো একজন নারী। তুমি নিশ্চয় বুঝবে যে এ কতো বড়ো কলঙ্ক একটি নারীর পক্ষে। তুমি আমাকে একটু দয়া কর।

অনীতা বললে, বেশ জ্যাক আসুক। সে যাতে তোমাকে বিয়ে করে তার ব্যবস্থা আমি করব।

মেরী মনে মনে অবাক হল। মুখে বললে, জ্যাককে তুমি চেনো না। সে সটান এই পিতৃত্ব অস্বীকার করবে।

অনীতা মৃদুস্বরে মেরীকে জিজ্ঞাসা করল—তাহলে আমি তোমার জন্যে আর কী করতে পারি বল?

মেরী বললে, তুমি এখানে থাকলে আমি জানি জ্যাক আমাকে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হবে না। তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও তাহলে আমার ওপর তার আগের ভালবাসা ফিরে আসবে নিশ্চয়। দোহাই, দোহাই তোমার তুমি আমাকে বাঁচাও, তুমি চলে যাও এদেশ ছেড়ে। না হলে আমাকে এই অবস্থায় আত্মহত্যা করতে হবে।

বলতে বলতে মেরী অনীতার হাঁটুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল।

জ্যাক আমার মুখের দিকে একটা কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি ফেলে বললে, জিমির প্ল্যানটা কী রকম চমৎকার ভাবে তৈরী দেখলে। তাছাড়া রোজমেরীর অভিনয়-টাও এত জীবন্ত হয়েছিল যে অনীতার মতো বুদ্ধিমতী মেয়েও সেটাকে অভিনয় বলে ধরতে পারে নি।

একটু থেমে চোখ নীচু করে জ্যাক বললে, আমি বেশ বুঝতে পারছি মেরীর কথায় অনীতার বারবার মনে পড়ছিল জ্যাকের নারীদেহের ওপর লোলুপ-তার কথাগুলো। সে তাই হয়তো মেরীর কথাগুলোতে এতটুকুও অবিশ্বাস করে নি। যাই হোক আমি গ্রামের বাড়ি থেকে এসে অনীতার কোন চিহ্নও অক্সফোর্ডে পেলাম না। প্রোফেসর ম্যাকিন্টরও তার কোন খোঁজ দিতে পারলেন না। তার ওপর জিমির বানানো ঐ মিথ্যে কথাটা—

বললাম, তাতো শুনলাম, কিন্তু অনীতা ভুল করল কোথায় ?

জ্যাক বললে, সে যাবার আগে আমাকে যদি একটা চিঠি লিখে জানিয়ে যেত। আমার আশ্চর্য লাগে অত বুদ্ধিমতী অত বিচারশীল অস্মিতার অধিকারিনী যে মেয়ে সে এত বড় একটা মিথ্যেকে কী করে অত সহজে বিশ্বাস করতে পারল ?

বললাম, মুনিদেরও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়—

জ্যাক বললে, এতদিন পরেও আমার মনে হচ্ছে আমি ধীরে ধীরে তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। সে আমার সম্মুখ থেকে হারিয়ে গেছে বটে, তবু তার অস্তিত্ব ছেয়ে আছে আমার সমস্ত ভিতরটা।

বললাম, আমি এই ব্যাপারে একটা দিক দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। মিথ্যেটা শেষ পর্যন্ত সত্যকে চাপা দিয়ে রাখতে পারল না। রোজমেরী এতদিন পরে তোমাকে নিজের থেকে এ সব গল্প বলবে এইটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

জ্যাক বললে, মেরী জিমির ওপর রেগে বারুদ হয়ে আছে। জিমি ওর অনেক ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছে।

অনীতাকে তাড়িয়ে মেরী ভেবেছিল, আমি তার সঙ্গে জুটব। কিন্তু আমি তখন সব ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম পথে। মেয়েদের চেহারাটা পর্যন্ত সে সময় আমার কাছে বিষ মনে হত। মনে হত এরাই হল এই পৃথিবীতে যত দুঃখের মূল কারণ।

জ্যাককে না পেয়ে মেরী জিমিকে ধরল। জিমিও মেরীকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে লাগল।

একদিন দুপুরে মেরী হঠাৎ জিমির ঘরে এসে দেখল দরজা বন্ধ। দরজায় টোকা দিয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখল, দরজা খুলে বার হয়ে এল বাড়িওয়ালীর সেই ওঁচা মেয়েটা। সেই দৃশ্য দেখে মেরীর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে যা তা বলে গালাগাল দিল জিমিকে। শেষ পর্যন্ত সে জিমির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করল। তার বহুদিন পরে মেরী বিল পেট্রীকে বিয়ে করে

লণ্ডনে। জিমি কেমন করে সেই খবর জানতে পেরে পেট্রীকে চিঠি লিখে জানায় মেরী জারজ সন্তানের মা। জ্যাকের ঔরসে তার একটা বাচ্চা হয়ে ছিল, একথা নাকি অক্‌স্‌ফোর্ডের সবাই জানে ইত্যাদি। বিলপেট্রি যদি মেরীকে ত্যাগ না করে তো জিমি ওই খবর তার পরিচিত মহলে ছড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল বিলকে। শেষে বিল লণ্ডন ছেড়ে চলে আসে সুদূর হাইল্যাণ্ডের একটা নগণ্য পাড়াগাঁয়ে। সেখানে সে আর মেরী স্কুলে মাস্টারী করে। তারা বেশ সুখেই আছে এখন।

জ্যাকের গল্প শেষ হতেই সে আড়ামোড়া খেয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দিলাম। বাইরের মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা খানিকটা দিনের আলো ঘরে ঢুকল। কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। আণ্টিজেন ঘরে এলেন। গুড্ মর্নিং, ও মাই, মাই, তোমরা সারা রাত একটুও ঘুমোও নি। বিছানা তো যেমন তেমনিই রয়েছে। তা এদিকে যে নটা বাজে। এসো, ব্রেক ফাস্ট তৈরী করে আমরা যে বসে আছি—

আমরা দুজনেই লজ্জিত হয়ে হাত মুখ ধুতে বার হয়ে গেলাম।

॥ ৩২ ॥

অন্ধকার মাঠটার মাঝামাঝি এসে পড়েছি। সম্মুখে রাজগীর শহরের আলোগুলো একটু একটু করে চোখে পড়ছে। তবুও পথ অনেকটা। একটা জনমনিষ্যি হাঁটছে না এই পথে, এই শীতের রাতে। একটু বেশী মাত্রায় সচেতন হয়ে শহরে ফেরবার জন্যে পা চালালাম। কিন্তু পথ সম্বন্ধে সচেতন থাকা খুব বেশীক্ষণ আর হয়ে উঠল না।

চলতে চলতে এক সময় মনে হল মাঠের দিকচক্রবাল থেকে যেন একটা দৈত্য ডুকরে চীৎকার করে ছুটে এল। তছনছ করে ফেলতে লাগল চারদিক। তার বীভৎস ঝাঁকড়া চুলের রাশ মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল। মাতাল হয়ে উঠেছে, পাগল হয়ে উঠেছে দৈত্যটা। ঝড় উঠেছে।

মনে পড়তে লাগল উত্তর সাগরের ওপরে সেই ভয়ংকর ঝড়ের কথা। আটলাণ্টিকের ওপর সেবার অর্বুদ প্রমত্ত দানব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রচণ্ড গতিতে। তোলপাড় করে তুলেছিল আকাশ আর সমুদ্র। তাদের সৃষ্টিনাশা মাতলামীতে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল ভাসল। কোটি কোটি লোক গৃহহারা অনাথ হল। সেই সব মত্ত দানবদের একটা ঝাঁক এসে পড়েছিল উত্তর সাগরের বুকেও। সেখানেও তারা কদিন ধরে প্রলয় লাগিয়ে দিয়েছিল। দলে দলে জাহাজ ডুবেছিল উত্তর সাগরের ওপরে। স্টোনহাভেনের পাইনফরেস্টের

একটা গাছও মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের মাথা-কাটা সৈনিকের মতো খানিকটা করে মাটির চাপড়া উপড়ে নিয়ে ভূমি নিয়েছিল। কাঠের বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে পথিককে উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিল একশো হাত দূরে। শহরের রাস্তাঘাটে লোক চলাচল গাড়ি ঘোড়া বন্ধ ছিল ঝড়ের কটা দিন। সে বীভৎস ঝড়ের কথা মনে হলে আজও হৃদকম্প হয়।

পয়লা জানুয়ারীর দিনটা ছিল বেশ নরম গরম, ভারী উপভোগ্য। সেদিনের জন্যে বৃষ্টি বাদলা সব উপে গিয়েছিল। আমি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। মিসেস ব্রাউনকে বলেছিলাম, শীতের দিনে এমন একটা গরম দিন বোধহয় তোমরা পেলে আমারই জন্যে। আমি গরম দেশের লোক কিনা—

মিসেস ব্রাউন মুখখানা গোমড়া করে বলেছিলেন—আহা রোস, সারাটা মাস এখনও পড়ে আছে। আর হতভাগা গরম দিনটা যেন সময় পেল না, আজ এই পয়লাই এসে হাজির।

বললাম, শুধু শুধু চটছ কেন মা ব্রুন ?

মিসেস ব্রাউন বললেন, চটব না ? জানুয়ারীর প্রথম দিনটা যদি ভেড়ার মতো আসে তবে যাবার দিনে সেই মেষটা যে সিংহ হবে—তার খবর রাখ ?

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে কি ? তোমাদের প্রবাদ বাক্যই তো বলে মর্নিং শোজ দ্য ডে। তা মাসের প্রথম দিনটা ভাল হলে সারা মাসটাই ভাল বলে ধরে নিতে পার।

মিসেস ব্রাউন বললেন, ওসব প্রবাদ বাক্য এদেশে খাটে না। এখানে সকালে রুদ্দুর হলে হলপ করে কেউ বলতে পারবে না যে সারাটা দিন শুকনো যাবে। হয়তো বেলা নটার পর থেকেই ঝুপ ঝুপুনি শুরু হয়ে যাবে। চলবে সারাটা দিন সারাটা রাত। আমার ভাবনা হচ্ছে জানুয়ারীর শেষের দিকে কোন দুর্যোগ না ঘটে।

এর কিছুদিন পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললাম, মা ব্রুন একটা লাফিং থ্রাস দেখেছি—বরফে ডোবা ক্ষেতের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে খাবার খুঁজছিল। এবার বোধ হয় শীত একটু কমবে মনে হয়—

আণ্টি জেনের মুখ আমার কথা শুনে ভারী হয়ে উঠল। বললেন, এ ভারী অমঙ্গলের চিহ্ন। থ্রাস জানুয়ারীতে—তাও আবার মাটির ওপর লাফাচ্ছে। নাঃ এ মাসটা ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি—

বলে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন বুকের ওপর।

ত্রিশে জানুয়ারী সকালবেলা আকাশ যথারীতি মেঘলা। বৃষ্টি পড়ছে সমানে। আবহাওয়া অফিস থেকে বেতারে ঘোষণা হল—খুব একটা প্রচন্ড ঝড় উঠেছে আটলান্টিকে। সে ঝড় এদিকে ফেরবার সম্ভাবনা আছে।

ঘরের মেঝেতে দেখি টোবি কচ্ছপটা অস্থির হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সারা শীতকালটা তাকে জীবন্ত মনে হয় না। সে র‍্যামসে কুকুরের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোমের তলায় শুয়ে আরামে ঘুমোয়। খায়ও না কিছু। হঠাৎ তার আজ হল কী? সে যেন বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে একটা কিছু দুর্যোগের আশঙ্কায়।

আণ্টি জেন আর মিসেস ব্রাউন ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে ফ্যাকাশে মুখ করে বললেন, খুব বড় একটা সাইক্লোন আসছে এদিকে। আচ্ছা, যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে তাদের কী হবে—

বললাম, ও আবহাওয়া অফিসের ঘোষণা তো? ওদের ঘোষণার সব সময়ে উল্টোটাই ফলে—

মিসেস ব্রাউন বললেন, আমি তো ওদের ঘোষণার ওপর নির্ভর করছি না। আমাকে আবহাওয়ার খবর আগে থেকে জানায় টোবি। ওর ছটফটানি থেকেই বুঝছি আজ ঝড় আসছে।

খেতে খেতেই শুনলাম ড্রয়িং রুমে টেলিফোন বেজে উঠল। আণ্টি জেন উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। একটু পরে ফিরে এসে একটা চোখ মটকে বললেন, বোধি, তোমায় একটি মহিলা টেলিফোনে ডাকছেন। ভোর না হতেই মেয়েবন্ধুদের ডাক। তুমি যে দেখি রবির্ বার্ণস্-এর থেকেও ভাগ্যবান ব্যক্তি।

হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। ওপার থেকে আওয়াজ এল —কে? মৈত্রেয় গুড্ মর্নিং। আমি নেলী কথা বলছি। আপনার বন্ধু শুদ্ধসত্ত্ব কোথায় বলতে পারেন?

গুড উইস্ ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, শুদ্ধসত্ত্বের কোন খবরই তো আমি জানি না।

নেলী বললেন, আজ কী আপনার খুব জরুরি কাজ কিছু আছে?

—না। কেন বলুন তো? আপনার জন্যে কি কিছু করতে পারি আমি—

—ও নিশ্চয়ই, সেই জন্যেই আপনাকে এই সাত সকালে বিরক্ত করছি।

নেলী বলতে লাগল—আজ দু দিন দুরাত শুদ্ধসত্ত্বের কোন খবর পাচ্ছি না। এক্ষুনি বেতারে ঝড়ের খবর শুনলেন কি—আমি কি করি বলুন তো—

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথা থেকে বলছেন—

নেলী বললে, শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ি থেকে—

বললাম, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি—

রাস্তার যখন বের হলাম তখন ঝড় একটু একটু শুরু হয়ে গেছে। লোক জনের পথে হাঁটতে রীতিমত কসরত করতে হচ্ছে। শহরের বাসগুলো চলছে খুব পরিমিত গতিতে, কড়া রাশে। আমি একটা বাস ধরে এক ঘণ্টার রাস্তা দুঘণ্টায় পার হয়ে ব্যাংখরি এলাম। সেখানে এসেই বুঝলাম, যে দানবরাজ

আসছে তার আসার প্রস্তুতির জন্যে তার অনুচররা ইতিমধ্যেই হাজির হয়ে গেছে। ব্যাংখরির জঙ্গলেভরা পাহাড় বারবার শিউরে উঠছে এক একটা ঝড়ের দমকায়।

অনেক কষ্টে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে শুম্ধসত্বের বাড়িতে হাজির হলাম। শুম্ধসত্বের বয় হ্যারি এসে দরজা খুলে দিলে। হ্যারির একটা পা খোঁড়া। সেই-জন্যে সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। আমাকে দেখেই হ্যারি একগাল হেসে গুডউইস করে স্পষ্ট উচ্চারণে বললে, আপনিই মিস্টার মৈত্রেয়—

—হ্যাঁ। তা মিস নেলসন কোথায়—

নেলসনের নাম শুনেই হ্যারির মুখটা লম্বা হয়ে গেল। হাসিটুকু যেন উপে গেল। গজগজ করে বলে উঠল, ও'র কথা আর বলবেন না। গতকাল থেকে যা বিরক্ত করছেন আমায়। এই একটু আগে বেরিয়ে গেলেন শহরের পুলিশ অফিসে খবর দিতে। বারণ করলাম এই ঝড় উঠছে এখন বের হবেন না। তা কে কার কথা শোনে। এই রকম অস্থির দুর্বল স্নায়ুর মহিলা আমি খুব কম দেখেছি।

—কিন্তু তোমার কর্তার কি হল? তিনি দুদিন ধরে গেলেন কোথায়?

হ্যারি নিশ্চিন্ত স্বরে বললে, তিনি ঠিকই আছেন—

একটু অবাক হয়ে বললাম, তাহলে তুমি জান ডাক্তার কোথায় গিয়েছেন?

হ্যারি অম্লান বদনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কই না তো—

জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে কী করে বলছ যে তিনি ঠিকই আছেন?

হ্যারি হাসতে হাসতে বললে, এ রকম দুদিন চারদিনের জন্যে বাড়িতে না আসা ডক্টরের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় কোন রুগী হয়তো মরণাপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। ব্যস্ তিনি আর তার শয্যার ধার থেকে উঠবেন না। লড়াই করবেন যমের সঙ্গে, তা যতক্ষণ লাগুক—

হঠাৎ হ্যারির গলার স্বর বদলে গেল। ঝাঁঝালো সুরে সে বললে, কিন্তু ডক্টরের খপ্পর থেকে রুগী ছিনিয়ে নিতে যমকে খুব কমই দেখেছি। তা বসুন স্যার বসুন। আমি কী বোকাগর্দভ দেখেছেন। আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই গল্প করছি। বসুন স্যার, চা করে নিয়ে আসি। মিস নেলসন এই এলেন বলে।

একটু বাদেই হ্যারি চা আর কিছু প্যাস্ট্রি নিয়ে হাজির হল। আমার সামনে চায়ের ট্রে সাজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম আরও কী বলতে চায়। এই একেবারে নিরালা নির্জন জায়গায় থেকে হ্যারি বোধহয় কথা বলবার জন্যে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে।

বললাম, তোমার কর্তা যে এইরকম মাঝে মাঝে ডুব মারেন তা ভাবনা হয় না?

হ্যারি বললে, ভাবনা কিসের? জানিতো দুচার দিন পরেই আবার ফিরে

আসবেন। সেই কথা বললাম মিস নেলসনকেও। তা কে কার কথা শোনে? নিজেই ছিটকে বার হয়ে গেলেন পুলিশে খবর দিতে। টেলিফোন করলেও তো চলত—তা নয়। আসলে হয়েছে কি জানেন, মিস নেলসন মনে মনে ডক্টরের সম্বন্ধে যতোই উদ্বিগ্ন হন ডক্টরও মনে মনে ওঁর ওপর ততটা বিরক্ত হন। আমি জানি তো ডক্টরকে। আজ প্রায় দু বছর একসঙ্গে আছি। কেউ তাঁর সেবা পরিচর্যা করুক, কেউ তাঁর কথা ভাবুক, এ তিনি একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। অথচ মজাটা হল এই যে আমি যদি বলি ডক্টরকে আপনার এই অভ্যাসের কথা মিস নেলসনকে জানিয়ে দেন না কেন—তাহলে তো হাঙ্গামা মিটে যায়। ডক্টর দেখি তাতেও নারাজ। একদিন বললাম, আপনি না বলতে পারেন আমি বলে দিই। তা তাতে একটা খুব খোলাখুলি উত্তর ডক্টর দেন না। অথচ এই ব্যাপারটাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে জটিলতা বাঁধছে কম নয়। আসলে যে গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে পরে ঘর করতে হবে—তাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের কথাগুলো আগে থেকে বলে দেয়াই ভাল, নয় কী—

হ্যারি বিজ্ঞের মত মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, আপনি তো ডক্টরের বিশেষ বন্ধু, আপনি ডক্টরকে এ বিষয় একটু হুঁশিয়ার করে দিন না কেন—

বললাম, আচ্ছা সে কথা ভেবে দেখব—

হ্যারি কিন্তু তবুও নড়ে না। এদিকে নেলীরও দেখা নেই। হ্যারিকে সামনের চেয়ারে বসতে বললাম। তারপর তার সঙ্গে গল্প শুরু করলাম।

হ্যারির চোখে শুদ্ধসত্ত্ব হল মানুষের ছদ্মবেশে দেবতা। দেখলাম সে তার মাস্টারের কথা বলতে পেলে দুনিয়ায় বোধ হয় আর কিছু চায় না। হ্যারি বলতে লাগল, এমন দরদী মন আপনি দুনিয়া ঢুঁড়লেও পাবেন না। ডাক্তার তো এদেশে অনেক আছে। কিন্তু ওঁকে পেলে রুগীরা মনে করে এবার তারা বাঁচবে। তাছাড়া গরীব দুঃখীদের উনি কী চোখেই দেখেন। এদিকে হাসপাতালের চাকরী ছেড়ে যদি উনি নিজে নিজেই প্র্যাকটিস করেন তো ব্যাংকে ওঁর পয়সা রাখার জায়গা হবে না। কিন্তু বাইরের রুগীদের কাছ থেকে উনি একটা পয়সাও নেন না। ওঁর বেশীর ভাগ রুগীই অবশ্য শ্রমিক এলাকার লোকেরা।

বললাম, এদেশে তো চিকিৎসা বিনা পয়সাতে হয়। হাসপাতালে গেলেই চিকিৎসা হয়।

হ্যারি বললে, আপনি ভেতরের খবর জানেন না তাই। চিকিৎসা হয় ঠিকই কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তাররাও গরীব বড়লোক রুগীদের সম্বন্ধে কমবেশী সচেতন। কাজেই বেশীর ভাগ লোকেদের রোগ পুরোপুরি না সারিয়ে তারা কতকটা ধামা চাপা দিয়ে হাসপাতাল থেকে বার করে দেয়। তারপর তার

নিজের বরাত। তাছাড়া শুধু চিকিৎসা হলেই তো হবে না, তার তো পথ্য চাই সেই অনুপাতে। শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের সেই পথ্য দেবার পয়সা কোথায়? বিশেষ করে অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে তো রোজগারের দফা গয়া।

তারপর হ্যারি বললে, এই ধরুন না কেন আমার কথা। আমার পায়ের হাড়ে টি, বি, হয়েছিল। হাসপাতালে বেশ কয়েক মাস ধরে দেখা শোনা করে রোগ ধরা পড়ল। ডাক্তাররা সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করল—আমার উরুতের ওপর থেকে কেটে বাদ দেওয়াই শ্রেয়। প্রাণের ভয়ে আমি সেই অপারেশনে মত দিলাম না। হাসপাতালও আমাকে সরিয়ে দিল। আমি সেই রোগ নিয়ে অসহায় অবস্থায় আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম। একটা পয়সা নেই। পেন্সনের পয়সা কটা সপ্তার দুদিনের মধ্যেই খতম হয়ে যায়। এমন সময় আমাদের পাশের বাড়িতে ডক্টর রে গেলেন একদিন রোগী দেখতে। রোগীটির রক্তবমি হচ্ছিল। তিনি সেই রোগীটিকে চাঙ্গা করে তুললেন কয়েক দিনের মধ্যে। আমি সেই সময়ে তাঁকে গিয়ে ধরি। হাসপাতালের ডাক্তাদের মতামত শুনে— তিনি আমার রোগ পরীক্ষা করলেন। আমার সব রকম খোঁজ খবর নিয়ে— আমাকে নিয়ে এলেন নিজের বাসায়। এই বাড়িতে আমাকে রেখে চিকিৎসা করে তিনি আমার রোগ সারিয়েছেন। দীর্ঘ এক বছর লেগেছে এই রোগ সারতে। যদিও পাটা একটু খোঁড়া হয়ে গেছে মাত্র, সম্পূর্ণ পাটা তো আর বাদ দিতে হয় নি। সেই থেকেই আমি ডাক্তারের কাছে রয়ে গেছি। আর শুধু আমি কেন আমার মতো অনেক রোগীকেই তিনি এই বাড়িতে এনে রেখেছেন। ওষুধ পথ্য দিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করে চাঙ্গা করে কর্মক্ষম করে তুলেছেন।

হ্যারি একটু থেমে ঘরের জানালা খুলে একবার বাইরেটা দেখে নিল। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম বাইরে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়েছে। গাছপালা-গুলো ঝড়ের দাপটে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বাড়িটা ঝড়ের ধাক্কায় ঝন ঝন করে উঠছে। হ্যারি চট করে জানালাটা বন্ধ করে দিল। চিন্তিত মুখে বললে, ঝড় খুব বাড়ছে। এই দুর্যোগে মিস নেলসন যে কোথায় গেলেন—

আমার মনে একটা প্রশ্ন বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। ভাবছিলাম হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করব কি করব না। শেষ পর্যন্ত কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার মাস্টার কি মিস নেলসনকে বিয়ে করবেন বলে স্থির করে ফেলেছেন—

হ্যারি মুখখানা বিকৃত করে বললে, ভগবান জানেন। তবে মিস নেলসন ডক্টরের পেছনে যে রকম লেগে আছেন গত কমাস থেকে তাতেই অনুমান করি হয়তো ডক্টর তাঁকে বিয়ে করলেও করতে পারেন। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, মিস নেলসন কাছে থাকলে ডক্টর তাঁকে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। অথচ

অভদ্র আচরণও যে কিছু করেন তাও নয়। শুধু দেখি তিনি পাথরের মতো শক্ত হয়ে যান।

জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে মিস নেলসন আসেন কেন এখানে—

হ্যারি বিজ্ঞের মতো বললে, সেই কথা তো আমিও ভাবি—

তারপর একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বললে, একটা ব্যাপার আমার বড় আশ্চর্য মনে হয়। আমি মুখ্যু মানুষ ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আপনারা লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান লোক হয়তো বুঝতে পারবেন ভিতরের কথাটা।

বলে আমার দিকে চেয়ে হ্যারি একটু থমকে গেল। বোধ হয় মনে করতে লাগল কথাটা আমাকে বলা উচিত হবে কি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার—

হ্যারি বললে, আমার মনে হয় মিস নেলসনের ওপর ডক্টরের যথেষ্ট ভালবাসা আছে। ভালবাসাটা মিস নেলসনের সামনে তিনি প্রকাশ করতে চান না। মিস নেলসন সামনে না থাকলে তাঁর সম্বন্ধে ডক্টরকে উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি। একবার মিস নেলসন ফ্লুতে পড়েছিলেন। ডক্টর এই বাড়িতে তাঁকে রেখে তাঁর চিকিৎসা নিজে করেছিলেন। যতদিন মিস নেলসনের টেম্পারেচর ওঠা নামা করছিল—ততদিন ডক্টরকে দেখেছি কী রকম উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু মিস নেলসনকে তিনি সে কথা জানতেও দেন নি। তাঁর ঘরে যেতেন ঠিক ডাক্তারের মতো, সেবা করতেন নার্সের মতো। ব্যস ঐ পর্যন্তই—

হঠাৎ বাইরের দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠতেই হ্যারি লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল। দেখলাম বাইরের দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে শুদ্ধসত্ত্ব আর তার কাঁধে পড়ে আছে নেলীর দেহটা। প্রচণ্ড ঝড়ের দমকে তাদের দেহ দুটোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কোন রকমে দেয়াল আঁকড়ে ধরে শুদ্ধসত্ত্ব পায়ের ভার রাখছে।

আমি আর হ্যারি ছুটে বার হয়ে এলাম। ওদের দুজনকে বহু কষ্টে ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। শুদ্ধসত্ত্ব নেলীর দেহটা সোফার ওপর আস্তে আস্তে বসিয়ে দিয়ে হ্যারিকে বললে, শীঘ্র গরম জল নিয়ে এসো ব্যাগে পুরে—

শুদ্ধসত্ত্বকে দেখাচ্ছে যেন একটা ঝড় খেকো কাক। লম্বা সমর্থ শরীরটা আজ যেন কে নিংড়ে নিয়েছে। তার মুখ চোখ শুকিয়ে উঠেছে। সারা মুখটা মড়ার মুখের মতো ফ্যাকাশে। তার হাত পাগুলো থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি সে পড়ে যাবে। এমন অবস্থায় আমি তাকে কোন দিন দেখি নি।

আমার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে সে শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করল—কখন এসেছ—

বললাম, কিছুক্ষণ আগে নেলীর টেলিফোন পেয়ে এসেছি। কিন্তু নেলীর কি হল—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, ঝড়ের মধ্যে পাহাড়ের পথে ছিটকে পড়েছিল। আমি ফেরবার সময়ে দেখি নেলী পড়ে আছে এই বাড়িতে ওঠবার রাস্তাটার মুখে। দেখি কোথাও চোট লেগেছে কিনা—

নেলীর শরীর অসাড় হয়ে পড়েছিল। তার জ্ঞান ছিল না। শুদ্ধসত্ত্ব সেই অবস্থাতেই তার চিকিৎসা শুরু করে দিল। গরম জলের ব্যাগ নিয়ে সেঁক দিতে লাগল হাতে পায়ে। একটা ওষুধও তাকে খাইয়ে দিল। আমি এগিয়ে গিয়ে গরম জলের ব্যাগটা ধরতে গেলাম। সেই রকম ম্লান হেসে শুদ্ধসত্ত্ব আমাকে বসতে ইঙ্গিত করল।

হ্যারি বিষম ব্যস্ত হয়ে ঘন ঘন তার মাস্টারের সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। শুদ্ধসত্ত্বের যেন কোন দিকেই খেয়াল নেই। কিছু পরে নেলীর দেহটা তুলে নিয়ে গিয়ে সে বিছানায় শুইয়ে দিলে। ঘণ্টা দেড়েক পরে নেলীর জ্ঞান ফিরে এল। শুদ্ধসত্ত্ব বললে, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে তেমন কোন চোট লাগে নি শরীরে—

নেলী চোখ মেলেই শুদ্ধসত্ত্বকে সামনে দেখে তার হাতটা প্রাণপনে জড়িয়ে ধরে বালিশের মধ্যে মুখ ঢাকল।

দুদিন দুরাত্রি সমানে তাণ্ডব চলতে লাগল উত্তর সাগরের তীরে। আমার আর শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ি থেকে বার হওয়া হয়ে উঠল না। আমি সেখানে দুদিন দুরাত্রি আটকা পড়ে রইলাম। নেলীর আঘাত খুব বেশী হয় নি কিন্তু সে শক্ পেয়েছিল প্রচণ্ড। তাই শুদ্ধসত্ত্ব তাকে কদিন বিছানা থেকে উঠতেই দেয় নি। ঝড়ের দাপটে বাইরে বার হওয়া অসম্ভব। রেডিওতে এখন তখন খবর আসছে সমুদ্রে কটা জাহাজ ডুবল, কটা বাড়ি ধূলিসাৎ হল, কতো মানুষ উড়ে গেছে—হতাহতের সংখ্যা ইত্যাদি। শুদ্ধসত্ত্বের বাড়িখানা কদিন ধরে ধাক্কায় যেন মাঝ সমুদ্রে জাহাজের মতো দোল খাচ্ছে। শুদ্ধসত্ত্বেরও বাইরে যাওয়া হয়ে উঠে নি।

এ কদিন দেখেছি, শুদ্ধসত্ত্ব নেলীর বিছানার কাছে প্রায় সব সময়েই আছে। নেলীর সঙ্গে সে ব্যবহার করছে, যেন সে একটা অসুস্থ ছোট্ট মেয়ে। শুদ্ধসত্ত্ব অপক্ষপাতে তার সঙ্গে হাসছে, গল্প করছে, কখনও বা পিয়ানোতে বসে তাকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে।

তিন দিনের দিন নেলীর মুখের রক্তিমাভা ফিরে এল। সে সহজ হয়ে উঠে দাঁড়াল। শুদ্ধসত্ত্বও আস্তে আস্তে তার ঘর থেকে সরে এল। বাইরে ঝড়ের দানব সমানে তার তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে শুদ্ধসত্ত্বের বাড়িটা বোধ হয় আর রক্ষা হল না। বিকেলের দিকে এক সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যারি টেলিফোন ধরে শুদ্ধসত্ত্বকে ডেকে দিলে।

শুদ্ধসত্ত্ব খানিকক্ষণ কথা বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। তারপরেই তার ঘরে গিয়ে সাজ পোশাক পরে তৈরী হয়ে এল।

নেলী উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, কোথায় যাচ্ছ এই দারুণ ঝড়ের মধ্যে—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, একটি রোগী মরণাপন্ন, এক্ষুনি যেতে হবে। এই ঝড়ে আর কোন ডাক্তার পাচ্ছে না।

নেলী জেদী মেয়ের মতো তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—না, না, না। আমি তোমাকে এখন কোথাও যেতে দেব না। যদি পৃথিবীটা আজ রসাতলে যায় তবুও আমি তোমাকে বাইরে বার হতে দেব না—

শুদ্ধসত্ত্ব ছোট্ট মেয়ের মতো তার মাথাটা ধরে নাড়া দিয়ে বললে, ছেলে-মানুষী করো না নেলী। আমায় এক্ষুনি যেতেই হবে।

নেলী বললে, তোমার প্রাণের চেয়েও কী সেই রোগীর প্রাণটা বড় ? আমি তোমাকে যেতে দেব না, দেব না—

শুদ্ধসত্ত্ব গম্ভীর গলায় বললে, কার প্রাণ ছোট কার প্রাণ বড় তা বিচার করার কথা আমার নয়। আমি ডাক্তার, রোগী সংকটাপন্ন অবস্থায়, আমায় যেতেই হবে।

বলতে বলতে শুদ্ধসত্ত্ব তার ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে দুপা এগিয়ে এসে আমাকে চিয়ারিও করে বললে, নেলীকে একটু দেখো। আমি চলি।

বললাম, এই তাণ্ডবের মধ্যে তোমার না গেলেই কি চলত না—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, আমার জীবন থাকতে রোগীর বিপদে আমি যাব না তা হয় না।

সে আর পিছনে তাকাল না। দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে খুলে ফেললে।

মুহূর্তের মধ্যে আমরা দেখলাম—দরজার বাইরে হাজার রাক্ষসের বীভৎস উম্মত্ততার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব নিজেকে জোর করে ঠেলে দিলে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, নেলীর সেই জেদ কোথায় চলে গেছে। সে একটা ছোট্ট অসহায় মেয়ের মতো ঘরের মেঝেতে কান্নায় লুটিয়ে পড়েছে।

অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে নেলীর বেশ অনেকটা সময় লাগল। আমিও নিতান্ত অপ্রস্তুতের মতো বসে বসে ভাবতে লাগলাম নেলীকে কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। এমন কি বেচারা হ্যারি পর্যন্ত এসে বার কয়েক শুনিয়ে গেল—কিছু ভাববেন না ম্যাডাম, ডক্টরের কিছু হবে না। উনি অক্ষত দেহেই ফিরে আসবেন।

এ সব কথা নেলীকে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দিল বলে মনে হল না। সে কাঁদছিল না বটে কিন্তু স্থানুর মতো চুপচাপ বসে রইল দুটো হাতের উপর চিবুক রেখে।

আমি মনে মনে একটু ভয় পেলাম। এই দুদিন আগে সে একটা বড় শক্ পেয়েছে শরীরে—বোধ হয় মনেও। আজ সবে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর আজই তার মনের উপর এই চাপ। ভাবলাম নেলীকে কথা বলাতে হবে। ওরকম চুপচাপ থাকতে দেওয়া চলবে না।

কটুস্বরে বললাম, শুদ্ধসত্ত্বের মতো এমন অদ্ভুত মানুষ আমি দেখি নি। আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে তার চলে যাওয়ার কোন মানেই হয় না—

নেলী আমার দিকে না ফিরেই নীচু গলায় বললে, কী দোষ দেব বলুন? তার কাছে আমার প্রাণের দাম অন্য একটা সাধারণ রোগীর থেকে এক কানা কড়িও বেশী নয়। কিন্তু কথাটা তো তা নয়। তার প্রাণের মূল্য আমার কাছে যে এই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও অনেক বেশী তা যে আমি তাকে কিছুতেই বোঝাতেই পারছি না—

বলতে বলতে নেলীর দুচোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল। সে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ।

আমি বললাম, আমায় মাপ করুন মিস নেলসন, আপনাদের ব্যক্তিগত কথায় একটু আসছি বলে। আমার মনে হয় শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসে। তবু—

নেলী মাথাটা নেড়ে বললে, হ্যাঁ, সে কথা আমিও জানি। কিন্তু এ যে কি সাংঘাতিক ভালবাসা তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আর পাঁচজনের মতো সে যদি আমাকে বলত, তুমি চলে যাও তোমাকে আমি চাই না, তাহলে বোধহয় আমি নিষ্কৃতি পেতাম। কিন্তু আমি জানি শুদ্ধসত্ত্ব এখনও আমার মঙ্গল অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে।

বললাম, তা যদি জানেন তবে দুঃখ পাচ্ছেন কেন?

নেলী বললে, দুঃখ কি পাই সাধে? আমাদের এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যে মাত্র একটি রাত ছাড়া ওকে আমি কাছে পেলাম না। ও আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে দূরে সরে রইল—

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের বিয়ে হয়ে গেছে—

নেলী বললে, শুদ্ধসত্ত্ব হয়তো সে বিয়েটাকে বিয়ে বলে মানবে না কিন্তু আমার বিয়ে হয়ে গেছে। শুদ্ধসত্ত্ব আমার স্বামী। বিয়ের সময়ে আমি ভয়ানক ছেলেমানুষ ছিলাম, না বুঝে একটা বিষম অপরাধ করে ফেলি। শুদ্ধসত্ত্ব সেই কথা জানতে পেরে আমাকে ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, এমন কি ভারত ছেড়ে চলে আসে এই সুদূর পশ্চিমে। নেলী আস্তে আস্তে তাদের সেই পুরোন দিনে কথা বলতে লাগল।

সে রাতটাও ঠিক এই রকম একটা ঝড়ের রাত। ১৯৪২ সন। ভারতবর্ষের চারিদিকে আগষ্টের বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সারাটা

উত্তর ভারত। বাংলা দেশ, বিহার, বেনারস, গোরক্ষপুর। জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহীরা রেলের লাইন উপড়ে, টেলিফোন টেলিগ্রাফের তার কেটে বৃটিশের সমস্ত শাসনযন্ত্র বিকল করে দিয়ে নিজেদের জাতীয় পতাকা তুলেছে। সারা ভারতবর্ষ হুংকার ছাড়ছে, বৃটিশ ভারত ছাড়।

সেই আগস্টের এক ঝড়ের রাতে শুদ্ধসত্ত্ব সি, আই, ডি, পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসছিল তরায়ের নাগরকাটা জঙ্গলের পথে। শুদ্ধসত্ত্ব ছিল বেনারসের এক বিপ্লবী দলের নেতা। বিপ্লব শুরু হতেই কলকাতা মেডিকেল কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র শুদ্ধসত্ত্ব বিপ্লবের আগুন কলকাতা থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল বেনারসে। তারপর তার দাপটের কথা কে না জানে? বৃটিশ রাজ তটস্থ হয়ে উঠেছিল শুদ্ধসত্ত্বের সম্বন্ধে। কাগজে কাগজে তার ফটো ছাপিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল—তাকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। শুদ্ধসত্ত্ব পালিয়ে গেল বেনারস থেকে গোরক্ষপুর। সেখান থেকে সটান মতিহারী। তারপর নেপালের তরায়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সে পথ করতে লাগল বাংলা দেশের দিকে। দিনের পর দিন সে হেঁটে চলতে লাগল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। স্নান নেই। আহার কোনদিন জোটে, কোনদিন কিছুই না। এইভাবে জেল পালানো কয়েদীর মতো শুদ্ধসত্ত্ব পালিয়ে যাচ্ছে জলপাইগুড়ির দিকে তরাইয়ের কোল ঘেঁষে। উদ্দেশ্য জলপাইগুড়ি থেকে কোন রকমে ট্রেনে গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায় হাজির হবে।

নাগরাকাটার জঙ্গলে এসে শুদ্ধসত্ত্ব ঠেক খেয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ভীষণ ঝড় আর জল। এতদিন সে গাছের ওপর রাত্রিবাস করে এসেছে, ঝড়ের রাতে তা আর সম্ভব হল না। ঝড় আর জলের তীব্রতা এতো বাড়তে লাগল যে সে জঙ্গলের মধ্যে থাকতে না পেরে কাছেই একটা বস্তিতে গিয়ে হাজির হল। ঝড় জলের সন্ধ্যাতে বস্তির সব কটা দরজাই বন্ধ। শুদ্ধসত্ত্ব ভিজতে ভিজতে বস্তির সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটি ঝুপড়ির দরজা খোলা তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক চিলতে আলো আর তার সঙ্গে এক বীভৎস চীৎকার। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যাপারটা দেখবার জন্যে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। ভারতকে বৃটিশ একটা বড় ঘাঁটি করেছে। তরায়ের জঙ্গলের মধ্যে বিদেশী সৈন্য এসেছে দলে দলে। জঙ্গলের মধ্যে সাজিয়েছে এ্যান্টিএয়্যারক্রাফট, জাপানী বোমারুদের ঘায়েল করবার জন্যে। তরাই তখন বিদেশী সৈন্যতে ভরা। সারাদিন তারা যুদ্ধের মহড়া দেয় আর রাতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় নারীমাংসের জন্যে। এদের উৎপাতে এদিককার সমস্ত বস্তি সন্ত্রস্ত।

শুদ্ধসত্ত্ব বাইরে থেকে দেখল একটা সাদা গোরা ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকেছে দরজা ভেঙে। একটা সোমত্ত মেয়েকে সে উলঙ্গ করে ফেলেছে। একটা লোক একপাশে

হাতে মুখ ঢেকে কাতর স্বরে কী সব অনুনয় করছে। মেয়েটা গোরাটার কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না। সে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছে আর চেঁচাচ্ছে। এই ঝড় জলে তার আর্তনাদ কারুর কানেই যাচ্ছে না।

শুদ্ধসত্ত্ব আর থাকতে পারল না। সে তার ঝোলা থেকে এক খণ্ড কাপড় বার করে মাথায় মুখে জড়িয়ে নিল। যাতে সহজে তাকে কেউ চিনতে না পারে। ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে আক্রমণ করল দানবটাকে। দুজনে ঘুসোঘুসি বেঁধে গেল। শুদ্ধসত্ত্ব কয়েকটা ঘুসিতে লোকটাকে ঝুপড়ির দরজার বাইরে ফেলে দিলে। সে তক্ষুনি উঠে আবার আক্রমণ করতে এল শুদ্ধসত্ত্বকে।

এবার লড়াই লাগল ঘরের বাইরে। শুদ্ধসত্ত্ব গিয়ে আক্রমণ করল গোরা-টাকে। যুযুৎসুর প্যাঁচে আছড়ে ফেলে দিলে তার শরীরটা দশহাত দূরে। লোকটা কিছুক্ষণ উঠল না। সেজায়গাতে পড়েই রইল। শুদ্ধসত্ত্বও সে জায়গা থেকে নড়ল না। কি জানি লোকটা যদি আবার এসে ঢোকে ঝুপড়িতে। ইতিমধ্যে ঝুপড়ির ভিতরকার লোকটা দরজাটা টেনেটুনে বন্ধ করে দিয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব কি করবে চিন্তা করার আগেই গোরাটা উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে একবার বিদ্যুৎ চমকাতে সমস্ত জায়গাটা একটুখানির জন্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর বাজের মত একটা রিভলবারের গুলি এসে বিঁধল শুদ্ধসত্ত্বের বুকে। শুদ্ধসত্ত্ব আহত হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। সেইখানেই বোধ হয় শুদ্ধসত্ত্বের সেদিন সব শেষ হয়ে যেত যদি না ডাক্তার নেলসনের দুর্ধর্ষ মেয়ে নেলী সেরাতে তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসত।

ব্যাপারটা ঘটেছিল নাগরাকাটার চা বাগানের মধ্যে। বস্তিটা ছিল চা বাগানের একটা কুলিবস্তি। সে রাতে সেই ঝড়ের মত্ততার মধ্যে চা বাগানের ডাক্তার নেলসনের মেয়ে নেলী অভিসারে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে। দার্জিলিংএর কনভেণ্টে পড়ার সময় সে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। তার সেই বয়ফ্রেণ্ড এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেটি সম্প্রতি এই চা বাগানের ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছে। নেলী তাকে নিয়ে কদিন খুব মাতামাতি করেছে। আজও এই ঝড়ের সন্ধ্যায় সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল প্রিয়-মিলনের জন্যে। সে ঘোড়ায় করে যেতে যেতে ভাবছিল, এই রাতে সে কী ভীষণ চমকে দেবে পিটারকে। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় তার নজরে পড়ল পায়ে চলা পথটার ধারে একটা কার দেহ পড়ে আছে। হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে সে দেখলে একটা লোক রক্তাক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে সেখানে। নেলীর আর এগোন হল না।

কাছেই কুলিবস্তি। সে কুলিদের ঝুপড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করে কয়েকজনকে জাগিয়ে তুললে। এ অঞ্চলে ডক্টর নেলসনের এই দুর্ধর্ষ মেয়েটাকে সবাই চেনে। কাজেই তার ডাকাডাকিতে আলো নিয়ে জনাকয়েক এসে দেখল শুদ্ধসত্ত্বের দেহটা রক্তের মধ্যে পড়ে গড়াচ্ছে।

নেলী সে দৃশ্য দেখে আর দেরী করল না। কটা কুলী ধরে সেই দেহটা তুলে নিয়ে সটান হাজির হল তাদের বাড়িতে। ডক্টর নেলসন সে সময়ে তাঁর ল্যাবরেটরীতে বইয়ের পাতার মধ্যে ডুবে ছিলেন।

নেলী শুদ্ধসত্ত্বের দেহটা তার বাবার চেম্বারের টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে নেলসনকে খবর দিল। খবর পেয়ে ডক্টর নেলসন ছুটে এলেন। তারপর সারারাত ধরে ডক্টর আর তাঁর মেয়ে নেলী শুদ্ধসত্ত্বের পরিচর্যায় লেগে রইল। ডক্টর পরীক্ষা করে দেখলেন আঘাতটা যদিও খুব সাংঘাতিক হয়েছে, বুকের একটা পাঁজরা তাতে বাদ দেওয়া দরকার—তবুও গুলিটা ভিতরে যাবার সুযোগ পায় নি। পাশ ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে। শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা পেয়ে গেছে বরাত জোরে। ইতিমধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের ঝুলিঝোলা হাতড়ে নেলী তার পরিচয় সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে। পরেরদিন সকালবেলা শুদ্ধসত্ত্বের মুখের দিকে তাকিয়ে নেলীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। মাত্র দুদিন আগেও এই দুর্ধর্ষ বিপ্লবীর ছবিটা স্টেটস্‌ম্যানের পাতায় বার হয়েছিল। একে যে ধরে দিতে পারবে তাকে সরকার দশহাজার টাকা পুরস্কার দেবে।

নেলীর এ মুখটা ভোলার কথা নয়। তার বয়ফ্রেণ্ড পিটারের মুখটাও একেবারে হুবহু একরকম না হলেও কতকটা এইরকমই। এই নিয়ে সে সেদিন ঠাট্টা করেছে পিটারকে। বলেছে, তুমি যদি আমার সঙ্গে দুষ্টুমি কর তো তোমাকে ধরিয়ে দিয়ে দশহাজার টাকা সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নেব। পিটার তার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বলেছে, সরকার আমায় নিয়ে কী করবে ? ফাঁসী দেবে তো ! তা আমার তো ফাঁসী হয়েই গেছে। তোমার গলায় যে ঝুলছি এখন আমি।

বলে সত্যি সত্যি নেলীর গলাটা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়েছিল।

নেলীর মনে পড়তে লাগল সে সব কথা। তার বাবা তার সবচেয়ে বড় বন্ধু। যা কিছু ঘটুক বাবাকে না বলা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। তাই সে তখুনি গিয়ে ডক্টর নেলসনকে সমস্ত কথা বলে ফেলল। তার কথা শুনে ডক্টর নেলসন একটু অবাক হলেন। বললেন, এই লোকটি যে আমার বাসায় আছে একথা কারোর কাছে প্রকাশ করো না। এমন কি ওর ঘরে চাকরদেরও ঢুকতে দিও না।

ডক্টর নেলসন জাতে বৃটিশ হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় তাঁর পুরোপুরি সম্মতি ছিল। বৃটিশের এই রক্তশোষণ নীতি তাঁর কাছে দুচক্ষের বিষ। তিনি একজন মস্ত উদারনৈতিক। ভারতবর্ষকে তিনি ভালবেসেছেন। সেই ভালবাসার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি জীবনসঙ্গিনী করেছেন একজন বাঙালী মহিলাকে। সবাই জানে নেলীর মা একজন বাঙালী মহিলা। মেয়ে একটু বড় হতেই বাবা তাকে দার্জিলিং-এর একটা কনভেন্টে ভর্তি করে দিলেন। এই কারণেই ডক্টর নেলসন নিজে একজন বৃটিশ হয়েও এ অঞ্চলের সাদা সমাজে খুব বেশী পাত্তা পান নি।

অন্যদিকে ভারতীয়েরা তাঁকে তাদের সমাজে ডেকে নেয় নি। ডক্টর নেলসনের তাতে কিছু এসে যেত না। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানপন্থী। চা বাগানের কাজ শেষ হলেই তিনি ঢুকতেন তাঁর গবেষণাগারে। কোন একটা ট্রপিক্যাল রোগের ওষুধ বার করবার জন্যে তিনি তাঁর আহার নিদ্রা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন।

মিসেস নেলসনও ছিলেন নিতান্ত নির্জনতাপ্রিয়। এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁর দেখা পেত অনেক কম। তিনি থাকতেন তাঁর বাগান নিয়ে।

নেলী ছেলেবেলা থেকেই দুর্দান্ত ডানপিটে কর্তৃত্ব প্রয়াসী। ভয় ডর কাকে বলে তা সে আদপেই জানত না। নেলী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে এসেছে বরাবর। কিন্তু ছুটিতে বাড়ি এলেই তার মা তাকে নিয়ে পড়তেন। তখন সব ছেড়ে নেলী শুধু বাংলা শিখত। মায়ের কাছে বাংলা গান শুনত, বাংলা গান কবিতা আবৃত্তি করত। ডক্টর নেলসনও বাংলা জানতেন। তাঁর বাড়িতে এই বাঙালী কালচারটা তিনি পছন্দ করতেন। তাই তিনি যেই শুনলেন যে ছেলেটি বিপ্লবী, তক্ষুনি তিনি সে কথাটা গোপন করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তাঁর বাংলোটা চা বাগানের সবচেয়ে শেষে আর একটেরে বলে কয়েকটা মাস কেউ জানতেও পারল না যে শুদ্ধসত্ত্ব সেখানে বাস করছে।

এই কয়েক মাসের মধ্যে দুনিয়ার বড় কিছু পরিবর্তন না হলেও নেলসন পরিবারের মধ্যে বেশ খানিকটা পরিবর্তন হল। বিশেষ করে নেলীর পরিবর্তনটা সবার চোখে পড়ল। নেলীর দুর্ধর্ষ স্বেচ্ছাচারী স্বভাব একটা জাদুদণ্ডের ছোঁওয়ায় আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগল। আগে তাকে ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে উঁচু পাহাড় থেকে নামতে প্রায়ই দেখা যেত। রাত বিরেতে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলত জঙ্গলের মধ্যে। জন্তু জানোয়ারের কী গোয়াট মিদের উৎপাতকে নেলী গ্রাহ্যও করত না। পিটারেরও মাঝে মাঝে ভয় করত নেলীর এই রকম দুর্ধর্ষ প্রকৃতি দেখে।

সেই নেলী তিন মাসের মধ্যে রীতিমত বদলে গেল। তাকে ঘর ছাড়তে বড় একটা দেখা যায় না ইদানীং। ঘরে শুদ্ধসত্ত্ব ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। সে তার বিপ্লবী জীবনের গল্প শোনায় নেলীকে। নেলী তার বিছানার পাশে বসে তাই শোনে।

তার একটা পাঁজরা ডক্টর নেলসন কেটে বাদ দিলেন। দীর্ঘ দিন ধরে সেবা করে ডক্টর নেলসন আর তার মেয়ে তাকে চাঙ্গা করে তুললেন। শেষে শুদ্ধসত্ত্ব একদিন উঠে বসল। সে পিয়ানোর সামনে বসে গানও গাইল। অপূর্ব তার গলা। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্যই যেন তার গলায় সুর দিয়েছেন ঈশ্বর।

সে গান শুনে নেলী মুগ্ধ। সে ছিল সঙ্গীতের একান্ত ভক্ত। তার মায়ের কাছে ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সে শুনেছিল। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সে

এই গানগুলোকে ভালবাসত। তাই শুদ্ধসত্ত্বের ভরাট পুরুষালী কণ্ঠে যে দিন সে শুনল—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে—

নেলী নিজেকে সামলাতে পারল না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবে শুদ্ধসত্ত্বের কাছে। ইদানিং সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পর তার হাতে কিছু করারও ছিল না।

একটা ব্যাপার নেলীকে বড় অবাক করেছিল। সে বরাবর মনে করেছে বিপ্লবীদের স্বভাব হয় দুর্ধর্ষ, তারা লোহায় গড়া মানুষ। শুদ্ধসত্ত্বকে দেখে তার সেকথা আদবেই মনে হল না। মনে হল এই ব্যক্তিটি নিতান্ত কোমল। শুদ্ধসত্ত্বের নির্মল মুখের দিকে তাকালে নেলী মনে করতেই পারে না যে এ লোকটি একদিন বৃটীশ রাজকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছিল।

একদিন সে শুদ্ধসত্ত্বের বিছানার ধারে বসে তার হাত নিয়ে খেলা করতে করতে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা আপনি তো বিপ্লবী। এই হাত দিয়ে কতো রেল লাইন উপড়েছেন, টেলিগ্রাফের তার কেটেছেন, কতো লোককে খুন করেছেন, কিন্তু আপনার হাত দেখে তো এসব মোটেই জানা যায় না। কী নরম হাত আপনার। আমার হাত আপনার চেয়েও শক্ত।

শুদ্ধসত্ত্ব হাসতে হাসতে বললে, কই দেখি।

সে নেলীর হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল অনেকক্ষণ। পরে বললে, তবুও এ হাত একটি সুন্দরী মেয়ের সুন্দর হাত। এ হাতের তুলনা হয় না। এই হাতের সেবাতেই তো আমি বেঁচে উঠলাম—

হঠাৎ নেলী রাঙা হয়ে উঠে বললে, জানেন, আমি একদিন এই হাতে একটা টমিকে এই বাগানের ধারে চাবুক পেটা করেছিলাম।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, ঐ জানোয়ারগুলোকে চাবুক মারাই দরকার।

বলে সে রাতের সেই ঘটনাটার কথা বলে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল, সেই সাদা টমিটা কি করে তাকে গুলী করেছিল। তারপর ফিকে হাসি হাসতে বললে, সে রাতেই বোধ হয় সব শেষ হয়ে যেত, যদি আপনি দয়া করে তুলে না নিয়ে আসতেন—

নেলী চটে গেল শুদ্ধসত্ত্বের কথা শুনে। সে ঝট করে তার হাত দুটো ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি আর আপনার কাছে আসব না। বাবাকে বলে আপনার জন্যে কাল থেকে একটা নার্সের বন্দোবস্ত করে দেব।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, আমার অপরাধটা কী—

নেলী বললে, আপনার ঐ রকম কথাগুলো আমার মোটেই ভাল লাগে না। আপনি আমায় দয়া করে বাঁচালেন, এ কথাটা আপনি সুযোগ পেলেই আমাকে শোনান।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, কথাটা তো আমি দিনে রাতে কখনও ভুলতে পারি না। আমি যে ঋণী হয়ে রইলাম আপনাদের কাছে, বিশেষ করে আপনার কাছে। এ ঋণ শোধ করবার সামর্থ আমার কই—

নেলী বললে, বেশ আমি আপনাকে আপনার ঋণ শোধ করবার সুযোগ দেব। আপনি আমায় গান শেখাবেন—

শুদ্ধসত্ত্ব গভীর আনন্দের সঙ্গে বললে, আমি রাজী—

সেই থেকে নেলী শুদ্ধসত্ত্বের গানের ছাত্রী।

এর পর থেকে শুদ্ধসত্ত্ব নেলীকে গান শেখাতে লাগল রীতিমতো।

ডক্টর নেলসনের চেম্বারে প্রথম জ্ঞান হবার পর থেকেই শুদ্ধসত্ত্ব বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিল একটি বিলাতী মেয়েকে পরিষ্কার বাংলা বলতে শুনে। নেলীর চেহারাটা খাঁটি বিলাতী। তাই যখন সে শুদ্ধসত্ত্বের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শুধাল—এখন কেমন বোধ করছেন—শুদ্ধসত্ত্ব একটু চমকে উঠেই বললে, ভালই। তবে বুঝতে পারছি না আমি আছি কোথায়—

নেলী তাকে ধীরে ধীরে সব কথা শুনিয়েছিল। আর শুনেছিল শুদ্ধসত্ত্বের কথাও।

একদিন নেলী বললে, আপনি যে অপক্ষপাতে আপনার জীবনের সব কথা আমায় বললেন, এখন যদি আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে সরকারের কাছ থেকে দশ-হাজার টাকা পুরস্কার নিই—

শুদ্ধসত্ত্ব নেলীর চোখে চোখ রেখে বললে, এ জীবন আপনি দিয়েছেন। তাই একে আমি আপনার হাতেই তুলে দিয়েছি। একে যদি বেচবার অধিকার কারও থাকে তো সে আপনার। আপনি এই জীবনটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন।

নেলী হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা এই কথা মনে থাকে যেন—

এরই কিছু দিন পরে নেলী গেল দার্জিলিংএ। মিসেস নেলসন প্রায় চার পাঁচ মাস হল একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন দার্জিলিংএর কোন একটা নার্সিং হোমে। নেলী মাঝে মাঝে তাই দার্জিলিং যায় মাকে দেখতে।

শুদ্ধসত্ত্ব একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই নেলী একদিন তাকে সারাদিন নিজের সম্বন্ধে কী কী করতে হবে, কোন ওষুধ পথ্য কখন খেতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে দার্জিলিং রওনা হল। বলে গেল তার ফিরতে সাত দিন সময় লাগবে।

সারা বাড়ি ফাঁকা। ডক্টর নেলসন পড়ে আছেন তাঁর লেবরেটরীতে। এই ফাঁকা বাড়ির মধ্যে একলা থেকে শুদ্ধসত্ত্ব হঠাৎ আবিষ্কার করল, তার হৃদয়ের সমস্তটা এ ক মাসে নেলী কিভাবে অধিকার করে নিয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে সে নেলীর অভাব অনুভব করতে লাগল। তার অনুপস্থিতিতে শুদ্ধসত্ত্বের

মতো একটা কঠিন বিপ্লবীর মনটা প্রায় বানচাল হবার উপক্রম হল।

এদিকে দার্জিলিং-এ গিয়ে নেলীরও স্বস্তি নেই। সে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে ডাক্তারের কাছে থেকে রিপোর্ট নিয়ে চটপট দুদিনের মধ্যে নাগরাকাটা চা বাগানে ফিরে এল। তার মুখটা বেজায় গম্ভীর।

তাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে ডক্টর নেলসন তো রীতিমত অবাক। জিজ্ঞেস করলেন—এতো তাড়াতাড়ি ফিরলে যে—

নেলী বললে, মা ভালই আছেন। তাছাড়া আমার তো সেখানে করবার মতোও কিছু নেই।

ডক্টর বললেন, কেন তোমার বন্ধু বান্ধবরা? তারা কোথায়—

নেলী মুখ নীচু করে বললে, তারা সবাই আছে। কিন্তু আমার এবার দার্জিলিংটা মোটেই ভাল লাগল না—

ডক্টর নেলসন এবার একটু অবাক হলেন। দার্জিলিং ছিল নেলীর কাছে স্বর্গের চেয়েও বেশী। সেখানে যেতে পেলে সে বোধ হয় স্বর্গসুখও ছাড়তে রাজী ছিল।

সেবার নাগরাকাটার জঙ্গলে অকাল বসন্তের আবির্ভাব হল। বর্ষার পরে শরত এল। ওপরে বৃষ্টি ধোওয়া ঝকঝকে নীল আকাশ আর নীচে সদ্য স্নান করে ওঠা চকচকে সবুজ জঙ্গল, এ সব মিলে যেন শুদ্ধসত্ত্ব আর নেলীকে একটা নতুন রাজ্যে পোঁছে দিলে। বিপ্লবী শুদ্ধসত্ত্ব ভুলে গেল তার বিপ্লবের মন্ত্র। নেলীও ভুলল সে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে পিটারকে।

সেদিন শারদ পূর্ণিমার রাতে একটা টিলার ওপর দুজনে বসেছিল হাতে হাত রেখে। বনৌষধির অপূর্ব গন্ধে সারা জঙ্গলটা মেতে উঠেছিল।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, আমি ধন্য, তোমার মতো মেয়ের ভালোবাসা আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে? আমার জীবন যে দাগী হয়ে আছে।

নেলী বললে, এখানে তোমাকে আমি আমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে রেখে দেব। কারুর সাধ্য হবে না তোমাকে খুঁজে বার করে। তুমি তো ডাক্তার, বাবার লেবরেটরীতে বসে সারা জীবন গবেষণা চালাতে পারবে। নতুন রোগের ওষুধ বার করতে পারবে।

শুদ্ধসত্ত্ব একটু ফিকে হেসে বললে, তুমি দার্জিলিং চলে যাবার পর পুলিশের লোক বাড়ি এসেছিল।

নেলী হেসে বললে, আমি জানতুম তারা আসবে—

শুদ্ধসত্ত্ব অবাক হয়ে বললে, তার মানে—

নেলী বললে, তারা অনেক আগেই টের পেয়েছে আমরা একজন বিপ্লবীকে এখানে লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু আমি তাদের চোখে ধুলো দিয়েছি। তুমি

কিছু ভেবো না—

একটু থেমে বললে, তা এই অদ্ভুত সুন্দর রাতটা কি শুধু পুলিশের কথা ভেবেই কাটবে—

শুদ্ধসত্ত্ব একটু লজ্জা পেয়ে নেলীকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিলে। নেলী তাকে আরও জড়িয়ে ধরে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো আমি এতক্ষণ চাইছিলাম। শুদ্ধসত্ত্বের কানে কানে সে বললে, এই আমাদের বিয়ে হল, তাই না—

শুদ্ধসত্ত্ব গভীর আবেগে তার মুখে চোখে চুমু খেতে খেতে বললে, হ্যাঁ—

নেলী বললে, কিন্তু আমাদের এই বিয়ের সাক্ষী কই—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, সাক্ষী থাকবে এই নাগরাকাটার জঙ্গলের গাছগুলো আর ওই পাথরের টিলাটা।

বলতে বলতে নেলীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। মুখে তার ফুটে উঠল একটা চমৎকার হাসি। বললে, তখন শুদ্ধসত্ত্ব কি রকম ছেলে-মানুষ ছিল তা জানেন। সেই রাতে কোথা থেকে একটা ছেনী আর হাতুড়ি নিয়ে এসে সেই পাথরের টিলাটার গায়ে বড় বড় অক্ষরে আমাদের দুজনের নাম খোদাই করে ফেললে। কিন্তু আমি সেরাতে তাকে আর একটা জিনিস দিয়েছিলাম। দার্জিলিং থেকে ফিরে আসার সময় নিয়ে এসেছিলাম একজোড়া পাথরের আংটি। অদ্ভুত নীল রঙের একটা পাথর দুখণ্ড করে দোকানীটা দুটো আংটি তৈরী করে দিয়েছিল। এরকম পাথর সাধারণত আপনি দেখবেন না। তার একটা পরিয়ে দিয়েছিলাম শুদ্ধসত্ত্বকে আর একটা ছিল আমার হাতে।

বলে নেলী তার হাতের আঙুলগুলো আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। দেখলাম তার অনামিকাতে সাপের বিষের মত নীল অথচ ঝকঝকে পাথরটা দপ্‌দপ করে জ্বলছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—শুদ্ধসত্ত্বের আঙুলে সেই আংটিটা কী এখনও আছে ?

নেলী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, নাঃ। তার আঙুলে সেটা আর দেখতে পাই না। তাইতে মনে হয় সে সেরাতের বিয়ের কথাটা ভুলে গেছে। একটু চুপ করে থেকে নেলী বললে, অবশ্য ভোলাটা কিছু আশ্চর্যের নয়। সে আজ দীর্ঘ দিন আগেকার কথা। তা ছাড়া ঐ একটা রাতই তো তাকে আমি নিবিড় করে পেয়েছিলাম—

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন একটা রাত কেন ? তারপরে শুদ্ধসত্ত্বের কী হল ?

নেলী আবার ডুবে গেল তার স্মৃতির অতলে। হয়ত বা সেই বিশেষ রাতটাকে মনে মনে বিশেষ করে অনুভব করতে লাগল। আস্তে আস্তে বললে, সে রাতে আমরা সমস্ত রাতটাই সেই পাহাড়ী টিলাটার উপর কাটিয়েছি, শুদ্ধসত্ত্ব আর আমি। আমি সেরাতে শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গ লোভীর মত ভোগ করেছিলাম। আমার মনের সমস্ত কপাট খুলে দিয়েছিলাম আনন্দ উপাচারের জন্যে।

শুদ্ধসত্ত্বের উপভোগে বাধা ছিল। বারবার তার মনে পড়ছিল তার জীবন সীমিত। সুস্থ সাধারণ জীবন তার জন্যে নয়। তার জন্যে বৃটিশ সরকার দশ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে।

আমার সে রাতে কোন বাধা ভাল লাগছিল না। আমি বন্যার জলে ভেসে যেতে চাইছিলাম, ডুবে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিল, শুদ্ধসত্ত্ব আমাকে নিয়ে যা খুশী করুক। শুদ্ধসত্ত্ব বারবার মনে করছিল তার ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা। আর সে আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল বারবার।

নেলী এবার তার মাথাটা উঁচু করে চুলটাকে ঠিক করে নিয়ে ভালভাবে বসল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—সে রাতে আমায় নেশায় পেয়েছিল। আমি মাতালের মতো সব ভুলে ক্ষেপে উঠেছিলাম। তাই যে গোপন কথাটা শুদ্ধসত্ত্বকে কখনও বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই কথাটাই আমার বুক চিরে বেরিয়ে এল।

শুদ্ধসত্ত্বকে বললাম, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার সব বিপদ কেটে গেছে। আমি দার্জিলিংএ গিয়ে সে ব্যবস্থা করে এসেছি।

শুদ্ধসত্ত্ব জানতে চাইল—কী ব্যবস্থা করেছ—

—প্রশ্ন শুনেই আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। সে কথা আমি কাউকে বলতে চাই নি। সে কথা আমি সেদিন উজ্জ্বল আনন্দে ভেসে গিয়ে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব আমাকে ভুলতে দিলে না। শেষ পর্যন্ত তাকে বলেই ফেললাম, দার্জিলিংএ কী ভাবে আমি আমার বয় ফ্রেন্ড পিটারকে বিপ্লবী শুদ্ধসত্ত্ব বলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে এসেছি।

—শুদ্ধসত্ত্ব আমার কথা শুনে একটুও আনন্দ পেল না। সে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। তার মুখ থেকে আর একটা কথাও আমি শুনলাম না। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমরা নিঃশব্দে বাড়ি ফিরলাম। আমি আমার ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে ছটফট করেছিলাম অনেকক্ষণ। মনে মনে একটা কথা শেষ পর্যন্ত স্থির করেছিলাম। শুদ্ধসত্ত্ব বলেছিল, সে তার জীবন আমাকে সঁপে দিয়েছে তা নিয়ে আমি যা খুশী করতে পারি। তাই আমি আমার খুশী মতোই একাজ করেছি। শুদ্ধসত্ত্বের এতে রাগ করা সাজে না। সে কথাটা বলব বলে তখনি শুদ্ধসত্ত্বের ঘরে গেলাম। দেখলাম তার ঘর ফাঁকা। সে আমাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

—একবার মনে হয়েছিল ঘোড়ায় করে ছুটে চলে যাই, তাকে পথ থেকে ধরে নিয়ে আসি। পর মুহূর্তেই একটা ভয়ানক ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, আমি সারাদিন তাই বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিলাম।

—তার পরের দিন থেকেই আমি শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলাম। চারদিকে তার খোঁজ চালাতে লাগলাম। সেই দিন থেকে আরম্ভ করে আর এই

কমাস আগে পর্যন্ত, এই প্রায় একটা যুগ আমি কেবল শুদ্ধসত্ত্বকেই খুঁজে বেড়িয়েছি। শেষকালে দেখা পেলাম এই আবার্ডিনে। আমি ভারতবর্ষে থাকতেই খবর পেয়েছিলাম পিটারকে পুলিশ আটকে রাখতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় যে সে শুদ্ধসত্ত্ব নয়। তাই তাকে তারা ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আজও শেষ হল না—

বলতে বলতে নেলী আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললে, আমি জানি শুদ্ধসত্ত্ব আমাকে ঘৃণা করে। শুধু যদি তার কাছে থেকে ঘৃণাই পেতাম তবে হয়তো আমি আত্মহত্যা করে শান্তি পেতে পারতাম। তা তো নয়, আমি যে জানি সে আমাকে আজও ভালবাসে। আর সে কথা জানি বলেই আমি এতো বেশী করে জ্বলছি।

বিকেলের দিকে ঝড়টা অনেকটা কমে এলো। নেলী সারাটা দিন প্রায় কিছুই না খেয়েই কাটাচ্ছিল। ঝড়টা কমে আসতে দেখে সে হাই-টীর ব্যবস্থা করতে রান্না ঘরে গেল হ্যারির সঙ্গে।

বাইরের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠতেই আমি আর নেলী ব্যস্ত হয়ে একসঙ্গে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দেখি জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলাম।—গুড ইভনিং, আরে এসো, এসো জ্যাক—

জ্যাক ঘরে ঢুকতেই নেলীর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলাম। জ্যাক নেলীকে গুড্ উইস করেই আমার দিকে ফিরে বললে, ধন্যি লোক বাবা—এই ঝড়ের মধ্যে এই জঙ্গলে কদিন লুকিয়ে থাকার মানে তো বুঝি না।

বললাম, কেন, আমি তো টেলিফোনে খবর দিয়েছিলাম প্রথম দিনই আণ্টি জেনকে—

জ্যাক বললে, সেইটুকুই রক্ষে করেছিলে। কিন্তু দুটো বুড়ী তোমার জন্যে যে কী উৎকণ্ঠায় আছে তা আর কি বলব। আজ দুপুরের পরে ঝড় কমতে না কমতে আমি গেলাম তোমার বাসায়। দুই বুড়ী আমায় ধরে বললে, এক্ষুনি একবার ব্যাংখরি যাও, বোধির পাত্তা কর। ভাগ্যে রক্ষে যে এই অঞ্চলের প্রায় সবাই ডক্টর রের বাড়িটা চেনে। নইলে হয়তো সারারাত আমাকে এই জঙ্গলে ঘুরে মরতে হত।

আবার বাইরের দরজায় কলিং বেল বাজল। এবার হ্যারি গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখা গেল শুদ্ধসত্ত্ব বাড়িতে ঢুকছে। তাই দেখে নেলী অস্থির উত্তেজনায় ছিলেকাটা ধনুকের মতো ছিটকে দৌড়ে গেল শুদ্ধসত্ত্বের কাছে। তার খেয়ালই রইল না যে আমরা বসে আছি ড্রয়িং রুমে।

শুদ্ধসত্ত্ব ধীরে সুস্থে একটা সোফায় বসে পাশেরটায় নেলীকে বসতে ইঙ্গিত করল। আমি জ্যাকের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলাম। প্রশান্ত মুখে

হাসতে হাসতে শুদ্ধসত্ত্ব জ্যাককে অভ্যর্থনা জানাল।

শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের কাছে ঝড়ের বিবরণ দিতে লাগল। বহুলোক গৃহহারা হয়েছে স্টোনহ্যাভেনেই। বহুলোক ঝড়ের মুখে পড়ে প্রাণ দিয়েছে, বহুলোক আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। সেই সব গল্প বলতে লাগল শুদ্ধসত্ত্ব।

একটু পরেই হ্যারি এসে চা পর্বের কথা ঘোষণা করতেই আমরা সবাই গিয়ে টেবিলে বসলাম। নেলী আগের থেকে অনেক সহজ হয়েছে এবার। নিজের থেকে উৎসাহ নিয়ে খাবার দিতে লাগল আমাদের। আমরাও গল্প করতে করতে খেতে লাগলাম।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি আর জ্যাক, নেলী আর শুদ্ধসত্ত্বের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

॥ ৩৩ ॥

জানুয়ারীর শেষ দিনটা সমস্ত কন্টিনেন্টে আর উত্তর সাগরের তীরে একটা বড় ক্ষত রেখে যাবার পর, ফেব্রুয়ারী আর মার্চ মাস দুটো বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল। শুধু এক শীতের উৎপাত। কিন্তু তাকে গ্রাহ্য করলে এদেশের লোকেদের চলে না। ক্রমশঃ এপ্রিল এল। মার্চ থেকেই চারদিকের বরফ গলতে শুরু করেছিল। এদিক ওদিক মাটি বার হয়ে পড়েছিল ফাঁকা ক্ষেতগুলোতে, জঙ্গলের ধারে, পাহাড়ের কোলে কোলে। এপ্রিল আসতেই সে সব মাঠ, ঘাট, জঙ্গল সবুজ ঘাসে ভরে যেতে লাগল।

রোদের মধ্যে কাঁচা সোনার রং খেলতে লাগল। আবহাওয়া আতপ্ত হয়ে এল। এতদিন পরে দেখলাম ঘরের মধ্যে একটা মাছি উড়ে এসে বসেছে দেয়ালে। শীতের মধ্যে কীট পতঙ্গ দেখতেই পাওয়া যায় না। দলে দলে লোকে গামবুট পরে ডীর একহাঁটু জলে ছিপ ফেলে দাঁড়াল। সারাদিন ধরে তারা ওৎপেতে অপেক্ষা করবে স্যামন শীকারের জন্যে।

দু একদিনের মধ্যেই রাস্তার চৌমাথায় ছোট ছোট দ্বীপগুলোতে দেখলাম মাটি ভেদ করে ভুঁই চাপার মতো ক্রকাস মাথা তুলেছে। নানা রং-এর ছোট ছোট ফুলগুলো রাস্তা আলো করে তুলেছে তাদের আভায়। এদিকে বাসে করে যেতে যেতে দেখি, রাস্তার ধারের হাড় বার করা পীচ আর প্লেন গাছগুলোতে যেন জাদুদণ্ডে ছোঁয়ার পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। গাছের ডালগুলো রোদ লেগে প্রথমে রসাল হয়ে উঠল। তারপর দেখলাম সেই সব ন্যাড়া ডালে এক ঝাঁক করে পোকা বসেছে। গুটীগুটী পোকার রাশ সারা গাছটার গায়ে ছড়িয়ে গেছে। দুদিনের মধ্যেই দেখলাম তারা পোকা নয়, তারা হল নতুন পত্রশিশু।

আরও দ্বদিনের মধ্যেই সে সব পাতারা পাক খ্বলে লম্বা হয়ে ডানা ছড়িয়ে দাঁড়াল ডালের উপর। যেন অজস্র প্রজাপতি মথ্ এসে বসেছে গাছের ডালে। এক সপ্তার মধ্যে সব কটা গাছ সব্বজে সব্বজ ছেয়ে গেল।

রাস্তায় রাস্তায় পথিকদের চলাটা ঢিমে হয়ে এল। শহর থেকে ঘন ঘন বাস ছাড়তে লাগল গ্রামের দিকে প্রমোদ ভ্রমণে।

আমাদের বাড়িতে দ্বই ব্বড়ি অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। টোবি কচ্ছপটা স্বচ্ছন্দে বাগানে গিয়ে চরে বেড়াতে লাগল। র‍্যামসে আগের চেয়ে আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আন্টি জেন পরম উৎসাহে বাগানের হেজের বেড়া ছাঁটতে লেগে গেলেন। মিসেস ব্রাউন যত্ন নিতে লাগলেন আর আর গাছগ্বলোর।

রবিবারগ্বলোতে হ্বল্লোড় আগের থেকে বেশী হতে লাগল। বিশেষ করে আন্টি এ্যানি যেন আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

ক্রমশঃ এপ্রিলেরও শেষ হল। মে এল। ডেজী, ড্যাফিডলায়নেরা দলে দলে ফুটতে লাগল যেখানে সেখানে। হথর্ন-এর ঝাড়ে যেন সোনা ছড়িয়ে দিল চারদিকে।

একদিন সবচেয়ে অবাক হলাম। সেদিনটা ছ্বটির দিন। দেখি ইউনিয়ন স্ট্রীটের চৌমাথার ধারে যে পার্কটা আছে সেখানে মে মাসের চড়চড়ে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রোফেসর রোজ আর প্রোফেসরম্যাকিন্টর দ্বজনে ড্রাফ্ট্ খেলছেন।

ড্রাফ্ট্ খেলা ভারী মজার। বিরাট একটা দাবার ছকের মতো ছক কাটা জায়গা। তার মধ্যে বসান বড় বড় কাঠের খ্বঁটি। আংটা লাগান দ্বটো লাঠি হাতে নিয়ে দ্বজনে দ্বদিক থেকে চাল দেয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। স্কটদের একটা বড় প্রিয় খেলা। দেখি দ্বই অধ্যাপক, একজনের ম্বখে পাইপ আর একজনের চুরোট, পরণে দ্বজনেরই টার্টানের কিল্ট। লেস আর হোজ মোজা। দ্বজনে এক মনে ড্রাফট্ খেলে চলেছেন।

জ্যাক আর আমি দ্বজনে সেই দ্বশ্যটা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে লাগলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম—ডক্টর রোজ যে প্রোফেসর ম্যাকিন্টরের সঙ্গে ড্রাফ্ট খেলছেন, কী ব্যাপার?

জ্যাক হাসতে হাসতে বললে, কিছ্ব আশ্চর্য নয়। প্রোফেসর ম্যাকিন্টর এই শহরে এসে আছেন বলেই না ডক্টর রোজ ঝগড়া করে আরাম পান। আর ম্যাকিন্টরও ওর পিছন না লেগে থাকতে পারেন না। আসলে দ্ব ব্বড়োয় ভয়ানক ভাব। এই দেখ না এই ড্রাফ্ট খেলার পরে দ্বই ব্বড়ো ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে গিয়ে বসবে। তখন এক স্কচ-হ্বইস্কি ছাড়া আর কিছ্ব সামনে দিলে দ্বজনেই ওয়েটারকে ধরে ছ্বঁড়ে ফেলে দেবে বোধহয়। তারপর কিছ্ব হ্বইস্কি পেটে পড়লে দ্বজনে দ্বজনকে কী প্রশংসা করতে আরম্ভ করে, কাছে থেকে শ্বনো।

জ্যাক আর আমি দুজনে একটা বাস ধরে চলে গেলাম হেজেলহেডের দিকে। হেজেলহেডের জঙ্গল বসন্তের ছোঁয়া পেয়ে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। গাছগুলো নব পত্রিকাতে ছেয়ে গিয়ে যেন কিশোরী কনে বৌয়ের মতো সেজেছে। হেজেল হেডের পার্কে ইতিমধ্যেই নানান ফুল ফুটতে শুরু করেছে। শুধু ক্রকাসই নয়, ড্যাফোডিলরা তাদের উজ্জ্বল হলুদে আভা এখানে ওখানে ছড়াতেশুরু করেছে। ফুটছে সাইক্লামেন। পার্কের বুকে ঘাসের লনগুলো আরও নরম হয়ে উঠেছে।

জ্যাক আর আমি সেই ঘাসের লনের উপর মে মাসের রোদে পিঠ দিয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। সারা শীতকালের আড়ষ্ট শরীরটার খিল যেন একটু একটু করে খুলতে লাগল। প্রায় ঘন্টা দেড়েক ঐভাবে কাটিয়ে জ্যাক বললে, চল বোধি একটু গলা ভিজানো দরকার এবার—

দুজনে উঠে বাস ধরে এলাম—ব্রীজ স্ট্রীটের চৌমাথায়। সটান ঢুকে পড়লাম ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে। আমাদের বরাবরের অভ্যাসমতো আমরা একটা কোণের টেবিল দখল করে বসলাম।

একটু পরে সামনের টেবিল থেকে ঠা ঠা হাসির উঁচু আওয়াজ উঠতেই দেখলাম প্রোফেসর ম্যাকিন্টর স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে কি একটা রসিকতায় হেসে ফেটে পড়ছেন। তার সঙ্গে ডক্টর রোজও খিলখিল করে একটা অদ্ভুত হাসি হাসছেন। সারাটা হোটেলের লোক আড়চোখে ওঁদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু ওঁদের ভ্রুক্ষেপও নেই।

হাসি থামতেই প্রোফেসর ম্যাকিন্টর বললেন, যদি আমার পছন্দের ওপর আপনি নির্ভর করেন তবে আমি হুইস্কির থেকে ক্লারেটকেই বেশী প্রাধান্য দেব। আসলে হুইস্কি স্কটরা তৈরী করেছে দুনিয়াকে মাতাল করবার জন্যে। তারা নিজেরা হল ক্ল্যারেট রসের রসিক। ডক্টর আপনার কী দার্শনিক হিউমের কথা মনে নেই। হিউম স্কট হয়েও অনেক দূরে প্যারিসে আড্ডা গেড়ে ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল—এডিনবরায় গিয়ে বাস করব আর প্রাণ ভরে আমার ক্ল্যারেট খাব। তখন ক্ল্যারেট কি সস্তাই ছিল, ১ ডজনের দাম ছিল মাত্র আঠার শিলিং—

প্রোফেসর বিগত দিনের কথা ভেবে ফোঁৎ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

ডক্টর রোজ তক্ষুণি বয়কে ডেকে অর্ডার দিলেন দু গ্লাস ক্ল্যারেটের, আর কিছু স্যান্ডউইচের। জ্যাকও অধ্যাপকের পন্থা অবলম্বন করল।

সামনে দুই অধ্যাপকে গল্প চলতে লাগল। আমি আর জ্যাক কান খাড়া করে তাই শুনতে লাগলাম।

হিউমের নামে ডক্টর রোজ খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, হিউম ইংরেজদের কী রকম চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিল মনে আছে আপনার প্রোফেসর?

প্রোফেসর ম্যাকিন্টর জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন ডক্টর রোজের দিকে। ডক্টর

রোজ চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে বলতে লাগলেন, হিউম একবার ইংরেজদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমরা স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা অশিক্ষিত। আমরা আমাদের রাজাকে হারিয়েছি, পার্লামেণ্ট হারিয়েছি, স্বাধীনতা হারিয়েছি, এমন কি আমাদের বড় বড় বংশের মর্যাদাগুলো পর্যন্ত হারাতে বসেছি। আমরা বিকৃত ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে কথা বলি বলে আমরা সত্যিই নিজেদের উপর অসন্তুষ্ট। তবুও এই অবস্থার মধ্যে আমি ভবিষ্যতবাণী করছি আমাদের এই স্কটল্যাণ্ডই ইউরোপের মধ্যে সেরা সাহিত্য সৃষ্টি করবে। কথাটা পরম বিস্ময়ের হলেও কিছুদিন পরে সেটা সত্যি হল।

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর বললেন, তা বটে। ওয়াল্টার স্কটই স্কটদের সেই মর্যাদা প্রথম দিয়েছেন। তিনি এ্যাডিসোনিয়ন ইংরেজী (বিদ্যাসাগরী বাংলার মতো) ছেড়ে স্কটল্যাণ্ডের সমস্ত উচ্চারণ আর বিকৃত ভাষাগুলোকেই জাতে তুলে ইংরেজীর মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন। আসলে ওয়ালটার স্কটই প্রথম তাঁর কাব্যে আর উপন্যাসে স্কটদের স্কট বলে সচেতন করে দিলেন। তাঁর কাব্য উপন্যাস পড়ে স্কটরা নিজেদের স্কট বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ না করে বরঞ্চ গর্বিত হতে লাগল। স্কটল্যাণ্ডের অন্য লোকদের নিজেদের ভাই-গোত্র বলে স্বীকার করে নিতে লাগল। এক কথায় স্যার ওয়াল্টারই স্কটল্যাণ্ডের লোকদের জাতীয়তাবোধে প্রথম উদ্বুদ্ধ করলেন। তাই নয় কি—

ডক্টর রোজ একটু চেপে মন্তব্য করলেন—হ্যাঁ তা মোটামুটি সেই কথা বলা চলে। তবে—

প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর পরম উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, স্কটের প্রভাবে স্কটল্যাণ্ডের লোকদের জীবনে অনেক ভাল সময় এল। তাঁরই প্রভাবে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের চতুর্থ জর্জ এডিনবরা পরিদর্শনে এলেন। ওয়াল্টার স্কট এই পরিদর্শন সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে সমস্ত স্কটল্যাণ্ডের কাছে আবেদন জানালেন—স্কটরা যেন নিজেদের অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে। ওয়াল্টার স্কট খুঁজে পেতে মণ্ট্রোজের সেই বিখ্যাত পুরনো তলোয়ারটা বার করলেন। তারপর নাইট মার্শালকে দিয়ে অভ্যর্থনা শোভাযাত্রায় সেটা বহন করালেন। তিনিই এডিনবরার সমস্ত ঐতিহাসিক প্রাসাদ আর দুর্গগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করলেন। স্কটল্যাণ্ডের পুরনো প্রথাগুলিকে তিনি আবার সমাজে চালু করলেন। চতুর্থ জর্জের শরীর রক্ষী হিসেবে তিনি ধনুকধারী সৈন্যদল নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর রাজা এডিনবরার তোরণে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্কটদের নির্দেশ মতো এডিনবরার শাসনকর্তা তাঁর হাতে শহরের চাবি সমর্পণ করলেন। সত্যি কথা বলতে কি, স্কটের জন্যেই স্কটরা রাজা চতুর্থ জর্জকে বিদেশী রাজা বলে না ভেবে নিজেদেরই একজন বলে মেনে নিল। তারা মনে করল চতুর্থ জর্জ হলেন স্টুয়ার্ট রাজ বংশের সন্তান, সুতরাং স্কটল্যাণ্ডের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী

তিনিই। স্কটল্যান্ড আবার নতুন করে কালচারড্ হতে লাগল।

ডক্টর রোজ এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন প্রোফেসর ম্যাকিন্টরের কথাগুলো। আর মাঝে মাঝে স্যাডউইচ্ চিবোচ্ছিলেন। ক্ল্যারেটের গ্লাসে একটা বড় চুমুক লাগিয়ে এবার তিনি বললেন, যাই বলুন আপনি, সে যুগটাকে স্কটিশ কালচারের নব জাগরণের যুগ না বলে আমি বলি বিসর্জনের যুগ।

প্রোফেসর ম্যাকিন্টর ক্ল্যারেটের গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটু বিস্মিত হয়ে শুধালেন —কেন ?

ডক্টর রোজ টিপ্পনী কাটলেন—স্কটের সময়ে প্রাচীন স্কট-কালচার যা স্কটদের একান্ত ছিল সেটার পুরোপুরি বিসর্জন হয়ে গেল বলে। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন পুরোপুরি ডুবে মরার আগে স্কটদের কালচারের ছিটে ফোঁটাকে স্কট অমর করে রেখে দিলেন। কিন্তু পুরনো স্কট-কালচারের মতো এমন একটা গোটা সুন্দর কালচার স্কট তৈরী করতে পারেন নি—এইটাই বড় দুঃখের বিষয়।

জ্যাক আমার দিকে চেয়ে চোখ মটকে একটু হাসল। তারপর ফিসফিস করে বললে, ডক্টর রোজ আজও স্বপ্ন দেখছেন প্রাচীন গ্যালিক কালচারের—

ডক্টর রোজ একটু থেমে মুচকে হেসে বললেন, যাক্ গে ওসব কথা। তবু প্রোফেসর ম্যাকিন্টর আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি না। আপনার মতো একজন বিদগ্ধ লোক যে স্কটল্যান্ড সম্বন্ধে আজও ভাবেন—সেইটা জেনেই আমি আজ বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি।

প্রোফেসর ম্যাকিন্টর আবার হো হো করে হলফাটা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, ডক্টর রোজ বোধ হয় অনেক ভাল ভাল কম্প্লিমেন্ট আমার কাছ থেকে আশা করেন—তাই অমন ভালো কম্প্লিমেন্ট আমাকে দিচ্ছেন। কিন্তু আমার কথা একটা। আমি একজন স্কট হয়ে স্কটল্যান্ডের প্রাচীন আত্মাকে শুকনো কথার কম্প্লিমেন্ট দিলে সেটা আমার বালচাপল্যের পরিচয় হবে—

বলে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর ডান হাতটা ডক্টর রোজের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ডক্টর রোজও তাঁর হাতখানা পরম সমাদরে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গটগট করে হোটেল ছেড়ে বার হয়ে গেলেন।

॥ ৩৪ ॥

ডক্টর রোজ ইন্ভার্নেসে চলেছেন সেখানকার প্রাচীন ইতিহাস সমিতির একটা বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে। বিশেষ অধিবেশনটা হচ্ছে বনি প্রিন্স-চার্লির স্মৃতি উপলক্ষে। ডক্টর রোজের পুরনো ঝধঝড়ে অস্টিনটার ভিতরের সীটে বসেছি আমি আর ডক্টর রোজ। শুদ্ধসত্ত্ব গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পাশে বসে আছে জ্যাক। ডক্টর রোজ গাড়িতে উঠেই রসিকতা আরম্ভ

করেছেন। যেমন ধ্বধ্বড়ে গাড়ী, তার মালিকও তেমনি। কিন্তু ডক্টর রে দুটোকেই সমান চালাতে পারেন, এটাই আশ্চর্য—

ডক্টর রোজের একবার রক্তবমি হয়েছিল কয়েক বছর আগে। হাসপাতালে গেলেন তিনি। যথারীতি রোগ সেরে ঘরেও এলেন। কিছুদিন ভাল যাবার পর একদিন আবার রক্তবমি। মিসেস রোজ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তক্ষুনি ডক্টর রোজকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু ডক্টর রোজ রাজী হলেন না। রক্তবমি করতে করতেই বললেন, ওই সব মিথ্যাবাদী খুনে ডাক্তারদের খপ্পরে পড়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। ওরা না একবার বলে দিয়েছে যে আমার শরীরে আর কোন রোগ নেই। তবে রক্তবমি হচ্ছে কিসের জন্যে—

কিছুতেই তিনি হাসপাতালে গেলেন না। তখন মিসেস রোজ প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। স্থানীয় একজন ডাক্তার বললে, ডক্টর রে-কে ডেকে একবার পরামর্শ করুন না। তিনি একজন ভাল টি, বি, স্পেশালিস্ট।

অগত্যা শুদ্ধসত্ত্বের ডাক পড়ল। শুদ্ধসত্ত্ব এসেই রোগীর নাড়ী নক্ষত্র সব জেনে নিল। তারপর ডক্টর রোজের মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে চিকিৎসা চালাতে লাগল। শুধু তাই নয়, ডক্টর রোজের চিকিৎসা করতে করতে শুদ্ধসত্ত্ব একদিন তাঁর পরম বন্ধু হয়ে গেল। শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আত্মার একটি রূপ দেখতে পেয়ে ডক্টর রোজের পুরাতাত্ত্বিক মন মুগ্ধ হল। ভারতীয় আত্মার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের আত্মার মিলন হয়ে গেল খুব স্বাভাবিক ভাবেই। শুদ্ধসত্ত্ব স্কটল্যাণ্ডের যা কিছু প্রাচীন তা শোনবার জন্যে বারবার ছুটে আসত ডক্টর রোজের কাছে। ডক্টর রোজ শুদ্ধসত্ত্বকে সে সব কথা শুনিয়ে সুখী হতেন। শেষে রুগীর রোগ সারল বটে, তবু ডাক্তারের আনাগোনা তাঁর বাড়িতে কমল না। সময় অসময়ে যখন তখন শুদ্ধসত্ত্ব ডক্টর রোজের বাড়ি আসত।

ডক্টর রোজের বাইরে সভা সমিতিতে ডাক পড়ত প্রায়ই। সে সব সময়ে মিসেস রোজ তাঁকে একা ছাড়তে ভরসা পেতেন না। শরণ নিতেন শুদ্ধসত্ত্বের। শুদ্ধসত্ত্ব অস্টিনটা তখন নিজে চালিয়ে নিয়ে যেত।

এবারেও আমন্ত্রণ এসেছে ইনভার্নেস থেকে। ডক্টর রোজ চলেছেন শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে। আমরাও সঙ্গে জুটেছি। ডক্টর এতে বেজায় খুশী।

জুলাই মাসের আকাশ রোদে ভরে গেছে। মেঘ, কুয়াশা আর ঠাণ্ডা হাওয়া মন্ত্রের চোটে যেন লোপাট হয়ে গেছে। মাঠ-ঘাট ভরে গেছে, হেদার, হথর্ণ, ড্যাণ্ডিলায়ন, বাটারকাপ আর ডেজীতে। আবার্ডিনসায়ারের চমৎকার দৃশ্যে দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সাপের গায়ের মতো মসৃণ কালো রাস্তা এঁকে বেঁকে সামনে চলে গেছে দুপাশে সবুজ শষ্যক্ষেত চিরে। পাহাড়গুলো সরে গেছে দূরে দূরে। ক্রমশঃ আমাদের মন বাইরের থেকে ভিতরে এসে জমতে লাগল।

শুদ্ধসত্ত্ব গাড়ি চালাতে চালাতেই ডক্টর রোজকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা ডক্টর, প্রিন্স চার্লস্ এডোয়ার্ডকে এরা বনি প্রিন্স চার্লি বলে কেন ? তাঁর বনি নামটা কি স্কটল্যাণ্ডের মহিলাদের দেওয়া ?

শুদ্ধসত্ত্বের প্রশ্ন শুনে ডক্টর রোজ ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করে তাঁর নিজস্ব ঢং-এর হাসিটা হাসতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে পুরুষ সবাই প্রিন্স চার্লসকে বনি প্রিন্স চার্লি বলে ডাকে। এটা হল তাঁর স্কটদের দেওয়া আদরের নাম। এ নামটা প্রিন্সকে দিয়েছে বিশেষ করে হাইল্যাণ্ডের লোকেরা। তারা তাঁকে ভয়ানক ভালবাসত। অবশ্য ভালবাসার কারণও ছিল।

জ্যাক বললে, শুনেছি প্রিন্সকে দেখতে আদৌ ভাল ছিল না। তাঁর চেহারাটা ছিল মেয়েলী।

প্রোফেসর বললেন, ইনভার্নেসে যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে যেন খবরদার ওরকম কথা বোলো না। ইনভার্নেস হল হাইল্যান্ডের রাজধানী। সেখানকার লোকেরা আর যাই সহ্য করুক বনি প্রিন্স চার্লির নিন্দে সহ্য করবে না তা বলে দিচ্ছি।

জ্যাক হাসতে হাসতে বললে, আমার নিজের বাড়িও ইন্ভার্নেসে। আমি একজন হাইল্যাণ্ডার।

ডক্টর রোজ জ্যাকের মুখের দিকে খানিকটা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে চোখ পাকিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা।

জ্যাক হাসতে হাসতে জবাব দিল—এতটুকুও মিথ্যে নয়।

ডক্টর রোজও ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললেন, গ্যালিক জান ?

জ্যাক মুখ নীচু করে বললে, না।

ডক্টর আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ক্ল্যানের (গোত্রের) নাম কী ?

জ্যাক একটু ইতস্তত করে বললে, ম্যাকফারসন।

সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর রোজ জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাকার ম্যাকফারসন ? তোমাদের ট্যাটার্নের রং কী ? তোমাদের সর্দার মাথায় কি চিহ্ন পরত ?

জ্যাক ম্লান হাসি হাসতে হাসতে বললে, অতশত জানি না ডক্টর—

ডক্টর রোজ আগের মতোই গম্ভীর মুখে বললেন, তুমি হাইল্যাণ্ডার নও। একজন খাঁটি হাইল্যাণ্ডার কখনো এসব পরিচয় দিতে ভোলে না।

একটু থেমে বললেন, তোমার পূর্ব পুরুষরা তাঁদের ক্ল্যানের বংশ-মর্যাদা সম্বন্ধে ভয়ানক গর্বিত ছিলেন। তাঁরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতেন যে তুমি তাঁদের বংশধর হয়ে নিজের বংশপরিচয় জান না, তবে হয়তো তাঁরা তোমাকে খোলা তলোয়ার দিয়ে খুন করতেন। আসলে তোমরা হলে বাডেনখ আর ক্লুনীর ম্যাকফারসন বংশ। তোমাদের পূর্ব পুরুষরা তাঁদের বনেটের ওপর বন-বিড়াল রাখতেন। ক্লুনীর ম্যাকফারসন একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। তিনি

কুল্লোডেন-এর যুদ্ধে বনি প্রিন্স চার্লস্‌কে সাহায্য করবার জন্যে ক্লুনী ছেড়ে ছুটে এসেছিলেন। তারপর যুদ্ধে প্রিন্স হেরে গিয়ে তো পালালেন। ক্লুনীও রাজ্যহারা হয়ে একটা পাহাড়ের গুহায় বাস করতে লাগলেন। এই ইনভার্ণেসের একটু দক্ষিণে স্পে নদীর ধারে কিংগউসি আর লেকইনস্‌-এর মাঝখানে ক্লুনীর গুহা এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, হাইল্যাণ্ডাররা ঠিক ভারতবর্ষের রাজপুতদের মত। বীরত্ব যেমন অসাধারণ, তেমনি তাদের বংশমর্যাদা জ্ঞান, তেমনি তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতা। রাজপুত রাজারাও এমনি করে যুদ্ধে হেরে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে না খেয়ে মরতেন। তবুও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করতেন না। ডক্টর, আপনি নিশ্চয় কর্ণেল টডের রাজস্থানের ইতিহাস পড়েছেন?

ডক্টর রোজ বললেন, পড়েছি। পড়ে অবাক হয়েছি যে এতদূরে থেকেও দুটো বিভিন্ন জাতের মতি গতি কি করে একরকম হয়। রাজপুতদের সঙ্গে হাইল্যাণ্ডারদের চরিত্রগত মিল ভয়ানক—

—ডক্টর, হাইল্যাণ্ডারদের সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ করে বলুন—

ডক্টর রোজ বললেন, সত্যিকারের হাইল্যাণ্ডাররা পাক্কা এ্যারিস্টোক্র্যাট। দুনিয়ায় যদি শ্রদ্ধা করার কিছু থাকে তাদের কাছে তবে তা হল তাদের পুরোন বংশাবলী। তাদের প্রাচীন প্রথা আর রীতি-নীতি। যাকে বলে প্রাচীন ঐতিহ্য। দু দুটো বিশ্ব যুদ্ধ খতম হয়ে গেল। পৃথিবী এখন সোঁ সোঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে। তবু হাইল্যাণ্ডারদের এই মনোভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। ডক্টর, আজকাল তো কম্যুনিজম্‌ আর সোস্যালিজম্‌ বলতে অর্ধেক দুনিয়ার লোক মনে করে প্রোগ্রেসিভ মতবাদ। তা সেসব মতবাদ স্কটল্যাণ্ডের শহর অঞ্চলে আপনি কিছু কিছু যে না পাবেন এমন নয়। কিন্তু হাইল্যাণ্ডের গ্রাম অঞ্চলে এসব মতবাদের লেশমাত্রও আপনি খুঁজে পাবেন না। এখানে যে কোন ক্ল্যানের লোকেরা তাদের গোষ্ঠীপতিকে এখনও হর্তা কর্তা বিধাতা জ্ঞান করে। পৃথিবীতে রাজার পরেই তাদের গোষ্ঠীপতির স্থান। তাদের প্রত্যেকের বংশমর্যাদা জ্ঞান ভয়ানক উগ্র বলে তারা গোষ্ঠীপতির অনুগত প্রজা। গোষ্ঠীপতিকে তারা ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাদের বাপ-মা বলতে তারা বোঝে তাদের গোষ্ঠীপতিকে। আগে হাইল্যাণ্ডের জীবন চলত প্রধানতঃ দুটো ব্যাপার নিয়ে, যুদ্ধ আর বংশ। হাইল্যাণ্ডের এক একটা ক্ল্যান বা গোষ্ঠী সাধারণতঃ বেশ ভারী। মামাতো, খুড়তুতো ভাই বোন—তস্য তস্য মামাতো খুড়তুতো ভাই বোন মিলিয়ে সংখ্যা বড় কম হত না।

এদের সবাইকার কর্তা হতেন একজন গোষ্ঠীপতি সর্দার। এই গোষ্ঠীপতিরা আইন তৈরী করতেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে তার মীমাংসা করতেন। তার গোষ্ঠীর লোকেদের ভরণ, পোষণ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য সবকিছুর জন্যেই

দায়ী থাকতেন। তাই হাইল্যাণ্ডারদের জীবনে প্রতিটি দিন হাজার কাজের মধ্যেও একটি বড় বোধ জেগে থাকত সেটা হল বংশের ঐক্য বোধ। এক একটা বংশের মধ্যে নামের দিক থেকে, সাজপোশাকের দিক থেকে কোন তফাত থাকত না। বংশের যে সর্দার তারও যা নাম, বংশের একজন অত্যন্ত সাধারণ লোকেরও সেই নাম। সর্দার যে টার্টানের কিল্ট পরবে সাধারণেও সেই টার্টানের কিল্ট ব্যবহার করবে। যে কোন ভোজের ব্যাপারে তারা একই টেবিলে বসে খানা খাবে। সর্দার তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের নিজের ভায়ের মতোই ভালবাসতেন। এমনকি গোষ্ঠীর মধ্যে যে সব জারজ সন্তান জন্ম নিত তাদেরও সাদর অভ্যর্থনা জানানো হত বংশের লোক হিসেবে। অবশ্য এর কারণও ছিল। যুদ্ধের সময় লোক বল একটা বড় বল। তাই যারাই মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসত তারাই সাদরে জায়গা পেত। ফেলা যেত না কেউই।

ডক্টর রোজ এবার একটু থেমে তাঁর চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর বেশ আরাম করে একমুখ ধোঁয়া টেনে নিয়ে আসতে আসতে সেটা ছাড়তে ছাড়তে বললেন, এই সব গোষ্ঠীদের মধ্যে যুদ্ধ সব সময়ে লেগেই থাকত। এক গোষ্ঠী লড়ত অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে। লড়াই লাগত বংশ মর্যাদা নিয়ে। অন্য অন্য সামান্য কারণেও লড়াই বেঁধে উঠত। কিন্তু লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল জমি। ভাল চাষ আবাদের জমির বড় অভাব এই হাইল্যাণ্ডে। তার জন্যেই এইসব ক্ল্যানরা একে অপরের সঙ্গে লড়ে মরত সারা জীবন। আর যখন তারা হাইল্যাণ্ডের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র না পেত তখন তারা নেমে আসত নীচু জমিতে। তারপর গরু, ঘোড়া, ছাগল ভেড়া যা পেত ঝাঁক ধরে চুরি করে নিয়ে যেত। এ কাজটা তারা আদবেই অন্যায় বলে মনে করত না।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, আমাদের বাংলাদেশের একজন মনীষী বলেছেন, না বলে পরের জিনিস নিলে চুরি করা হয়। তা তারা বোধ হয় বলে কয়ে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসত। তাই তাদের এতে কোন বিবেকের বালাই ছিল না—

ডক্টর রোজ তাঁর সেই নিজস্ব ধরনে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, এ ভারী মজার কথা তো। বলে নিলে চুরি নয়, না বলে নিলেই চুরি। তা যাই হোক বড় ছোট সব বংশেরই এই অপবাদটা আছে। ম্যাকডোন্যাল্ড, ম্যাকক্লারেন, ম্যাকক্লাউড, ম্যাকিন্টর, ম্যাকফারসন, ম্যাকগ্রেগরদের তো কথাই নেই—সবাই চুরি ডাকাতি তাদের বীরত্বেরই একটা অঙ্গ বলে মনে করে এসেছে। তবে একটা গুণ এদের ছিল। এরা বারফাট্টাই একেবারেই ঘেন্না করত। সর্দার হয়ে যে রাজা সেজে বসে থাকবে এমন নবাবী হাইল্যাণ্ডাররা কেউ করত না। বা কেউ করলেও বরদাস্ত করা হত না। হাইল্যাণ্ড সর্দাররা আরামকে হারাম জ্ঞান করত। তাদের মধ্যে জোর রেষারেষি চলত, কে কত কষ্টসহিষ্ণু হতে পারে এই নিয়ে। সাধারণ হাইল্যাণ্ডাররা এক হাঁটু বরফের মধ্যে খালি পায়ে মাত্র একটা কম্বল সম্বল

করেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাটিয়ে দিত। হাইল্যাণ্ডারদের ভিতর গল্প আছে যে একজন লোক বাইরে বরফের ওপর শোবার সময় বরফ দিয়ে একটা বালিশ তৈরী করে তার ওপর মাথা রেখে বিলাসিতা করছিল। সেই অপরাধে তাকে ক্ল্যান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

গল্প শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু ডক্টর রোজ মোটেই হাসলেন না। গম্ভীর মুখে তিনি বলে যেতে লাগলেন, অনেকেই হয়তো এটাকে অসভ্যতা বলে মনে করবে। কিন্তু সভ্যতা আর আরামপ্রিয়তা এ দুটোর কী দুরকম অর্থ নয়—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ডক্টর, বেঁচে থাকবার জন্যে যাদের সব সময়ে যুদ্ধ করতে হত, প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে, তাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা কি কালচার আসত কেমন করে ?

ডক্টর রোজ আমার দিকে ফিরে বললেন, কেন ? হাইল্যাণ্ডের সর্দাররা শিক্ষা দীক্ষায় কারুর চেয়ে কিছু কম ছিল না। দেশে সে লড়াই করেছে শত্রুর সঙ্গে কিন্তু তাই বলে অক্‌স্‌ফোর্ড কী ফ্রান্স-এর কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিতে সে ভোলে নি। এই দেখুন না ইন্‌ভারিউরীর কাছে হার্লোতে ২৪শে জুলাই ১৪১১ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে লড়ে ছিল আইল্‌স-এর লর্ড ডোল্যাণ্ড আর মারের আর্ল আলেক্‌জাণ্ডার। যে ডোল্যাণ্ড স্কট্‌দের রাজাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে একটুও ভয় পায় নি, সে নিজে একসময়ে ছিল অক্‌স্‌ফোর্ডের ছাত্র। বেশী কথা কি এই ব্যারিস্‌ডেলের ম্যাকডোনাল্ডকেই ধরুন না। এমনিতে তিনি একজন পাকা লুটেরা। কিন্তু অন্যদিকে তাঁর মতো পণ্ডিত স্কটল্যাণ্ডে তখন খুব কম ছিল। তিনি তরোয়ালের হাতলে ভার্জিলের বিখ্যাত গোটাকতক শ্লোক খোদাই করে রেখেছিলেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু লোক সাধারণের কালচার—

ডক্টর বললেন, ক্ল্যানের জনসাধারণের পক্ষে হয়তো বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ হত না, কিন্তু তবুও সাধারণ হাইল্যাণ্ডারদের মধ্যে একটা জীবন্ত কালচার ছিল। এই জীবন্ত কালচার থেকেই সুন্দরী দিয়ার্দ্রের প্রেম কাহিনী বার হয়েছে। দিয়ার্দ্রে ছিলেন কেল্টিক নারীকুলচূড়ামণি। তিনি ভালবেসেছিলেন আইরিশ রাজবংশের ছেলে নাওসেকে। সেই ভালবাসার কাহিনী শেষ হয় করুণ বিচ্ছেদে। আরো কতো শত লোককাহিনী, লোকগাথা তুমি যে হাইল্যাণ্ডে ঘুরলে শুনতে পাবে তার ইয়ত্তা নেই। এসবের মধ্যে ছিল সাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জিনী শক্তি আর সেই সঙ্গে লোক শিক্ষার উপকরণ। তা ছাড়া প্রত্যেক সর্দারের সভায় অন্ততঃ একজন করে চারণ কবি থাকত। তারা এইসব সর্দারদের বীরত্ব গাথা, প্রাচীন প্রেম গাথা, মুখে মুখে রচনা করে শোনাত।

শুদ্ধসত্ত্বের দিকে ফিরে তিনি বললেন, এ চারণ কবিদের সঙ্গে রাজপুতানার

চারণ কবিদের একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাই। এই চারণ কবিদের গাথার উপকরণ ছিল সর্দারদের বীরত্ব আর নারীর প্রেম। রাজপুত চারণদেরও উপকরণ ঠিক ঐ ছিল বলে পড়েছি কর্ণেল টডের বইয়ে। তাই নয় কী—

শুদ্ধসত্ত্ব গাড়িটা রাস্তার একটা বাঁকে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, ঠিক ঠিক। কিন্তু একটা জিনিস রাজপুতানার ছিল না ডক্টর। সে হল আপনাদের হাই-ল্যাণ্ডের ব্যাগপাইপ। শুনেছি প্রত্যেক সর্দার তাদের নিজস্ব পাইপ বাজিয়ের দল পুষতেন।

ডক্টর পরম উৎসাহে বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। এটাও একটা লোককালচারের অঙ্গ। এক একটা বংশই এক একটা ক্লাসিক রাগে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করত। এই ক্লাসিক্যাল রাগকে গ্যালিকে বলে সিওল মোর (Ceol Mor) বা বৃহৎ রাগিণী। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কতোদিন আগে এই সব রাগ-রাগিনী তৈরী করেছে এই হাইল্যাণ্ডের জনসাধারণ। কিন্তু আজও কয়েক শ বছর ধরে তারা হুবহু সেই একই ভাবে, একই রাগ পাইপে বাজিয়ে আসছে। পাইপে ওস্তাদ বংশগুলির মধ্যে আজও যদি কারুর নাম করতে হয় তো প্রথমে ধরতে হবে ম্যাককাইদের। তারপর গেয়ারলঘের ম্যাকেঞ্জিদের, আর ম্যাকডোন্যাল্ড সর্দারদের পাইপ বাজিয়ে কিনলখ ময়দার্টের ম্যাকিণ্টরদের।

আবার খিলখিল করে ডক্টর তার সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসতে লাগলেন। জ্যাককে বললেন, তোমার প্রোফেসর ত সেই বংশের সন্তান, জিজ্ঞাসা করে দেখত তিনি পাইপ বাজাতে পারেন কি না—

ডক্টর রোজ আজ অদ্ভুত মেজাজে রয়েছেন। অনর্গল কথা বলছেন আর ঠাট্টাতে ফেটে পড়েছেন। গাড়ি সমানে চলেছে। আমরা বান্‌ফ্‌সায়ারের সুন্দর সবুজ শস্য ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। শুদ্ধসত্ত্ব গাড়ি চালাতে চালাতেই কথা বলছে, ডক্টর রোজকে ঠিক মেজাজে রেখে।

পাইপের কথা উঠতেই শুদ্ধসত্ত্ব বললে, শুধু পাইপ কেন ডক্টর, হাইল্যাণ্ডের নাচ তো শুনেছি জগৎবিখ্যাত। তার কথাতো কিছু বললেন না।

ডক্টর রোজ বললেন, নাচ আর গান ছিল হাইল্যাণ্ডের প্রাত্যহিক জীবনের মাধুর্য। প্রথমে নাচের কথা বলি। হোয়াইট ড্যান্সিং সোলজার থেকে আরম্ভ করে কয়েক শ নাচই আছে, যা হাইল্যাণ্ডের একান্ত নিজস্ব। সে সব নাচ হাইল্যাণ্ডার ছাড়া কেউ নাচতে পারবে না। ব্রীমারের মেলাতে সেপ্টেম্বর মাসে গেলে দেখতে পাবে ক্লাসিক নাচের নমুনা। ক্লাসিক ছেড়ে দিলেও হাইল্যাণ্ডাররা ঘাটে মাঠে নিত্য নৈমিত্তিকভাবে নাচে, গান গায়, কবিতা আওড়ায়, স্ফূর্তি করে।

একটু থেমে ডক্টর বললেন, গানের কথা যদি বল তে বলব গান একসময়ে ছিল হাইল্যাণ্ডের সর্বত্র। সন্ধ্যের আড্ডায় মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, যুবো সবাই এক জায়গায় যে কোন কুঁড়ের নীচে জমতো। তারপর শুরু করত গান। গানের

পর গল্প, তারপর হয়তো নাচ। মেয়েরা সেলাই করতে করতে গান করত। মেছো মেয়েরা ঝুড়ি তৈরী করতে করতে গান গাইত। মেছো ছেলেরা কড় পাকাতে পাকাতে গান গাইত। মাঠে শস্য কাটার সময় তো কথাই নেই, গানে গানে চতুর্দিক তখন ছেয়ে যেতো। মাছ ধরতে যাবার সময় জেলেরা গান গাইতো একসঙ্গে। শুধু যে একসঙ্গে কাজ করার সময়ই তারা গান গাইত তা নয়। একা চাষার মেয়ে শস্য কাটত মাঠে গান গাইতে গাইতে। সে গানের কথা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তো তাঁর বিখ্যাত কবিতায় লিখে গিয়েছেন। তাছাড়াও, মুচী জুতো সেলাই করতে করতে গান গাইত। এমনি কি দাঁতের ডাক্তার দাঁতের ব্যথা সারাতে গান গাইত। সমাজে যে কোন ক্রিয়াকলাপে তো গান লেগেই ছিল। এখানে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সর্বদাই গানে ছেয়েছিল।

—সে ছিল সেই যুগের কথা যখন হাইল্যাণ্ডাররা ছিল পৃথিবীর অন্য সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন, একেবারে একলা। সাধারণতঃ হাইল্যাণ্ডারা তাই অন্য জগতের লোকদের সংস্পর্শে এলে গোমড়ামুখো হয়ে যায়। কথাবার্তা বলে কম। কিন্তু খোলা পাহাড় জঙ্গল আর প্রান্তরে হাইল্যাণ্ডাররা তাদের আত্মাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করত বলে, সেখানে তারা নিজেদের সত্ত্বাকে গানে গানে ছড়িয়ে দিত।

ডক্টর রোজ একটু থেমে চুরোটে দুটো বড় বড় টান দিয়ে বললেন, তাদের সে সুখে বাদ সাধল জেনারেল ওয়েড অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হাইল্যাণ্ডের চতুর্দিকে রাস্তা খুলে দিয়ে। রাস্তা খুলতেই হাইল্যাণ্ডের সেই একান্ত নির্জন, নিজস্ব ধ্যানী আবহাওয়াটা নষ্ট হল। ইংলণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডের লোল্যাণ্ড থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। এল সৈন্যদল, এল গ্লাসগো আর এডিনবরা থেকে ব্যবসায়ীরা। তারা হাইল্যাণ্ডে স্যামন, হেরিং, আর হুইস্কির জোর ব্যবসা ফেঁদে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে হাইল্যাণ্ডের সমাজ বিপর্যস্ত হল। এদিকে তো স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের সন্ধি হয়ে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট হয়েছে। কিন্তু হাইল্যাণ্ডারদের সঙ্গে সে গবর্ণমেণ্টের আসলে কোন সম্পর্কই ছিল না। হাইল্যাণ্ডারদের ধর্ম এপিস্কোপ্যালিয়ান। তাদের পোশাক ঘাগরার মতো কিল্ট। যা কিনা দেহের মাত্র আধখানা ঢাকা থাকে। তাদের ভাষা গ্যালিক। তাদের রীতি-নীতি, ঐতিহ্য সব কিছু নিয়ে তারা স্কটল্যাণ্ডের নীচের অধিবাসীদের চোখে আধাসভ্য, একেবারে বিদেশী। তাছাড়া হাইল্যাণ্ডের সর্দাররা তাদের নিজস্ব চালে চলে। কারুর বড় একটা ধারও ধারে না। এটাও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের সহ্য হবার কথা নয়। গবর্ণমেণ্ট হাইল্যাণ্ডের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার শুরু করে দিল। তাদের প্রতিবাদ হিসেবে হল জ্যাকোবাইট দলের উদ্ভব। শেষ জ্যাকোবাইট হলেন ফ্রান্সে পলাতক স্টুয়ার্ট রাজবংশের শিভালিয়ার দ্য সেণ্ট জর্জের ছেলে প্রিন্স চার্লস্ এডোয়ার্ড। তাঁর নেতৃত্বে হাইল্যাণ্ডের সব ক্ল্যান

গুলো একত্র হয়েছিল। তারপর তারা লড়াই চালিয়েছিল ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। প্রিন্স চার্লস্ একবার এডিনবরা দখল করে ইংলণ্ডের ডার্বি পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেখানে তার সৈন্যদলের চেয়ে দশগুণ ভারী হ্যানোভারিয়ান সৈন্যদল তাঁকে হুমকি দিল। তিনি সরাসরি এসে ঢুকলেন হাইল্যাণ্ডে। সমস্ত ক্ল্যানগুলোকে একত্র করলেন। শেষে ইন্‌ভার্নেসের কাছে কুল্লোডনের প্রান্তরে দুদলে লড়াই হল—১৬ই এপ্রিল ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে। প্রিন্সচার্লি হেরে গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালালেন। বহুদিন হাইলাণ্ডের এখানে ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থেকে শেষে তিনি ফ্রান্সে চলে গেলেন।

তারপর লর্ড কাম্বারল্যাণ্ড যা শুরু করল তাতে তাকে হাইল্যাণ্ডের লোকেরা 'বুচার' নাম ঠিকই দিয়েছিল। বর্বর ভাবে কাম্বারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডের উপত্যকাগুলো চষে ফেলতে লাগল। আর যত ক্ল্যান ছিল তাদের ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে শস্যের গোলা পুড়িয়ে, তাদের মেয়েদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে ক্ল্যানগুলো ভেঙে তছনছ করে দিলে। আইন হল হাইল্যাণ্ডরা আর কিল্ট পরতে পারবে না। তাদের এপিস্কোপ্যালিয়ান ধর্ম ছেড়ে ক্যাথলিক হতে হবে। গ্যালিক যে বলবে তার মাথা কাটা যাবে বিনা বিচারে। বোঝা একবার বর্বতার বহরটা—

এখানে এসে ডক্টর একটু চুপ করলেন। পরে চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, হাইল্যাণ্ডের জাতীয় সেণ্টিমেণ্টের কারণে লড়াই করেছিলেন বলে প্রিন্স চার্লসকে হাইল্যাণ্ডেররা এত ভালবাসে, এত সুন্দর চোখে দেখে। তাই তাঁর নাম তারা দিয়েছে বনি প্রিন্স চার্লি। কুল্লোডেনের যুদ্ধক্ষেত্রে আজও দেখবে তাঁর পাথরের স্ট্যাচুটা সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আজও হাইল্যাণ্ডের স্বদেশ প্রেমিক কোন পাইপবাজিয়ে সেই স্ট্যাচুর তলায় দাঁড়িয়ে পাইপে সুর বাজায়—উইল ই না কম্ ব্যাক এগেন—

জ্যাক একমনে ডক্টরের গল্প শুনে যাচ্ছিল। এবার সে ফোঁৎ করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, তারপরে কি হল বলুন ডক্টর।

ডক্টর একটু হেসে বললেন, ১৭৮০ খৃঃ হাইল্যাণ্ডের লোকেরা তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেল। তারা কিল্ট পরবার, গ্যালিক বলবার অধিকার পেল। এপিস্কোপ্যালিয়ান হতে তাদের আর কোন বাধাই রইল না। সে পরের কথা। কিন্তু হাইল্যাণ্ডের সেই ধ্যানী নিজস্ব ঐতিহ্যটুকু যে ভয়ানক ভাবে ঘা খেল তার সুরাহা আর কিছুতেই হল না—

শুদ্ধসত্ত্ব গাড়ি চালাতে চালাতে বললে, তা কেন ডক্টর? এই তো কিছুদিন আগে আমি এলিজাবেথ গ্রাণ্টের স্মৃতিকথা পড়ছিলাম। তিনি ১৮০০ খৃঃ থেকে ১৮৩০ খৃঃ পর্যন্ত হাইল্যাণ্ডের কি রকম অবস্থা ছিল তার হুবহু বর্ণনা রেখে গেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন ক্ল্যানের সপ্তম লেয়ার্ড (সর্দার) রোথিমুরখাস অঞ্চলের জমিদার। প্রতিটি লোকের মা-বাপ। তাঁর অধীনে ছিল স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল।

সেই সৈন্যদলের অফিসার সবাই আবার ছিল ম্যাকফারসান আর গ্রাণ্ট। তাঁর ডুনের বাড়ি তন্য তন্য করে ঢুঁড়লেও একটা ভাল পালঙ্ক কি ভাল আসবাব মিলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু বাড়ি আত্মীয়স্বজন পরিজনে ঠাসা ছিল। তাঁর একজন মজার পাইপবাজিয়ে ছিল। সে যে ব্যাপারে হুইস্কি থাকত না সে ব্যাপারে কিছুতেই মাথা ঘামাত না। হুইস্কি না থাকলে না কি তার সূক্ষ্ম মীড় গমকের কাজ নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকত।

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। শুদ্ধসত্ত্ব বললে, হাইল্যাণ্ডের গোষ্ঠীপ্রীতি যে কত বেশী তা এলিজাবেথ গ্রাণ্টের বর্ণনা থেকে ভারী সুন্দর বোঝা যায়। যখন এলিজাবেথ গ্রাণ্ট তাঁর মায়ের সঙ্গে ইনভার্নেস আর ফোরেসে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন তাঁদের নিজেদের জ্ঞাতি গোত্রদের বাড়ি ঘুরে দেখা শোনা করতে হত। এলিজাবেথ গ্রাণ্ট তো অবাক—এতো গ্রাণ্ট এক সঙ্গে দেখে। পোশাক তৈরী করা দর্জি গ্রাণ্ট, রাজপুরুষের স্ত্রী গ্রাণ্ট, স্কুলের মাস্টারণী গ্রাণ্ট, সম্মান-পাওয়া কর্নেল গ্রাণ্ট, একজন সর্দারের স্ত্রী গ্রাণ্ট। গ্রাণ্টের পর গ্রাণ্ট—সবাই একই ক্ল্যানের লোক। সেখানে এলিজাবেথ শুনলেন যে ক্ল্যানের জারজ সন্তানরা নাকি ক্ল্যানের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় না। ক্ল্যানের সর্দার তার ভরণ-পোষনের ভার নেন। শেষে তাকে বিয়ে থা দিয়ে সমাজে স্থান করে দেন। এই ধরনের সন্তান জন্ম হওয়াতে কোন মায়ের কোন লজ্জা নেই, আর ছেলেকেও কোন কলঙ্ক ভোগ করতে হয় না—বলে শুদ্ধসত্ত্ব চুপ করল।

ডক্টর রোজ বললেন, এলিজাবেথ গ্রাণ্টের বইয়ের সবচেয়ে মজার জায়গাটা আপনি ভুলে গেছেন ডক্টর—

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, কোনটা—

ডক্টর রোজ বললেন, হাইল্যাণ্ডারদের দানের হাত যে কতো লম্বা সেই কথা বলতে গিয়ে গ্রাণ্ট একটা সুন্দর ঘটনার কথা লিখেছেন। এমনিতে তিনি তো মনোরম ভাষায় বর্ণনা করেছেন—হাইল্যাণ্ডারদের মন কতো দরাজ। প্রত্যেক বাড়ির দরজা অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে খোলা থাকত। বিশেষ নেমতন্নের কোন বালাই ছিল না। যে কেউ যে কোন সময়ে যে কোন বাড়িতে ঢুকে কিছু ওট্‌কেক, কিছু চীজ্ আর কিছু হুইস্কি খেয়ে যেতে পারত। এলিজাবেথ গ্রাণ্ট একদিন দেখলেন, একজন সর্দারের স্ত্রী একটি কাঠুরের বৌকে শিং-এর চোঙ্গাতে হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছেন। দিচ্ছেন তো দিচ্ছেন। দেবার আর বিরাম নেই। কাঠুরে বৌ বেশ ভাল ভাবে টেনে চোঙ্গাটা ভর্তি করে নিয়ে তার বাচ্চা ছেলেটার হাতে দিল। ছেলেটা ততক্ষণ মার পাশে তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাচ্ছিল। সর্দারের স্ত্রী তো অবাক। এলিজাবেথও অবাক। তাঁরা বাচ্চাটাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে, তোর মাথা ঝিমঝিম করে না—

বাচ্চাটা জবাব দিলে—করে তো। সেটাই তো মজার—বলে ডক্টর রোজ

খিলখিল করে হেসে উঠলেন। আমরা বান্‌ফ্‌সায়ার ছাড়িয়ে এতক্ষণে এল্‌গিনে এলাম।

স্কটল্যাণ্ডের আরও পাঁচটা ছোট শহরের মতো এল্‌গিন শহর। আমরা গাড়ি নিয়ে একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে কিছু স্যাণ্ডউইচ আর কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম।

ইনভার্নেস্‌ এখান থেকে মাত্র ঘন্টাখানেকের রাস্তা। আমরা আবার গাড়ি বোঝাই হলাম। শুদ্ধসত্ত্ব গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়িতে উঠেই ডক্টর রোজ বললেন, কিন্তু একটা কথা আপনি মনে রাখবেন ডক্টর, পুরোন হাইল্যাণ্ডের কিছু কিছু ধারা আজও বেঁচে থাকলেও সেই গোটা হাইল্যাণ্ডের সমাজ এখন ছিন্ন ভিন্ন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তার কারণটা কী—

ডক্টর রোজ বললেন, কারণ দুনিয়ার অগ্রগতি। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, অর্থ-নৈতিক অগ্রগতি, প্রলোভনের অগ্রগতি। সেই অগ্রগতির চাকার নীচে পড়ে হাইল্যাণ্ডের সর্দাররা—যারা আগে তার ক্ল্যানের লোকের বাপ-মা ছিল তারা এখন ব্যবসায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পয়সা চাই, আরও পয়সা। তা ছাড়া দূর হাই-ল্যাণ্ডের গেঁয়ো জায়গা আধুনিক ব্যবুদের পছন্দ নয়। তাঁরা থাকতে চান লণ্ডন এডিনবরায়। জীবন যাপন করতে চান আধুনিক উপকরণগুলি উপভোগ করে। এতে পয়সা লাগে প্রচুর। তার আগে যে গোষ্ঠীপতির চোখ থাকত তার ক্ল্যানের লোকদের মঙ্গল অমঙ্গলের ওপর, তাদের সেই চোখ এখন দেখতে চায় খালি ব্যাংক-ব্যালান্স। আগে টাকার কথা ছিল গৌণ। সর্দারের যশ হত টাকায় নয় তার বুকের পাটায়। মেয়ের বিয়েতে যৌতুক যেত গরু, ঘোড়া। লোকে খাজনা দিত হাঁস, মুরগীতে। এখন তো আর তা হবার জো নেই গো। এখন ফেল কড়ি মাখ তেল। কাজেই গরীব হাইলাণ্ডাররা দলে দলে ঘর বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে অর্থগৃধ্নু জমিদারের পাল্লায় পড়ে। পশ্চিম হাইল্যাণ্ড তো এই জন্যে প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। তারা দল বেঁধে দেশ ঘর ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডাতে পালিয়েছে। প্রতিজ্ঞা করেছে বিদেশে গিয়ে না খেয়ে মরব তবু আর দেশে ফিরে আসব না। যাবার সময় তারা যে সব গান তৈরী করে গেছে তা গাইলে আজও চোখে জল আসে। "লেখাবার নো মোর" অথবা "আইল্‌ নিভার, আইল নিভার নিভার রিটার্ণ"—গানগুলো সেই সব ঘরছাড়াদের কথাই মনে করায়।

ডক্টর রোজ একটু থেমে আবার একটা চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, এত কথার পরেও বলি সাধারণ হাইল্যাণ্ডাররা এখনও তাদের হৃদয়ের সম্পর্ক ঠিক পয়সা দিয়ে বিচার করে না। তারা এখনও পার্থিব আরামের উপকরণগুলোকে ঠিক মতো মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই বাইরের লোকেরা তাদের এক

নজরে দেখেই মনে করে যে তারা কুঁড়ে। কিন্তু আসল কথাটা কি জানেন? একজন হাইল্যাণ্ডারের কাছে জীবন তো শুধু মাত্র কাজ আর কাজ নয়। সেখানে আরও অনেক উপভোগের জিনিস আছে। আছে গান, আছে প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য, আছে মানুষের প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, রোমান্স। এদের মনের এই দিকটা ইংরেজরা ঠিক বুঝবে না, আমেরিকানরা তো নয়ই। তোমরা ভারতীয়েরা এটা পুরোপুরিই বুঝবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই এতো কথা আজ তোমাদের শোনালাম হাইল্যান্ডের সম্পর্কে। একবার পায়ে হেঁটে হাইল্যাণ্ড বেড়িয়ে যেও, বুঝবে আমার কথা কত দূর সত্যি।

ডক্টর রোজ চুপ করলেন। গাড়ি গিয়ে ঢুকল ইন্‌ভার্নেসে।

॥ ৩৫ ॥

ইন্‌ভার্নেস যদিও হাইল্যাণ্ডের রাজধানী, তবু ইনভার্নেস্‌কে দেখলে হাইল্যাণ্ডের কিছুই বোঝা যায় না। বৃটেনের আর সমস্ত শহরের মতোই ইনভার্নেস্‌ শহর। ঝকঝকে, মাঝারি (আবার্ডিনের থেকে একটু ছোট) সুন্দর শহর। নেস নদী শহরটিকে দুভাগে ভাগ করে বয়ে গেছে। একটু দূরে গিয়ে সে মিশেছে লখ (লেক) নেসে। লখ নেস এদিককার বিখ্যাত লেক। চওড়ায় দুমাইলের বেশী নয় কিন্তু লম্বায় প্রায় চব্বিশ মাইল। এর দু পাড়ে সুন্দর মস্‌ণ রাস্তা, তার ওপরেই খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের পাঁচিলী। পাহাড়ের কোলে কোলে বার্চ আর রোডোডেণ্ড্রনের অরণ্য। জুলাই মাসের রোদ লেগে প্রত্যেকটি গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। পিছনের সারিতে বার্চ গাছগুলো ছাড়া একটু নীচুতে সবুজ বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। গোছায় গোছায়, ঝাড়ে ঝাড়ে ফুটেছে রোডোডেণ্ড্রন, নানা রং-এর। এ যেন ছোট খাট একটা রোডোডেণ্ড্রনের পাহাড়। চলে গেছে বড় পাহাড়টার কোল ঘেঁসে। সারা রাস্তা, পাহাড় আর লেক আলো হয়ে উঠেছে সেই ফুল-পাহাড়ের জৌলুষে।

মুগ্ধ হয়ে সেই শোভা দেখছিলাম। পাশ থেকে মিঃ ক্লুটস্‌ বলে উঠলেন—আমাদের এই লেকের নাম দুনিয়ার লোকে জানে। কেন জানেন? এর সম্বন্ধে ভারী মজার গল্প আছে।

তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম।

মিঃ ক্লুট্‌স্‌ ইন্‌ভার্নেসের বিখ্যাত সখের পক্ষীতত্ত্ববিদ। সেই সঙ্গে কিছুটা পুরাতত্ত্বেরও আলোচনা করে থাকেন তিনি। তাঁর আর একটা সখ হাইল্যান্ডের ভূতুড়ে গল্প সংগ্রহ করা। রোগা, লম্বা, তীক্ষ্ন নাসা ভদ্রলোক মিঃ ক্লুটস্‌। পিঠে সব সময়ে চামড়ার বেল্টে ঝোলে একটা বাইনোকুলার আর হাতে থাকে নোট বই। ডক্টর রোজের বিশেষ বন্ধু মিঃ ক্লুটস। ডক্টর রোজই তাঁর সঙ্গে

আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ ক্লুটস মেজাজে খাঁটি হাইল্যাণ্ডার। কাজ কর্ম বিশেষ কিছু করেন না। পৈত্রিক জমি কিছু আছে তাতে চাষ আবাদ হয়। হাঁস, মুরগী পালেন। তাতেও আয় হয় ভাল। আর হাইল্যান্ডের এখানে ওখানে মেলা বসলে তিনি তাঁর নিজের হাতে তৈরী করা একটা ভ্যান নিয়ে সেই মেলায় যান। সেখানে বিক্রী করেন স্যাণ্ডউইচ্, কফি, সুইটস। বাদ বাকী সময় কাটে নদীতে স্যামন মেরে আর পাখির পিছনে দৌড়োদৌড়ি করে। কোন বড় লোক শীকারে এলে তিনি তার সঙ্গে 'ঘিলি' হয়ে যান। শীকারে সাহায্য করেন। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, এখনো বিয়ে করার সময় হয় নি। ডক্টর রোজ আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন, এই ভদ্রলোক পাখীর পিছনে ছোটাছুটি করে এতো সময় নষ্ট করেন যে মেয়েদের পিছনে ছোটবার আর সময়ই পান না। তাই আজও সঙ্গিনী বেছে উঠতে পারেন নি।

মিস্টার ক্লুটসের গাড়িটাও ডক্টর রোজের গাড়ির মতো পুরোন ধুন্ধুড়ে। তবে এ গাড়ির তিনি যে শুধু মালিক তাই নন। তিনি এর ড্রাইভার, মেক্যানিক সব কিছু। কেউ যদি হাইল্যাণ্ড দেখতে আসে তবে তিনি সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাকে নিয়ে গাড়িতে করে সমস্ত জায়গা দেখিয়ে নিয়ে বেড়ান। তাতে তাঁরও কিছু আয় হয়। যে লোক হাইল্যাণ্ড দেখতে চায় তারও একজন ভালো সঙ্গী জোটে।

বনি প্রিন্স চার্লির স্মৃতিসভা শেষ হতে ডক্টর রোজ আর শুদ্ধসত্ত্ব আবার্ডিনে ফিরে গেল। ডক্টর রোজ বাইরে থাকতে পারবেন না মিসেস তাঁর জন্যে চিন্তিত হবেন। শুদ্ধসত্ত্বের থাকাও অসম্ভব। নেলী আজ কদিন হল শয্যাশায়ী। জ্বর ছাড়ছে না তার। দিন দিন তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। আগের সেই অপূর্ব সুন্দর চেহারা তার আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে। এ কমাসে নেলীর বয়স যেন পনেরো বছর এগিয়ে গেছে। তার চোখের কোলে কালি জমেছে। সময়ে সময়ে কথা বলতে বলতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। ইদানীং আবার তার শুরু হয়েছে জ্বর! শুদ্ধসত্ত্ব তার জন্যে একটু চিন্তিত। কিন্তু যতটা হওয়া উচিত ততটা নয়।

ইনভার্নেসে এসে দেখা হয়ে গেল জিমির সঙ্গে। জ্যাক প্রথমে জিমির সঙ্গ এড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জিমি প্রায় কাঁঠালের আঠার মতোই আমাদের সঙ্গে লেগে রইল।

মিঃ ক্লুটসের গাড়িতে বসেছিলাম আমরা তিনজন। আমি, জ্যাক আর জিমি। জিমি ঠাট্টা করে মিঃ ক্লুটসকে বললে, কী গাঁজার দেশ মশাই আপনাদের। এই লখ্ নেসে নাকি একটা দৈত্য আছে। সে নাকি লেকের মধ্যে কোন মানুষকে পেলে তক্ষুনি মেরে ফেলে। সেই দৈত্যটার চেহারা পর্যন্ত

আপনারা এঁকে, ফটোতে তুলে বিক্রী করেছেন। ধন্যি মশাই আপনাদের হাইল্যাণ্ড। যতো গাঁজা আর গুলীর আড্ডা।

মিস্টার ক্লুটস একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, মাঝে মাঝে এখানে এসে না হয় গাঁজা গুলী দিয়ে মৌজ করবেন। মদের তো খরচা অনেক। এখানে মৌজটাও জমাটি হবে, খরচও বেশী হবে না। কিন্তু কথাটা কী জানেন, লেকের দৈত্যটাকে দেখেছে এমন লোকের অভাব নেই এই ইনভার্ণেসে। আমাদের কথা ছেড়ে দিন মিঃ ম্যাক্‌কিলপ্‌-এর কাছে চলুন। তিনি ইন্‌ভার্ণেসের কাউণ্টি কাউন্সিলের একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন বহু বছর। তা ছাড়া ইন্‌ভার্ণেসের প্রত্যেকটি লোক তাঁকে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে সম্মান করে। তিনি কম্যাণ্ডার অব্‌ দি মোস্ট এক্‌সেলেণ্ট অর্ডার অব্‌ বৃটিশ এম্পায়ার। তাঁর কথা তো মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তিনি নিজে সেই দৈত্যটাকে দেখেছেন এই লখ নেসের জলে—বলে জিমির মুখের ওপর এক ঝলক পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন। তারপর গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে বললেন, এর ওপরেও আর একটা কথা আছে। ঐ দৈত্যটা মোটেই আজকের দৈত্য নয়। সেণ্ট কলাম্বা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখন তিনিও লখনেসের জলে ঐ দৈত্যটাকে দেখেন। শুধু তাই নয় তাঁর খৃষ্টানদের জোরে সেই দৈত্য কেঁচোর মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই মহিমা দেখেই তো এ অঞ্চলের দুইদরা দলে দলে তাঁর কাছে খৃষ্টান হল। আডামনানের ল্যাটিনে লেখা 'লাইফ অব্‌ সেণ্ট কলাম্বা' বইটা পড়ে দেখবেন।

বলে আরও খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন জিমির মুখের ওপর। তাঁর ভুরু আর চোখ দুটো নাচতে লাগল। আমরা স্পষ্ট দেখলাম মিঃ ক্লুটস যেন একটা অবজ্ঞা ছুড়ে মারছেন জিমির দিকে। জিমি একটু সেঁতিয়ে গেল।

সেই দিনই বিকেল বেলা আমরা ইন্‌ভার্ণেস ছেড়ে এ্যাভিমোর-এর পথ ধরলাম। মিঃ ক্লুটস্‌ বললেন, এবার আপনাদের আসল হাইল্যাণ্ড দেখাব। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা এসে হাজির এ্যাভিমোরে। ছোট্ট এক টুকরো একটা শহর এ্যাভিমোর। তারই একটা হোটেলে বসে হাই-টি খেয়ে নিলাম। তারপর মিঃ ক্লুটস আমাদের নিয়ে গেলেন এ্যাভিমোরের পুবে যে বিস্তৃত জলাভূমিটি আছে তারই পাশে। বরফ গলে গিয়ে জলাভূমিতে ঘাস ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে পিট্‌ বগ্‌। ছোট ছোট গুল্ম হাজার হাজার বছর ধরে মাটিতে চাপা পড়তে পড়তে কয়লার মতো হয়ে যায়। তাদের বলে পিট্‌। স্কটল্যাণ্ডের জলাভূমির বেশীর ভাগ এই পিটেতে ভরা থাকে। স্কটরা এগুলোকে কেটে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে জ্বালানী করে।

এখানে এসে দেখলাম পাখিদের মেলা বসে গেছে। হরেক রকমের পাখি। ছোট, বড়, মাঝারী। সাদা, কালো, পাটকিলে, নানা রং-এর বাহারে, চিত্র বিচিত্র পাখিতে পাখিতে জলাভূমিটা ছয় লাখ।

জিমি গাড়ি থেকে নামল না। গাড়ির মধ্যে ঢুকঢুক করে বোতল থেকে জিন খেতে লাগল। জ্যাক আর আমি নেমে এলাম। মিঃ ক্লুটস পরম যত্ন নিয়ে আমাদের পাখি চেনাতে লাগলেন।

—ঐ, ঐ লম্বা ঠোঁট দেখছেন, ওরা হল ফ্লাইক্যাচার। ঝোপে ঝাড়ে থাকে। সেখানেই ডিম পাড়ে। ওর থেকে একটু অন্য রকমের, ছোট ঠোঁট ঐ যে একটা উড়ে বসল আর একটার কাছে ওটা হল অরেস্টার ক্যাচার। নদী আর সমুদ্রের ধারেই ওদের দেখতে পাওয়া যায়। ঐ দেখুন স্যাণ্ড্ পাইপারদের ঝাঁক। জল দেখলে ওরা পাগল। সেখান থেকে আর নড়বে না। ঐ বাঁ দিকে দেখুন কালুর্দের ঝাঁক।

পাখি চেনান শেষ করে মিঃ ক্লুটস বললেন, এবার আমরা পাহাড়ে রাস্তার ওপরে উঠব। সেখানকার গাছপালা, ফুল, পাখি সব এখানকার থেকে কিছুটা তফাৎ। যাকে বলে আল্পাইন ফ্লোরা আর ফনা তাই দেখতে পাব ওপরে। ঘড়ি দেখলাম সন্ধ্যা প্রায় ৮টা। কিন্তু আকাশে রদ্দুর চড়চড় করছে।

আমরা এবার এ্যাভিমোর ছেড়ে স্পে নদীর পাশের রাস্তা ধরে এলাম গ্রাণ্ড টাউন অন্ স্পে তে। মিঃ ক্লুটস তখন পাখিদের সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করে চলেছেন। তিনি বলছিলেন অরেস্টার ক্যাচার আর স্যাণ্ড পাইপাররা আসলে হল এই স্পে নদীরই পাখি। কিন্তু গুজাণ্ডারদের বড় নদীতে দেখা যায় না। তাদের দেখতে পাওয়া যাবে শাখানদীগুলোতে। আরও একটি মজার পাখি আছে এ অঞ্চলে। তারা বুনো খরগোসের গর্তে ডিম পাড়ে। তাদের বলে রেড্ ব্রেস্টেড্ মার্গানসার। এসব পাখিরা জাতে খাঁটি হাইল্যাণ্ডার।

এ্যাভিমোর থেকে গ্রাণ্ড-টাউন-অন স্পে মাত্র পনেরো মাইল। আসতে আধ-ঘণ্টা সময় লাগল। শহরটা হল স্পে নদীর উত্তর তীরে। সেখানে উঁচু পাহাড়ে টিলায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাসল্ গ্রাণ্ট। স্পে নদীর দক্ষিণ তীরের রাস্তাটা চলে গেছে টোমিলটুল হয়ে ব্রীমারে। এই রাস্তাটা গেছে বরাবর একটা বিরাট পাহাড় টপকে। মিঃ ক্লুটস আমাদের নিয়ে পথ ধরলেন টোমিনটুলের। বললেন, এই রাস্তাটা হাইল্যাণ্ডের সব চেয়ে দুর্গম রাস্তাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

টোমিনটুলে এসে দেখলাম সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লেও অস্ত যায় নি। রাস্তাটা উঠে গেছে বরাবর প্রায় দু হাজার ফিটেরও বেশী ওপরে। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে কেয়ার্ণগর্মের মৌন গম্ভীর পাহাড় শ্রেণী। মাথায় তাদের শুভ্র তুষার কিরীট। তাদের ওপর পড়ন্ত সূর্যের অস্তরাগ লেগে বর্ণালী খেলা করছে। অপূর্ব দৃশ্য।

ব্যালমোর‍্যাল আর ব্রীমারে যাব র জন্যে যে রাস্তাটা বেঁকে গেছে তারই ওপর একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে—সামনের রাস্তা বরফ পড়ে ডুবে গেছে। অথচ টোমিলটুলে এতটুকুও বরফ নেই। মিঃ ক্লুট্স্ আমাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে

সামনে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। জ্যাক কি যেন একটু বলতেই, মিঃ ক্লুট্স্ বললেন, ওটা হল বরাবরের নোটিশ। বরফ পড়লে ওটা টাঙান হয়। কিন্তু বরফ গলে সাফ হয়ে গেলেও ওটা নামিয়ে নেবার মাথা ব্যথা কারুর নেই। ভয় করবেন না আপনারা আমি এ রাস্তায় প্রায়ই যাতায়াত করি। এর নাড়ী নক্ষত্র সব আমার জানা।

রাস্তাটা এবার একটা প্রচণ্ড উৎরাই ধরে সটান নেমে এল ডন নদীর উপত্যকার দিকে। সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়তে লাগল। যে কেয়ার্ণগর্মকে এতক্ষণ দূর বলে মনে হচ্ছিল তার চূড়োগুলো কাছে এসে গেল। মিঃ ক্লুট্স্ বললেন, সামনে দেখুন তুষারমৌলি বেন-ম্যাক্‌ধুইকে।

রাস্তা আরও নামতে লাগল খাড়া উৎরাইয়ের দিকে। শেষে আমরা নেমে এলাম চোদ্দ শ ফিটে। রাস্তাটা ডন নদীকে টপকে চলে গেছে। ডনের চেহারা এখানে একটা ছোট্ট পাহাড়ী ঝরনার মতো।

মাইল দুই রাস্তাটা সোজা চলে গিয়ে ডন উপত্যকা ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে গেয়ার্ণের উপত্যকায়। ডন আর গেয়ার্ণের মাঝখানকার জলাভূমিটা জুনিপারের ঝাড়ে ভরে আছে। মিঃ ক্লুটস্ বললেন, এখানে চমৎকার লাল গ্রাউজ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলটায় হল তাদের সব চেয়ে বড় আড্ডা।

গাড়ি সমান বেগে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের রাস্তায়। রাত প্রায় দশটা বেজে গেছে কিন্তু তবু এখনো আলোর কিছু কমতি নেই। আকাশে সূর্য নেই বটে তবুও গোধূলির চড়া আলো খেলা করছে আকাশ জুড়ে। আমরা গেয়ার্ণ ছেড়ে আরও একটি পাহাড় ডিঙিয়ে এসে পড়লাম ডীর উপত্যকায়। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ব্যালমোর্যাল। একটি পাইনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাড়ি এসে ঢুকতেই দেখলাম ধুনোর আঠার চমৎকার গন্ধে সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। মিঃ ক্লুট্স্ বললেন, সারাদিন চড়চড়ে রোদ্দুরে পাইন থেকে গন্ধ নির্যাস বার হয়। তারপর হাত বাড়িয়ে পাশেই একটি পাহাড় দেখালেন। বললেন, এই হল লখ্‌নাগার, তিন হাজার আটশো ফিট উঁচু।

পাইন-এর জঙ্গলের মধ্যে এসে মিঃ ক্লুট্স্ এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কয়েকটি উড়ন্ত পাখির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, এরা পাইন মার্টিন। এই জায়গা-টিতেই একটি সোনালী ঈগলের বাসা আছে যদি আপনারা দেখতে চান তো নেমে আসুন।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে মিঃ ক্লুট্স্‌কে অনুসরণ করলাম। তিনি পাশের একটি পাহাড়ে ওস্তাদ পাহাড় চড়িয়ের মতো চড়চড় করে উঠে গেলেন। আমরা চড়তে লাগলাম অতি কষ্টে। কিছুদূর উঠে দেখি পাহাড়টি একটি কার্নিসের মতো এগিয়ে ঝুলে রয়েছে। মিঃ ক্লুট্স্ সেই কার্নিসটির সামনের দিকে চলে গেলেন। পথের ওপর দুটো এ্যাডার সাপকে শুয়ে থাকতে দেখা গেল। মিঃ

ক্রুট্‌স্‌ হাতের লাঠি দিয়ে সাপ দুটোকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমরাও সেই কার্নিসটির ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম সমুখে বিরাট একটি ফাঁকা জায়গা। সেই কার্নিসটির নিচ দিয়ে পাহাড়টা হেঁট হয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। সেই প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গাটি হল গ্লেন্‌ অব ডী। ডী নদীর উপত্যকা। তার ধারে ধারে দেখতে পাচ্ছি কেয়ার্ণগর্মের চুড়োগুলোকে। আর মাঝখানে পেতের সুতোর মতো দেখা যাচ্ছে একটি জলরেখা। ওটাই ডী নদীর উৎস। মিঃ ক্রুট্‌স্‌ আমাদের কার্নিসের নীচে একটি জায়গায় ভাল করে দেখতে বললেন। দেখলাম সে জায়গাটায় পাহাড়টা একটু বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে খানিকটা জায়গা করে দিয়েছে। তারই পাশে একটি বড় গুহা। সে দিকে চোখ পড়তে অবাক হলাম। দেখলাম প্রকাণ্ড দুটো পাখি সেখানে বসে আছে। তাদের একটি পাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। ডানার একদিক থেকে আর এক দিক মাপলে বোধ হয় হাত আড়েকের কাছাকাছি হবে। বাদামী রঙের পালক, লম্বা তীক্ষ্ণচঞ্চু, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাখি দুটো। একটি পুরুষ একটি স্ত্রী। দেখলেই গরুড়ের কথা মনে হয়। যে পাখিটি ডানা ছড়িয়েছিল সে ডানা মুড়ল। দেখলাম তার তলায় ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চা চিঁ চিঁ করে উঠল। আরও দেখলাম, একটি হরিণ শিশুর মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানে। তার পেপটা ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে। আর নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি করছে বাচ্চাগুলো। মিঃ ক্রুট্‌স্‌ বললেন, রাত্তিরের আগে ওরা পেট ভরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু শিকারটা বোধহয় টাটকা ধরা হয়েছে আজই। থান থান রক্ত জমে আছে চারদিকে। মিঃ ক্রুট্‌স্‌ বলে চললেন, তীব্র ঝড়ে যখন একটা দাঁড়কাক পর্যন্ত আকাশে থাকতে পারে না তখন এই সোনালী ঈগলের ওড়া দেখবার মতো ব্যাপার। পাখিদের মধ্যে এত বড় পাখি এদেশে আর নেই। এরা স্ত্রী পুরুষে এই একই জায়গায় প্রায় গত চোদ্দ বছর ধরে বাস করছে।

নিস্তব্ধ, নির্জন সমস্ত অঞ্চলটা যেন একটি ধ্যানের রাজত্ব। সেই রাজ্যের মধ্যে আমরা হলাম একান্ত আগন্তুক। গোধূলির আলো ধূসর ম্লান হয়ে এসেছে। আমরা পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম। আশে পাশে চারদিকে এখানে হেদার ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। রক্তাভ বেগুনি রঙে পাহাড় ছেয়ে গেছে। হেদারের ফুল থেকে একটা অত্যন্ত হাল্কা মিষ্টি গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে। আমাদের পায়ের শব্দে কোন ঘুমন্ত গ্রাউজের ঘুম ভেঙে গেল। পাশের হেদারের ঝোপ থেকে একটি টর্মিজান ঝটপট করে উড়ে গেল প্রায় মাটির উপর দিয়েই। ঘুম জড়ান গলায় আওয়াজ তুলল—কঃ কঃ কুঃ।

মিঃ ক্রুট্‌স্‌ বললেন, এ জায়গাটায় গ্রাউজ শীকার করে করে আর কিছু রাখে নি। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি তবু গ্রাউজের আওয়াজ আসে কোথা থেকে? তবে এ অঞ্চলের সেরা পাখির গান যদি শুনতে চান তো কাল ভোরবেলায়। সেনা

বাশ্টিং-এর দল তখন চড়া গলায় গান ধরবে। তারা এখন ঘুমোচ্ছে।

আমরা নেমে এসে আবার গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি সোজা ব্যালমোর্যাল ক্যাসেলের পাশ দিয়ে এসে ব্রীমারে পেঁাছাল।

॥ ৩৬ ॥

ব্রীমারে আসতে আসতেই অন্ধকার নেমে এসেছিল। রাতও প্রায় বারোটা বাজে। এখন কোথায় রাত কাটান যাবে। সেইটাই হল চিন্তার কথা। মিঃ ক্লুট্স্ বললেন, এখন সিজ্ন্ শুরু হয়ে ব্রীমারের হোটেলে তিল ধারনের জায়গা নেই। চলুন আমরা আমার এক স্কুল মাস্টার বন্ধুর বাড়ি যাই—

না না, এই রাতে কারুর বাড়ি গিয়ে উপদ্রব করা কী উচিত হবে? আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—

মিঃ ক্লুট্স্ বললেন, মনে রাখবেন অনেক সভ্য হয়েও হাইল্যান্ড এখনো অতিথিদের তাড়াবার মতো সভ্য হয়ে ওঠে নি। এইটাই আপনাদের মতো ভব-ঘুরে লোকেদের একটা আশার কথা—

কেয়ার্ণব্রিকহেড পাহাড়ের নীচে এসে মিঃ ক্লুট্স্ গাড়ি থামালেন। পাহাড়ের তলায় একটি ছোট্ট বাংলোতে গিয়ে দরজায় কলিং বেল টিপলেন। একটু পরেই বাড়ির কর্তা স্কুল মাস্টার বেরিয়ে এসে মিঃ ক্লুট্স্কে জড়িয়ে ধরলেন। আমরা এদিকে গাড়ি থেকে নেমে এসেছি। জ্যাক আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, এটা রোজমেরীর বাড়ি। ঐ হল রোজমেরীর স্বামী বিল পেটিট্র। জিমি মিঃ ক্লুট্সের পিছু পিছু গিয়ে বাংলোর বারান্দায় আগেই উঠে পড়েছিল। মিঃ ক্লুট্স্ তার সঙ্গে মিঃ পেটিট্রর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে আসতেই বিলপেটিট্র আনন্দের সঙ্গে জ্যাকের হাত দুটো ধরে ফেললেন। জ্যাক তাকে একটু আড়ালে নিয়ে অনুরোধ করলে—আমাদের যে আগের থেকে পরিচয় আছে তা যেন ঘুনাক্ষরে প্রকাশ করবেন না। তবে রোজমেরীকে বলবেন যে জিমি এসেছে—

জিমিকে নিয়ে মিঃ ক্লুট্স্ ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন বলে তারা দুজনে কেউই জ্যাকের কথাগুলো শুনতে পেল না।

মিস্টার পেটিট্র আমাদের নিয়ে গিয়ে বাইরের ড্রইংরুমে বসিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে রোজমেরী এসে হাজির। সঙ্গে স্যান্ডউইচের প্লেট।

ছোট খাট, সুন্দরী মেয়ে রোজমেরী। ঢলঢলে চমৎকার কচি মুখখানা। দেখলে মনেই হয় না তার বয়স হয়েছে। মনে হয় না যে সে অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট।

আমি এবার চোখ ফেরালাম জিমির দিকে। দেখলাম জিমির মুখটা সাদা ফেঁকাশে হয়ে গেছে। তার ঠোঁটের কোণ দুটো ঝুলে পড়েছে দুধারে। চোখ দুটো বিস্ময়ে ফেটে বার হবার জোগাড়।

মেরী সবার সঙ্গেই করমর্দন করে চা আর স্যাণ্ডউইচ দিয়ে আপ্যায়ণ করতে লাগল। সেও ঘুনাক্ষরে প্রকাশ করল না যে সে জিমিকে বা জ্যাককে চেনে।

ড্রইংরুমের মেঝেতে ম্যাট্রেস বিছিয়ে আমাদের শোবার আয়োজন হল। মিঃ পেট্রি বারবার দুঃখ করতে লাগলেন, আমাদের আসার খবর যদি আজ বিকেলেও তিনি ঘুনাক্ষরে জানতে পেতেন তবে নির্ঘাৎ একটা ডাক রোস্ট করিয়ে রাখতেন। আর স্কুলের বাড়িতে আরামে শোবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

বিল পেট্রির বৈঠকখানায় রাতের আড্ডা জমে উঠল। মিঃ ক্লুটস্ তাঁর গাড়ির পিছন দিকটা খুলে গোটা দুই হুইস্কির বোতল নামিয়ে নিয়ে এলেন।

আমি বললাম, শুনেছি, মিঃ ক্লুটস্ এই হাইল্যাণ্ডের ভুতুড়ে গল্প সংগ্রহ করে থাকেন। এই রাতের বেলায় ভুতের গল্প যেমন জমে এমন আর কিছু নয়। মিঃ ক্লুটসের যদি আপত্তি না থাকে তো দু একটা ছাড়ুন না।

মিঃ ক্লুট্স্-এর আপত্তি ছিল না। তিনি হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, গ্রীষ্মকালে ভুতের গল্প শোনার সময় বড় অল্প। মাত্র দুঘণ্টা কী আড়াই ঘন্টা অন্ধকার থাকে আকাশে। তারপরই তো গোধুলির আলো দেখা দেবে। যাই হোক তবু আপনারা যখন শুনতে চাইছেন তখন শুনুন।

গ্লাসে আবার একটা চুমুক লাগিয়ে পাইপের ধোঁয়াটা ভিতরে টেনে নিয়ে মৌজ করে বলতে লাগলেন মিঃ ক্লুটস্-হাইল্যাণ্ডের লোকগাথা, লোককাহিনী, পাইপ আর নাচ যেমন তাদের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয় তেমনি এই ভুতের গল্পও তাদের ঐতিহ্যের একটা অঙ্গ।

মজার কথা হল এই যে এগুলোকে হাইল্যাণ্ডাররা ঠিক গল্প বলে মনে করে না। আগের যুগে প্রত্যেকটি হাইল্যাণ্ড বংশের পোষা একটা করে ভুত থাকত। তাদের বলা হত 'ব্রাউনি'। ব্রাউনিরা ছিল বংশের বন্ধু। ধরুন না কেন ম্যাকলাখলানদের কথা। তাদেরও একটা পোষা ব্রাউনি ছিল। সে রোজ সকালে বাড়ির ফার্নিচার নতুন করে সাজিয়ে রাখত। রোজ বাড়ির লোক সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখত ফার্নিচারগুলো অদ্ভুতভাবে ছড়ান। কিন্তু ওটা হল ব্রাউনির নিজস্ব স্টাইলে সাজানর ব্যাপার।

একবার প্রচণ্ড শীত পড়াতে বাড়ির লোকেরা ঠিক করল ব্রাউনির জন্যে একজোড়া ট্রাউজার তৈরী করিয়ে দেবে। কিন্তু ব্রাউনি মাপ দিতে নারাজ। সে ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে আসতে চায় না। শেষে তারা একজোড়া ট্রাউজার তৈরী করে রান্না ঘরের চেয়ারের পিছনে টাঙিয়ে রেখে দিল। ব্রাউনি সেখানে হাজির হয়ে ট্রাউজারটা তুলে নিলে। সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠল,

আরে আরে মাপ ছাড়াই দেখি ব্রীচেস্ বনে গেছে। আর সেটা ঝুলছে পিছনে। এবার মুন্নার (ব্রাউনিটার নাম ছিল মুন্না) কেটে পড়ার সময় হল আর কি—

শেষ পর্যন্ত সে সেই ট্রাউজারটি নিয়েছিল। সেটা সে পরত উল্টো করে। মানে পিছন দিকটা সামনে আর সামনের দিকটা পিছন করে। তার ওপর সে পরত একটা লাল রঙের ওয়েস্ট কোট। একবার ম্যাকলাখলনের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়। বরটাকে ব্রাউনির একেবারে পছন্দ নয়। তবু বিয়ের বন্দোবস্ত হল সেই ছেলের সঙ্গে। ব্রাউনি তো চটে ভোজের সময় বাঁধাল গণ্ডগোল। দেখা গেল যারই সামনে খাবার দেওয়া হচ্ছে সে খাবার উবে যাচ্ছে—

এদিকে রাত অনেক হয়েছে। মিঃ পেট্রী তো হুইস্কির ঝোঁকে প্রায় ঝিমিয়ে পড়ছেন। জিমির অবস্থাও প্রায় সেই রকম। মিঃ কুট্‌স বললেন, এবার একটু গড়িয়ে নিন। ট্রো ভূতের গল্প আরও শোনাব পরে—

ঘুমজড়ান গলায় মিঃ পেট্রী বললেন, বোতলে এখনও খানিকটা মাল রয়েছে। মিঃ কুট্‌স চলুন আমরা ভিতরে যাই। ওঁরা এখানে বিশ্রাম করুন।

জিমি বললে, তবে আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে—

জ্যাক জিমির গলার কলারটা চেপে ধরে বললে, শোবে চল।

ওঁরা দুজনে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন বোতলটাকে শেষ করতে। আমি জ্যাক আর জিমি কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

গাঢ় ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল একটা কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জনে। একই সঙ্গে আর্তনাদ উঠল পাশের ঘর থেকে—বাঁচাও বাঁচাও—

পরক্ষণেই শক্ত কঠিন মেয়েলী গলায় আওয়াজ এল—তুমি শয়তান, একটা আস্ত শয়তান। নৈলে এমন সর্বনাশ তুমি আমাদের করবার চেষ্টা করতে না—

আমি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম সুইচে হাত রেখে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, জিমির গলার আওয়াজ শুনলাম না। কোথায় সে ?

জ্যাক আঙুল দিয়ে ঘরের মধ্যে দেখিয়ে দিলে। ঘরের ভিতর থেকে তখনও কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসছে। আর আসছে জিমির গলা থেকে বার হওয়া একটা গোঙানী।

জ্যাক ঘরের দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে খুলতে গেল। দেখা গেল সেটা চাবি বন্ধ।

জ্যাক এবার চেঁচিয়ে উঠল—মেরী মেরী, দরজা খোল—

বলে সে দরজায় ঘা দিল, জোরে জোরে কয়েকবার।

এত আওয়াজে কিন্তু পাশের ঘরে মিঃ কুট্‌স্ কী বিল পেট্রির হুইস্কির ঘুম ভাঙল না। তাঁরা দুজনে মেঝেতে ম্যাট্রেস্ বিছিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

শেষে মেরী ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল। দেখলাম পরনে ঘুমের

পোশাক। মাথায় টুপী নেই। চুলগুলো বিস্রস্ত। চোখ দুটো ঘোর লাল। মুখের সেই মিষ্টি ছেলেমানুষী ভাবটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। একটা কঠিন হিংস্র জিঘাংসায় তার মুখটা শক্ত হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। সে উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

ঘরের মধ্যে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড বড় এ্যালশেশিয়ান কুকুর জিমির অজ্ঞান হয়ে যাওয়া শরীরটার ওপর থাবা গেড়ে বসে আছে।

জ্যাক দৌড়ে গিয়ে মেরীকে ধরে ফেললে। মেরী জ্যাকের কাঁধে মাথা রেখে ছেলেমানুষের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল। জ্যাক তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

একটু সামলে নিয়ে সে বললে, অনেক দিন থেকে ঐ জানোয়ারটাকে শাস্তি দেবার সুযোগ আমি খুঁজেছি। আজ ঈশ্বর আমার সে সাধ পূর্ণ করেছেন। জানোয়ারটা আমার আর আমার স্বামীর কম অমঙ্গল করার চেষ্টা করে নি। শেষে কিছু না পেরে আমাদের সুখের সংসারে ফাটল ধরাবার চেষ্টায় ছিল।

আমি নিদারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললাম, কিন্তু কুকুরটা যে ওকে কামড়ে মেরে ফেলবে।

মেরী চোখ মুছতে মুছতে বললে, না, বিঙ্গো শুধু ভয় দেখায়, কাউকে কামড়ায় না। সেই ভয়েতেই জিমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করল—তা জিমি তো এই ঘরে শুয়েছিল—ওখানে গেল কেমন করে—

মেরী বললে, চায়ের টেবিলে সবার অলক্ষ্যে আমি একটুকরো কাগজে লিখে জিমিকে ঐ ঘরে আসতে বলেছিলাম—

॥ ৩৭ ॥

গ্রীষ্মের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের যতো গান, যতো মেলা যতো আনন্দ। তখন বেলাও থাকে অনেকক্ষণ। সূর্য ডোবে প্রায় রাত দশটায়। তারপরেও থাকে গোধূলির ধূসর আলো। দুই দু ঘণ্টা অন্ধকার। আবার শুরু হয় প্রভাতের গোধূলি। জুন, জুলাই, আগস্ট-এর আকাশ বেশীর ভাগই থাকে পরিষ্কার—রোদ ঝর ঝরে। এই কটা মাসেই স্কটল্যাণ্ড তার প্রাণরস সঞ্চয় করে নেয় সূর্যের আলো থেকে, সারা বছরের মতো। ফুলের দল ঝাড়ে ঝাড়ে ফোটে যেখানে সেখানে। আপনা থেকেই ঝরে যায়।

বসন্তে বনিস্কোশিয়া নবোঢ়া কিশোরী। তার কুয়াশার ঘোমটা খুলেও খোলে না। ঘোমটার আড়ালে সে ভর-যৌবনা সুন্দরী। জুন, জুলাই, আগস্টে স্কটল্যাণ্ডের সৌন্দর্য অনেকটা স্থির। তার ফুলসম্ভার অফুরন্ত এই

তিনটে মাসে। হাইল্যাণ্ডের সমস্ত পাহাড় আর জঙ্গল ছেয়ে যায় হেদার, রোডোডেন্ড্রন, সাইক্লামেন, প্রিমিওলাতে। কোথাও কোথাও ফোটে সাদা আজিলিয়ারা—গন্ধে ভরে দেয় এক একটা অঞ্চল। ডীর দুই তীরে গ্রীষ্ম আসে সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে। সুদূর উত্তর পশ্চিম হাইল্যাণ্ডেও তার ছোঁওয়া লাগে।

আগস্ট শেষ হতে না হতেই আবার শুরু সেই মেঘ, বৃষ্টি আর ধোঁয়া। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে।

গ্রীষ্মের শেষে স্কটল্যাণ্ড থেকে বিদায় নিলাম। হাসি, গান আর প্রাণের রেশ থাকতে থাকতেই বিদায় নেওয়া ভাল বলে মনে হল।

কিন্তু বিদায় নেবার সময় নাড়ীতে টান পড়ল। বুঝলাম স্কটল্যাণ্ডের সব কিছুর সঙ্গে এ কমাসে এমন জড়িয়ে গিয়েছি—যে পাক খুলতে গেলেই আঁতে টান পড়ছে।

আমার যাবার কথা শুনে থেকে দুই বুড়ি তো কেঁদেই অস্থির। আণ্টি জেন সারা সপ্তা ধরে কি কি ভাল ভাল রাঁধতে পারেন তারই মহড়া দিচ্ছেন। যেন ঘরের ছেলে দূরে বিদেশে যাচ্ছে—ফিরতে লাগবে অনেক দিন।

মিসেস ব্রাউনের মুখ গম্ভীর। খাবার টেবিলে বসেই একবার করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর বলেন—তুমিতো আর মাত্র কটা দিন। আবার কী এদিকে আসবে? যদিই বা আস আমাদের এই দুই বুড়ীকে হয়তো আর দেখতে পাবে না।

বলেন আর চোখে রুমাল চাপা দেন। আমার মনে হয় এবাড়ির সব কিছুই যেন আমার অন্তরে জড়িয়ে গেছে। ঐ বিলিবয়, টোবী কচ্ছপ, র‍্যামসে কুকুরটা পর্যন্ত। ওদেরই বা ছেড়ে থাকব কেমন করে?

থেরেসার মাও আমার যাবার কথা শুনে রুমালে চোখ মুছলেন। থেরেসা ম্লানমুখে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল অনেকক্ষণ। পরে বললে, যাবার আগে আমাদের এখানে ডিনার খেয়ো একদিন।

সবার কাছ থেকে একদিন বিদায় নিতে হল। প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর, ডক্টর রোজ, জ্যাক, শীলা, এমন কি কর্তার সিং, ডোরা বুথি সবার সঙ্গেই দেখা শেষ করলাম। দিলাম আমার বিদায়ের খবর। শ্যামল আর পামেলাকেও একদিন নিমন্ত্রণ করে আমার যাবার কথাটা শুনিয়ে দিলাম। শুনে থেকে শ্যামলের চোখ ছলছল করতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, দাদা, ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে চলে যাই। কতদিন যে কলকাতা দেখিনি।

শেষে গেলাম শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ি। শুদ্ধসত্ত্ব ভিতরেইছিল। নেলীর কদিন খুব জ্বর চলছে। শুদ্ধসত্ত্ব তাই খুব ব্যস্ত।

শুদ্ধসত্ত্বকে বললাম, এবার তো আমাকে ফিরে যেতে হবে—

শুদ্ধসত্ত্ব তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললে, তাই নাকি? এত শীঘ্র—

বললাম, এখানে অনেকদিন তো হয়ে গেল। এবার যাবার পালা।

শুদ্ধসত্ত্বের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ গভীরে চলে গেল। আমাকে ছাড়িয়ে সমস্ত ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে তারা যেন অনন্তে আশ্রয় নিল। মুখে তার একটা অব্যক্ত ভাব খেলা করতে লাগল। ধীর গম্ভীর স্বরে তার কণ্ঠ দিয়ে বার হল—

—সব চেয়ে পুরাতন কথা

যেতে নাহি দিব।

অনন্ত প্রদীপ মুখে শিখা নিব নিব

আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে

কহিতেছে শতবার যেতে দিব নারে।

তবুও সময় হয়

তবু যেতে দিতে হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুদ্ধসত্ত্ব সচকিত হল। বললে, তুমি ভারতে ফিরছ একথাটা মনে করতেই ভারতের জন্য মন কেমন করে উঠল। দেখো সব ছেড়ে দিলেও আমাদের ছেলেবেলাকার স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝে আমাদের বড় বিচলিত করে, নয় কী ?

ঈষৎ ব্যথাতুর চোখের দৃষ্টি তুলে সে ফিকে হাসি হাসতে লাগল।

বললাম, তুমি তো ইচ্ছে করলেই ভারতে ফিরে যেতে পার।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, না পারি নে—

শুদ্ধসত্ত্ব কেমন যেন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সে যেন অনেক নীচে নেমে এসেছে। তার ব্যথা ভরা সেই মনটাকে আমি আবার ধরতে ছুঁতে পারছি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন পার না। এখন তো আমাদের দেশ স্বাধীন। তুমি দেশে ফিরলে তোমাকে দেশের লোক বরণ করে নেবে। চলে এসো না কেন বাংলা দেশে।

শুদ্ধসত্ত্ব আবার সেই রকম ব্যথা ভরা গলায় বললে, না, তা হয় না।

তারপর শুক্‌নো গলায় বললে, বোধি আমায় মাপ কর ভাই। আমার বাংলাদেশের ফেরার কথা বোলো না। আমি বাংলা মার অবাঞ্ছিত সন্তান।

সে কি—

শুদ্ধসত্ত্ব সেই ভাবেই বললে, হ্যাঁ—

নীরবে পাইপ সে টানতে লাগল। আমি তার সামনে বসতে পারলাম না। কে যেন আমাকে ঠেলে সেখানে থেকে উঠিয়ে দিলে। আমি নেলীর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। নেলীর সেই চমৎকার রূপ কোথায় উপে গেছে এই কমাসে। তার চোখের কোলে ক্লান্তির কালি। তার মুখটা অতিমাত্রায় শুকনো। মুখের মধ্যে কেবল নজরে পড়ে তার চোখ দুটো। সে দুটো আগের থেকে আরও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে।

নেলীর কাছ থেকে বিদায় চাইলাম। নেলী শুধু আমার হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে জোরে জোরে ঘষতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বললে, বোধি জান, আমি খুব সুখী—

—সে কি ? তোমার এই অসুখ—

নেলী হাসতে হাসতে বললে, অসুখ হল বলেই না আজ শুদ্ধসত্ত্বের কাছে আমি থাকতে পেরেছি। ওকে সব সময়ে দু চোখ ভরে দেখছি। এই অসুখ বাঁধাবার জন্যে আমি কী না করেছি। দিনের পর দিন স্রেফ কিছু না খেয়ে কাটিয়েছি। কিন্তু আমার শরীরটা ছিল বেয়াড়া রকমে ভালো। কিছুতেই কিছু হল না। একদিন দেখি শুদ্ধসত্ত্বের ক্লিনিকে একটা টেস্টটিউবে রয়েছে যক্ষ্মা রোগের বীজানু। ও সেটাকে কালচার করছে। আমি ওর অজানাতে সেই বিষটা শরীরে নিয়ে নিলাম। তারপর এখন আমি বেশ ভালই আছি—

আমি ভয়ে আঁৎকে উঠলাম—করেছ কী ? শুদ্ধসত্ত্বকে বলেছ এ কথা ?

নেলী খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরল—খবরদার, ওকে তুমি এ কথা বোলো না। আর তুমি তো কাল চলেই যাবে। এর পর আর কেউ জানবে না এ কথা।

নেলীর ঘর থেকে ছিটকে বাইরে চলে এলাম। ড্রইংরুমে শুদ্ধসত্ত্ব আগের মতোই চুপচাপ বসে পাইপ টানছে আর অন্যমনস্ক ভাবে একটা কী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রশ্ন করল—নেলীকে কেমন দেখলে—

—খুব খারাপ—উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে বললাম, ও বাঁচবে তো—

শুদ্ধসত্ত্ব একটু ম্লান হেসে বললে, সেকথা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ বলতে পরে না। তবে রোগীর সারবার ইচ্ছেটা অনেক সময় ডাক্তারদের চিকিৎসা করতে সাহায্য করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখছি নেলীর সারবার কোন ইচ্ছেই যেন নেই।

আমি বললাম, কিন্তু তার জন্যে তুমি কি নিজেকে দায়ী বলে মনে করো না শুদ্ধসত্ত্ব ?

শুদ্ধসত্ত্ব এক মুহূর্তের জন্যে যেন একটু থমকে গেল। পরক্ষণেই প্রশান্ত হাসি হাসতে হাসতে বললে, তা কিছু কিছু করি বৈকি।

বললাম, কিছু কিছু মানে ? আমার তো মনে হয় তুমি নেলীর অসুখের জন্যে পুরোপুরি দায়ী।

শুদ্ধসত্ত্বের হাসিটা আরও বিস্তৃত হল। এবার দেখলাম সেই পুরোন শুদ্ধসত্ত্ব আবার ফিরে এসেছে। এক দৃষ্টে সে আমার দিকে দেখছে যেন প্রবীণ শিক্ষক পরম কৌতুকের সঙ্গে অকালপক্ক ছাত্রের বক্তৃতা শুনছে। এমনি একটা ভাব।

মুখের ওপর সেই ভাবটা বজায় রেখেই সে বললে, নেলী তোমাকে বলেছে—আমাদের সম্বন্ধের কথা—

—কিছুটা—

—তাতে করে নিশ্চয় তুমি আমাকে একটা নারীহন্তা বলে ধরে নিয়েছ, নয় ? কিন্তু আমার তো এতে কিছু বলার নেই বোধিসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব বললে শুধু একটা কথা বলি তোমাকে। যে কারণে আমি বাংলাদেশে ফিরতে পারছি না ঠিক সেই কারণেই আমি নেলীকে গ্রহণ করতে পারি নি। সে কারণটা তুমি আমার কাছ থেকে আর শুনতে চেয়ে না ভাই। সেটা বলা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ি থেকে যখন বার হয়ে এলাম তখন মনে নানা রকম তোলা-পাড়া চলছে। নেলীর কথা মনে পড়তেই শুদ্ধসত্ত্বের ওপর বিতৃষ্ণা আসছে। আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে কী এমন কারণ শুদ্ধসত্ত্বের থাকতে পারে যা শুদ্ধ-সত্ত্বের মতো একজন স্থিতধী লোককেও ভারতে যেতে বাধা দিচ্ছে। মানব প্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক শুদ্ধসত্ত্বের এ কোন ছল ?

হঠাৎ এক ঝাঁক কুকুরের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। রাজগীরের বাজারের কাছে চলে এসেছি এতক্ষণে। পা অভ্যস্ত পথ ভুল করে নি। কনকনে শীতের রাতে এর মধ্যেই লোকজন ঘরের ভিতর গিয়ে আস্তানা নিয়েছে। তাই রাস্তায় লোকজন কম। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল ঝিমঝিম করে গ্যাসের বাতিগুলো জ্বলছে।

আমি আস্তে আস্তে গিয়ে আমার অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বাইরের রাস্তা থেকে এক টুকরো আলো এসে ঘরটার মধ্যে পড়েছিল। আলো আর জ্বাললাম না। মেঝেতে পাতা বিছানাটার ওপর গড়িয়ে পড়লাম।

॥ ৩৮ ॥

পরের দিন ভোরের বাসে সটান নালন্দায় হাজির হলাম। গত রাতেও সারা রাত জ্যাকের কথা মনে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খুব বেশী করে মনে পড়েছে শুদ্ধসত্ত্ব আর নেলীর কথা।

ভারতবর্ষে ফেরার পর প্রথম কয়েকটা মাস শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে চিঠি পত্রের আদান প্রদান ছিল। তাতে সে নিজের কথা বা নেলীর কথা কিছু মাত্রও উল্লেখ করত না। অদ্ভুত লোক শুদ্ধসত্ত্ব। অথচ আমি নেলীর খবর পাবার জন্যে মনে মনে উন্মুখ হতাম কম নয়। ধীরে ধীরে চিঠি পত্রের আদান প্রদান কমতে লাগল। গত কয়েক বছর আর শুদ্ধসত্ত্বের কোন খবরই পাই নি। একমাত্র জ্যাক আমাকে রীতিমতো চিঠি লিখতো। তার শেষ চিঠি গত ছমাস আগেও পেয়েছি।

নালন্দা মহাবিহারে গিয়ে খোঁজ করতে একজন গাইড আমাকে নিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। নতুন তৈরী বাড়িগুলি প্রাচীন নালন্দার ওপর যেন জীবনের ছোঁয়া এনেছে। হোস্টেলে বাস করছে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আসা ছাত্রের দল। চীনা, বার্মিজ, তিব্বতী, জার্মান আরও অনেকে। তাদের ভিতর থেকে জ্যাককে খুঁজে বার করলাম। হোস্টেলের একটেরে একখানা ঘরে সে জায়গা পেয়েছে।

ঘরের দরজা খোলা। দেখি জ্যাক ঘরের মেঝেতে পাতা একটা মাদুরের ওপর বসে শীতের সকালে রোদে পিঠ দিয়ে পরম আরামে কী একটা বই পড়ছে।

আমি ডাকলাম—জ্যাক—

আমার ডাক শুনে সে ধড় মড়িয়ে উঠে পড়ল। দরজার দিকে ফিরেই আমাকে সাপটে বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, জ্যাক নয়, আনন্দ—

আমাকে টেনে নিয়ে সে ঘরের মেঝেতে পাতা মাদুরটার ওপর বসিয়ে দিলে। বললে, একটু বস, চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যাক আর চা দুই-ই এসে হাজির। আমরা চা খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম।

বললাম, গত কাল সন্ধ্যাবেলা তোমাকে দেখা থেকে মন আমার ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেছে। কেবল মনে পড়ছে স্কটল্যাণ্ডের, আবার্ডিনের কথা। মনে পড়ছে আণ্টীজেন, মিসেস ব্রাউনের কথা। মনে পড়ছে ডক্টর রোজ, প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর আর তাঁর ছাত্র জ্যাককে। মনে পড়ছে থেরেসাকে, শ্যামল—পামেলাকে। মনে পড়ছে শুদ্ধসত্ত্ব, নেলীকে। এমন কি ডোরা বুথিকেও আজ মনে পড়ছে ভীষণ ভাবে। আশা করি আবার্ডিনের জীবন যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলছে—

জ্যাক বললে, অনেক কথা জমে আছে, তোমাকে জানাবার জন্যে। আশা করি তোমার ফেরবার কোন তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে সব কথা শোনাবার মতো সময় দিতে পারবে।

বললাম, আমি এখানে এসেছি ছুটিতে বেড়াতে। কাজেই তাড়া করবার মতো কারণ আমার নেই—

জ্যাক বললে, তোমার বাড়িউলী দুই বুড়ীর একজন মারা গেছেন খবর জান নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, মিসেস ব্রাউন সেরিব্রাল স্ট্রোকে মারা গেছেন খবর পেয়েছি। বুড়ি আণ্টি জেন আজও বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁর দুটো চোখই খারাপ হওয়ার জন্যে আমাকে আর চিঠি লিখতে পারেন না।

—আণ্টি এ্যানীকে তোমার মন আছে? জিজ্ঞাসা করল জ্যাক। সেই রসাল বৃদ্ধাটিকে। তিনি মিসেস ব্রাউন মারা যাবার এক সপ্তা আগে রবি বার্ণস্‌-এর জন্মদিনে এতো মদ খেয়েছিলেন যে, তাতেই হার্ট ফেল করে মারা যান। আণ্টি

এ্যানীর কথা উঠতেই মনে পড়ল সেই সুন্দরী বৃদ্ধাটিকে। যত্ন করে চুল কোঁকড়ান, কানে মুক্তোর দুল, গলায় মুক্তোর শেলী, চোখে সুর্মা, ঠোঁটে লিপস্টিক, হাতে 'নিউজ অব্ দি ওয়ার্লড্'-এর একখণ্ড। এখন তখন রসিকতায় ভেঙে পড়ছেন আণ্ট এ্যানী। বার্ণস্ থেকে অনর্গল আবৃত্তি করছেন।

জ্যাককে জিজ্ঞাসা করলাম—শ্যামলের খবর কিছু জান।

জ্যাক বললে, আমি আর শ্যামল এক সঙ্গে লণ্ডনে এসেছিলাম সেবার। ছিলাম একই হোটেলে। বেচারা শ্যামল সেই হোটেলে খুন হয়। রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ড বলে তার একজন বন্ধু তাকে খুন করে। ব্যাপারটা কাগজে পর্যন্ত উঠেছিল—

গলার কাছটা ভারী হয়ে উঠেছিল। সেটা সাফ করে নিয়ে কোন রকমে বললাম, হ্যাঁ এদেশেও খবরটা বার হয়েছিল। আচ্ছা রবার্ট যে ওকে খুন করল তার কারণ কিছু জানো ?

জ্যাক বললে, বিশেষ কিছু না। তবে পামেলা বলে যে মেয়েটিকে শ্যামল সঙ্গে নিয়ে ঘুরত শোনা যায় সেই হল তার উপলক্ষ।

জিজ্ঞাসা করলাম—পামেলাকে আবার্ডিন ছাড়বার আগে দেখেছ—

জ্যাক বললে, দেখি নি। তবে তার সম্বন্ধে শুনেছি কিছু কিছু। ডোরা বুথিকে তোমার মনে আছে ? তুমিই একদিন তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। অবশ্য দিতে বাধ্য হয়েছিলে। পরে আবার আমাকে সাবধান করেও দিয়েছিলে। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে এমন লেপটে গেল যে তাকে কিছুতেই আর সরাতে পারলাম না। মেয়েটি ভয়ানক গরীব ছিল বলে পয়সার ধান্ধায় নানা বদ কাজ করত। আমি তাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি দিতেই সে তার সেই বদ অভ্যাসগুলো একে একে ছেড়ে দিলে। আসলে মেয়েটির মধ্যে ভাল হবার মতো উপকরণ ছিল। ভালবাসবার মতো গুণও ছিল যথেষ্ট। যাক, তার কথা পরে বলছি তোমায়। আবার্ডিনের বাজে মেয়েদের আড্ডায় এক সময়ে তার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল বলে ওখানকার সব কেচ্ছাই সে জানত। সে আমাকে একদিন কথায় কথায় বলেছিল পামেলার কথা। মেয়েটির বয়স কম। এই বয়সেই মিসেস মরিসন পামেলাকে এই দিকে ঠেলে দিয়েছে।

—শ্যামল যে তাকে বিয়ে করবে বলেছিল। বললাম আমি।

—মরিসন গিন্নীর খপ্পর থেকে তাকে উদ্ধার করা এরকম হাজারটা শ্যামলেরও কাজ নয়। বললে জ্যাক।

বুঝলাম কেন রবার্ট ম্যাকডোন্যাল্ড শ্যামলকে খুন করেছে। একদিনের কথা আমার খুব স্পষ্টভাবে মনে হল। রবার্ট বলেছিল, ও যদি পামেলাকে শেষ পর্যন্ত কদর্য জীবন থেকে রক্ষে করতে না পারে তাহলে ওকে আমি খুন করব—শ্যামলের কথা ভেবে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। পরে বললাম, হ্যাঁ

তোমার কথা কি যেন বলছিলে ? ছ মাস আগে আমাকে একটি খুব রহস্যময় চিঠি লিখেছিলে মনে আছে ? জ্যাক হেসে বললে, কারগফ ইউথ হোস্টেল থেকে তো ? তখন সেখানে আমি ওয়ার্ডেন হয়ে রয়েছি। আমার সভ্য জগতের ওপর বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। তাই সেই পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা জায়গাটায় বাস করছিলাম—ডোরা বুথিকে নিয়ে। ও আমার সেবায় নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছিল। মেয়েটি সত্যি সত্যি আমাকে ভালবেসেছিল তার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে। কিন্তু আসলে সে ছিল বড় হতভাগিনী।

—কেন—

—কারগফে থাকতে থাকতেই একদিন তার তেড়ে জ্বর এল। তারপর তার ঠোঁটের ওপর জিভের ওপর ফোস্কা বার হতে লাগল। দেখেশুনে আমি পাথর হয়ে গেলাম। বুঝলাম তাকে কালব্যাধিতে ধরেছে। বলে জ্যাক একটু থামল। পরে বললে, চিকিৎসা করবার জন্যে তাকে আবার্ডিনে নিয়ে এলাম। কিন্তু দুদিন পরে দেখি সে ঘর দোর ছেড়ে কোথায় হাওয়া হয়েছে। বুঝলাম সে আমাকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু মুক্তি তো আমি চাই নি সেদিন বোধি। আমি চেয়েছিলাম তাকে সারিয়ে তুলে তার সঙ্গেই ঘর করতে। কারণ তার মধ্যে ভালবাসায় ভরা মনটাকে আমিই যে প্রথম আবিস্কার করেছিলাম—

জ্যাক একটু থেমে বললে, থাক সেকথা। ডোরা বুথি পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম, ঢের হয়েছে আর না। মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে রীতিমতো উঠে পড়ে লেগে গেলাম। ভাবলাম যখন এই পৃথিবীতে মানুষের আঁকড়ে ধরবার মতো কোন কিছু শক্ত অবলম্বন নেই তখন আঁকড়ে ধরবার এই বাসনাকে শেষ করা দরকার। কিন্তু কি করে তা করা যায় ? প্রফেসর ম্যাকিন্টরের কথাগুলো বারবার মনে পড়তে লাগল—যদি সেই সুপ্রীম ব্লিসকে, সেই অখণ্ড শান্তিকে লাভ করতে চাও তবে ভারতবর্ষ হল তার সবচেয়ে বড় জায়গা।

কিন্তু ভারতবর্ষে গেলেই তো হবে না। ভারতবর্ষ একটি বিশাল জায়গা। সেখানে শুনেছি রাস্তায় অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী পাওয়া যায়। যাদের বেশীর ভাগই হল ভুয়ো সাধু। ভারতবর্ষে এমন কে আছে যে আমাকে এই বাসনা নিবৃত্তির পথ দেখাতে পারবে ? সেখানকার কোনটা ঝুটো আর কোনটা আসল তা কেমন করে জানব ? সেখানকার ভাষা আমি বুঝি না। সেখানকার রীতিনীতিও কিছু জানি না। আমি মনে মনে গভীর চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম। কিন্তু অস্থির হয়ে রইলাম ভারতে যাত্রা করবার জন্যে।

—এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটল।—বলে জ্যাক আমার মুখের দিকে তার পুরু লেন্সের চশমা মোড়া চোখ দুটো তুলে মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বললে, এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রহস্য লুকিয়ে আছে। জান বোধি—

বললাম, একটা কেন অনেক রহস্যই তো আছে।

জ্যাক বললে, সবচেয়ে বড় রহস্যটার কথা আমি বলছি। এই সৃষ্টির একটা অনুর সঙ্গে অপর একটা অনুর যোগসূত্র অচ্ছেদ্য। একটা ঘটনার সঙ্গে অপর আর একটা ঘটনাও অচ্ছেদ্য কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা। তাই যে কোন একটা ঘটনা-সূত্রে টান পড়লে সব কটা কার্যকারণেই সঙ্গে সঙ্গে টান পড়ে। তখন আপাত দৃষ্টিতে যে সব পুরোনো অধ্যায়গুলিকে মনে হয়েছিল একেবারেই শেষ হয়ে গেছে, তারাও আবার চোখের সামনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

—জ্যাক, কথাটা বড় জটিল লাগছে আমার কাছে—বললাম আমি।

—একটুও জটিল নয় ব্যাপারটা। বললে জ্যাক। উদাহরণ দিলেই বুঝবে। আমার জীবনই হল এর একটা উদাহরণ। বললাম না, যখন আমি পথ পাবার জন্যে, ভারতে যাবার জন্যে মনে মনে খুবই উৎসুক তখন একটা ঘটনা ঘটল। অথচ সে ঘটনার আসল নায়ক হল শুদ্ধসত্ত্ব। আমি হলাম তার মৌন সাক্ষী। কিন্তু তাতে আমি আর শুদ্ধসত্ত্ব দুজনেই যে পথ পেলাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, শুদ্ধসত্ত্বের আবার কি ঘটল ? নেলী আছে কেমন ? শুদ্ধসত্ত্বই বা কেমন আছে—

জ্যাক আমার প্রশ্নগুলোকে সরাসরি এড়িয়ে গিয়ে বললে, শুদ্ধসত্ত্বের গল্পটা তোমায় বলি শোন তাহলেই জানতে পারবে সব।

মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, শুদ্ধসত্ত্বের গল্প তুমি আমাকে আর কী শোনাবে বল ? নেলীর ওপর তার আচরণ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি —তা তুমি যাই বল না কেন—

জ্যাক বললে, ও ব্যাপারটাতে শুদ্ধসত্ত্বকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

—বল কি তুমি ? তুমি তাহলে ভিতরের কথা জান না—

জ্যাক প্রশান্তভাবে হাসতে হাসতে বললে, শুদ্ধসত্ত্বের ভিতরের কথা এক আমি আর শুদ্ধসত্ত্ব ছাড়া আর তৃতীয় কেউ জানে না। শুদ্ধসত্ত্ব নিজেও তার জীবনের রহস্যটুকু কোনদিন জানতে পারত না, যদি না মানসিং-এর সঙ্গে আবার্ডিনে তার দেখা হত।

—কে মানসিং ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—শুদ্ধসত্ত্বের বাবার মোটর চালাত সে। বললে জ্যাক।

অবাক হয়ে বললাম, শুদ্ধসত্ত্বের বাবার মোটর ড্রাইভার মানসিং আবার্ডিনে এল কি ভাবে ?

জ্যাক বললে, ব্যাপারটা ঘটল ভারী ইণ্টারেস্টিং। শোন বলছি সেই গল্প।

ডোরা বুথিকে নিয়ে আমি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলাম এ্যাণ্ডারসন ড্রাইভের দিকে। জায়গাটা ফাঁকা আর নিরালা বলে আমার পছন্দ হয়েছিল। তা ছাড়া

ডোরার যে রোগ তাতে তাকে নিয়ে শহরের মাঝখানে থাকতে খুব বেশী উৎসাহ পাই নি। তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে মনে মনে একটু নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ খুঁজছিলাম। এমন সময় সে নিজেই একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে গিয়ে আমাকে মুক্তি দিলে। সে নিজে মুক্তি পেল কি না জানি না। কিন্তু সেই হতভাগিনীর কথা ভাবতে ভাবতে মনটা খারাপ হয়ে যেতে লাগল।

একদিন গেলাম মিসেস ব্রাউন আর আণ্টি জেনের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক দিন ওঁদের সঙ্গে দেখা করি নি। আমি যেতেই দুই বুড়ির খুব আনন্দ। আমাকে রাতের ডিনার খাইয়ে ছাড়বে বলে তো আটকে ফেলল। আণ্টি জেনের দরদ দেওয়া রান্না বহুদিন পরে খেয়ে ড্রইংরুমে আণ্টির পিয়ানো শুনছি এমন সময় হাতের কাছে টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি টেলিফোনটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—কাকে চাই?

টেলিফোনের ওপর থেকে প্রশ্ন এল—এখানে কী মিস্টার মৈত্রেয় বলে কোন ভারতীয় ভদ্রলোক থাকেন?

—তিনি তো দেশে ফিরে গেছেন—বলেই, হঠাৎ মনে হল তোমার কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধব হয়তো তোমার খোঁজ করছে। কিন্তু তোমার পরিচিত সব বন্ধুই তো আমারও পরিচিত। তাই একটু কৌতুহল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কে কথা বলছেন জানতে পারি কী? আমি মিঃ মৈত্রেয়র বিশেষ বন্ধু জ্যাক।

উত্তর এল—আমি ফ্লোরার হয়ে কথা বলছি। সে বিশেষ অসুস্থ। আপনি যদি এখুনি একবার দয়া করে আসেন তো বড় ভাল হয়।

বলে যে ফোন করছিল সে বাড়ির ঠিকানাটা জানিয়ে দিল। জায়গাটা ব্রীজ স্ট্রীটের চৌমাথার কাছেই।

আমি তক্ষুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে জায়গাটায় পেঁছালাম। দেখি বিরাট একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। তারই তিনতলার ভিতরকার একটা ঘরে বিছানার উপর ক্যাথলিন মায়ার শুয়ে আছে। জায়গাটা দেখে বুঝতে দেরী হল না এখানে কিছু গোপন কারবার চলে। ঘরটায় ডেটলের গন্ধ ভর ভর করছে। পাশেই একটা নার্স বসে আছে। সেই-ই আমাকে টেলিফোন করেছিল ডিনারের পরে।

আমার মুখ থেকে বার হয়ে গেল—ফ্লোরা—

জ্যাক বললে, হ্যাঁ, ফ্লোরা ওরফে মিসেস ক্যাথলিন মায়ার। ডোরা বুথির কাছে তার নাম আমি খুব কম করে হবে একশোবার শুনেছি। সে ডোরার খুব পরিচিত ছিল।

কিন্তু আমি যখন হাজির হলাম তখন ফ্লোরার হাত পা ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। নার্সটাকে পাশের ঘরে এনে ধমকাতে লাগলাম। সে ভয়ে কেঁদে ফেলে সব কথা ফাঁস করে দিলে। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম—এটা হল কর্তার সিং-এর চেম্বার। সে সেখানে ভারতীয় গাছ গাছড়ার সাহায্যে

অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে। কিন্তু ফ্লোরার কেসটা নাকি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। কর্তার সিং কী একটু ওষুধ দিয়ে চলে গেছে বাড়িতে। এদিকে রোগী প্রতি মুহূর্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে নার্সটি ভয় পেয়ে ফ্লোরাকে জিজ্ঞাসা করে, কাউকে ডাকবে কি না। সে অতি কষ্টে তোমার নাম ঠিকানা দেয়।

কিন্তু সে ঠিকানা দিয়েছিল মিসেস মরিসনের বাড়ির। সেখানে টেলিফোন করে নার্সটি মিসেস ব্রাউনের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে। নার্সটির বয়স খুবই কম, ছেলেমানুষ। কাঁদতে কাঁদতে বললে, এ রুগী তো মারাই যাবে। যে রকম রক্তপাত হচ্ছে ওতো বাঁচবে বলে মনে হয় না। আর আমিও রক্ষে পাব না। ও মরে গেলে লোক জানাজানি হবে। পুলিশ আমাকে রেহাই দেবে না।

আমি ক্যাথলিন মায়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অতি কষ্টে চোখ মেলে ধীরে ধীরে বললে, মিঃ মৈত্রেয় কী এখানে নেই ?

বললাম, না, তিনি ভারতবর্ষে চলে গেছেন অনেক দিন।

ফ্লোরা বললে, আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমি বেশীক্ষণ বাঁচব না। আমার কাছে কিছু টাকা আছে আমি কী আপনাকে বিশ্বাস করে দিয়ে যেতে পারি ? একজনের কাছে সেই টাকাটা পৌঁছে দেবেন আপনি। সে এই টাকাটা না পেলে বিনা চিকিৎসায় না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

আমি তখন ভাবছিলাম—একে এক্ষুনি একজন ভাল ডাক্তারের হাতে দেওয়া দরকার। নাহলে বেঘোরে প্রাণ দেবে বেচারা। কিন্তু কেসটা খারাপ। লুকোছাপার ব্যাপার এতে আছে। সবটাই এর আইনের বিরুদ্ধে। যে কোন একজন ডাক্তার ডাকলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। আর কাঁচ নার্সটাও বিপদে পড়ে যাবে। হঠাৎ মনে হল শুদ্ধসত্ত্বের কথা।

তুমি চলে আসবার পর আমি শুদ্ধসত্ত্বের একজন গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। তার আকাশের মতো নির্মল উদার চরিত্রটা আমার কাছে অনেক দূরের জিনিস বলে মনে হত। তাতে আমি মুগ্ধ হতাম। নেলী সম্পর্কে তুমি যেমন শুদ্ধসত্ত্বের দোষ গুণের বিচার করতে তেমন কিছু করতে আমার মন একবারেই রাজী ছিল না। আর শুদ্ধসত্ত্বও আমাকে স্নেহ করতে শুরু করেছিল তার একজন বিশিষ্ট বন্ধু হিসেবে।

আমি শুদ্ধসত্ত্বকে টেলিফোন করলাম তক্ষুনি। মনে হল সে এসে হয় তো এই বিশ্রী অবস্থার হাত থেকে রোগীকে বাঁচাবার একটা পথ করে দিতে পারবে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব এসে হাজির। সব দেখে শুনে সে হাসপাতালে টেলিফোন করে একটা এ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে মিসেস্ ক্যাথলিন-মায়ারকে সেখানে নিয়ে গেল। শুদ্ধসত্ত্বকে আবার্ডিনের হাসপাতালের প্রায় সব ডাক্তাররাই চিনতেন। কাজেই ব্যাপারটার খুব বেশী নাড়াচাড়া হল না।

কিন্তু ফ্লোরাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচান গেল না। খুব দেরী হয়েছিল তার চিকিৎসাতে। [illegible]গে সে তার ব্যাঙ্কের পাশ বইটা শুদ্ধসত্ত্বের হাতে তুলে দিয়ে বললে, এ[illegible] দেড়হাজার পাউণ্ডের মতো আছে। এর সমস্তটা আমি আমার শরীর বেচে জমিয়েছি, আমার এক বন্ধুর চিকিৎসার জন্যে। সে বহুদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছে। তাকে এদেশের সব ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছে। সে এখন ভারতবর্ষে যেতে চায়। সেখানে ক্যানসারের ওষুধ পাওয়া যায়।

ফ্লোরা তার বন্ধুর নাম আর ঠিকানা দিল। তার কাছ থেকেই পেলাম মানসিং-এর ঠিকানা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাসল্ গেটের কাছে সেই ঠিকানা বার করলাম। একটা পুরোন ঝরঝরে বাড়ির মধ্যে একটা এঁদোপড়া স্যাত-সেঁতে ঘরে মানসিং-এর সন্ধান পাওয়া গেল। দেখলাম একটা অস্থিসার কংকাল চুপচাপ খাটের উপর বসে আছে। তবে তার চেহারাটা দেখলে মনে হয় সুস্থ অবস্থায় লোকটার কাঠামোটা ছিল বিরাট। প্রকাণ্ড চওড়া হাতখানা শুধু এখন চামড়ায় ঢাকা। তার ওপর উল্কীতে 'ম' অক্ষরটা লেখা আছে দেবনাগরীতে বেশ বড় করে।

জ্যাকের কথা শুনে আমার বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। এখন বুঝলাম সেদিন মিসেস ক্যাথলিন মায়ার কি করে আমার রুমালটাকে চিনতে পেরেছিল।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জ্যাক বললে, কি ভাবছ ?

বললাম, ফ্লোরা ওরফে ক্যাথলিন মায়ারকে মনে করার চেষ্টা করছি।

জ্যাক বললে,এমনতর ভালবাসার কথা আমি জীবনে শুনি নি। প্রেমাস্পদকে বাঁচাবার জন্যে নিজের দেহ পর্যন্ত বেচে দেয়। তুমি শুনেছ ?

বললাম, শুনেছি কিন্তু দেখি নি। ক্যাথলিন মায়ারের আসল কথাটা সেদিন জানতাম না বলে তাকে আমি সত্যি বলতে কী ঘৃণাই করেছিলাম কিছুটা। কিন্তু আজ তোমার কাছে তার কথা শুনে মনে হচ্ছে দারুণ ভুল হয়ে গেছে আমার।

জ্যাক বললে, শুদ্ধসত্ত্বও সেই কথাই বলেছিল। বলেছিল, এ নারী যে কোন মহিয়সী নারীর সঙ্গে এক আসনে বসবার উপযুক্ত। যাক্ সেকথা। আমি বলছিলাম মানসিং-এর কথা—

মানসিং-এর মুখের দাড়ী, মাথার চুলগুলো পেকে ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তার শরীরে কিছুই ছিল না, কিন্তু তার চোখ দুটোর দিকে চেয়ে অবাক হলাম। সেখানে রোগ ভোগের কোন চিহ্নই নেই। প্রশান্ত স্নিগ্ধ অচঞ্চল সে চোখের দৃষ্টি।

মানসিং জ্যাক আর শুদ্ধসত্ত্বকে দেখে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু দেখা গেল

দাঁড়াতে গেলে তার পা দুটো থরথর করে কাঁপে। সে আবার টলে। শুদ্ধসত্ত্ব গিয়ে তাকে ধরে আবার বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ইতস্তত করবার পর সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি মিস্টার সিং ?

পরিষ্কার ইংরেজীতে জবাব এল—হ্যাঁ। আপনারা আমার এখানে কেন এসেছেন জানতে পারলে বাধিত হব।

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, ফ্লোরা বলে কোন মহিলাকে আপনি জানতেন ?

মানসিং-এর দাড়ির জঙ্গল চিরে একটুকরো ম্লান·হাসি বার হয়ে এল। সে বললে, খুব জানি। কিন্তু আপনারা কি তারই জন্যে এখানে এসেছেন ?

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, না, তাঁর খোঁজে নয়। তবে তাঁর সম্বন্ধে একটা দুঃসংবাদ আপনাকে জানাতে এসেছি।

মানসিং-এর শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। সে দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—দুঃসংবাদ ?

শুদ্ধসত্ত্ব বললে, হ্যাঁ তিনি গতকাল রাতে মারা গেছেন। তাঁর দেহটা হাস-পাতালে রয়েছে। শেষ কাজ করবার আগে কী আপনি তাকে একবার দেখতে চান ?

কথাটা শোনামাত্র মানসিং তার মুখের ওপর কংকালসার আঙুলগুলো চাপা দিল। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বললে না। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জলে চুঁইয়ে পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর সে মুখ খুলল। বললে, চারদিন আগে একবার সে এখানে এসেছিল। তারপর তার আর কোন সংবাদই পাই নি। কী হয়েছিল তার ?

শুদ্ধসত্ত্ব জবাব দিল—হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। কিন্তু মারা যাবার আগে তিনি আপনাকে দেবার জন্যে আমার কাছে কিছু টাকা রেখে গেছেন।

বলে শুদ্ধসত্ত্ব তাকাল মানসিং-এর মুখের দিকে। জ্যাকও দেখল। মানসিং আবার একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, আমি অথর্ব হয়ে পড়ার পর থেকেই ফ্লোরা আমার সব খরচ চালাচ্ছিল। কিন্তু কি করে যে সে এই খরচের টাকা রোজগার করেছে—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যাক, এখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি তাঁর কোলে তাকে টেনে নিয়েছেন—

এই কটা কথা বলেই মানসিং হাঁপিয়ে উঠল। তার সেই প্রশান্ত চোখ দুটো জলে ভরে গেল। শুদ্ধসত্ত্ব তার আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল। বললে, আপনি কী তাকে একবার দেখতে চান ?

মানসিং বললে, না। তাছাড়া আমার নড়বার

বলে তার চোখদুটো শুদ্ধসত্ত্বের মুখের ওপ

মুখখানা দেখতে দেখতে সে বললে, কিছু মনে কর